REGISTERED No. C. 197.

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

বৈশাখ, ১৩১৭।
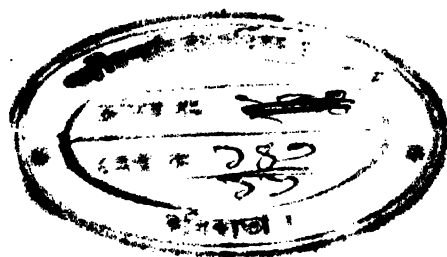
REGISTERED No. C. 102.

কৃষক।
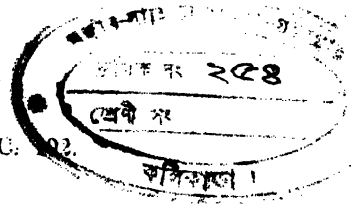
কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

ষোড়শ খণ্ড,—১ম সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্

বৈশাখ, ১৩২২

কলিকাতা; ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েশন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপন।

১৯১৫ সালের ৪ আইন আমরা ভারতগর্ণমেণ্টের [illegible] হইতে উক্ত আইনের প্রতিলিপি প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান যুদ্ধ যতদিন চলিবে ততদিন ও তাহার পরে আরও ছয় মাসকাল পর্য্যন্ত এই আইন বলবত থাকিবে। সাধারণের বিপন্নিবারণ ও ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের শান্তিরক্ষার নিমিত্ত এই আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। মিথ্যা বা ভয়াবহ বা অসন্তোষ জনক সংবাদ রটনা দ্বারা কিম্বা কার্য্যতঃ দেশের শান্তির ব্যাঘাত উৎপাদন করিলে দোষী ব্যক্তির কি প্রকারে দণ্ডবিধান করা হইবে তাহারই বিধি ব্যবস্থা হইয়াছে।

কৃষক।

সূচীপত্র।

বৈশাখ ১৩২২ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষিশিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিকপত্র

১৬শ খণ্ড। { বৈশাখ, ১৩২২ সাল। } ১ম সংখ্যা।

পাটের জমিতে আলু ও রবি শস্যের চাষ

শ্রীউপেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী—গিরিডি

গত দুই বৎসর হইতে বঙ্গীয় কৃষককুলের দৈবনিগ্রহে পাট চাষে সম্পূর্ণ ক্ষতি হইতেছে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান বর্ষে, পাটের আবাদ সমগ্র বঙ্গে ভাল হইয়াও, ক্রেতার অভাবে একেবারেই ক্ষতি হইয়াছে। ইহা স্পষ্টতঃ ভগবানের অভিপ্রায় ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। নীলের আবাদও বঙ্গদেশ হইতে এই ভাবেই, উঠিয়া গিয়াছিল। দৈব আঘাত ভিন্ন মানুষের কোন বিষয়ে চৈতন্য হয় না। পাট চাষে চাষারা আশু এবং অসময়ে চাকচিক্যশালী আশাতীত রজত মুদ্রা পাইয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া অমিতব্যয়ীতা দোষে, নিজ নিজ বিলাসের বস্ত্র খরিদ, আহার বিহারের স্বচ্ছন্দতা, জমিদারের খাজনা, এবং মহাজনের দেনা শোধ করিয়া সমুদায় টাকাই ব্যয় করিয়া ফেলে। বাজারে খাদ্যাদি খরিদের সময় একগুণ জিনিষের তিনগুণ দাম দিয়া ক্রয় করতঃ ছয়মাসের মধ্যেই সংগৃহীত টাকা খরচ করিয়া পুনরায় স্থানীয় কৃষিব্যাঙ্ক ও অন্যত্রে উত্তমর্ণের দারস্থ হয়। সঞ্চয়শীলতা কাহাকে বলে, তাহা মূর্খ কৃষকেরা আদৌ জানে না। এই জন্যই "তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে।" এই পুরাতন সঙ্গীতের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। এবার পাটে হঠাৎ এই দুর্দ্দশা দেখিয়া লোকের সেই জ্ঞানটুকু হওয়া উচিত। তবে কোন কোন বুদ্ধিমান, দূরদর্শী লোকে, কিছু বুঝিয়া চলিতে জানে, স্বীকার করা যায়। উৎপন্নকারী কৃষককুলের দোষেই বর্ত্তমান দেশের এত দৈন্য দশা

ও অভাব আসিয়া পড়িয়াছে, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাও স্বীকার্য্য বিষয় যে, চাষার ঘরে অন্ন না থাকিলে, সমগ্র দেশেই হাহাকার উঠে। চাষা ভাইরা যদি নানাবিধ ধান, তরিতরকারি, তৈলশস্যের চাষ, একেবারে তুলিয়া দিয়া কেবল পাটের টাকার মোহে, প্রত্যেক মজুরকে, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে ১৲ টাকা হারে মজুরী দিয়া, পাটের আবাদ না করিত, তবে প্রত্যেক জিনিষের এত অভাব হইত না। আজ যদি প্রত্যেক কৃষক অর্দ্ধেক পাট এবং অর্দ্ধেক জমিতে পূর্ব্বের ন্যায় আউস বোরো, জ্যেঠে, প্রভৃতি ধান, তরিতরকারি, শাকসব্জী, ডাউল কলাই, এবং তৈল শস্যের আবাদ করিত, তবে, একা পাট অবিক্রেয় হইলে, দেশের লোকে, এত ক্ষতি বোধ করিত না। আর ধান করিলে ২।৩ বৎসর গোলায় মজুত করিয়া রাখিলেও, তাহাতে আদৌ ক্ষতি বা অবিক্রেয় হইত না, কারণ ইহা বাঙ্গালী বলিয়া কেন, আজিকালি ভারতের সকল জাতিরই প্রধান খাদ্য বলিয়া পরিগণিত। সকলেই ধান ও চাউল খরিদ করিয়া থাকে। কিন্তু পাট একমাত্র বিদেশী লোকে খরিদ করে, এদেশের লোকের এত দরকার হয় না।

যাহাইহোক্, এই বৈশাখের শেষে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার, কৃষকেরা যে সকল উচ্চধরণের জমিতে মাটি তুলিয়া এবং সার ছড়াইয়া দিয়া পাটের চাষের তদ্‌বির করিয়া রাখিয়াছে, কোন জমিতে পাট জন্মিয়াছে, সেই সমুদায় উচ্চধরণের জমির পাট গাছ তাড়াতাড়ি কাটিয়া ফেলিয়া, নিম্ন লিখিত ভাবে, গোল আলুর চাষ আরম্ভ করিয়া দিলে, সম্ভবতঃ পাটের ক্ষতি অনেকাংশে পোষাইয়া যাইতে পারে। বর্দ্ধমান, বৈদ্যবাটী প্রভৃতি কতকগুলি স্থানের চাষী ভিন্ন, এখনও অধিকাংশ স্থানের কৃষকেরা, আলুর চাষ শিখে নাই ও জানে না। পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম প্রদেশের অধিকাংশ নীচু ও জলা ভূমিতে, আলু চাষ হইতে পারে না। তবে তথায় চৈতে, বোরো এবং একপ্রকার আশু বালাম ধান ভিন্ন, অন্য কোন ফসল এ সময় হইবে না।

আশ্বিন মাসে প্রায় সর্ব্বদেশেই বর্ষার বিরাম হইয়াছে। এইবার উক্ত পাটের জমি গুলিতে মহিষের লাঙ্গল দ্বারা, গভীর করিয়া চাষ দিয়া ধূলিবৎ কর্ষণ করতঃ পাটের গোড়া গুলা বেশ করিয়া বাছিয়া ফেলিয়া ক্ষেত্রকে নিষ্কণ্টক করিয়া ফেলিতে হইবে। পাট, ছিমড়ী জাতীয় গাছ। সুতরাং ছিমড়ী জাতীয় উদ্ভিদের মূলে যে গোলাকার গাঁইট থাকে, তাহাতে উদ্ভিদ পরিপোষক একপ্রকার সারাল পদার্থ জন্মাইয়া ঐ মৃত্তিকাকে বেশ সারাল করে। অতএব পাটগাছের শিকড় গুলি তুলিয়া দিয়া, ঐ জমিতে অল্প পরিমাণে আবর্জ্জনা, গোবরসার, ছাই ইত্যাদি সার ছড়াইয়া দিয়া আরও দুই একবার লাঙ্গল ও মই দিয়া জমিগুলি, চৌরাস (plane) করিয়া লইয়া দুই হাত অন্তর ঐ লাঙ্গলের দ্বারা শীরাল কাটিয়া যাইয়া সেই শীরালের মধ্যে মধ্যে আবার অর্দ্ধ হাত অন্তর এক একটী ছোট ছোট কুঁড়ী বিশিষ্ট বীজ আলু ফেলিয়া

যাইবে। কিম্বা চোক্‌ওয়ালা বড় বড় বীজ আলুকে, ঐ সকল চোক শুদ্ধ, ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া নির্দ্দিষ্ট শীরাল বা পিলীতে রোপণ করিলেও চলিতে পারে। বীজরোপণ শেষ হইলে তখন পিলীস্থিত রোপিত বীজের উপর অতি অল্প অর্থাৎ ১ ইঞ্চ পরিমিত ধুলিবৎ কোমল মৃত্তিকার দ্বারা বীজ গুলি বেশ করিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। পরে ৩।৪ দিন পরে, ঐ বীজাঙ্কুর গুলি চারা রূপে চারি অঙ্গুলি পরিমাণ বড় হইয়া উঠিলে তখন রেড়ির খৈলের সহিত ধুলিবৎ মাটি মিশাইয়া উহাদের গোড়ায় অল্প অল্প পরিমাণ দিয়া গোড়া ঢাকিয়া দিয়া যাইতে হয়। রেড়ির খইলের গন্ধে (white ant) উই বা অন্য কোন কীটাদি আসিয়া ছোট চারার কোন প্রকার অনিষ্ট করে না। এই খৈল সংযুক্ত মাটীর সহিত অতি সামান্য পরিমাণ (sulphate of Copper) তুঁতের গুড়া মিশাইয়া দিলে, সকল আশঙ্কাই মিটিয়া যায় বটে কিন্তু হাতে কলমে তদ্‌বিরকারী কৃষকেরা, আলুর ক্ষেতে তুঁতের গুড়া দেওয়ার নাম শুনিলে একেবারেই ভয়ে চম্‌কাইয়া উঠিবে বলিয়া তাহা প্রয়োগে নিষেধ করিতে বাধ্য হইলাম তবে শিক্ষিত লোকে এই কাজে হাত দিলে উক্ত খৈলের সহিত তুঁতে গুড়া মিশাইয়া দিতে পারেন। তাহা হইলে, আলুর পাতার যে ছত্রক রোগ হয়, তাহার আর কোন আশঙ্কাই থাকে না। সাধারণতঃ এদেশের লোকে গোবর সার ভিন্ন অন্য কোন প্রকার সার প্রদানই পছন্দ করে না, কিন্তু খৈল কিম্বা বিশেষ রাসায়নিক সার প্রয়োগে লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই।

৪। এই ভাবে আলুর চারা যত বড় হইতে থাকিবে, ততই শীরালের দুইধার হইতে ৫।৭ দিন অন্তর অল্প অল্প মাটি তুলিয়া গাছের গোড়ায় আল্‌গা করিয়া দিতে হয়। আর আলু গাছের গোড়ার চারা গুলি, সতেজ না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্তভাবে অল্প অল্প পরিমাণে ৩।৪ বার মাত্র খৈলের সহিত, তুঁতের গুড়া মিশাইয়া দিতে হয়। বাঙ্গালার মাটি স্বভাবতঃই সরস ও বালি দোয়াশ;—সুতরাং ক্ষেতের বিশুস্কতা এবং সরসতা বুঝিয়া নিকটস্থ পগার, ঁ, বা পুষ্করিণী হইতে পিলীর গোড়ায় মোটের উপর ২।৩ বার জল সেচন করিলেই চলে। ভার বা অন্য কোন পাত্রে করিয়া, গোড়ায় গোড়ায় জল ঢালিয়া দেওয়া উচিত নহে। তাহাতে শিকড় বাহির হইয়া গাছ চম্‌কাইয়া নিস্তেজ হইয়া, মরিয়া যায়। আলু ধরে না। আলু গাছের গোড়ায় যতই আল্‌গা ভাবে মাটি যত উচ্চ করিয়া দেওয়া যাইবে, ততই শিকড় চালাইয়া গাঁইটে গাঁইটে বেশী পরিমাণে আলু ধরিবে।

৫। ইহা কন্দ জাতীয় উদ্ভিদ। গাছ গুলি এক হাত পরিমাণ উচ্চ ঝাড়াল হয়। লাল আলুর ন্যায় লতান গাছ নহে। যতই নীচের দিকে, শিকড় চালাইতে পারিবে ততই উহার গাইটে গাঁইটে আলু ফলিবে। গাছের তেজ কম হইলে আলুর পরিমাণ বেশী হয়।

বিঘা প্রতি বীজ পরিমাণ—

৬। এক বিঘা জমিতে দুই হাত অন্তর বীজ রোপণ করিলে, Row চল্লিশটি বা পিলীতে ছোট বীজ হইলে, ॥৹ অৰ্দ্ধ মণের কিছু বেশী লাগে আর বড় বীজ হইলে, প্রায় দেড় মণ বীজ লাগে। কারণ ওজনে বেশী এবং পরিমাণে কম হয়। চোক কাটিয়া পুতিলে, ইহা অপেক্ষাও কম লাগে। কলিকাতার ভারতীয় কৃষি সমিতির (Indian Gardning association) এর, সুরক্ষিত বীজই, চাষের পক্ষে ঠিক্ উপযুক্ত ও বিশ্বাস্য। এখানকার বীজ প্রায় নিস্ফল হয় না। ইহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বীজ প্রস্তুত করিয়া রাখেন। অনেকের বিশ্বাস বাজারের আলু পুতিলেই, বেশ আলু হয়, কিন্তু সেটী সম্পূর্ণ ভ্রম। ঐ খানকার নাইনিতাল আলুর প্রতিমণ বীজ ১০৲ হিসাবে, ঐ আলু বাজারেও ৴১৹ আনা হইতে।৹ আনার কমে ৴১ সের মিলে না। তবে বৈদ্যবাটীর দেশী—আম্‌ঝুপি, লাল গোরক্ষপুরীর দাম কম।

৭। উৎকৃষ্ট ফলন হইলে, প্রতি গাছে গোড়া হইতে অগ্রহায়ণের শেষে এবং ফাল্গুন মাসের ১৫ই মধ্যে দুইবারে ৴৫ আলুর কম পাওয়া যায় না। হাতে কলমে কৃষি কাজের হিসাব দেখাইতে গেলে ঠিক্ জিনিষের পরিমাণ এবং বাজার দরের উঠ্‌তি পড়্‌তি মূল্য ধরিয়া খরচা এবং আয়ের পরিমাণ, আনুমানিক ভিন্ন, কখনই প্রকৃত অঙ্কপাত করিয়া দেখান যায় না। যিনি তাহা দেখাইতে চেষ্টা করেন, সেটী কেবল লেখনীর চাতুর্য্যে, বাহাদুরী এবং ভ্রম মাত্র। বিশেষতঃ আজ কাল্ যেরূপ জিনিষের দর চড়িয়াছে এবং মজুর দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় কেহই একথা খাঁটি করিয়া বলিতে সাহসী হন্ না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ মধ্যে প্রতি সের ৴১৹ হইতে ৴৫ পয়সা পর্য্যন্ত, বাজার দর উঠিলে ও পড়িলেও এই চাষের লোকসানের ভাগ অপেক্ষা লাভের অংশই বেশী। আর একবারে পাইকারি হারে মণ ধরণে বিক্রয় করিয়া দিলে পাটের ন্যায় থোক টাকা পাওয়া যায়।—

৮। অগ্রহায়ণে দুই একটী গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তুলিবার উপযুক্ত হইয়াছে কি না বুঝিলে এক ফসল আলু তুলিয়া লইয়া, তাহার গোড়ায় পুনরায় অল্প অল্প মাটী মিশান খইলের গুড়া দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। প্রথম আলু বাজারে বাহির করিলে নূতন আলু বেশ দরে বিক্রয় হয়। নূতন আলু ৴১৹—৴১১৹ পয়সা হারে বিক্রয় করিলে, বেশী দাম পাওয়া যায়। তুলিবার সময় অতি সাবধানে তুলিতে হয়। যেন শিকড় ছিড়িয়া না যায়। বাঙ্গালাদেশের আলুর গাছে, মাঘ মাসের শেষে, দক্ষিণা বাতাস বহিলে গাছের পাতা পিঙ্গলবর্ণ হইয়া শুখাইতে আরম্ভ করে। সুতরাং ১৫ই ফাল্গুন মধ্যে গাছ মরিতে আরম্ভ হইলে, শেষ ফসল তুলিতে হয়। প্রথমতঃ দুই একটী গাছের গোড়া খুঁড়িয়া আলু পুষ্ট হইয়াছে কি না দেখিতে হইবে। কাঁচা আলু তুলিলে, তাহার বীজ প্রস্তুত হয় না। নাইনিতাল অপেক্ষা, বাঙ্গালার মাটিতে বৈদ্যবাটী, আম্‌ঝুপি,

গোরক্ষপুরী লাল বর্ণের আলুই বেশী ফলন হয়। আর এই দুই প্রকার খাইতে মিষ্টা-স্বাদ ও নরম। কিন্তু বর্ষার পূর্ব্বে বাতাস পাইলে, অনেক পচিতে আরম্ভ হয়। নাইনি-তালে, তত পচন ধরে না। নাইনিতাল ফলন নিতান্ত মন্দ হয় না। বর্ষাকালে রাখিবার ও খাইবার পক্ষে, নাইনিতালই ভাল। আলু আজ কাল্, নিত্য আহরীর তরকারি মধ্যে গণ্য। ভাতের অভাব হইলে, অনেক সময় আলু সিদ্ধ করিয়া খাইয়া জীবন ধারণ করা যায়। ইহাতেও শরীর পোষক শ্বেতসার (starch) যথেষ্ট পরিমাণে আছে। ইহা আমিষ ও নিরামিষ সকল ব্যঞ্জনেই খাটে। বর্ষার জন্য রাখিবার আলুকে, ঘরের মধ্যে বিশুদ্ধ স্থানে বালি পাতাইয়া রাখিতে হয়, আর বীজ আলু নরসারী কিম্বা বীজাগার হইতে খরিদ করাই উচিত কারণ তাঁহারা পৃথক ভাবে বীজ রক্ষার উপায় বিধান করেন।

ডাইল কলাই এবং তৈলশস্য—

৯। রবিশস্যও এই সময় এবং ঐ রকম উচ্চ ধরণের জমিতে বপন করিতে হয়। আলুর ক্ষেতের পাশাপাশি জমিতে ঐ ভাবে চাষ দিয়া সোণামুগ, শ্বেত শর্ষপ, শূয়ারগুজা এবং তিসি বা মষিনা এই সময় বুনিয়া দিলে এক সঙ্গে ফাল্গুন চৈত্র মাসের মধ্যে একত্রে অনেক গুলি ফসল পাইয়া লাভ করা যায়। আর কয়টী ফসল এক সঙ্গে বুনিলে পাতলা করিয়া বুনিতে হয়। ইহারাও বেশী দরে বিক্রিত হইতেছে।

১০। মুগ তিন প্রকার। সরু দানা সোণা মুগ, মোটা দানা ঘোড়া মুগ, কৃষ্ণ মুগ সুতরাং সরু দানা নল্‌ছিটির মুগই উৎকৃষ্ট। সোণার ন্যায় বর্ণ সুগন্ধ এবং সুস্বাদু। ঘোড়া মুগ ভাল নহে। কৃষ্ণ মুগও মন্দ নহে। সুতরাং সোনা মুগ এবং কৃষ্ণ মুগেরই দাম বেশী। তিশী বা মষিনাও উৎকৃষ্ট শস্য। ইহা হইতে যথেষ্ট তেল নির্গত হয়। এই তেল অধিকাংশ রঙের কাজে লাগে। যাবতীয় কল কারখানা ও রেলওয়ে কোম্পানি এই তেল নানাবিধ রঙের কাজে লাগাইবার জন্য, খরিদ করিয়া থাকেন। সর্ষপের তেলের সহিত দোকানদারেরা অন্য তৈল ভাঁজাল দিয়া থাকে। শ্বেত সরিষা এদেশের চাষরা চাষ করে না বটে, কিন্তু ইহার তৈলের ঝাঁজ অত্যন্ত বেশী, দানা মোটা ও সাদা বর্ণ তেল বেশী হয়। আর তৈলের ঝাঁজ অত্যন্ত অধিক। ডাক্তারেরা এই সর্ষপ হইতেই মষ্টার্ড (mastard) প্রস্তুত করিয়া, রোগীর শরীরে লাগান এবং নানাবিধ তরকারিতে দিয়া খাইয়া থাকেন; দামও অধিক। শুয়ারগুজাও তৈল শস্য মধ্যে পরিগণিত। ইহারও ফলন বেশী, তেলও অধিক হয় এবং অত্যন্ত ঝাঁজ। সুতরাং ইহার চাষেও বেশ লাভ হয়। এই সমুদায় চাষ এককালীন উঠাইয়া দেওয়ায়, যাবতীয় ডাইল কলাই এবং তৈল শস্যের অভাব বশতঃ সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাদিরও অভাব হইয়া দর চড়িয়া গিয়াছে।

কৃষি, কৃষক ও পক্ষীরক্ষা

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সরকার—উকিল হাইকোর্ট

কৃষি সম্বন্ধে অনেক কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং পক্ষী জাতির সহিত কৃষির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে তাহাও আমাদের দেশের কৃষকগণ সবিশেষ জানেন। মুর্গী, চড়ুই, চন্দনা, টিয়া প্রভৃতি পাখিগণ কচি ও অঙ্কুরোদ্গত শস্যের সময়ে সময়ে বিশেষ হানি করে বটে, কিন্তু পক্ষী রাজ্যের অধিকাংশ পক্ষীই কৃষির বিশেষ সহায়ক। পক্ষীকুল চঞ্চুর দ্বারায় পোকা, মাকড়, ডিম উই ইত্যাদি মাটীর ভিতর হইতে বাছিয়া খায় এবং এই কার্য্যে অলক্ষিতে বায়ু গত মৃত্তিকা ঘটিত সার মাটিতে মিশাইয়া উদ্ভিদ্ খাদ্য সংগ্রহের বিশেষ সহায়তা করে। বায়ু হইতেও উদ্ভিদের প্রাণপোষণোপযোগী খাদ্য পক্ষ সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়া কৃষকের সাহয্য দানে ত্রুটি করে না। অম্লযান, যবক্ষারজান, কার্বণ, চুন আদি সামগ্রী উদ্ভিদ্ জীবন পোষণের প্রধান উপাদান গুলি বায়ু ও পক্ষীর সাহায্যে মাটীর সহিত নৈসর্গিক ক্রিয়ায় মিশ্রিত হইয়া থাকে, তাহা আমরা জানিয়াও জানিতে চাহি না। এ হেন উপকারী পক্ষীকুলকে আমরা অবলীলাক্রমে নিজ রসনা সুখ ও বিলাসবৃত্তি চরিতার্থের জন্য নৃশংসভাবে ধ্বংস করিয়া থাকে। পক্ষীকুল বিনাশের মত, অবিধিবদ্ধ বা অনেয়ন্ত্রিত গোবধে ও আমাদের কৃষি ও বাণিজ্যের কি মহীয়সী অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা কৃষক সম্প্রদায় ভিন্ন অপর কেহ সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবে না। আমাদের দেশের দীন কৃষকদের দুঃখ কে শুনে বা কে তাহাদের অভাব ও অভিযোগের প্রতীকার করে? কৃষকগণই আমাদের অন্ন বস্ত্র যোগায় তাহারাই আমাদের পার্থীব যাবতীয় সুখ সচ্ছন্দতার মূল। তাহা হইলেও তাহাদের দিকে আমরা চাহিয়া দেখি না। জমিদারগণের পেষণ ও উৎপীড়নের মাত্রা ঐ সম্প্রদায়ের উপরই অত্যধিক। দেশের যাবতীয় শক্তি এ খাদ্য ভাণ্ডারের রক্ষী কৃষক সম্প্রদায়ে কেন্দ্রীভূত নহে কি? কিন্তু তাহাদের প্রতিনিধিত্ব কোন রাজদরবারে আছে কি? কেহ কি সে বিষয় লইয়া একবার চিন্তা করিয়া থাকেন? বিলাতে মজুর, কারিকর, শ্রমজীবী গোয়ালা কৃষাণ সকল সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধিত্ব পার্লিয়ামেণ্টে আছে, কিন্তু ভারত হেন বিশাল কৃষি প্রদেশের দীন কৃষককুলের কোন সভায় কোন স্থান নাই। জমিদার, বাণিজ্য, ডিষ্ট্রিকট্ বোর্ড, মুসলমান সম্প্রদায়, কর্পোরেশান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সকল বিভাগেরই রাজদ্বারে প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার আছে, কিন্তু এই সকল বিভাগের মূল যে; দেশের কৃষি হইতেছে; এবং যাহা সদত ও সর্ব্বত রক্ষা বিধান করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য, সে দিকে রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া কোন

চিন্তাশীল স্বদেশী মহোদয়ের চিন্তায় অধিকার ভূত হয় না ও এদিকে আদৌ দৃষ্টি পর্য্যন্ত পড়ে না, ইহা অপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? কৃষিই সৃষ্ট জীব মাত্রের জীবন, তাহা আমাদের আর্য্য ঋষিগণ বহু সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জানিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা কৃষি বৃত্তিকে খুবই উচ্চ পদবী প্রদান করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন আর্য্যগণের অর্থশাস্ত্র মতে বাণিজ্যের পরেই কৃষির স্থান। আজ বাণিজ্য ও কৃষির প্রতিভা বলে জার্ম্মাণী ও আমেরিকা সভ্য জগতের শীর্ষস্থানীয় এবং মহাশক্তির সমাবেশ ঐ সকল দেশেই পুরামাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।

কৃষি রক্ষা করিতে হইলে কৃষককে রক্ষা করিতে হইবে এবং তাহার সহায় পশু পক্ষী কুলকে রক্ষা করিতে হইবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমেরিকা মহাদেশে পক্ষী কুলের অবাধ ধ্বংসে তদ্দেশস্থ কৃষির বিশেষ হানি হয়। পোকা বংশ অপর্য্যাপ্ত বৃদ্ধি পাইয়া, লেবু, কমলা, আপেল, প্রভৃতি ফলের ফার'ওক্ প্রভৃতি বাহাদুরি কাষ্ঠেরও হানি করে এবং জই, যব, গম, কড়াই কপি প্রভৃতি খাদ্য শস্যের অশেষবিধ ক্ষতি করিয়া দেশের লক্ষ লক্ষ টাকার হানি করে। অবশেষে প্রেসিডেণ্ট্ উইল্সন নিউইয়র্ক জুলজিকাল্ সোসাইটীর ডাইরেক্টার মিঃ উইলিয়াম টি হর্ণাডে সাহেবকে তীব্র আবেদনে উত্তেজিত করিয়া আইন পাশ দ্বারা আমেরিকা মহাদেশের পক্ষী কুলের রক্ষা বিধানের পথ করিয়া দিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাজ্য অষ্ট্রেলিয়া এবং ক্যানাডা প্রদেশ পক্ষী রক্ষণশীল বিধি পাস করাইয়া সমগ্র পৃথিবীর মহীয়সী হিত সাধন করিয়াছেন। যুদ্ধের জন্য বিলাতি প্লমেজবিল্ স্থগিত আছে। মিঃ বক্ল্যাণ্ড এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী এবং সিন্ধু দেশের অন্তর্গত লার্কানা জিলার মধ্যস্থ বের গ্রামে যে সকল "ইগ্রেট্বক" পালনাগার আছে তাহার পরিদর্শন করিবার জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া পত্র দিয়াছেন। মিঃ জেম্স্ বক্ল্যাণ্ড ২৮ নং সেণ্ট্ টমাস্ ম্যানসান্ ওয়েষ্ট মিনষ্টার বৃজ, লণ্ডন, এস্, ই, ঠিকানায় তাঁহার বাসা। তিনি পক্ষী রক্ষার জন্য যাবতীয় ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য মধ্যে অদম্য উৎসাহে আন্দোলন করিতেছেন। বক্ল্যাণ্ড সাহেব আমাদের কৃষিপ্রধান ভারত রাজ্যের গো ও পক্ষী রক্ষার বিশেষ পক্ষ পাতী।

সে দিন লুভেয়ার হইতে "লাগি ও কান্দা" ছবি খানির চুরি উপলক্ষে সমগ্র পৃথিবীতে কি তুমুল আন্দোলনই না উপস্থিত হইল, কত লেখা লেখি চলিল, কত থানা পুলিশ ঘটিল, শেষে চোর গেরেপ্তার হইয়া জেল খাটিতে যাইল, পৃথিবী, শান্ত হইল! আর এই কাপড়ে আঁকা ছবি খানির মত প্রত্যহ ভগবানের নিভৃতে আঁকা কত কোটী কোটী জিয়ন্ত ছবি পক্ষী সভ্য লোকে বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য নৃসংশরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার জন্য কৈ কেহ ত একবার আন্দোলন, এমন কি একটা কথা পর্য্যন্ত বলে না? ইহাকে আমাদের দুরদৃষ্ট বই আর কি বলিতে পারি। পালকের

ব্যবসা সম্বন্ধে "ব্যবসা বাণিজ্য" পত্রিকায় সে দিন একটা সামান্য প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম কিন্তু তাহা পড়িয়া পক্ষীকুল নাশের কথা মনে পড়াতে বিশেষ ক্লিষ্ট বোধ করিলাম। পালকের ব্যবসা লইয়া কত যুদ্ধ বিগ্রহ না ঘটিয়াছে; কত শত শত কোটী টাকা অযথা ব্যয়িত না হইয়াছে! কত সহস্র সহস্র নির্দ্দোষ লোক, তাঁহাদের বুকের তপ্ত শোনিত দিয়া এই পাপের প্রয়শ্চিত্ত না করিয়াছেন, তাহা কি আমারা একবার ভাবিয়া দেখি! পিটারসন, নিকুলিয়ে প্রভৃতি পালক ব্যবসায়ীগণ এবং সেদিনকার কথা একজন অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্ প্রদেশের পালক ব্যবসায়ী সাহেব বেলজিয়াম, জার্ম্মাণ দেশের আফিকা দেশীয় উপনিবেশে পক্ষীকুল ধ্বংস করিতে গিয়া কাফি হটেন্ টট্, ব্যারোটো বাসী জঙ্গলীদের প্রকোপে পড়িয়া সাধের জীবন হারাইয়া শেষে বন্য অধিবাসীগণের সহিত উক্ত সভ্য রাজগণের সহিত ভবিষ্যৎ যুদ্ধের বীজবপন করিয়া যায়; এবং তাহার ফলে রণসাজে সৈন্য প্রেরিত হইয়া কতকগুলি নির্দ্দোষী লোকের জীবন বন্দুকের গুলিতে যায়। মিশরী, আবোর, লুশাই, ভীরাবর্ম্মা যুদ্ধ যাত্রাগুলির মূলে এইরূপ বাণিজ্য। রবার সংগ্রহের জন্য কঙ্গোদেশে বেলজীয়ম তদ্দেশবাসী অসভ্য বন্যদের প্রতি কি নৃশংস ব্যবহার না করিয়াছেন, তাহা সংবাদ পত্রপাঠকের অবিদিত নাই। এই রসনাসুখ পরিতৃপ্তি এবং বিলাসিতার চরিতার্থ জন্য আমরা যে সহস্র সহস্র কোটী কোটী গো, ছাগল, মেষ, মহিষ ও সুন্দর পক্ষী বিনাশ করিতেছি তাহার বিরুদ্ধে কি একটা কথা বলিবার কেহ কি নাই? বৃটিশ এবং বার্লিন মিউজিয়ামে রক্ষিত প্রস্তরীভূত অস্থি ও কঙ্কাল খণ্ড দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে অতি প্রাচীনকালে পক্ষী এবং সর্পকুলের উৎপত্তি একই রূপ ছিল। পাশ্চাত্যাভিমানী বাবুদের নিকট ইহা নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্য হইলেও আমরা তাহাতে কিছু বিচলিত হই না। যেহেতু আমাদের সাধের মহাভারতের "বিনতা ও কদ্রুর" উপাখ্যান এই দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করিয়া সন্দেহ বহুকাল পূর্ব্বে নিরসান করা হইয়াছে। জাতীয় মহা সমিতির সেক্রেটারি মিঃ জে, গিলবার্ট পিয়ার্সন মার্কিনদেশের শিকাগো নগরে পক্ষী রক্ষা সম্বন্ধে ১৮৯৭ সালে যে মহা সম্মিলনী হয় তাহার অধিবেশনে বলেন, যে মধ্যফ্রোরিডা দেশের মধ্যে তিনি এক বৃহৎ বকের পালক কারখানা দেখিয়া বহু শত শত বকের মৃত দেহ ও অস্থিময় কঙ্কাল রাশি দেখিয়া পালক ব্যবসায়ীগণের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। ম্যাসাচুলেট্ ষ্টেট্ বোর্ড অব এগ্রিকল্‌চারের প্রধান অধ্যক্ষ এবং useful Birds and their Protection প্রণেতা মিঃ এড্‌ওয়ার্ড হো ফরবশ্ (Mr. Edward Howe forbush) ১৯০৭ সালে পক্ষীকুল বিনাশের মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী তাঁহার পুস্তকে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতের প্রধান পক্ষী শাস্ত্রবিদ্ মিঃ William L. Finley অরিগন প্রদেশান্তর্গত মালিউর হ্রদের সন্নিকটস্থ বককুলের উপনিবেশের উল্লেখ করিয়া বলেন যে পালক ব্যবসায়ীগণ এই হ্রদের কোটি কোটি বকের পালকের জন্য নৃশংস রূপে প্রাণনাশ করিয়া উপনিবেশগুলিকে পক্ষী শূন্য

করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত মেলবোর্ণ নগরের সন্নিকট নদীর জলাভূমিসমূহে কোটি কোটি "শ্বেত ইগ্রেট্ বকের" নীড়াবদ্ধ ভূমি পরিদর্শন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে পালক ব্যবসায়ীদলের অমানুষিক নৃশংসতা ও হত্যার কথা লিখিয়া পাঠান। ইহার ফলে কলোনিয়াল স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা প্রাপ্ত অষ্ট্রেলিয়ান উপনিবেশ হইতে অবারিত পক্ষীহত্যা রূপ নৃশংস ব্যবহার বিধির দ্বারা তিরোহিত হয়। দীন ভারতে প্রতি বৎসর কত কোটি কোটি টাকার শস্য কীটাদি ও বন্য পশুর উপদ্রবে নষ্ট হইয়া যায় এবং সে কারণে দেশের নিঃস্ব দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত কৃষককুলের কি ক্ষতি হয় তাহার দুঃখগাথা কীর্ত্তন করিবার এক জগদীশ্বর ছাড়া আর ভারতের ও ভারতবাসীর প্রিয়বন্ধু আর কে আছে তাহা আমরা জানি না। ভারতের গো-বল ও পক্ষী-বল যতদিন রক্ষিত না হইবে, ততদিন ভারতের উত্থানের আশা নাই। আশা করি ভারতের গণ্যমান্য ও মাননীয় উচ্চপদ প্রার্থী মহোদয়গণ এবং রাজা মহারাজাগণের দৃষ্টি এদিকে শীঘ্রই পড়িবে এবং এই বিষয় ব্যবস্থাপক সভাসমূহে আলোচিত হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত করিবে।

ভারতে শর্করা উৎপাদন

বিগত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার কৃষকে আমরা ভারতে সাধারণ ভাবে শর্করা উৎপাদন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধে একটি মধ্যমাকারের চিনির কারখানায় কিরূপ আয় ব্যয় হইতে পারে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছিল। এক্ষণে দেশ বিশেষে শর্করা প্রস্তুতের প্রধান অন্তরায় কি এবং কিরূপ ভাবে কার্য্য করিলে দেশীয় চিনির কারখানা বিদেশীয় চিনির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে পারে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক।

ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃষি পত্রিকায় সরকারী শর্করা বিশেষজ্ঞ, মিঃ হুম্ যুক্তপ্রদেশে শর্করা প্রস্তুত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রবন্ধে অনেকগুলি পুরাতন কথা থাকিলেও ইহা যে বর্ত্তমান সময়োপযোগী হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। অনেকেই অবগত আছেন যে ভারতে যে সমুদায় ইক্ষু উৎপাদনের কেন্দ্র আছে তন্মধ্যে যুক্তপ্রদেশ অন্যতম।

সমস্ত ভারতে ৭২ লক্ষ বিঘা ইক্ষু উৎপাদনের জমির মধ্যে একমাত্র যুক্তপ্রদেশেই প্রায় ৪০ লক্ষ বিঘা জমিতে ইক্ষু উৎপাদিত হয়। কিন্তু এত জমিতে ইক্ষু চাষ হইলেও বিঘা প্রতি গুড়ের হার অত্যন্ত কম। শুধু যুক্তপ্রদেশে কেন ভারতের অন্যান্য স্থানেও

ইক্ষু হইতে প্রাপ্ত শর্করার মাত্রা অতিশয় সামান্য বলিয়াই এত বহুনি খরচ দিয়াও এতদ্দেশে কোটি কোটি টাকার যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের শর্করা বিক্রয় হয়।

ভারতে সুলভ শর্করা উৎপাদনের প্রধান অন্তরায় সমূহের বিশ্লেষণ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে মূলতঃ ছয়টি কারণের জন্য একই প্রকারের চিনি প্রস্তুত করিতে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এখানে এত অধিক খরচ পড়ে। যথা :—(১) শর্করা কারখানা হইতে ইক্ষু ক্ষেত্রসমূহের অত্যধিক ব্যবধান। (২) কারখানার কাজের দিনের সল্পতা। (৩) বিঘা প্রতি উৎপাদনের পরিমাণের ও ইক্ষু রসে শর্করার পরিমাণের হ্রস্বতা। (৪) মাঝারি ধরণের কারখানার পরিবর্ত্তে অত্যন্ত বড় অথবা অত্যন্ত ছোট কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা। (৫) শর্করা কারখানার সহিত অন্য কোন কাজ না করিয়া কেবল শর্করা উৎপাদন। (৬) ইক্ষু হইতে প্রাপ্ত রসের স্বল্পতা।

যে সমুদয় দেশ হইতে সুলভ মূল্যে ভারতে চিনি আমদানি হয়, যেমন যবদ্বীপ প্রভৃতি, সে সমুদয় দেশে ইক্ষু কারখানা বিশাল ইক্ষু ক্ষেত্রসমূহের মধ্যেই অবস্থিত। সুতরাং কর্ত্তিত ইক্ষু অতি সামান্য সময়েই এবং উৎকৃষ্ট অবস্থায় কারখানায় আসিয়া পড়ে। এতদ্দেশে তাহা নহে ; ইক্ষু অনেক দূর হইতে আসে এবং কলওয়ালাগণকে অনেক সময় বাধ্য হইয়া তাঁহাদের দৈনিক প্রয়োজনের অধিক পরিমাণ ইক্ষু ক্রয় করিতে হয়। ফলে এই দাঁড়ায় যে বাসি ইক্ষু মাড়াই করিয়া শর্করা উৎপাদন হিসাবে কলওয়ালাগণ ক্ষতি স্বীকার করেন। ইক্ষু কাটার পর যে কত শীঘ্র ইক্ষু রস উৎসেচন ক্রিয়ার প্রভাবে খারাপ হইয়া যায় তাহা সামান্য চাষী কেন, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও অবগত নহেন।

দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে একটি সাধারণ কারখানা বৎসরের মধ্যে প্রায় ১০০ দিন কাজ করে ; বাকি ২৬৫ দিন বন্ধ থাকে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় কাজ করিতে হইলে একটি কারখানায় ১ জন ম্যানেজার, সহকারী সহিত ১ জন ইঞ্জিনিয়ার, একজন রাসায়নিক ও এক দল অভিজ্ঞ রস জ্বাল দেওয়ার লোকের আবশ্যক। ইহাদিগের মাহিনা এবং কলকব্জার মূল্য হ্রাস প্রভৃতি বাবতে অনেক টাকা পড়ে। ১০০ দিন কাজ করিয়া সেই সমস্ত খরচ তুলিয়া লাভ করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। যদি কর্ষিত ইক্ষু-জাতি সমূহ নির্দ্ধারণের ভার কলওয়ালাগণের উপর থাকিত তাহাহইলে তাঁহারা অবশ্য এমন জাতি চাষ করিতেন যে কল যথা সম্ভব অধিক দিন চালাইতে পারা যায়। খুব জল্দি হইতে আরম্ভ করিয়া খুব নাবী জাতীয় ইক্ষু চাষ করিলে ১০০ দিনের অধিক কল চালাইতে পারা যায় সন্দেহ নাই। তাহাতে কারখানার এবং চাষী উভয়েরই লাভ আছে। যত দিন অধিক কাজ হইবে শর্করা উৎপাদনের মাত্রা তত অধিক হইবে। এবং মূল্যের হারও কম হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সময় এই হিসাবে কাজ করিতে হইলে কলওয়ালাগণকে তাঁহাদের আবশ্যকীয় ইক্ষুর অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ স্বয়ং চাষ করিতে হয়।

বিদেশীয় শর্করার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে হইলে ইক্ষু জাতির উন্নতি সাধন করা যে একান্ত আবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য। কি বিঘা প্রতি উৎপাদিত ইক্ষুর পরিমাণে, কি ইক্ষু রসে শর্করার পরিমাণ, উভয় হিসাবে ভারত অন্যান্য শর্করা উৎপাদক দেশের অনেক নিম্ন স্থান অধিকার করে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মতামত দিয়াছেন সত্য বটে কিন্তু সরকার ও জনসাধারণের সমবেত চেষ্টা না হইলে কোন বিশেষ উন্নতি হইবার আশা নাই। কোন্ কোন্ উপায়ে উৎকৃষ্ট জাতীয় ইক্ষু এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, নির্ব্বাচিত উৎকৃষ্ট জাতিসমূহের স্থানীয় জল বায়ু ও মৃত্তিকার হিসাবে আপেক্ষিক গুণাগুণ কি প্রকার প্রভৃতি বিষয় বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনার স্থান নাই। বস্তুতঃ ইহাই আমাদের বলা উদ্দেশ্য যে বর্ত্তমান কথিত ইক্ষুজাতি সমূহ লইয়া বর্ত্তমান চাষের প্রণালীতে ইক্ষু উৎপাদন করিয়া মূল্যের তুলনায় বিদেশীয় শর্করার সহিত দেশীয় শর্করার সমকক্ষ হইবার সম্ভাবনা একবারেই নাই।

শর্করা ব্যবসায়ের অন্তরায়ের চতুর্থ কারণ অত্যন্ত বড় অথবা নিতান্ত ক্ষুদ্র কারখানা খুলিবার আকাঙ্ক্ষা। একদিকে যেমন বড় কারখানা বন্ধ হইয়া থাকিলে লোক জনের মাহিনা প্রভৃতি ও কলকজার তদারক, মূল্য হ্রাস প্রভৃতি বিষয়ে প্রভূত লোক্সান হয়, অন্যদিকে ছোট কারখানার শর্করা উৎপাদনের মাত্রা হ্রাস হওয়ার খরচ খরচাদি বাদে উৎপাদিত শর্করার মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। সর্ব্বাপেক্ষা ছোট কারখানা করিতে গেলে দৈনিক অন্ততঃ ২৭০ মন ইক্ষু মাড়াই চলে এরূপ কারখানা করিতে হয়, ইহার কম করিতে গেলে লাভ হয় না। বৎসরে ১০০ দিন কাজ করিলেও এরূপ কারখানায় ন্যূনাধিক ২৫০ বিঘা ইক্ষু ক্ষেত্রের ফসল আবশ্যক হয়। অবশ্য ইহাতে অভিজ্ঞের সংখ্যা কম থাকিবে অথবা দেশীয় অভিজ্ঞগণ দ্বারা কাজ হইবে। পক্ষান্তরে অন্যান্য দেশে এত বড় বড় কারখানা আছে যে প্রত্যহ তাহাতে ১৫ হাজার মন ইক্ষু আবশ্যক হয়। সেরূপ কল এতদ্দেশে বর্ত্তমান সময় চলা অসম্ভব। সুতরাং আমরা আমাদিগের পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে দৈনিক ১৫০ টন অর্থাৎ কিঞ্চিদূর্দ্ধ ৪ হাজার মন কারখানার বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহাই এতদ্দেশের পক্ষে উপযুক্ত। বিশেষ বিবেচনার সহিত ইক্ষু পাইলে এরূপ কারখানা বৎসরে ১২০ দিন অর্থাৎ চারি মাস চলিতে পারে। কিন্তু দৈনিক দেড় হাজার মন ইক্ষু মাড়াইর উপযুক্ত কারখানা এতদ্দেশীয় মধ্যবিৎ ধনীর পক্ষে আরও সুবিধাজনক। ইহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প মূলধন আবশ্যক হইবে এবং সাহেব ইঞ্জিনিয়ার অথবা ম্যানেজার না রাখিয়া শিক্ষিত ভারতবাসীগণের দ্বারাই কার্য্য চলিতে পারিবে।

কিন্তু যে কারখানা বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দিবস কার্য্য করিলে মোট ১২০ দিন কার্য্য করে এবং অবশিষ্ট সময় বন্ধ থাকে তাহাতে প্রভূত মাত্রায় শর্করা উৎপাদিত না হইলে লাভের আশা নাই। তজ্জন্য কেহ কেহ ইহা প্রস্তাব করেন যে যাহাতে কারখানা একবারে বন্ধ না হইয়া থাকে সেই জন্য আকের কারখানার সহিত শ্যার

কিছু টাকা খরচ করিয়া তৈল মাড়াই প্রভৃতির কাজ করিলে কোন প্রকার লোকসান্ হইবার সম্ভাবনা নাই। তৈল ও খৈলের কাটতি দেশের সর্ব্বত্রই যথেষ্ট। প্রতি বৎসর বহুল পরিমান তৈল বীজ ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়; ইহাদের খৈল সমস্তই পশু-খাদ্যরূপে বিদেশে ব্যবহৃত হয় এবং তৈল পরিষ্কৃত হইয়া অধিকাংশ সময় এতদ্দেশেই ফিরিয়া আসিয়া তৈল বীজের চারিগুণ দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। গুড়ের গাদ প্রভৃতি এবং খৈল যদি পক্ষান্তরে পশুখাদ্য রূপে এখানেই প্রস্তুত হয় তাহা হইলে উক্ত দ্রব্যসমূহের ক্রেতার অভাব নাই। এদিকে চিনির কারখানার যে সমুদয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে রাখিতে হয় সেই সমুদয় ব্যক্তিই সামান্য মনোনিবেশ করিলেই পরিষ্কৃত তৈল অথবা মিশ্রিত পশুখাদ্য উৎপাদন করিতে পারে। এইরূপ কার্য্যে বৎসরে বৎসরে ১৫০—২০০ দিন লাগিতে পারে। সুতরাং বৎসরের মধ্যে কারখানার লোকজন ২ মাস ছুটি পায় এবং সেই অবসরে কলকব্জা সারাই, কারখানা ও গৃহাদি মেরামত কার্য্যও হয়।

শর্করা ব্যবসায়ের অন্তরায়ের কারণ এই যে ইক্ষু হইতে উপযুক্ত পরিমাণে রস বাহির করা হয় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্মত যে সমুদয় কারখানা হইয়াছে তাহাতে ইক্ষু হইতে সাধারণতঃ শতকরা ৯০ ভাগ শর্করা উৎপাদক রস বাহির করা হয়। কিন্তু এতদ্দেশে সাধারণ কল কব্জার সাহায্যে শতকরা ৫০ ভাগের অধিক রস পাওয়া যায় না। বহুরুল বিশিষ্ট কল থাকায় আধুনিক কারখানা সমূহ এত অধিক রস নিষ্কাষণ করিতে পারে। কিন্তু ভারতে আকমাড়াই বলদের দ্বারাই হয় এবং মাড়াই কলও সকল স্থানে সুবিধা জনক নাই। বিদেশীয় শর্করার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে হইলে আর বলদ দিয়া আকমাড়াইলে চলিবে না। বাষ্পীয় কলের সাহায্যে এই কার্য্য করা আবশ্যক। বৈদ্যুতিক অপেক্ষা বাষ্পীয় কল অধিকতর উপযোগী বলিবার কারণ এই যে শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিলে আকের ছোবড়া দ্বারা অনেক কাজ হইতে পারে। এই গুলি কারখানার বাজে আয়। এতদ্ভিন্ন উত্তাপের আধিক্যে আপাততঃ যে পরিমাণ ইক্ষু রস নষ্ট হইয়া যায়, বাষ্পের সাহায্য গ্রহণ করিলে তাহা হইবে না। কিন্তু এস্থলে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। ইক্ষু হইতে অধিক পরিমাণে রস বাহির করিলে উদ্ভিদের মধ্যে রসও বাহির হইয়া থাকে। তাহা হইতে শর্করা প্রস্তুত করিতে হইলে বিশেষ প্রক্রিয়া আবশ্যক। ছোট কারখানায় সেরূপ অধিক রস নিষ্কাষণ না করাই ভাল। সুতরাং রস নিষ্কাষণের কারখানা হিসাবে একটা Standard করিয়া লইলেই ভাল হয়। হুম সাহেব হিসাব করিয়াছেন যে বহু-রুল যুক্ত কল ব্যবহার করিলে আপাততঃ দেশীয় প্রথায় যে পরিমাণ রস বাহির হয় তদপেক্ষা শতকরা ৩০ ভাগ অধিক রস বাহির হইবে। টাকার হিসাবে ধরিতে গেলে এই অধিক পরিমাণ রস হইতে উৎপাদিত শর্করার মূল্য ১৩৷৷০ কোটি টাকা। পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিতেছেন যে আধুনিক কলকব্জার সাহায্যে কত অধিক অর্থ লাভ করা যাইতে পারে।

ভারতে মৎস্য ধরার প্রণালী ও মৎস্য ধরার যন্ত্রাদি

জল বায়ু মৃত্তিকা প্রভৃতির হিসাবে অন্যান্য শর্করা উৎপাদক দেশ ভারতের বর্ত্তমান ইক্ষু কেন্দ্রসমূহের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইতে পারে। কিন্তু যদি এই তিনটি প্রাকৃতিক অবস্থা নির্ব্বাচন করিয়া ভারতের দেশ বিশেষে ইক্ষু চাষ আধুনিক প্রথায় ও আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে করা যায় তাহা হইলে ইহা স্থির নিশ্চয় যে, কোন দেশ ভারতের সমকক্ষ হইতে পারে না। মূলধনের অভাব ও উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গের স্বল্পতায়ই বর্ত্তমান শর্করা ব্যবসায় এই রূপ হইয়াছে। পুরাকালে ভারতের বস্ত্রাদির ন্যায় ভারতের শর্করাও বিশ্ব-বিখ্যাত ছিল। এখনও যবদ্বীপ প্রভৃতির অনেক জাতীয় ইক্ষু প্রথমতঃ ভারত হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা কেবল চরম চেষ্টার অভাবেই পশ্চাৎ পদ হইয়া পড়িতেছি।

বাঙলা, বিহার উড়িষ্যায় মৎস্য বাণিজ্য

সর্ব্বত্র সর্ব্বদেশেই মাছের আদর দেখিতে পাওয়া যায়। এমন দেশ নাই যেখানে মৎস্য একটি প্রধান খাদ্য নহে। বাঙলা দেশে প্রায় শতকরা ৮০ জন লোক মৎস্য খাইয়া থাকে। বাঙলা দেশে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩০০ দিন মাছ খায় না এমন লোকের সংখ্যা কম। মাছ এখন সকলে পায় না, যদি রীতিমত মাছ মিলে তবে এক বাঙলা দেশের লোকে বৎসরে ৪।৫ কোটি মন মাছ খাইয়া ফেলিতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে বাঙলা বিহারে মোটে বৎসরে ১৪।১৫ লক্ষ মণ মাছ মাত্র মিলে; ইহাতে অনেকের পক্ষে মাছ জুটে না, তাহাতে আর বিচিত্র কি। বাঙলায় প্রধাণতঃ ৩ প্রকার জলাশয় হইতে মাছ মিলে,—(১) নদী জাত, (২) খাল বিল পুষ্করিণী জাত, (৩) সামুদ্রিক। নদী, খাল বিল মাছের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। পুকুর দিঘি প্রভৃতি জলাশয়ে মাছ কম জন্মিতেছে। সামুদ্রিক মৎস্যের বিষয় বিশেষ নজর এতকাল ছিল না।

মৎস্য বাণিজ্য তত্ত্ব আলোচনা করিবার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ সার কে, জি গুপ্ত মহোদয়কে নিযুক্ত করেন। সে আজ ৬।৭ বৎসরের কথা তিনি মৎস্য তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করেন। বাঙলার খাল বিল দিঘি পুষ্করিণীর সন্ধান লইয়াছিলেন। বাঙলার সমুদ্রের উপকূলে মাছ ধরার ব্যবস্থা করিতে তিনিই প্রথমে গভর্ণমেণ্টকে উপদেশ দেন। শুধু তাহা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। যুক্তপ্রদেশে কানাডায়, ইংলণ্ডের সমুদ্রোপকূলে কি উপায়ে মৎস্য ধৃত হয়, কি প্রকারে সরবারহ, কি মাছই বা পাওয়া যায়, বাঙলায় সেই সকল মাছের সদৃশ কোন মাছ আছে কি না ইত্যাদি মৎস্য সরবরাহ সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করেন, অনেক বিচার করেন। তৎ প্রকাশিত বিবরণীতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাঁহার পর

আমেদ সাহেব মৎস্য কমিশনর হন। আমেদ সাহেবের সময় পর্য্যন্ত মৎস্য বিভাগটি গভর্ণমেণ্ট খাসে ছিল। এখন মৎস্য বিভাগ কৃষি বিভাগের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। বাঙলা দেশে মাছের চাষের ও মাছের ব্যবসায়ের সমধিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বাঙলায় মাছের অভাব দূর করিবার দুইটি উপায় আছে। (১) বাঙলার জলাশয়ে মাছের আবাদ বৃদ্ধি করা, সমধিক পরিমাণে মাছের চাষ করা, (২) বাজারে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে মাছ আসে তাহার ব্যবস্থা করা। মৎস্য বিভাগ এ বিষয়ে সাধারণকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। মাছের ডিমও কম হয় না এবং ডিম হইতে পোনাও কম হয় না। মাছের পোনা অনেক নষ্ট হয়। নদী, খাল, বিল ভাসিয়া গিয়া মাছের পোনা ক্ষেত পাথারে, খানা ডোবায় ঢুকিয়া অনেক নষ্ট হয়। এই রূপ নষ্ট হওয়া যথাসাধ্য বন্ধ করিতে পারিলে বাঙলার মাছের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে। দ্বিতীয়—মাছের স্বভাব পর্য্যালোচনা করা—দেখা যায় যে ইলিশ মৎস্য ডিম ছাড়িবার জন্য বর্ষাকালে সমুদ্রের লোনা জলে থাকে না, নদীর স্রোতে উজান বাইয়া কোন একটা নিরাপদ স্থানে যাইয়া ডিম ছাড়ে। ইলিশ মাছ কেন অনেক মাছই এরূপ করিয়া থাকে। এমেরিকার মৎস্য বিভাগ হইতে মৎস্য তত্ত্ব আলোচনা করিয়া কৃত্রিমউপায়ে মৎস্য-গণের ডিম ছাড়িবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেকগুলি চৌবাচ্ছা এক সঙ্গে,—একটি হইতে আর একটিতে জল ছাড়া হয়, মৎস্যগণ চৌবাচ্ছা হইতে চৌবাচ্ছা অন্তরে উজান বাহিয়া যাইয়া চৌবাচ্ছাতেই ডিম ছাড়ে। কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটাইবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। ইহাতে একটা ডিমও নষ্ট হয় না, একটি পোনাও মারা যায় না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছের চাষ আরাম্ভ করিলে মাছের সংখ্যা বৃদ্ধির ভাবনা দূর হইতে পারে। মৎস্য সংখ্যার বৃদ্ধির প্রতিকূলে আর একটি কার্য্য প্রতিনিয়ত চলিতেছে,—ডিমওয়ালা মাছগুলি ধরিয়া আহার করা। বাঁধা জলের কতকগুলি মাছ আছে যাহাদের ডিম হয় বটে কিন্তু সে ডিম বাঁধা জলে ফুটে না, সুতরাং সে ডিম আহারে দোষ নাই। শোল, শাল, কৈ, মাগুর প্রভৃতি কতকগুলি মাছের ডিম বাঁধা জলে ফুটে। ফল কথা যে সকল ডিম হইতে মৎস্য বংশের বৃদ্ধি হইতে পারে সে রকম ডিম ক্রমাগত নষ্ট করিলে মাছের সংখ্যা কমিয়া যাইবেই। সকল মৎস্যেরই ডিম হইবার ও ছাড়িবার সময় আছে। মাছ ধরার সময় নিয়মিত হইলে মাছের সংখ্যা হ্রাস হইতে সহজে পায় না।

মৎস্য বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর সাউদাল সাহেব তাঁহার বিবরণীতে একটু অপূর্ব্ব কথা বলিয়াছেন, যাহার সত্যাসত্যের উপর আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। ভারতের সকল পণ্যের মত মৎস্য ব্যবসাটিও এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে আবদ্ধ, যাহারা নিরক্ষর মূর্খ মূলধনহীন, ব্যবসায় বুদ্ধি রহিত, কাজে উৎসাহহীন। "The whole Industry is thus loft in the hands of people with no capital, no education, no initiative and business capacity says Mr. South-

well. গুপ্তসাহেব এই রকমের কতকটা অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু এরূপ মনে করি না, আমাদের দেশের জেলেদের ব্যবসা বুদ্ধি বেশ আছে, তাহারা সর্ব্বতোভাবে বিজ্ঞান সম্মত উপায় জানুক বা নাজানুক সাধারণ ভাবে মাছের আবাদ করিতে তাহারা বিলক্ষণ পটু, এবং তাহারা যে পরিমাণ ব্যবসায় করে তাহাতে তাহাদের মূলধনের অভাব হয় না। তবে অনেক সময় তাহাদিগকে অতি উচ্চহারে সুদ দিয়া টাকা ধার করিতে হয়, ইহাতেও তাহাদের ক্ষতি হয় না, কারণ মৎস্য ব্যবসায়ে লাভ প্রচুর।

এই সকল দেশী জেলেদের মৎস্য ধরিবার কৌশল মন্দ নহে এবং নানা কৌশলে মাছ ধরিয়া এবং সমুদ্রের উপকূল হইতে মাছ ধরিয়া আনিয়া মাছের ব্যবসায়ে তাহারা যথাসম্ভব জাগাইয়া রাখিয়াছে। তবে তাহাদের মাছ ধরার বাষ্পিয় বোট নাই বা সমুদ্রে মাছ ধরিবার মত জাহাজ নাই। এ সকল সাজসরঞ্জম যোগাড় করিবার মত তাহাদের পয়সাও নাই, এ কথা সত্য। ধনী শিক্ষিত লোকের এ কাজে অগ্রসর হইতে আপত্য কাহারও নাই, তবে তাঁহারা জেলেদের সঙ্গে না লইলে ব্যবসায় লাভবান হইতে পারিবেন না এ কথা খুব সত্য। মৎস্য ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে যাইয়া, মাছ ধরা ব্যাপারে জাহাজ, বাষ্পিয় বোট নিয়োগ করিয়া ব্যবসায় ফালাও করিতে শতবার চেষ্টা করুন, ইহা কাহারও অনভিমত নহে, কিন্তু বিদেশ হইতে সাহেবী জেলে আমদানি করিয়া দেশের জেলেদের অন্নে হস্তারক না হন!

মৎস্য ব্যবসায়ে আর একটি অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। নিকারি জাতীয় একদল লোক মাছের ব্যবসায় লিপ্ত আছে। ইহারা জেলেদের ধরা মাছ বাজারে আনিয়া বিক্রয় করে। মাঝে পড়িয়া ইহারা খুব লাভ করে, ইহাদের ব্যবসা বর্ত্তমান সময়ে কতকটা এক চেটে বলিয়া মনে হয়। ইহারা যদি কিছু কমদরে বাজারে মাছ ছাড়িত তাহা হইলে মাছ এত দুর্ম্মূল্য হইত না কিম্বা ইহাদের লাভের অংশ জেলেরা কতক পাইত তাহা হইলে জেলের উন্নতি হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে মাছ ব্যবসায়ের উন্নতি হইত।

সাময়িক কৃষি সংবাদ

আখের পরিক্ষা—

১৯১২-১৩ আখে কয়েক প্রকারের সার দেওয়া, এবং অন্যান্য বিষয়ে একই রকমে উৎপন্ন করিয়া, রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অধীনে তাহাদের পরস্পরের দোষ গুণ পরীক্ষা করাতেই, এই কার্য্য প্রধানতঃ আবদ্ধ ছিল।

দেখা গিয়াছে যে বিঘাপ্রতি কত পরিমাণ আখ জন্মে ও সেই আখ হইতে কত পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয় এই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আখের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কত দিনে পাকে এবং কি পরিমাণে নীরোগ ও বন্যজন্তুকর্তৃক অনাক্রান্ত থাকে এবিষয়েও তাহাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। ভাল চাষ হইলে বার্ব্বেডোজ আখ মরীচদ্বীপের (Striped) আখ হইতে স্থানীয় আখ অপেক্ষা অধিকতর মিষ্ট রস ও একারপ্রতি অনেক অধিক গুড় পাওয়া যায়। এইরূপ কোন কোন প্রকারের আখ হইতে একরপ্রতি এমন কি ১২০/০ মণ, অর্থাৎ বিঘাপ্রতি ৪০/০ মণ গুড় পাওয়া যায়। এই সকল উচ্চ দরের আখ জন্মাইতে হইলে খুব ভালরূপ চাষ করা ও প্রচুর পরিমাণে সার দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বিঘাপ্রতি ১৫০/০ মণ গোবর দিলেও যে খুব বেশী সার দেওয়া হইবে তাহা নহে। চাষীরা যদি প্রচুর পরিমাণে সার দিতে ও ভালরূপ চাস করিতে না পারে তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে স্থানীয় আখ জন্মাইল ভাল।

একই জমিতে পর পর অনেক বৎসর ধরিয়া আখ জন্মান উচিত নহে। পাল্‌টি করিয়া অন্যান্য ফসল জন্মান উচিত এবং আখের ফসল দিবার পূর্ব্বে একটা উদ্ভিজ্জসারের ফসল জন্মাইয়া লাঙ্গল দিয়া তাহাকে চষিয়া দিতে পারিলে খুব ভাল হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আখের পরীক্ষা এখনও চলিতেছে এবং সার দেওয়া ও পোতার প্রণালী বিষয়েও পরীক্ষা করা হইতেছে। এপর্য্যন্ত যে পরীক্ষা হইয়াছে তাহা হইতে এই টুকু বোঝা গিয়াছে যে উচ্চ দরের আখ পুতিতে গেলে একরপ্রতি ৭,০০০ টুকরার (cutting) বেশী ব্যবহার করা উচিত নহে।

মাটীর পরীক্ষা—

১৯১২-১৩ সালে পুরাতন পলিমাটীর পরীক্ষাতেই এই কার্য্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ ছিল। পরীক্ষাতে দেখা গিয়াছে, এই মাটীতে চূণ, ফস্ফরিক আসিড ও অর্গানিক পদার্থ খুব কম এবং এই মাটী সাধারণতঃ টক্ হয়। যে মাটীতে এই সকল দোষ থাকে সে মাটীতে কখনই খুব ভারী ফসল হইতে দেখা যায় না।

প্রভৃমাটীর উপরোক্ত অভাব পূরণ করিবার জন্য চূণ, হাড়ের গুঁড়া ও উদ্ভিজ্জসার ব্যবহারে উপকারিতা সম্বন্ধে মাঠে অনেক পরীক্ষা করা হইয়াছে। গত দুই বৎসরের

পরীক্ষায় প্রমাণ হইয়াছে যে চূণ ও হাড়ের গুঁড়া বড় উৎকৃষ্ট সার, বিশেষতঃ শীতকালের ফসলের পক্ষে। কারণ এই দুই প্রকারের সার ব্যবহার করিয়া সরিষা ও মাটিকলাইয়ের খুব বেশী ফলন পাওয়া গিয়াছে। একরপ্রতি ১/০ মণ চূণ ও ৩/০ মণ হাড়ের গুঁড়া দিয়া কেবল সরিষার ফসল হইতেই লাভ পাওয়া গিয়াছে এবং পর বৎসরে খুব অপর্য্যাপ্ত মাটিকলাইয়ের ফসলও হইয়াছে। চূণ ব্যবহার করিয়া ধানের ফসলে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় নাই। কিন্তু একরপ্রতি ৩/০ মণ হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিয়া ধানের ফসল কোন কোন স্থলে দ্বিগুণেরও বেশী পাওয়া গিয়াছে এবং প্রায় সকল স্থনেই এমন বেশী পাওয়া গিয়াছে যে প্রথম ফসলেই সারের খরচ উঠিয়া গিয়াছে।

হাড়ের গুঁড়ার গুণ এক বৎসরে নষ্ট হইয়া যায় না, কয়েক বৎসর ধরিয়াই থাকে।

হাড়ের গুঁড়া দেওয়া জমিতে বৎসরে বৎসরে কত কম সার দিলে বেশী বেশী ফসল জন্মে তাহা স্থির করিবার জন্য পরীক্ষা চলিতেছে। অন্য প্রকারের ও সস্তা স্বাভাবিক ফস্ফেটের ব্যবহার সম্বন্ধেও পরীক্ষা চলিতেছে। উপরোক্ত সমস্ত পরীক্ষা আগামী বৎসরেও চলিবে।

বঙ্গে হৈমন্তিক ধান্য—

১৯১৩—১৪ অব্দে ৯ কোটী ৪৫ লক্ষ একর ভূমিতে ধান্য হইয়াছিল এবং গড় পড়তায় গত পাঁচবৎসরে বাৎসরিক ১ কোটী ৪৯ লক্ষ একরে এবং গত দশ বৎসরের গড়পড়তায় ১ কোটী ৫১ লক্ষ একরে ধান হইয়াছিল বলিয়া সরকারী অনুমান হইয়াছিল। এবার দেড়কোটী একর ভূমিতে ধান আবাদ হয়। কিন্তু এক বর্ষাশেষে বৃষ্টি না হওয়ায় উৎপন্নের পরিমাণ ৯ কোটী ৫৭ লক্ষ হন্দর ধরা হইয়াছে। গত বৎসরে ১১ কোটি ৭৮ লক্ষ হন্দর এবং গত ৫ বৎসরের গড়পড়তায় বার্ষিক উৎপন্ন ১৫ কোটী হন্দর এবং দশ বৎসরে গড়পড়তায় ১৪ কোটী ১৩ লক্ষ হন্দর উৎপন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ গত দশ বৎসরে ধানের চাষের বিস্তৃতি কমিয়াছে এবং উৎপন্ন এবারে অনেক কম হইবে।

নীলের কারবার—

এদেশে কৃষিজাত নীলের কারবার আবার জাঁকাইবার জন্য গত ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লীতে বিশেষজ্ঞগণের এক বৈঠক বসিয়াছিল। এই বৈটকে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, যখন নীলের আবাদ সম্বন্ধে যতটা উন্নতি সম্পাদিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে মিঃ ও মিসেস হাওয়ার্ট যথাবিহিত চেষ্টা করিতেছেন, তখন তাঁহাদের প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিলে প্রতি বৎসর সহজে অনেক উৎকৃষ্ট বীজ পাওয়া যাইবে। এখন নীলের গাছ জলে পচান ও ভৈষজ্য নীল প্রস্তুত সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য-সংগ্রহের জন্য একজন রসায়নবিদের

প্রয়োজন এবং বিলাতে যে কৃত্রিম নীল প্রস্তুত হইবে তাহার ন্যায় এদেশজাত ভৈষজ্য নীল যাহাতে শুল্ক সম্বন্ধে সুবিধা পায় তাহার ব্যবস্থা কর্ত্তৃপক্ষকে করিতে হইবে। বৈঠকের মন্তব্য এখন ভারত-গবর্ণমেণ্ট বিবেচনাধীন আছে।

পূর্ব্ববঙ্গে অন্নকষ্ট—

ত্রিপুরা চাঁদপুর হইতে শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ পত্রান্তরে লিখিছেন যে, এবার পাটের বাজার পড়িয়া যাওয়ায় পূর্ব্ববঙ্গের কৃষকগণ অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। ফলে আজকাল চাঁদপুর মহকুমায় প্রায় তিন হাজার লোকের আহার জুটিতেছে না এবং সাড়ে আট হাজার লোক কেবল এক বেলা খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। এদেশের হিন্দু মুসলমানেরা নিতান্ত অচল না হইলে খাদ্যাভাবের কথা প্রকাশ করে না। এখন উপায় কি? গবর্ণমেণ্ট মহাসমরে ব্যস্ত, এমন দেশের ধনি-সম্প্রদায় যদি ক্ষুধার্ত্ত দেশবাসীর মুখে এক মুষ্টি অন্ন উঠাইয়া না দেন তবে তাহারা দাঁড়াইবে কোথায়? দামোদর বন্যার সময়ে যাঁহারা দানসত্র খুলিয়াছিলেন তাঁহারা এ দুর্দ্দিনে নিশ্চিতই নিশ্চিন্ত থাকিবেন না।

গম রপ্তানি---

কলিকাতার অধিবাসীরা সকলেই জানেন, গত কয়েক মাসের মধ্যে আটা-ময়দার দর দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বঙ্গের সহর নগর পল্লী সর্ব্বত্রই আটা-ময়দা এইরূপ দুর্ম্মূল্য। শুধু বঙ্গদেশে কেন ভারতের সকল স্থানেই এইরূপ। বাঙ্গলায় আটা-ময়দা প্রধান খাদ্য নহে; সুতরাং বাঙ্গালা দেশে ইহার দর বৃদ্ধি হইলে সর্ব্বসাধারণের একটা গুরুতর কষ্টের বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু ভারতের অন্যান্য অনেক স্থানে—উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতের প্রায় সকল স্থানেই—আটা-ময়দাই সকল অধিবাসীর প্রধান খাদ্য। এখানে যেমন ধান না হইলে বা চাউলের দর বৃদ্ধি হইলে সকল লোকেরই মহাচিন্তার কারণ উপস্থিত হয়,—ঐ সকল স্থানে গম না হইলে বা আটা-ময়দার দর চড়িলে তেমন সকল লোকেই চিন্তিত হইয়া উঠে। গত কয়েকমাসে ভারতের সর্ব্বত্রই গমের দর অতি মাত্রায় বৃদ্ধি হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রজাগণের মনে ভারী দুরবস্থার ভীষণ মূর্ত্তি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ভারত-গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিকারব্যবস্থায় প্রয়াসী হইয়াছেন; যাহাতে গমের দর আর অধিক বৃদ্ধি পাইতে না পারে এবং যাহাতে শীঘ্র গমের দর কমিয়া যায়, আটা-ময়দা অপেক্ষাকৃত সুলভ হয়, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট সাধ্যমত চেষ্টা ও সম্ভবমত ব্যবস্থা করিতেছেন।

প্রথমে গবর্ণমেণ্টের আদেশে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত গম রপ্তানি পরিমাণ হ্রাস হইয়াছিল। তাহাতে সুফল হয় নাই; এজন্য গবর্ণমেণ্ট আদেশ করেন,—১৯১৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বর্ত্তমান বর্ষের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ভারতের গম

রপ্তানী বন্ধ থাকিবে। তবে, গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে, কিম্বা প্রয়োজন বুঝিলে, নিজের তত্ত্বাবধানে রপ্তানীর ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। এই আদেশ আগামী ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বলবত থাকিবে, এখন এইরূপই ঘোষণা হইয়াছে।

গম রপ্তানী সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয় অধিবাসীগণের সুবিধা অসুবিধার কথা যে ভাবেন নাই, এমন নহে; কিন্তু তাহার অপেক্ষা নিশ্চিতই অধিক ভাবিয়াছেন ভারতের চাষী ও অপর সাধারণ অধিবাসীদের কথা। এখন এই ব্যবস্থার ফলে তাঁহাদের সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই প্রজার সুখ হইবে।

ফলের বাগানে নাইট্রেট অব সোডা সার—

আম লিচু প্রভৃতি গাছ ফলবান হইতে আরম্ভ হইলে উহাকে সেই সময় হইতে বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহাদের ফলও বেশী হইতে থাকে। সেইজন্য এই সময় পোষণোপযোগী খাদ্য অধিক মাত্রায় প্রয়োজন। যে গাছ আঁঠীবিশিষ্ট ফল উৎপন্ন করে, তাহাদের সকলেরই এক বিষয়ে সমতা দেখা যায় এই যে, যে মাটীতে চূণের ভাগ বেশী পরিমাণে থাকে সেই মাটিই এই জাতীয় ফল বৃক্ষের বিশেষ উপযোগী।

সারের পরিমাণ—

বেলে দোয়াশ মাটিতে—সমভাগ নাইট্রেট অফ সোডা এবং সুপার ফসফেট।

ক্ষারবিশিষ্ট মাটিতে—১ ভাগ নাইট্রেট অফ সোডা, ২ ভাগ সুপারফসফেট। কর্দ্দম মাটিতে—১ ভাগ সুপারফসফেট। ২ ভাগ নাইট্রেট অফ সোডা। টক্ আস্বাদ বা জলবসা কঠিন জমিতে অর্দ্ধসের চুণের সহিত নাইট্রেট অফ সোডা।

উপরোক্ত সার ব্যবহার কালীন ১ সের পরিমিত ছাই প্রতি গাছে দেওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক বৃক্ষে, বৃক্ষের বয়সের অনুপাতে মিশ্রসারের পরিমাণ অর্দ্ধসের হইতে আড়াই সের।

বৈশাখ, ১৩২২ সাল।

নব বর্ষ

বর্ত্তমান বৎসরে কৃষক ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিল। যে দেশে সর্ব্বপ্রকার সাধারণ চেষ্টা—সভা, সমিতি, সংবাদ পত্র প্রভৃতির জীবন নলিনীদলগত জলের অপেক্ষাও চপল সেরূপ স্থলে "কৃষকের" ন্যায় কেবল বিশেষ বিশেষ বিষয়ের আলোচনায় আবদ্ধ পত্রের এত দিন টিকিয়া থাকিতে যে কি প্রকার জীবন সংগ্রাম করিতে হইয়াছে তাহা প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। আমাদের লেখক, সংবাদ দাতা, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের প্রভূত সহানুভূতি না থাকিলে যে ইহা কখনই সম্ভবপর হইত না তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমরা তাঁহাদিগকেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

দেশীয় কৃষি, কৃষি সংশ্লিষ্ট শিল্পাদি প্রভৃতির উন্নতি সাধন ও বিস্তারের জন্যই "কৃষকের" অস্তিত্ব। সুতরাং বিগত বৎসর এ সমস্ত বিষয়ে সাধারণ উন্নতি কতদূর হইয়াছে এবং নিজের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তিতে "কৃষক" তাহার কতদূর সাহায্য করিতে পারিয়াছে তাহা প্রথম বিবেচ্য বিষয়। অপরাপর বৎসরের ন্যায় প্রধান প্রধান ক্ষেত্রজ ফসল সম্বন্ধে "কৃষকে" যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। অধিকন্তু ধান্য সম্বন্ধে যাহাতে অধিকতর চর্চ্চা হয় তজ্জন্য ধান্যের আদিম বাসস্থান, চাষের বিস্তার, শরীর তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশে কি প্রকার ধান্য উৎপাদিত হয় তাহাও আলোচিত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট এবং অমিশ্রিত বীজ বপন এবং ঘন ঘন বীজ পরিবর্ত্তন ভিন্ন উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার আর কোন উপায় নাই। এই দিকে সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে যে অনেক উন্নতি সাধিত হইবে তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ভারতে ফলের বাগান রচনা সম্বন্ধে "কৃষকে" যেরূপ সুবিবেচিত আলোচনা

হইয়াছে তাহা ইতিপূর্ব্বে আর কোন দেশীয় পত্রিকায় হয় নাই। উদ্যান তত্ত্ব সম্বন্ধেও বিগত বৎসর অনেক শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে এবং আমরা আশা করি যে, আমাদের পাঠকবর্গ কলম দ্বারা পেঁপের চাষ সম্বন্ধে প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া পরীক্ষা করিতে ভুলিবেন না। ভারতীয় কৃষি-সমিতি নির্ব্বাহিত পরীক্ষাদির বিষয় আমরা যথা সময়ে প্রকাশ করিয়াছি। গোবিন্দপুর কৃষি-ক্ষেত্র উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদনের কেন্দ্র হিসাবে ক্রমশঃ ক্রমশঃ জনসাধারণের নিকট অধিকতর পরিচিত হইতেছে এবং এই স্থানে নূতন নূতন পরীক্ষার অবসর পাইলেই তাহা কখনও অবহেলা করা হয় না এবং তৎসমূহের ফলাফলও "কৃষকে" সময় মত আলোচিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সরকারী কৃষি বিষয়ক পত্রাদির মূল মর্ম্মাদি "কৃষক" সকল সময়েই পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিয়া থাকেন। আমাদের কৃষি-বিষয়ক উন্নতির একটা প্রধান অন্তরায় এই, বৈজ্ঞানিক কৃষি সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আলোচিত হয় সেগুলি সমস্তই ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। দুই চারিটি বিষয় অবশ্য দেশী ভাষায় প্রকাশিত হয় কিন্তু তাহাতে যে সমস্ত তথ্য থাকে সেগুলি প্রায়ই অসম্পূর্ণ। সুতরাং বিপুল অর্থ ব্যয়ে এই যে প্রাদেশিক অথবা ভারতীয় কৃষি বিভাগ সমূহের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তৎসমুদয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অভিজ্ঞতার ফল সাধারণ কৃষকের নজরে অনেক সময় আসিয়া পৌছে না। প্রধান প্রধান ফসল সম্বন্ধে কোথায় কিরূপ পরীক্ষা চলিতেছে, উহাদের ফলাফল কি প্রকার দাঁড়াইতেছে এবং দেশ, কাল, পাত্র হিসাবে ঐ সমুদয় প্রথা প্রবর্ত্তনের উপযুক্ত কি না—এই সমস্ত বিষয় সমালোচনা ও বিবেচনা করার ক্ষমতা দেশীয় ভূস্বামীগণের যে নাই তাহা বলিতে পারা যায় না। অন্ততঃ উক্ত বিষয়াদি বাঙ্গালায় প্রকাশ করিলে তাঁহারা বিবেচনার অবসরও পাইয়া থাকেন। আমরাও এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টিত আছি। এই অবসরে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট "কৃষক" যে সহানুভূতি ও উৎসাহ পাইয়া আসিতেছে তজ্জন্য "কৃষকের" পরিচালকবর্গ গবর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

বিগত বৎসরে দেশের কৃষির সাধারণ অবস্থা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, কৃষির অবস্থা নিতান্ত মন্দ না হইলেও বাণিজ্যের বিশৃঙ্খলার জন্য কৃষক তাহার পরিশ্রমের মূল্য পাইতেছে না। কিন্তু ইহা কেবল আমাদের দেশের নহে, সমস্ত পৃথিবীরই দুঃখ। যে মহাসমর গত শ্রাবণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া এখনও চলিতেছে এবং তাহার শেষ কবে হইবে তাহা বিচক্ষণ সৈনিকগণও বলিতে পারিতেছেন না—সেই মহাসমর জন্য বাণিজ্যকে একবারেই বিচলিত করিয়া দিয়াছে। যে সমস্ত দেশ প্রকৃত যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত তাহাদের কথা ত ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। অন্যান্য সুদূরস্থিত দেশেও এই মহাযুদ্ধের প্রভাব প্রকৃষ্ট রূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে। যে সমস্ত বণিক আমদানি রপ্তানির কার্য্যে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেন তাঁহারা আজ কাল প্রায় কর্ম্মহীন হইয়া বসিয়া আছেন।

প্রকৃত কৃষিজীবীগণ অবশ্য এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই, তথাপি পাটচাষীগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে বিদেশীয় বাজারে কাটতির জন্য ফসল প্রস্তুত করায় সময়ে সময়ে কিরূপ গুরুতর ক্ষতির আশঙ্কা রহিয়াছে। কিন্তু তন্তুশস্য, তৈলশস্য প্রভৃতি ছাড়িয়া দিয়া খাদ্য শস্যের বিষয় আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অপরাপর ব্যবসায়ের ন্যায় বর্ত্তমান বৎসর সেরূপ ব্যবসায়ের জোর নাই। এক কলিকাতার বন্দরে আমদানি রপ্তানির পরিমাণ দেখিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এপ্রেল হইতে ডিসেম্বর ১৯১৪, অর্থাৎ গত বৈশাখ হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত কলিকাতায় মোট ২ কোটি ৩০ লক্ষ মণ খাদ্য-শস্য আমদানি হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসর ঐ সময়ে আরও ৪৫ লক্ষ মণ অধিক খাদ্যশস্য আমদানি হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ধান্য, গম, ছোলা, দাউল প্রভৃতি সমস্তই আছে। সুখের বিষয় এই যে চাউলের আমদানি কম না হইয়া উক্ত সময়ে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ কয়েক মাসে কিঞ্চিদূর্দ্ধ দেড় কোটি মণ ধান ও চাউল কলিকাতায় আসে। ইহার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক এক ২৪ পরগণা জেলা হইতেই আসে। কলিকাতার বাজার বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলা হইতে চাউল কম আসিলেও বর্ম্মা হইতে ৮৭ লক্ষ মণ চাউল আসিয়াছিল। তজ্জন্যই বাজারে অধিক টান পড়ে নাই।

খাদ্যশস্যের ন্যায় কার্পাস, পাট, তিসি, সরিষা ও রাই, তামাক, চিনিও আমদানি কম হইয়াছে। অবশ্য আমদানি কম হইলে রপ্তানিও কম হইবে। খাদ্য শস্যের অধিক রপ্তানি দেখিয়া যাহারা উদ্বিগ্ন হইয়া থাকেন তাঁহারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে উক্ত নয় মাসে মোটে ৫৭,৯১,০০০ মণ রপ্তানি হইয়াছে; তৎপূর্ব্ব বৎসর ঐ সময়ে ১২,৯০২,০০০ মণ রপ্তানি হইয়াছিল।

চাউলের উপর আমাদের প্রধান নির্ভর। বিগত বৎসর ধান্যের আবাদ মন্দ হয় নাই তবে আবাদের পরিমাণ কিছু হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। গত বৎসর মোট ৭ কোটি ৫১ লক্ষ একর জমিতে বৃটিশ ভারতে ধান চাষ হয়। তৎপূর্ব্ব বৎসর জমির পরিমাণ আরও এক লক্ষ একর অধিক ছিল। ভারতবর্ষ ভিন্ন মিসর, ইতালী, জাপান, কোরিয়া, আমেরিকার যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি স্থানেও ধান্য উৎপাদিত হয়। সে সমুদয় দেশেও মন্দ ধান্য হয় নাই, সুতরাং ভারতের চাউলের অধিক টান পড়ার আপাততঃ সম্ভাবনা নাই।

গোধূম সম্বন্ধে কিন্তু তাহা বলিতে পারা যায় না। পাশ্চাত্য দেশবাসীগণের মধ্যে খাদ্যের উপাদান হিসাবে গোধূমই প্রধান স্থান অধিকার করে। বর্ত্তমান সময়ে যে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহাতে অনেক স্থান হইতেই আমদানি বন্ধ। যে সকল দেশে যুদ্ধ চলিতেছে সে সকল স্থানে চাষের লোকেরও অভাব। এই জন্য ভারতের গোধূমের উপর সকলেরই দৃষ্টি আছে। এ বৎসর ভারতীয় গোধূমের উৎকৃষ্ট ফলন হইয়াছে। [illegible] ২ কোটি ৮৯ লক্ষ একরের স্থানে ৩ কোটি ২১ লক্ষ একরে গম চাষ [illegible] ফলনও ৩ কোটি ৮৯ লক্ষ কোয়াটারের (১ কোয়াটার—প্রায় পাঁচের

পৌণে ছয়মণ) স্থানে প্রায় ৪ কোটি ৮০ লক্ষ কোয়াটার হইবে। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর অভাব হিসাবে এই পরিমাণ গম সামান্য। মার্কিন, ক্যানাডা, রুস্, ভারত, আর্জিণ্টাইন ও অষ্ট্রেলিয়া এই কয়েক দেশেই যথেষ্ট গম উৎপাদিত হয় কিন্তু রপ্তানির হিসাবে সর্ব্বাধিক পরিমাণ গম মার্কিন হইতে, তৎপরে আর্জিণ্টানই, তৎপরে ক্যামেডা এবং সর্ব্বশেষে ভারত হইতে যায়। এ বৎসর যাহাতে অত্যধিক রপ্তানি না হইতে পারে ও ধনীগণের ষড়যন্ত্রে কৃষকগণ তাহাদের লেহ্য লাভ হইতে বঞ্চিত না হন তজ্জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট বিশেষ আইন জারি করিয়াছেন। সরকারের এই দূরদর্শী কার্য্যের জন্য কৃষক মাত্রেই তাঁহাদিগের নিকট ঋণী।

কৃষিজাত দ্রব্যাদির ভবিষ্যত এখনও তমসাচ্ছন্ন। মহাসমরের একেবারে নিবৃত্তি হইলেই যে ভারতীয় কৃষিজাত পণ্যাদির উপর সমস্ত জগতের ব্যবসায়ীগণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তখন অর্থনীতির অবশ্যম্ভাবী নিয়মের প্রভাবে ভারতের বাজার একবার ধনী, ব্যবসায়ী, দালাল প্রভৃতির বিপুল ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়া পড়িবে। তাহাতে প্রকৃত কৃষকগণের কি উপকার হয় তাহা এখনই বলিতে পারা যায় না।

দেশীয় শ্রম শিল্পের ভবিষ্যত---

প্রতি বৎসরই বৎসরান্তে অথবা নববর্ষের প্রারম্ভে গুড্‌ফ্রাইডের অবকাশে একবার প্রাদেশিক সমিতির অধিবেসন হয় এবং তৎসঙ্গে স্থানে স্থানে দেশীয় শিল্পাদির আলোচনার জন্য একটি শিল্প সমিতিরও অধিবেশন হইয়া থাকে। মামুলী প্রথা অনুসারে এবারেও সেইরূপ হইয়াছে। বিহার Industrial conference এর সভাপতি এবার ছিলেন মাননীয় মিঃ লি। তাঁহার বক্তৃতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কতিপয় জ্ঞানগর্ভ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে শ্রমশিল্পের স্বল্পতার অন্যতম কারণ এই যে দেশের লোকের এত দিন পর্য্যন্ত চাষ আবাদ করিয়া এত সুখে সচ্ছন্দে কাটাইয়া আসিয়াছে যে তাহারা সহজে কল কারখানার দিকে যাইতে চায় না। যে দেশে কর্ষণযোগ্য জমি কম অথবা অন্যান্য কারণে কৃষিকার্য্য অধিক ব্যয় অথবা অত্যন্ত শ্রমসাপেক্ষ সেই দেশেরই লোকে শিল্পের দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনের চেষ্টা করে কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া কোন জাতিই শুধু কৃষি কার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। উন্নত সুসভ্য এবং অন্যান্য উন্নতিশীল জাতির সমকক্ষ হইতে হইলেই শিল্পকলার চর্চ্চা ও শিল্পের বিস্তার একান্ত আবশ্যক।

কিন্তু কি করিয়া দেশে শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি হইতে পারে। শুধু উপযুক্ত যুবক বৃন্দকে বিদেশে পাঠাইয়া বিশেষ বিশেষ শিল্প শিখাইয়া [illegible]। অনেকে এই ভ্রান্ত ধারণায় দেশে শিল্প শিক্ষাগার স্থাপনের জন্য ব্যতিব্যস্ত। [illegible]

সেইরূপ ব্যক্তিগণকে লক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে—"Institutions which train students in the science underlying manufacturing operations and in modern industrial processes only prepare them to conduct industries and do not make the industries themselves. Industries come from the people not from institutions nor from the Government and unless the people of the country have the desire to found and promote and foster industries there will be no industries". অর্থাৎ যে সকল শিক্ষাগারে শিল্প কার্য্যের মূলাধার বিজ্ঞান অথবা আধুনিক শিল্পাদি প্রস্তুতের প্রকরণ শিক্ষা দেওয়া হয় সেই সকল শিক্ষায় কেবল শিল্পাদি কার্য্য পরিচালনার উপযুক্ত ব্যক্তি গঠন করে মাত্র; তাহাতে কিছু শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় না। শিল্পের প্রতিষ্ঠা দেশের জনসাধারণের দ্বারাই হয়। শিক্ষাগারের দ্বারা কিম্বা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ইহা হয় না। যতক্ষণ না জন সাধারণের শিল্প স্থাপন, পোষণ ও উন্নতির চেষ্টা না হইবে ততক্ষণ কোন শিল্পেরই উদ্ভব হইবে না—এই উক্তিটি যথার্থ, আমরা এ সম্বন্ধে অনেক বার অনেক কথাই উল্লেখ করিয়াছি।

কৃষি কলেজ সম্বন্ধে লি সাহেবের অভিমত---

কৃষি কলেজ সমূহের বর্ত্তমান অবস্থা দেখাইয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যের যুক্তি যুক্ততা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কৃষিকলেজ গুলিতে উন্নত প্রণালীর কৃষি শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ছাত্রও যথেষ্ট আছে, কিন্তু যে শ্রেণীর লোকেরা এই রূপ শিক্ষা পাইলে দেশে বৈজ্ঞানিক কৃষির বিস্তার হইত তাহারা সাধারণতঃ কলেজে আসে না। যাহারা আসে তাহারা কেহই কৃষি কার্য্য জীবিকা স্বরূপ অবলম্বন করে না। কেবল বিশেষ বিশেষ পদের উপযুক্ত হইবার জন্যই কলেজে অধ্যয়ন করে। এইরূপ হওয়ার একটা কারণ আছে। বড় বড় ভূস্বামীগণ বলেন যে কৃষি শিক্ষায় তাঁহাদের কোন লাভ নাই। কারণ, তাঁহাদের যথেষ্ট জমি থাকিলেও তাহার অধিকাংশই বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহা হইতে প্রজা উঠান অসম্ভব। অন্যদিকে সামান্য যাহা দখলে আছে, তাহা চাষ করিলে তাঁহার অবস্থার লোকের কোন সুবিধা হয় না। সুতরাং কৃষি কার্যে হস্তক্ষেপ না করাই ভাল। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান কারণ সমূহ দূরীভূত না হইলে বড় বড় জমিদারেরা যে কৃষি কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন না তাহা একপ্রকার নিশ্চয়।

কৃষি কলেজ ভিন্ন অন্যান্য শিল্প কলেজেরও অবস্থাও একই প্রকার; নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইবার জন্যই এসকল স্থানে ছাত্রেরা অধ্যয়ন করিতে আসে। উপযুক্ত জ্ঞানার্জ্জন করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নহে সেই জন্য বরং কতকগুলি শিল্প শিক্ষাগার স্থাপন করিয়া অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যক শিল্প শিক্ষা

না দিয়া যে সকল শিল্পের দেশে প্রকৃত অভাব আছে এবং যাহা প্রতিষ্ঠার জন্য লোকে ইচ্ছুক সেইরূপ শিল্প শিক্ষারই ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা না করিয়া যে সকল শিল্পের লোকের আস্থা নাই অথবা যে সকল শিল্পের নিকট ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ নহে সেই গুলি কতিপয় যুবক বৃন্দকে শিক্ষা দিয়া কেবল কতকগুলি অসন্তুষ্ট চিত্ত ব্যক্তির সৃষ্টি করা মাত্র।

এইত গেল জনসাধারণের সহিত বর্ত্তমান সময় শ্রম শিল্পাদির সম্বন্ধের বিষয়। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশে শিল্পাদি সম্বন্ধে যতটা উন্নতি হইয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে গেলেও বিশেষ সন্তোষলাভ করা যায় না। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে মিঃ সোয়ান্ বঙ্গদেশীয় শ্রমশিল্পাদির অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি উক্ত বিষয় সম্বন্ধে একটি বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম বিকাশে যে সকল নূতন নূতন শিল্পাদির স্থাপন হইয়াছিল তাহার অনেকগুলি এখন অদৃশ্য হইয়াছে।

এতদ্দেশে যৌথ কারবার স্থাপন অতি অল্প দিনই হইয়াছে। ১৮৮৯ সালে মিঃ কলিন যখন শিল্পাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত হন তখন একটিও ছিল না। ১৯০৭-০৮ সালে অর্থাৎ ১৯ বৎসর পরে পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গে যখন মিঃ কামিং ও মিঃ গুপ্ত এই কার্য্যে নিযুক্ত হন তখন অনেকগুলি যৌথ কারবার হইয়াছিল; আর বৎসর পরে অনেকগুলি উঠিয়া গিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ২৫ বৎসরের ভিতর বঙ্গ দেশে যৌথ কারবারের উত্থান ও পতন উভয়ই হইয়াছে। ইহার কারণ কি? সাবান, দেশালাই, মোজা, গেঞ্জি, কাপড় ও রঞ্জক পদার্থ প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য যে এতগুলি কল কারখানা স্থাপন হইল ও কি কারণে এবং কি প্রকারে অন্তর্হিত হইল তাহা একটি বিশেষ ভাবনার বিষয়।

মিঃ সোয়ান বলেন এইরূপ অবস্থা প্রধানতঃ দুইটি কারণের সংযোগে সংঘটিত হইয়াছে—১। অনপর্য্যাপ্ত মূলধন। ২। অনুপযুক্ত তত্ত্বাবধান। বস্তুতঃ উক্ত নূতন নূতন কারবার সমূহের উত্থান ও পতনের ইতিহাস আলোচনা করিলে কোন কারণটাই অলীক বলিয়া বোধ হয় না।

যে সমুদায় লোকের উদ্যোগে এই সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন বটে কিন্তু বিশেষ বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা জন্য যে বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক তাহা প্রায় কাহারই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং কি পরিমাণ মূলধন হইলে কার্য্য স্বচ্ছল ভাবে চলিতে পারিবে তাহা তাঁহারা প্রথমে অনুমান করিতে পারেন নাই। কিম্বা তাঁহারা অনেক স্থলে কার্য্য আরম্ভ করিলে টাকা আসিবে এ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। অবশেষে দেখিতে পাওয়া গেল যে প্রস্তাবিত মূলধনের সামান্য অংশ মাত্র সংগৃহীত হইল এবং যে স্থলে

উক্ত স্বল্প অর্থেই কার্য্য তাড়াতাড়ি আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইল সে স্থলে আর মূলধন উঠিল না! সেই জন্য কোথাও হয় ত কল কব্জা ক্রয় করা হইল, আবশ্যকীয় উপাদান ও মজুরী যোগাইবার আর উপায় থাকিল না এবং কোথায় হয় ত অভাব পরিপূরণের জন্য এত অধিক সুদে ঋণ গ্রহণ করা হইলে যে কারখানায় লাভ হইলেও সুদের টাকা দিতেই তাহা ঘাটিয়া গেল।

এস্থলে সোয়ান সাহেবের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। কারণ কথাটা বড়ই ঠিক। তিনি বলিয়াছেন যে "Adequate capital is particularly necessary in the case of industries run by Indian capital and under Indian management, owing to the reluctance of banks and of firms that supply machinery and raw materials to give them credit. When a concern has to pay cash for its raw materials and at the same time to allow credit to its customers, it must have at its command much more working capital than a similar business which enjoys the usual banking facilities." অর্থাৎ যে সকল কারবার ভারতীয় মূল ধনে এবং ভারতবাসীগণের তত্ত্বাবধারণে পরিচালিত হয় তাঁহাদের মূলধন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হওয়া অধিকতর আবশ্যক। কারণ ব্যাঙ্ক কিম্বা কলকব্জা অথবা মূল উপাদান ব্যবসায়ীগণ তাহাদিগকে ধার দিতে চায় না। যখন কোন কারবারকে নগদ টাকা দিয়া মূল উপাদান ক্রয় করিতে হয় এবং খরিদ্দারগণকে ধার দিতে হয় তখন উক্ত রূপ যে সকল কারবারকে করিতে হয় না সে সমুদয় কারবার অপেক্ষা উহার আয়ত্তাধীনে অধিকতর মূলধন থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়।

বলা বাহুল্য যে বিদেশীয়গণ পরিচালিত কারখানাকে ব্যাঙ্ক অথবা ব্যবসায়ীগণ ধার দিতে সকল সময়েই ইচ্ছুক। ভারতবাসীগণ যে সুবিধা পায় না এবং তাহাই নূতন কারবারের উন্নতির একটি প্রধানতম অন্তরায়। কার্য্য পরিচালনার সুদক্ষ লোক যে দেশীয়দিগের মধ্যে নিতান্ত কম তাহাও অস্বীকার করা যায় না। আজ কাল ইংলণ্ড, ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে বিশেষ বিশেষ শিল্পে কতিপয় ব্যক্তি সুশিক্ষিত হইয়া আসিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু তাঁহারা আবশ্যকীয় দ্রব্যই প্রস্তুত করিতে পারেন। কিন্তু কি প্রকারে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যে মূল উপাদান ক্রয় করিয়া সর্ব্বোচ্চ মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিতে হয়, কিরূপভাবে মূলধন ব্যয় করিলে কারবার অক্ষুণ্ণ থাকে, বাজার হিসাবে কি রকমে পণ্যের দাম অথবা প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিতে এ সকল বিষয় অভিজ্ঞ নহেন। যাঁহারা বড় বড় কারবারে লিপ্ত থাকিয়া হাতে কলমে এই সকল কাজ করিয়াছেন, তাঁহারাই কার্য্য পরিচালনায় উপযুক্ত ব্যক্তি। এতদ্দেশীয় যে কোন কারবারের ডাইরেক্টারগণের তালিকা পাঠ করিয়া দেখিলে বড় বড় জমিদার, উকিল,

ব্যারিষ্টার প্রভৃতির নাম অনেক দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক কাজের লোকের নাম বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। সে রকমের লোক দেশে কম সত্য। কিন্তু কারবারে যখন অভিজ্ঞতা ক্রয় করিতে হয় তখন কারবারের শুভাকাঙ্ক্ষায় বিদেশ হইতে ঐ প্রকার লোক সংগ্রহ করার আপত্তি কি ?

বঙ্গদেশে যৌথ কারবারের সাধারণ অবস্থা এইরূপ হইলেও মিলিত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কার্য্যাদির ভবিষ্যত যে একবারে অন্ধকারময় নয় তাহা দুই চারিটি কারবারের অবস্থা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। এগুলি অবশ্য প্রকৃত প্রস্তাবে যৌথ কারবার নহে। দুই চারিজন ব্যক্তি একত্রিত হইয়া এগুলির প্রতিষ্ঠা করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বেঙ্গল কেমিকেল ও ফারমাসিউটিকাল ওয়ার্কস, পেনসিল নিব প্রভৃতি প্রস্তুত কারক মেসার্স এফ, এন, গুপ্ত কোম্পানি, কলিকাতা পটারি ওয়ার্কস, বেঙ্গল ন্যাসনাল ট্যানারি প্রভৃতির বিষয় বলিতে পারা যায়। এই সমস্ত কারবারের আর্থিক অবস্থা আপাততঃ উত্তম এবং ইহাদের দ্রব্যাদির কাটতি দেখিয়া বোধ হয় যে এইগুলি বাজারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। অল্প সংখ্যক অংশীদার থাকায় তত্বাবধারণ অধিকতর কার্য্যকরী বলিয়াই হউক কিম্বা মূলধনের প্রাচুর্য্যতা বশতঃই হউক, যে কারণেই হউক, এই সকল কারবার মোটের মাথায় সফলতা লাভ করিয়াছে এবং তদ্দ্বারা দেশেরও নাম রক্ষা করিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শ্রম শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার দেশের লোকের উপরেই নির্ভর করে। কিন্তু কখন কোন বিষয়ে সরকারী সাহায্যও বাঞ্ছনীয়। যদি গবর্ণমেণ্ট ইহা দেখাইয়া দিতে পারেন, যে কোন নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট মূল্যে প্রস্তুত হইয়া উপযুক্ত পরিমাণ লাভে বিক্রয় হইতে থাকে, তাহা হইলে উক্ত কারবার প্রতিষ্ঠার সুযোগ যে কেহ অবহেলা করিবেন না তাহা স্থিরনিশ্চয়। সোয়ান সাহেবের মতে গবর্ণমেণ্ট যদি নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে মনঃসংযোগ করেন তাহা হইলে শ্রমশিল্প বিস্তারে অনেক সুবিধা হইতে পারে—

১। গ্রাম্য শ্রমজীবীগণের (যেমন তাঁতি, রেশমী বস্ত্র ও পিত্তলের দ্রব্য প্রস্তুত-কারীগণ) মধ্যে যৌথ ঋণ দান সমিতি সংস্থাপন। উক্ত সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রমজীবি-গণকে মূল উপাদান ক্রয় করিতে এবং প্রস্তুতীকৃত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে উপযুক্ত পরিমাণ সাহায্য প্রদান করিবেন।

২। উন্নত প্রণালীর কল কব্জার উপকারিতা বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থলে প্রদর্শন। তাঁতিদিগের এইরূপ প্রদর্শনীতে স্থানে স্থানে অনেক উপকার হইয়াছে। কিন্তু তসর বস্ত্র ও পিত্তল বাসন প্রস্তুত কারকগণের এই উপায়ে অনেক শিক্ষা দিতে পারা যায়।

৩। বনবিভাগের সাহায্য প্রদানে যাহারা দেশলাই, পেনহোল্ডার ও পেনসিল প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে চান তাঁহাদিগকে বন বিভাগ উপযুক্ত কাষ্ঠ বিশেষ বন্দোবস্তে

সরবরাহ করিয়া উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠার অনেকটা সাহায্য করিতে পারেন। ফলতঃ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের আয়ত্তাধীনে যে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য আছে তাহা জানাইয়া এবং মূল উপাদান উপযুক্ত মূল্যে দিয়া শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠাতাগণকে উৎসাহ প্রদান করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহারা নিজে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে তাদৃশ ইচ্ছুক নহেন।

শ্রমশিল্পের ভবিষ্যৎ সুতরাং দেশের লোকের উপরেই নির্ভর করিতেছে। যে যে কারবার সফল হইবার আগে দুই চারিজনের মিলিত চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত কারবার কৃতকার্য্য হওয়া আবশ্যক। কারণ উহাই যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের শিক্ষা স্থল। ইংলণ্ডের শ্রমশিল্পের ইতিহাস অধ্যয়ন করিলেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যে যে কারবারের যুগ যখন ইংলণ্ডে আসে তাহার বহুপূর্ব্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তিগণ স্বতন্ত্রভাবে কিম্বা দুই চারিজন মিলিয়া বড় বড় শিল্পের প্রতিষ্ঠান করেন। কালক্রমে যখন ঐ সমুদয়ের কারবার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বিশাল শিল্পশালায় পরিণত হয় তখনই তাঁহারা সাধারণকে উহাতে যোগদান করিতে আহ্বান করেন। ইহাতে সাধারণের বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয় না এবং কোন প্রকার দুর্ঘটনার আশঙ্কাও কম থাকে। এতদ্দেশে তাহাই প্রথমে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পত্রাদি

ধান ক্ষেতে সেওলা-তাহারপ্রতিকার---

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সরকার—গ্রাম কুড়চিবেড়িয়া, পোঃ গুজারপুর, হাওড়া।

মহাশয়, হৈমন্তিক ধান্যের জমিতে ধান্য রোপণের পর গেঁয়াদি নামক এক প্রকার বিষাক্ত শেওলা উৎপন্ন হইয়া ধান্য গাছের বিশেষ অনিষ্ট করে, এমন কি উহাতে ধান্য উৎপাদানের আশা থাকে না। উক্ত জলজ শস্ক প্রায় শেওলার মতন দেখিতে এবং উহার গন্ধ রুশুনের ন্যায়; এমন কি জলেতেও উক্ত দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। শিশুদিগের প্লীহা ও যকৃৎ হইলে যেমন তাহাদের জীবনী শক্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া আইসে, সেই প্রকার হৈমন্তিক ধান্যের গাছ বিবর্ণ ও শীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া ভাবি ফলনের আসা একেবারে নির্ম্মূল করে। অতএব যদি ইহার কোনও প্রতিকারের উপায় থাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক কৃষক পত্রিকায় প্রচার করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। কারণ উহাতে ধান্য চাষীর যত অনিষ্ট হয়, এমন আর কিছুতেই নহে।

উত্তর—আপনার পত্রের উত্তরে আপনাকে জানান যাইতেছে যে, উক্ত ধান জমির জল যখন শুকাইয়া যাইবে তখন জমিটিতে বারম্বার চাষ দিয়া, তাহাতে চুণ ছড়াইয়া দিতে

হইবে। চূণ ছড়াইবার পরও ২।১বার চষিলে ভাল হয়। চূণের ঝাঁজে ঝাঁজি মরিয়া যাইবে। বারম্বার চাষ দিলে ঝাঁজের শিকড় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রোদ্র বাতাসে শুকাইতে আরম্ভ করে; তাহার উপর চূণ পড়িলে নিশ্চয়ই প্রতিকারের সম্ভাবনা। জমিতে যদি বারমাস জল থাকে এবং জল যদি বাহির করিয়া দিবার উপায় না থাকে তবে জলে কাদায় চষিয়া চূণ ছিটাইলেও ঝাঁজি পচিয়া যাইতে পারে।

জলপাই গুড়ির কড়ে মাটী, তাহার উন্নতিবিধান, সবুজসারপ্রদান---

শ্রীদীননাথ দাস---জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি—

উক্ত ব্যক্তি লিখিতেছেন:—আমার একটী ক্ষেতে ১০০ বিঘার উপর জমিতে কিছুতেই আউস ধান্য জন্মাইতে পারিতেছি না। হৈমন্তিক ধান্যেরও ফলন বিঘাপ্রতি ৩/০ মনের বেশী প্রায়ই হয় না। এই ভূমিতে দোয়াস মাটী উপরে প্রায় একফুট তাহার নিচেই ১॥ ফুট ঈষৎ ব্রাউন রঙ্গের মাটী তাহার নিচেই পুনরায় দোয়স মাটী ১ফুট তাহার নিচে বালি। এদেশের যে কোন স্থানে নিচে বালি থাকিবেই। আমি যে জমির কথা বলিতেছি সে জমিতে ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে আউস ধান্য বুনিলেই জ্যৈষ্ঠ মাসের অর্দ্ধেক দিন পর্য্যন্ত ধান্যের গাছ সতেজ থাকে তার পর রৌদ্রের তেজ কিছু বেশী হইলেই ধান্যের গাছ গুলি নিস্তেজ হইতে থাকে ও মাজ মরিতে থাকে আষাঢ় মাসে ধান্যের শিষ বাহির হয় বটে কিন্তু তাহা ৩।৪ অঙ্গুলের অধিক লম্বা হয় না। হৈমন্তিক ধান্য রোপণ করিলে যেরূপ ঝাড় বাঁধে ইহাতে সেরূপ বাঁধে না। এই জমিতে কিরূপ সারের ব্যবস্থা করিলে উপকার হইতে পারে উপদেশ দিলে বাধিত হইব। আবশ্যক হইলে পরীক্ষার্থ মাটী পাঠাইতে পারি। ১৩২১ সালের বৈশাখ ও অগ্রহায়ণ মাসের কৃষকে হরিৎ সার সম্বন্ধে লেখা আছে, পরীক্ষার্থ ৬ বিঘা ধঞ্চা দিয়া দেখিতে ইচ্ছা করি এ জন্য নিবেদন নিম্নলিখিত বিষয় কয়েকটীর উত্তর দিলে বাধিত হইব। ১। কোন্ সময় ধঞ্চা আবাদ করিতে হয়? ২। ধঞ্চার জমি কিরূপ পাইট হওয়া (চাষ আদি হওয়া) আবশ্যক? প্রতি বিঘায় কত বীজ দিতে হয়? উহার মূল্য কত?

উত্তর—সবুজ সার প্রায়োগে জমির উন্নতি হইতে পারে। ধঞ্চে চষিয়া দিবার সময় কিছু চূণ ছিটাইয়া দিলে উপকার দর্শিতে পারে। চূণ প্রয়োগে ঘাসের বা আগাছার শিকড় পচিয়া যায় এবং কড়ে মাটী নরম হইতে পারে। উপরে যখন ৩।৪ ফিট মাটী রহিয়াছে তখন নিচে বালি থাকিলে ধান চাষের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না। কড়ে মাটীতে শিকড় পৌছিলেই শস্যের হানি হয়। গোময় সার প্রতি ১৫০ মণ ও ঐ সঙ্গে কিছু চুণ প্রয়োগ করিলেও উপকার দেখিতে পাইবেন। জমির মাটীর নমুনা পাঠাইলে পরীক্ষা করিয়া বলা যায় কত টুকু চুণ প্রয়োগ আবশ্যক মোটা মুটী পরীক্ষার জন্য ৫৲ টাকা ফি লাগিবে।—

লেবু ঘাসের কথা লিখিয়াছেন—লেবু ঘাসের বা অন্য কোন গন্ধ তৃণের চাষ করা মন্দ নহে। কিন্তু গন্ধ তৃণের চাষ করিয়া পূর্ব্বে ঘাস চোলাই করিবার ব্যবস্থা করিতে হয় অথবা কোন কারখানার সহিত বন্দোবস্ত করিতে হয়।

গন্ধ তৃণের জাতি আলাহিদা। কৃত্রিম উপায়ে ঘাসে গন্ধ জন্মাইবার উপায় নাই।

উচ্চজমিতে ভাদুই ধান---

উত্তর—ভাদুই ধানের চাষ না করিয়া আমন ধানের চাষ করিতে পারেন। বাঁক তুলসী, দাউদখানি প্রভৃতি মিহিধানের বীজ ভারতীয় কৃষি সমিতি হইতে পাইবেন। আপনার জমি উচ্চধরণের সুতরাং মিহি ভিন্ন মোটা ধানের চাষ চলিবে না। মোটা ধানের গোড়ায় অধিক জল থাকা চাই।

মানুষের খাদ্য---

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

জার্ম্মাণি দেশের লোক রাই নামক এক প্রকার শস্যের চাষ করে। রাই পিষিয়া ময়দা করিয়া তাহা হইতে মোটা রুটি করিয়া এ দেশের সাধারণ লোকে ভক্ষণ করে। ধনবান লোকেরা গমের রুটি আহার করে। রাই বলিলে আমরা মনে করি যে, ইহা একজাতীয় সরিষা। কিন্তু জার্ম্মাণি দেশের রাই, সরিষা নহে। ধান যব গমের ন্যায় ইহা একজাতীয় ঘাসের বীজ। উদ্ভিদ শাস্ত্রে ইহাকে সিরিয়াল বলে। রুষ দেশের অনেক লোকেও রাই ভক্ষণ করে। ইহা হইতে তাহারা কোয়াস নামক এক প্রকার মদ্যও প্রস্তুত করে। রাই-বীজে এক প্রকার পীড়া হয়। তখন ইহা ভয়ানক বিষ হয়। ডাক্তারিতে ঔষধরূপে এই বিষ ব্যবহৃত হয়। ইহাকে আর্গট বলে।

উদ্ভিদ্ শাস্ত্রে রাই ঘাসকে সিকেল সিরিয়াল বলে। যে সমুদয় ঘাসের বীজ মানুষে ভক্ষণ করে, ইংরেজিতে তাহাদের সাধারণ নাম সিরিয়াল। ধান, যব, গম, জই, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, কোদো, মড়ুয়া, রাই, চীনা, শ্যামা, কাঙ্গনি, গড়গড়া, দেবধান্য, বাঁশ প্রভৃতি অনেক ঘাসের বীজ সিদ্ধ করিয়া মানুষে ভক্ষণ করে।

ঘাস ব্যতীত আরও অনেক প্রকার উদ্ভিদের বীজ খাইয়া লোকে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য জীবন ধারণ করে। কেহ কেহ ইহাদিগকেও সিরিয়াল মধ্যে পরিগণিত করেন; কিন্তু তাহা ভ্রম। বীজের জন্য যে সমুদয় ঘাস মানুষে চাষ করে, তাহাকেই সিরিয়াল বলা উচিত। বঙ্গদেশে চাউল অর্থাৎ ভাতকে আমরা অন্ন বলিয়া জানি। পশ্চিমে ধান্য যব গম জোয়ার ভুট্টা প্রভৃতি সকল প্রকার চাষের বীজকে লোকে অন্ন মধ্যে পরিগণিত করে। সে জন্য উপবাসের দিন আমি অনেককে মাথামা, সিঙ্গেড়া, ফাফড়া

প্রভৃতি বীজের ময়দা খাইতে দেখিয়াছি। মাখানা জলে হয়। পাণিফলকে এ দেশে সিঙ্গেড়া বলে। ফাপড়াকে ইংরেজিতে বক্‌হুইট বলে। পশ্চিমে ও পঞ্জাবে কোন কোন স্থানে লোকে ইহার চাষ করে। হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশেই ইহার অধিক চাষ হয়। হিমালয়ের অনেক স্থানে লোককে আমি ডেঙ্গো শাকের বীজ ভক্ষণ করিতে দেখিয়াছি। ইহাকে তাহারা বাথু শাক বা বাথুয়া বলে। দক্ষিণে নীলগিরি পর্ব্বতে বডগর জাতিও ইহার চাষ করে। দ্রাবিড় অঞ্চলে উপবাসের দিনও লোকে ইহা ভক্ষণ করে, কারণ এ সমুদয় বস্তুতঃ ঘাসের বীজ নহে, সুতরাং অন্ন মধ্যে পরিগণিত নহে। চাউল ব্যতীত এ স্থানে লোকের প্রধান অন্ন মড়ুয়া ঘাসের বীজ। এ অঞ্চলে লোকে ইহাকে রাগি বলে। আমি দেখিয়াছি যে, ইহাকে পিষিয়া সিদ্ধ করিয়া তাহার পর ডেলা পাকাইয়া লোকে ইহা টপ টপ গিলিয়া ফেলে। রাগি যাহাদের প্রধান আহার, তাহাদের শরীর বলিষ্ঠ হয়। মহীসুরের হায়দার আলির পলিগার সৈন্যের ইহা প্রধান আহার ছিল। পশ্চিমে লোকের প্রধান আহার যব জোয়ার ও বাজরা। পঞ্জাবের প্রধান আহার ভুট্টা। ইহার অন্য নাম জনার ও মকাই। কৃষকেরা সচরার গম বিক্রয় করিয়া ফেলে। তাহার পর জোয়ার বাজরায় ন্যায় অল্প মূল্যের শস্য খাইয়া জীবন ধারণ করে।

আরব প্রভৃতি বালুকাময় মরু দেশের লোকের প্রধান আহার খেজুর। মিশরে ও আরবে আমি অনেক খেজুরেব বাগান দেখিয়াছি। পারস্য-উপসাগরের উপকূলে, যে স্থান এক্ষণে ইংরেজ সেনা দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে, সে স্থানে নদীর দুইধারে কেবল খেজুরেরর বাগান আছে।

পূর্ব্ব আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদিগের প্রধান আহার কদলী। আমাদের দেশে যে জাতীয় কদলীকে আমরা কাঁচ-কলা বলি, তাহাই ইহাদের প্রধান আহার। কাঁচকলা পুরুষ্ট হইলে তাহারা উষ্ণ ভস্মের ভিতর সন্নিবেশিত করে। ভস্মের উষ্ণতায় কলা সিদ্ধ হইয়া যায়। তাহাই খাইয়া এস্থানের লোক জীবন ধারণ করে। যে স্থানে লোকের বাস, সে স্থান কদলী গাছে পরিপূর্ণ। লোকের কুটীর তাহার ভিতর সম্পূর্ণভাবে লুক্কায়িত থাকে। পূর্ব্ব আফ্রিকায় কম্পালা নামক নগর আছে। ইহাতে ষাট হাজার লোকের বাস। নিকটে গিয়াও তুমি একটী ঘর দেখিতে পাইবে না। সেই কলা গাছের ভিতর লোকের ঘর। আফ্রিকার ইংরেজ-শিক্ষায় ইহারা এক্ষণে কদলী ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের চাষ করিতেও আরম্ভ করিয়াছে।

আফ্রিকার আদিম অধিবাসীগণের শরীর দেখিলে বোধ হয় যে, কদলী খাইয়া প্রাণ ধারণ করিলে মানুষ দুর্ব্বল হয় না। একবার পুতিয়া দিলে অনেককাল চলিতে থাকে। আমাদের দেশে ঝড়ের উপদ্রবে কদলীর অধিক চাষ করিতে পারা যায় না। গাছ বড় হইল, ফল হইল, আর ঝড় আসিয়া সব ফেলিয়া দিল। আমি ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু পূর্ব্ব আফ্রিকার মধ্যস্থলে ঝড়ে বোধ হয় অধিক ক্ষতি করিতে

পারে না। তবে আর এক বিপদ আছে। কখন কলা গাছের কিরূপ একটা রোগ হয়। সেই রোগে দেশের সমুদয় কলাগাছ মরিয়া যায়। তখন দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে এই দুর্ভিক্ষে দেশের সমুদয় লোক মরিয়া যাইত, দেশ একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়িত। কিন্তু এখন সেরূপ বিভ্রাট ঘটে না। কলা গাছের রোগ আরম্ভ হইলে ইংরেজ প্রথম তাহার প্রতিকার করিতে চেষ্টা করেন। রোগ নিবারণ করিতে না পারিলে, ইংরেজ বিদেশ হইতে অন্যরূপ খাদ্য আনায়ন করিয়া আশ্রিত প্রজাবর্গের প্রাণ রক্ষা করেন। "বঙ্গবাসী"

বাগানের মাসিক কার্য্য

জ্যৈষ্ঠ মাস।

কৃষিক্ষেত্র—এই সময় আমন ধান বোনা হয়, পাট ও আউশ ধানের ক্ষেত নিড়াইতে হয়, বেগুন ভাঁটি বান্ধিয়া দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অরহর বীজ বপন করা চলে। আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বসাইতে পারা যায়। শাঁকালুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

সব্জী বাগ,—এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন করা উচিত। কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। জলদি ফসল হইতে ইতি মধ্যে ভুট্টা ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স, পালা ঝিঙ্গা, পালা শসার বীজও এই মাসে বপন করা চলে। বর্ষাতি মুলা ও নানা জাতীয় শাক বীজের বপন কার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হইবে। জলদি ফুল কপি খাইতে গেলে এই সময় হইতে পাটনাই ফুল কপি বপন করিয়া চারা তৈয়ারি করিতে হইবে।

ফুলবাগিচা—এই সময় জিনিয়া, দোপাটী, গাঁদা বীজ বপন করিতে হইবে। ডালিয়া বীজ ও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়ার মূল এই সময় বসাইতে বলেন, আমরা কিন্তু বলি আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূল গুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে, সেই জন্য বর্ষান্তে বসাইলেই ভাল। কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র ফুলের মুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না। পূর্ব্বে কথিত ফুল বীজ ব্যতীত আমরান্থাস্, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, রাধাপদ্ম, ধুতুরা, মার্টিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ বপনের এই সময়।

ফলের বাগানের এখন বিশেষ কোন পাট নাই। ফল আহরণ এখন একমাত্র কার্য্য। তবে কুল, পীচ, লেবু প্রভৃতি যে সকল গাছের থাপকলম করিতে হইবে তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হয়।

পার্ব্বত্য প্রদেশে, কিন্তু ঋতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। সেখানে এখন ডালিয়া ফুটিতেছে। তথায় মটর ও সীম ফলিতেছে। বাঁধা কপি ও ফুলকপির বীজ এখন বপন করা যায়।

REGISTERED No. C. 193.

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

ষোড়শ খণ্ড,—২য় সংখ্যা
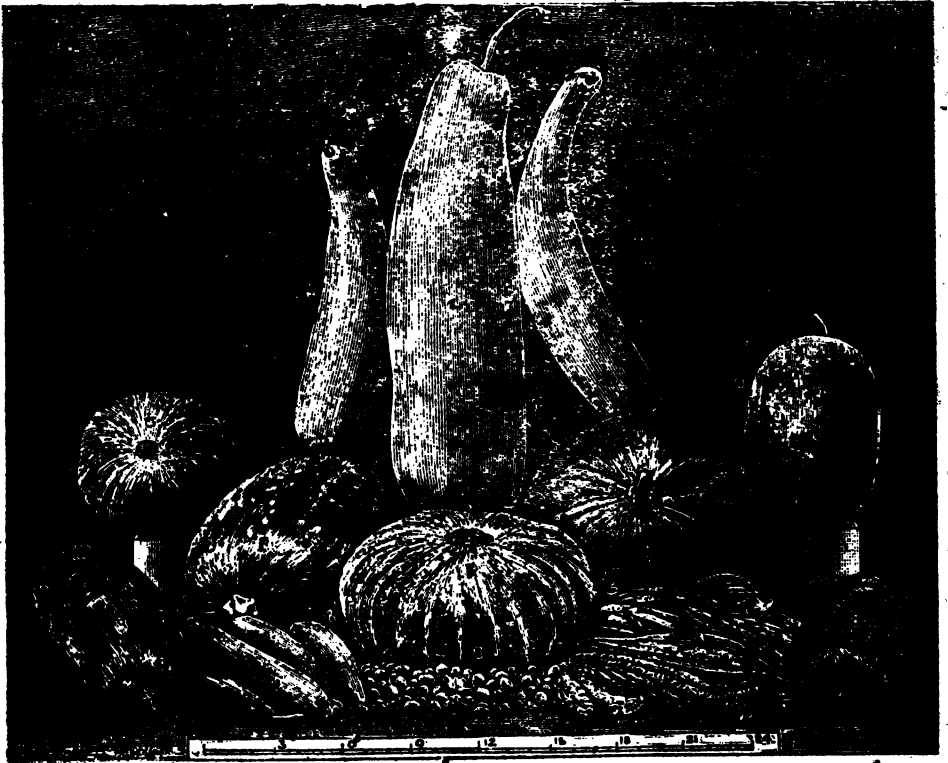
সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২

কলিকাতা; ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৬২নং বহুবাজারষ্ট্রীট, শ্রীরাম প্রেস হইতে।

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶৹ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

KRISHAK.

Under the Patronage of the Governments of Bengal and E. B. and Assam.

THE ONLY POPULAR PAPER OF BENGAL

Devoted to Gardening and Agriculture. Subscribed by Agriculturists, Amateur-gardeners, Native and Government States and has the largest circulator.

It reaches 1000 such people who have ample money to buy goods.

Rates of Advertising.

1 Full page Rs. 3-8. 1 Column Rs. 2.
½ Column Rs. 1-8

MANAGER—"KRISHAK"
162, Bowbazar Street, Calcutta.

বিজ্ঞাপন।

১৯১৫ সালের ৪ আইন আমরা ভারতগবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উক্ত আইনের প্রতিলিপি প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান যুদ্ধ যতদিন চলিবে ততদিন ও তাহার পরে আরও ছয় মাসকাল পর্য্যন্ত এই আইন বলবত থাকিবে। সাধারণের বিপন্নিবারণ ও ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের শান্তিরক্ষার নিমিত্ত এই আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। মিথ্যা বা ভয়াবহ বা অসন্তোষ জনক সংবাদ রটনা দ্বারা কিম্বা কার্য্যতঃ দেশের শান্তির ব্যাঘাত উৎপাদন করিলে দোষী ব্যক্তির কি প্রকারে দণ্ডবিধান করা হইবে তাহারই বিধি ব্যবস্থা হইয়াছে।

কৃষক।

সূচীপত্র।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৬শ খণ্ড। { জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ সাল। } ২য় সংখ্যা।

অনুর্ব্বরা ভূমি উর্ব্বরা করিবার উপায়

শ্রীশশি ভূষণ সরকার লিখিত —

কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা যে কত চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহাদিগের এই চেষ্টার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার ক্ষেত্রসমূহ দিন দিন অধিকতর শস্যশালিনী হইতেছে এবং সেইজন্য ঐ সকল দেশে অন্নাভাব হয় না। আমাদের দেশে ভূমির অভাব নাই। কত যে পতিত জমি আগাছা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে তাহার সীমা নাই, কিন্তু উপযুক্তরূপ চাষ কারকিতের অভাবে সেই সকল ভূমি কোন ফল প্রসব করে না।

আমাদের দেশে কর্ষিত কৃষিক্ষেত্রসমূহ বহুকাল ধরিয়া শস্য প্রসব করিয়া ক্রমেই শক্তি-হীন হইয়া পড়িতেছে। আমরা তাহার শক্তিবৃদ্ধি করিতে পারিতেছি না। প্রাচীন-কাল হইতে যে প্রথায় সার দিয়া ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, আমরা কোনরূপে সেই প্রথারই অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমানকালে ভূমির অবস্থা বিবেচনা করিয়া ও সেই প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য কোন উৎকৃষ্টতর প্রথা প্রবর্ত্তন করা যায় কিনা সে বিষয়ে চিন্তাও করি না, এবং কেনই বা পূর্ব্বাপেক্ষা ভূমির উর্ব্বরতা হ্রাস হইতেছে তাহারও কোন আলোচনা করি না। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিকেরা কেবল ফলশালিনী ভূমির শক্তি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য যত্নশীল নহেন, যাহাতে দেশের পতিত উর্ব্বরতাশক্তি-হীন ভূমি সকলও শস্যশালিনী হয়, সে জন্য তাঁহারা নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কি প্রকারে তাঁহারা অনুর্ব্বরা

ভূমিকে উর্ব্বরা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

কৃষকের পাঠকগণ অবগত আছেন পটাস, ফস্ফরাস নাইট্রোজেন প্রভৃতি পদার্থ উদ্ভিদের আহার্য্যসামগ্রী। যে সকল ভূমিতে এই সকল পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে সেই ভূমিস্থ উদ্ভিদ যখন ভূমি হইতে ঐ সকল পদার্থ শোষণ করিয়া ফেলে তখন ভূমি নিঃস্ব হইয়া পড়ে এবং উদ্ভিদকে পোষণ করিকবার শক্তি আর তাহার থাকে না। এই জন্যই ভূমিতে সার দিবার ব্যবস্থায় পটাস, ফস্ফরাস ও নাইট্রোজেন প্রভৃতি পদার্থের প্রয়োগ ব্যতীত আর কিছুই নাই। ভস্ম পটাস সরবরাহ করে, অস্থিচূর্ণ ফস্ফরাস যোগায় এবং পশ্বাদির মলমূত্র নাইট্রোজেন প্রদান করিয়া থাকে। কেহ কেহ জমীতে সোরা দিয়া থাকেন, ইহার হেতু এই যে, সোরাতে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন বিদ্যমান আছে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে এই পটাস, ফস্ফরাস ও নাইট্রোজেন এই তিনটি পদার্থের মধ্যে শেষোক্তটি উদ্ভিদকে যেরূপ পরিপুষ্ট ও ফলশালী করে অপর দুইটি পদার্থের দ্বারা সেরূপ হয় না। এই জন্য ভূমি নাইট্রোজেনশূন্য হইলে তাহা ফলশস্যপ্রসবে এক প্রকার অসমর্থ হয়। নাইট্রোজেন দুষ্প্রাপ্য নহে আমাদিগের চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু-মণ্ডলে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন বিদ্যমান আছে। বায়ুমণ্ডলের পাঁচ ভাগের চারিভাগ বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন। কিন্তু আশে পাশে নাইট্রোজেন বিদ্যমান থাকিলেও, বৃক্ষাদি যে নাইট্রোজেনের অভাবে মারা যায়, ইহার কারণ আর কিছুই নহে—উদ্ভিদ স্বয়ং বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন গ্রহণে অক্ষম। মাটির সহিত এমোনিয়া, সোরা প্রভৃতি যৌগিক পদার্থ মিলাইয়া দিলে তাহা যখন রসরূপে পরিণত হয় তখন উদ্ভিদসকল মূল দ্বারা নাইট্রোজেন শোষণ করিয়া লয়। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে বায়ু-মণ্ডলে নাইট্রোজেন বিদ্যমান থাকিলেও ভূমি নাইট্রোজেন পরিশূন্য হইয়া থাকিতে পারে। তাহার নিজের নাইট্রোজেন আকর্ষণের শক্তি নাই তবে বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে মটরকলাই প্রভৃতি কতকগুলি শুঁটীধারী উদ্ভিদের (Leguminous plants) বায়ু-মণ্ডল হইতে ভূমিতে নাইট্রোজেন আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, কোন একটী ক্ষেত্র নাইট্রোজেন অভাবে গম বা যব প্রভৃতি শস্য ভালরূপ জন্মিতে পারে না, কিন্তু সেই ভূমিতে একবার সীম মটর মুসুর প্রভৃতি কলাই বপন করিবার পর তাহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তখন গম বা যব বপন করিয়া অত্যাশ্চর্য্যরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে। উত্তরোত্তর পরীক্ষার দ্বারা এইরূপ ফল পাইয়া বৈজ্ঞানিকেরা জানিতে পারিয়াছেন যে শুঁটিধারী উদ্ভিদের ভূমিতে নাইট্রোজেন আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে অনেকে বোধ হয় জানেন যে, আমাদের দেশে ধান পাট বা ইক্ষু প্রভৃতির ক্ষেত্রে যেরূপ সারপ্রয়োগ করিয়া তাহার উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা হয়, মটর কলাই, ছোলা প্রভৃতির ক্ষেত্রে সার দিয়া তাহাদেরও সেরূপ পাইট করিতে হয়।

"বিজ্ঞান" বলিতেছেন যে, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা যখন পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে শুঁটিধারী উদ্ভিদের বায়ু-মণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে তখন তাঁহারা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন যে কি জন্য এই জাতীয় উদ্ভিদ নাইট্রোজেন আকর্ষণ করে। বহু গবেষণার পর অধ্যাপক হেলরিগেল (Professor Hellrigel) দেখিলেন যে, যে সমস্ত শুঁটিপ্রসবকরী উদ্ভিদের মূলে ফোস্কার মত গাঁইট (nodule) দেখা যায় তাহারাই নিঃস্ব ভূমিতে ভালরূপ জন্মে কিন্তু যাহাদের মূলে সেরূপ গাঁইট নাই সেগুলি তত ভালরূপ জন্মে না। ইহাতে স্থির হইল যে, যে কোন অজ্ঞাত প্রক্রিয়ায় ঐ সকল গাঁইট বায়ু-মণ্ডল হইতে জমীতে নাইট্রোজেন সংগ্রহের সহায়তা করে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত করিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত রহিলেন না। আবার পরীক্ষা চলিতে লাগিল এবং বহু গবেষণার পর স্থির হইল যে ঐ গাঁইটগুলি এক প্রকার মৃত্তিকাস্থ উদ্ভিদাণু Bactoria বা অধ্যাপক বেইয়েরিঙ্ক (Professor Beyerinck) এই উদ্ভিদাণুর নাম রাখিলেন র‍্যাডিওকোলা (Radiocola)। ঠিক সেই সময়ে অধ্যাপক কক (Professor Koch) Bacteria বা উদ্ভিদাণু কর্ত্তৃক রোগোৎপত্তির কারণ জগতে প্রচার করিয়াছিলেন।

এই সময়ে অধ্যাপক নব্বে আবার ঐ সকল শুঁটিপ্রসবকারী উদ্ভিদের ফোস্কাগুলি লইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই অনুসন্ধানের বিশেষ বিবরণ এস্থলে প্রদান করা অসম্ভব। তবে তিনি যাহা করিয়াছিলেন সংক্ষেপে তাহারই দুই একটী কথা বলিতেছি। তিনি ঐ ফোস্কাযুক্ত গাঁটইগুলি শুকাইয়া গুঁড়া করিলেন ও তাহা জলে গুলিলেন। পরে চিনি, এস্‌পারাগিন (Asparagine) ও অন্যান্য দুই একটি পদার্থ মিশাইয়া একটি জিলাটিনের (Gelatin) ন্যায় সরবৎ তৈয়ার করিলেন এবং সেই সরবতে উল্লিখিত গুঁড়াগুলি মিশ্রিত জল মিশাইলেন। ক্রমে দেখা গেল সেই সরবতের ন্যায় পদার্থে নানাজাতীয় উদ্ভিদাণু বা Bacteria জন্মিয়াছে। এই উদ্ভিদাণু লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে নাইট্রোজেন শূন্য ভূমিতে উহা মিশাইয়া শস্য বপন করিলে তাহা অদ্ভুতরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহা দেখিয়া তিনি ঐ উদ্ভিদাণুর এক প্রকার আরক প্রস্তুত করিলেন। তদ্দ্বারা জর্ম্মাণদেশে কৃষি-কার্য্যের বস্তুতঃ এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। জার্ম্মাণকৃষকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে অধ্যাপক নব্বের ঐ আরক গরম জলে গুলিয়া তাহাতে মৃত্তিকা মিশ্রিত বীজ ভিজাইয়া রাখিতে হয় যখন বীজগুলি ঐ আরক শুষিয়া লয় তখন উহা ক্ষেত্রে বপন করিলে উদ্ভিদাণুগুলি জমীতে সংক্রামিত হয় এবং তাহারা ভূমিতে প্রভূত পরিমাণে নাইট্রোজেন আকর্ষণ করিয়া জমীর উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। যে সকল বীজ আরকে ভিজাইয়া বপন করা হয় তাহা যেরূপ ফলশালী হয়, প্রচলিত প্রথায় যে বীজ বপন করা হয় তাহাতে সেরূপ ফল হয় না ইহা বহু পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই হেতু এক্ষণে কেবল জর্ম্মাণীতে নহে আমেরিকাতেও অধ্যাপক নব্বের আবিষ্কৃত

উদ্ভিদাণুর আরক কৃষি-কার্য্যে প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা নিঃস্বভূমি হইতেও ফল শস্য সংগৃহীত হইতেছে।

বহু গবেষণার দ্বারা পণ্ডিতেরা স্থির করেন যে মনুষ্যশরীরে রক্তহীনতা যেমন একটি রোগ, ভূমির নাইট্রোজেনহীনতাও সেইরূপ একটা রোগ। রক্ত দূষিত হইলে মনুষ্য দেহ শীর্ণ বিশীর্ণ ও ক্রমে মরণোন্মুখ হয়, ভূমি নাইট্রোজেন শূন্য হইলে ইহারও সেই দশা ঘটে। এক্ষণে বৈজ্ঞানিকেরা মনুষ্যের বিভিন্ন রোগ দূর করিবার জন্য যেমন মনুষ্য দেহে সেই সেই রোগের জীবাণু সঞ্চারিত করিয়া দেন জমীতে যদি নাইট্রোজেনভুক অণু সকল সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহার নাইট্রোজেনহীনতা দূর হইতে পারে। এই সিদ্ধান্তের পর অধ্যাপক বটম্‌লি শুঁটিধারী উদ্ভিদের মূলস্থ ফোস্কাযুক্ত গাঁইটের অণু হইতে এক বীজ (seram) প্রস্তুত করিয়াছেন। যেমন রোগীকে টীকা দেওয়া হয় বা প্লেগের বীজ দেহ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় তেমনি এই উদ্ভিদাণুর বীজ গোধুম ভূট্টা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শস্যের বীজে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া অনুর্ব্বরা ক্ষেত্রে বপন করিলে তাহা প্রচুর পরিমাণে ফলশালী হয়। আমেরিকার কৃষিবিভাগে ইহার বহু পরীক্ষা হইয়াছে এবং সর্ব্বত্রই আশাতীতরূপ ফললাভ হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে অধ্যাপক বটম্‌লির আবিষ্কৃত প্রথায় কেবল মাত্র অনুর্ব্বরা ক্ষেত্রই ফলশালী হয়, কিন্তু সাধারণতঃ যে সকল ক্ষেত্র শস্য প্রসব করিয়া থাকে তাহাতে কোন ফল পাওয়া যায় না; কারণ এই যে বীজস্থ নাইট্রোজেনভুক্ উদ্ভিদাণু সকল যদি মৃত্তিকা নাইট্রোজেন প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে আর তাহারা বায়ু-মণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন আহার করিতে প্রয়াস পায় না সুতরাং ইহাতে ভূমিস্থ নাইট্রোজেন বরং নিঃশেষিত হয়। কিন্তু ভূমিতে যদি নাইট্রোজেন না থাকে তাহা হইলে উদ্ভিদাণু সকল উহা বায়ু-মণ্ডল হইতে আহরণ করিয়া আপনাদিগকে রক্ষা করে এবং ভূমিকেও তাহার অংশ প্রদান করে।

আমাদের দেশে অনুর্ব্বরা পতিত ভূমির পরিমাণ বড় সামান্য নহে। অধ্যাপক বটম্‌লির প্রথায় অনায়াসে এই সকল ভূমি শস্যশালিনী হইতে পারে। কিন্তু সে কার্য্যসাধন নিরক্ষর কৃষকদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই জন্য আমাদিগকে ক্ষেত্র গুলিকে শস্যশালী করিবার জন্য সহজ উপায খুঁজিতে হইবে।

সহজলভ্য সার—

গোবর ও ছাই কৃষকগণ যতদূর সম্ভব ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু গোময় এদেশে সচরাচর জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় বলিয়া কৃষকগণ অধিকাংশ জমি বিনা সারে আবাদ করিয়া থাকে। চীন ও জাপান দেশে চাষীগণ বড়ই অধ্যবসায়ী তথায় কোন ফসলই বিনা সারে জন্মাইবার রীতি নাই। ফসল জন্মাইতে জন্মাইতে জমি যে নিস্তেজ হইয়া আইসে ইহা আমাদের দেশের কৃষকগণ বিলক্ষণ জানে তাহাদের কিন্তু

অধ্যবসায় কম। যে জমিতে বৎসরে বৎসরে নদীর বান আসিয়া পলি পড়িয়া থাকে, ঐ জমিতে বিনাসার ফসল জন্মাইতে পারা যায় বটে, কিন্তু পূর্ণ মাত্রার উর্ব্বরতা এক বৎসরের পলি দ্বারা লাভ হয় না। পাব্না, ময়মনসিং প্রভৃতি যে সকল জেলার অনেক জমি প্রতিবৎসর জলে ডুবিয়া যায় ঐ সকল যদি তিন বৎসর বিনা আবাদে ফেলিয়া রাখিয়া পরে পুনরায় আবাদ করা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উপর্য্যুপরি তিন বৎসর পূর্ণমাত্রায় অর্থাৎ বিঘা প্রতি প্রায় ৮ মণ করিয়া পাট জন্মে। চতুর্থ বৎসরে পলিপড়া সত্বেও ৮ মণের পরিবর্ত্তে ৫ মণ পাট জন্মে। অতঃপর পলি পড়া সত্ত্বেও এক বৎসর পাট এইরূপ পর্য্যায়ে কার্য্য করিলে তবে বিঘাপ্রতি ৫৷০ মণ পাট জন্মে, নতুবা বৎসর বৎসর পাটের উৎপন্ন কমিয়া যায়, ধানের উৎপন্নও বিনা পর্য্যায় রোপণে সম্ভবতঃ কমিয়া যায়। কিন্তু কৃষকেরা এ বিষয়ে ঠিক্ লক্ষ্য করে নাই। অনেকেই বলে পূর্ব্বে জমিতে যেরূপ ধান হইত এক্ষণে তাহা হয় না। ধইঞ্চা, বর্ব্বটী, শণ, নীল, এইরূপ কয়েকটী শুঁটীধারী শস্য জন্মাইলে জমির তেজ হ্রাস না হইয়া অনেক বৃদ্ধি হয়। এ সম্বন্ধে কৃষকদিগেরও বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। যে জমিতে পলি পড়ে না, সে জমিতে পূর্ণমাত্রায় পাট জন্মাইবার জন্য পাবনা ও ময়মনসিংহের অনেক কৃষক বর্ষাবসানে শণ জন্মাইয়া থাকে। যে জমিতে শণ জন্মান হয়, পর বৎসর সেই জমিতে ৮৷৯ মণ পাট হয়। পুষ্করিণী ও নালার মৃত্তিকা ফাল্গুন-চৈত্র মাসে উঠাইয়া শুষ্ক করিয়া পরে জমিতে ছিটাইয়া দিলে পলি ও গোবর সারের ন্যায় কার্য্য করে।

সারের শ্রেণী-বিভাগ—

সার সমুদায় পাচ ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়।

সাধারণ সার—

যাহাতে যবক্ষারজান, ফস্ফরাস্, পটাশ, চূণ, লৌহ, গন্ধক ইত্যাদি উদ্ভিদের আহারীয় পদার্থ সমস্তই কিছু না কিছু পরিমাণে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় বর্ত্তমান আছে ; যথা, জন্তুদিগের মল-মূত্র, পলুর নাদি, রেশম-কুঠীর আবর্জ্জনা (চোকৃড়ি) নানাপ্রকার খৈল, রক্ত-মাংস, পচা বা শুষ্ক মৎস্য, ঘাস, পাতা, বিচালি, পুষ্করিণী, সমুদ্র, ও আর আর জলাশয়ের পলি-মাটি, পুষ্করিণী ও নালার পাক মাটি (শুষ্ক অবস্থায়), পানা ও আগাছা, সহরের আবর্জ্জনা, নীল-সিটি, তাহাই সাধারণ সার নামে অভিহিত।

ফস্ফরাস্ সার—

যাহাতে ফস্ফরাস্ অম্লের পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগের অধিক বর্ত্তমান আছে ; যথা, আপেটাইট্ প্রস্তর, জন্তুদিগের অস্থি ইত্যাদি। খৈলে ও ছাইয়ে শতকরা ১ হইতে ৪ ভাগ পর্য্যন্ত ফস্ফরাস্ সার বিদ্যমান থাকে বলিয়া যেখানে ফস্ফরাস্ প্রয়োগের

আবশ্যক, সেখানে যদি আপেটাইটাদি অথবা অস্থিচূর্ণ প্রয়োগ অসম্ভব হয়, তবে খৈল ও ছাই প্রয়োগ দ্বারা কতক ফস্ফরাস্ সারের কার্য্য সাধিত হয়।

যবক্ষরাজান ঘটিত সার বা নাইট্রোজান সার—

যাহাতে যবক্ষারজানের পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগের অধিক বর্ত্তমান আছে; যথা, সোডিয়াম্ নাইট্রেট্, এমোনিয়াম্ সাল্‌ফেট্, সোরা, মৎস্যের সার, রেড়ির খৈল, চীনাবাদামের খৈল, খোসা ছাড়ান, কাপাস বীজের খৈল, পোস্তদানার খৈল, কুসুম ফুলের বীজের খৈল, শুষ্ক শোণিত, মাংস, ছিন্ন পশমীবস্ত্র ইত্যাদি। মৎস্য সারে, খৈলে, রক্ত-মাংসে ও ছিন্ন পশমী বস্ত্রে বিশিষ্ট পরিমাণ ফস্ফরাস্ ও পটাশাদি সারও বর্ত্তমান আছে বলিয়া এ সকল সামগ্রী সাধারণ সারেরও অন্তর্ভুক্ত। পাকশালার ঝুলের শতকরা ২৷৩ ভাগ যবক্ষারজান আছে, এ কারণ ইহাও সার-পদার্থ এবং ইহার কীট-নাশক গুণ থাকাতে ইহার ব্যবহার দ্বারা কপির চারা প্রভৃতিতে পোকা লাগিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পটাশ—

যাহাতে শতকরা পাঁচ ভাগের অধিক পটাশ বা ক্ষার আছে; যথা, ছাই, কাইনিট্, সোরা ইত্যাদি। সোরাতে যবক্ষারজান ও পটাশ উভয় উপাদানই শতকরা ৫ ভাগের উপর আছে বলিয়া যবক্ষারজান ঘটিত সার প্রয়োগের আবশ্যক হইলেও এই সামগ্রী ব্যবহার করা যাইতে পারে পটাশ-সার প্রয়োগের আবশ্যক হইলেও ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। সকল ছাইয়ে সমান পরিমাণে পটাশ থাকে না। নব-পল্লব ও পত্র শুষ্ক করিয়া জ্বালাইয়া, যে ক্ষার পাওয়া যায় উহাতে শতকরা ১৪৷১৫ ভাগ পটাশ থাকে; বিচালি জ্বালাইয়া যে ক্ষার হয় উহাতে ৪৷৫ ভাগ মাত্র পটাশ থাকে, কাষ্ঠ জ্বালাইয়া যে ক্ষার হয় উহাতে আরও কম পরিমাণ পটাশ থাকে। সকল রকম ক্ষার মিশ্রিত করিলে গড়ে শতকরা ১০৷১১ ভাগ পটাশ উহার মধ্যে আছে এরূপ ধরা যাইতে পারে। কলার পাতা বা খোলা পুড়াইয়া যে ছাই হয় তাহাতে পটাশের পরিমাণ ১০৷১২ ভাগ থাকে।

চুণ সার—

যাহাতে শতকরা ৫ ভাগের অধিক খাঁটি চুণ আছে; যথা, চুণ, শম্বুক, ঝিনুক, ঘুটিং, জিপ্‌সম্ ইত্যাদি।

ফস্ফরাস, যবক্ষারজান, পটাশ অথবা চুণ-ঘটিত সারকে বিশেষ সার বলা যাইতে পারে। অনেকগুলি বিশেষ সারের দ্বারা সাধারণ সারেরও কার্য্য হইয়া থাকে। হাড়ের গুঁড়া প্রধানতঃ ফস্ফরাস্-ঘটিত সার বটে, কেন না ইহাতে শতকরা ২৩৷২৪ ভাগ ফস্ফরাসাম্ল বিদ্যমান। কিন্তু হাড়ের গুঁড়াতে ৩॥০ ভাগ যবক্ষারজান, সামান্য পরিমাণে পটাশ ও

বিশেষ পরিমাণে চূণও বিদ্যমান আছে কাযেই এই সার প্রয়োগ করাতে ফসলের সকল অভাব দূর হইতে পারে। হাড়ের গুঁড়ার দোষ এই ইহাতে গলিত বা গলনশীল ভাবে অতি সামান্য পরিমাণ উপাদান বর্ত্তমান থাকে, কাজেই ইহার প্রয়োগ দ্বারা হাতে হাতে ফল পাওয়া যায় না। অন্ততঃ দশ বৎসর ধরিয়া এই সার জমির কিছু কিছু উপকার করিয়া থাকে। সাল্‌ফিউরিক এসিড দ্বারা হাড়ের গুঁড়া ও এপেটাইটাদি প্রস্তরের গুঁড়া গলনশীল অবস্থায় পরিণত করিয়া ব্যবহার করিলে ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়।

সূত্র প্রদানকারী উদ্ভিদ

সূত্র প্রদানকারী উদ্ভিদের মধ্যে সাধারণতঃ পাট, শণ, ধঞ্চে, তুলা প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান উদ্ভিদের আলোচনা হইয়া থাকে। এদ্ব্যতীত অনেক সুপ্ত ও বহু প্রয়োজনীয় সূত্র প্রদানকারী উদ্ভিদ আছে যাহাদের কিছু কিছু পরিচয় আমরা দিয়া রাখিতে চাই।

রিয়া সূত্রের—

শ্রীশশি ভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত—

কথাও অনেকে অবগত আছে কারণ রিয়া লইয়া অনেক লেখালিখি আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে—কেননা ইহার সূত্র দামী রেশমের মত এত চিকণ না হইলেও রেশম অপেক্ষা শক্ত। ইহার সূত্র অতি কোমল, রৌপ্যবৎ শুভ্র রেশম ব্যতীত অন্যান্য সূত্র অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল সুতরাং দামী।

অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, চীন ও জাপান রিয়ার চাষে বিলক্ষণ লাভবান হইতেছে; এদেশের নীলকর, চিনিকর, চা-কর সাহেবের রিয়ার চাষে বিশেষ উদ্যোগসহকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। অন্যান্য সভ্যদেশে ইহার চাষ হইলেও তথাকার লোকে ইহাকে শিল্পোপযোগী পরিচ্ছন্ন করিতে জানে না বলিয়া তত লাভের ব্যবসায় বলিয়া গণ্য করে না; এদেশে আমরা যদি অন্ততঃ কাঁচামাল প্রচুর উৎপন্ন করিতে পারি, তাহা হইলে কালে উন্নত বিজ্ঞানোপায়ে তাহাকে পরিষ্কারও করিতে পারিব সন্দেহ নাই।

সকল ভূমিতেই "রিয়া" জন্মিতে পারে, তথাপি দোঁয়াশমাটী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ভালরূপ জন্মিলে বৎসরে চারিবার এমন কি পাঁচবার পর্য্যন্ত ইহার গাছ ছাঁটা যাইতে পারে। এইরূপ কর্ত্তিত শাখার দৈর্ঘ্য ৪ হইতে ৬ হাত পর্য্যন্ত হয়, তবে ইহা ঋতু, জল ও

ক্ষেত্রের অবস্থার তারতম্যের উপর নির্ভর করে। রিয়ার ভূমি সরস হওয়া আবশ্যক অথচ অধিক জল বসিলে গাছের বৃদ্ধির বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে এমন কি মরিয়াও যাইতে পারে।

বিছুতি বা চিচিরা—

এই উদ্ভিদের দেহ লোমবৎ সূক্ষ্ম, কণ্টকে আবৃত থাকে। মনুষ্য পশ্বাদির গাত্রে লাগিলে যন্ত্রণাদায়ক কণ্ডুয়ন উৎপাদন করে—ঘাট পর্ব্বতদ্বয়ন, নাগপুর, মান্দ্রাজের নীলগিরি পর্ব্বত এবং নেপালে স্বভাবতঃ এই উদ্ভিদ প্রচুর জন্মে। বন্য অবস্থায় ইহা হইতে তত উৎকৃষ্ট সূত্র জন্মে না এজন্য মান্দ্রাজে ইহার রীতি মত চাষ হইয়া থাকে এবং চাষে এই জাতীয় সূত্র দিন দিন উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। এই সূত্র এরূপ সূক্ষ্ম, দৃঢ়, কোমল ও রেশমের ন্যায় ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট যে মসিনার সূতা বলিয়া ভ্রম জন্মে এবং তৎপরিবর্ত্তে শিল্পেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট সূতা ও টোয়াইন প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার ফেঁশো (Tow) অর্থাৎ সূতারছাট গারোপর্ব্বতের তূলার ন্যায় কোমল ও স্থিতিস্থাপক এজন্য ছাগমেষাদি জাতীয় পশুলোমের (Wool) সহিত মিশ্রিত হইয়াও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তিসি সূত্র—

তিসির সূতাকেই Flax বলে ইহা হইতে সুপ্রসিদ্ধ linen নামক বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্রকে ক্ষৌম বসন বলে। তিসির সূতা শুভ্র ও রেশমের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য বিশিষ্ট বলিয়া স্থূল সূক্ষ্ম উভয়বিধ বস্ত্রশিল্পে, নানাপ্রকার টোয়াইন Twine, বোরা ও নানাজাতীয় সূত্রে মিশ্রণের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এই সূত্রনির্ম্মিত শিল্পাদি বহুমূল্য। রুসিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড, ইটালী, মিশর, আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে শুদ্ধ সূত্রের নিমিত্ত ইহার চাষ হইয়া থাকে ; কেবল রুষিয়া ও আমেরিকার সূত্র ও তৈল এই উভয়বিধ ব্যবহারের জন্য ইহার দৃষ্ট হয়।

আকন্দ সূত্র—

পণ্ডিতেরা ইহাকে অর্ক সূত্র বলে। ভারতের সর্ব্বত্রই আকন্দগাছ জন্মে, শ্বেত ও রক্ত পুষ্পভেদে ইহা দুই প্রকার এবং পুষ্পের আকৃতিভেদে রক্ত আকন্দ আবার দুইপ্রকার। সকল প্রকার ভূমিতেই আকন্দগাছ জন্মে। তবে উষ্ণ ভূমিতে ও উষ্ণ-কালে সর্ব্বাপেক্ষা সতেজ বর্দ্ধিত হয়।

আকন্দ হইতে ক্ষৌম-সূত্রের (Flax) ন্যায় উৎকৃষ্ট ও সূক্ষ্ম বস্ত্র-বয়নোপযোগী সূত্র পাওয়া যায়। ব্যবসায়ী মহলে এই সূত্রের নাম "yercum" য়ার্কক অর্থাৎ সংস্কৃত অর্ক শব্দের রূপান্তর। এই সূত্র মণ প্রতি ১৬৲ হইতে ২৬৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয়

হয়, ইহা অত্যন্ত দৃঢ়, শুভ্র, সূক্ষ্ম ও চিক্কণ বলিয়া অনেকে ইহার দ্বারা বস্ত্র-বয়নের পক্ষপাতী, আবার কেহ কেহ অত্যন্ত দৃঢ় বলিয়া রসারশি প্রস্তুতের পরামর্শ দিয়া থাকেন।

ম্যানিলা কদলী—

একপ্রকার কদলী হইতে এই সূত্র প্রস্তুত হয়। ইহা মুসা টেক্সটাইল (Musa textiles) নামক কদলীর সূত্র—মানিলা কদলীর আঁশের নাম আবাকা (Abaca)। গাছগুলি দীর্ঘে ১০।১৪ হস্ত হয়, দেখিতে গাঢ় সবুজবর্ণ, কাণ্ডের উপরিভাগ অত্যন্ত মসৃণ, পত্র সবুজবর্ণ, ও শিরাল; ফল অপুষ্ট, ত্রিকোণাকার ও ক্ষুদ্রকার এবং ফল দণ্ডের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে। উষ্ণ ও সরস বাষ্পপূর্ণ ঘন জঙ্গলময় পর্ব্বতের উপত্যকা বা পাদদেশস্থ অত্যন্ত সরস ও সারবান ভূমিতে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর জন্মিয়া থাকে। ফিলিপাইনের আবহাওয়া অনেকটা বঙ্গদেশের অনুরূপ, বঙ্গদেশেও ইহা জন্মিয়া থাকে তবে সখের হিসাবে, সখের বাগানে; এ পর্য্যন্ত ব্যবসায়ের হিসাবে এদেশে ইহার বিস্তৃত আবাদ হয় নাই।

মূর্ব্বা—

যদিও পূর্ব্বকালে ধনুকের ছিলার নিমিত্ত আকন্দের সূতার ব্যবহার হইত তথাপি মৌর্ব্বীকল্পে মূর্ব্বারই প্রাধান্য ছিল এবং অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত ইহাই প্রচুর পরিমাণে ছিলার নিমিত্ত ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। বিশেষ গুণবত্তা না থাকিলে কদাচ একটী উদ্ভিদ হইতে ছিলার এই বিশিষ্ট নাম উৎপন্ন হইতে না কারণ মূর্ব্বা হইতেই মৌর্ব্বী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মূর্ব্বার সূত্র কেশের ন্যায় কোমল, দৃঢ় ও সূক্ষ্ম এবং অতিশয় শুভ্র ও চাকচিক্যশালী, উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে পারিলে রেসমের সহিত ইহার প্রভেদ নির্ণয় করা কঠিন। উদ্ভিদজাত সূত্র সমূহের মধ্যে ইহা দেখিতে অনেকটা আনারসের সূতার ন্যায়। সরু, মোটা নানাবিধ টোয়াইন (Twine) সূতা, রশারশি এমন কি ইহার সরু আঁশ (Fibre) দ্বারা সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নোপযোগী ক্ষৌম সূত্রের (Flax) কার্য্যও সম্পন্ন হইতে পারে। কাগজ প্রস্তুতের ইহা একটী উৎকৃষ্ট উপাদান। আজকাল বিলাত হইতে লক্ষ টাকার পুস্তক বাঁধিবার, মাছ ধরিবার, জাল বুনিবার, ঘুড়ি উড়াইবার, নানা প্রকার সূতা ও রঙ্গিন টোয়াইন আমদানী হইতেছে, মূর্ব্বা হইতে এ সকল সুন্দর প্রস্তুত হইতে পারে। অনেক ইংরাজ চা, চিনি ও নীলকর সাহেব মূর্ব্বার চাষে বিলক্ষণ লাভবান হইতেছেন।

আনারস—

উদ্ভিদজাত সূত্রের মধ্যে আনারসের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও দৃঢ়তম সূত্র অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। ইহা রেসমের ন্যায় কোমল, শুভ্র ও সুচিক্কণ এবং ক্ষৌম সূতার (Flax), উৎকৃষ্ট অনুকল্প (Substitute), মূর্ব্বার সূত্র ইহার নিম্নে পরিগণিত হয়। ফিলিপাইন

দ্বীপের প্রসিদ্ধ আনারসী বস্ত্র (Pineapple cloth) ও পিনা (Pina) নামক সুসূক্ষ্ম বস্ত্র, ইহার রেশমবৎ সূক্ষ্ম তন্তু হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে ; এতদ্ব্যতীত টোয়াইন (Twine) ডোর, সূতা ও নানাবিধ সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্পের জন্যও ইহার প্রচুর ব্যবহার হয়। জাপান ও জর্ম্মণীতে ইহার পত্র হইতে পার্চমেণ্টের (Parchment) ন্যায় উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়; শুনা যায় জর্ম্মণীতে রাসায়নিক দ্রব্যান্তর সংযোগে ইহার পত্র হইতে এরূপ কঠিন কাষ্ঠবৎ পিজবোর্ড প্রস্তুত হয় যে তদ্দ্বারা রেলগাড়ীর চাকা ও অন্যান্য অংশ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। আনারসের সূতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জলসহনশীল অর্থাৎ সহজে জলে পচিয়া নষ্ট হয় না। মূর্ব্বার সূত্র প্রস্তুতপ্রণালী,—ইহার কাঁচা পত্রের উপরকার মাংসল অংশ ভোঁতা অস্ত্র দ্বারা চাঁচিয়া ফেলিলেই সূত্র বাহির হয়, তৎপরে সূক্ষ্ম তন্তুপ্রান্ত সকল আঠা দ্বারা জুড়িয়া বাণ্ডিলের মত জড়াইয়া বয়নকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শুষ্ক পত্র হইতে আদৌ সূতা বাহির হয় না। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে জলে পচাইয়াও সূত্র বাহির করিয়া থাকে ; এইরূপে প্রস্তুত সূত্র পুনরায় শুভ্রীকরণ (Bleaching process) প্রণালী মতে পরিষ্কৃত করিলে উহা দেখিতে রেসমের ন্যায় কোমল ও উজ্জ্বল হয়, এবং তদ্দ্বারা লিনেন (Linen) বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। এদেশে আনারস কাটিয়া লইলে গাছটী শুকাইয়া মরিয়া যায়, কোন কাজে লাগে না ; আমরা সচেষ্ট হইলে এই পত্র হইতে ডোর, ঘুড়ি উড়াইবার সূতা, টোয়াইন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারি, এজন্য পরের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না।

এগেভ সূত্র বা মুর্গা সূত্র—

Agave vivipara, Kantala. ইহা পূর্ব্বোক্ত জাতীয় আমেরিকার উদ্ভিদ বিশেষ; ভারতবর্ষে মান্দ্রাজ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর জন্মে। ইহার সুদীর্ঘ পত্র হইতে উপরোক্তের ন্যায় অত্যন্ত দৃঢ় ও দীর্ঘ সূত্র পাওয়া যায়। ইহার চাষ আবাদ অবিকল উপরোক্তের মত। পত্রগুলি ২০ দিবস জলে ফেলিয়া পচাইতে হইবে পশ্চাৎ উঠাইয়া কোন তক্তার উপর দণ্ড দ্বারা ছেঁচিয়া জলে উত্তমরূপ ধৌত করতঃ শুকাইয়া লইলেই সূত্র প্রস্তুত হয়। এই জাতীয় সূত্র হইতে রশারশি, দড়ি, পাপোষ, ম্যাটিং (Matting) প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। মণ প্রতি ৫,৬ টাকা দরে এই সূতা বিক্রয় হয়।

সিসল হেম্প, Agave sisalana, Sisalhemp. ইহাও উপরোক্ত জাতীয় উদ্ভিদ বিশেষ, যুকেটান, মেক্সিকো প্রভৃতি মধ্যে আমেরিকার দেশসমূহে স্বভাবতঃই জন্মে ; এদেশে ইহা প্রচুর উৎপন্ন হয়। সাহেবেরা উল্লিখিত দুই প্রকার অপেক্ষা ইহাঁর চাষে আজকাল অধিক মনযোগী হইয়াছেন কারণ এই জাতীয় সূত্র অতি উৎকৃষ্ট ও পরিমাণে প্রচুর উৎপন্ন হয় এবং উদ্ভিদজাত সূত্র সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জলসহনশীল। জাহাজের কাছি ও সমুদ্র মধ্যগত টেলিগ্রাফের তারের (Cable rope)

জন্য ইহার দড়ি অপর্য্যাপ্ত ব্যবহার হয়। যে সকল ভূমি জলাভাবে সর্ব্বদা নীরস ও শুষ্ক, যথায় অন্য কোন উদ্ভিদ বা শস্য সহজে জন্মেনা এবং যাহা জন্মে তাহাও একেবারে নিস্তেজ হইয়া যায় তথায়ও সিসল অতি সুন্দর জন্মিয়া থাকে। ইহার চাষ দিন ২ যত বৃদ্ধি পাইতেছে সূত্রও তত উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। বৎসরে প্রতি গাছ হইতে আধসেরের উপর সূত্র উৎপন্ন হয়। তক্তার উপর লৌহের আঁচড়ার দ্বারা পাতাগুলি চিরিয়া লইয়া সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা উপরের ত্বক্‌ভাগ ও হরিত অংশ ধীরে ধীরে চাঁচিয়া লইলেই সূতা বাহির হয়; পূর্ব্বে এই উপায়ে সূতা প্রস্তুত হইত, অধুনা বিজ্ঞান সম্মত নানাবিধ যন্ত্রযোগে সূত্র নিষ্কাশিত হইতেছে। মার্কিণদেশে রাসায়নিক দ্রব্য বিশেষ সংযোগে পত্রের হরিত অংশ বিগলিত করিয়া পশ্চাৎ উত্তমরূপ ধৌত ও শুষ্ক করতঃ সূত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১০ হইতে ১৫ টাকা মণ দরে এই সূতা বিক্রয় হয়।

Furcrœa gigantea ইহাও পূর্ব্বোক্ত বর্গীয় অর্থাৎ Amarillidaceœ বর্গের অন্তর্ভুক্ত, তবে Agave জাতীয় নহে। উত্তর মধ্য আমেরিকা, আলজিরিয়া, নেটাল, সেণ্টহেলেনা এবং ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও মান্দ্রাজে প্রচুর জন্মে; ত্রিহুত অঞ্চলে অনেক সময় ইহার দ্বারা বাগানের বেড়া দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার মূল দেশ হইতে যে চারা বাহির হয় তাহাই রোপণ করিতে হয়। উপরোক্ত কয়েক জাতীয় মূর্গা (Agave) অপেক্ষা ইহা অত্যন্ত শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় এবং অতি অপকৃষ্ট ভূমিতেও সুন্দররূপ জন্মে। ইহার সূত্র নিষ্কাশন প্রণালী অবিকল সিসলের ন্যায়। ইহার বৃহৎকায় মাংসল সুদীর্ঘ পত্র হইতে উপরোক্ত উদ্ভিদগুলির ন্যায় অতি দৃঢ়, শুভ্রবর্ণ ও চিক্কণ সূত্র পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা রশারশি, বোরা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে।

বেড়েলা সূত্র—

পীত বেড়েলা—Sida acuta. শ্বেত বেড়েলা—Sida rhomboidea.

বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই নানাজাতীয় বেড়েলা বন্যভাবে জন্মে। এই উদ্ভিদের চাষ কদাচ দৃষ্টি হয়। বেড়েলা জাতি মাত্রই সূত্রপূর্ণ কিন্তু উপরোক্ত দুইটী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সূত্র পাওয়া যায়। এই সূত্র অতিশয় শুভ্র, কোমল ও উজ্জ্বল, দেখিতে মূর্ব্বা বা তিসির সূতার মত এবং পাট অপেক্ষাও দৃঢ়, বহুগুণে উৎকৃষ্ট ও মূল্য অধিক। ইহাদের চাষ, আবাদ প্রণালী ও ফলন পাটের মত হইতে পারে। ইহা হইতে টোয়াইন, সূতা, ক্যাম্বিশ, বোরা, দড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে এবং পাটের ন্যায় নানাবিধ বস্ত্রশিল্পে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

এদেশে বেড়েলা সকল প্রকার ভূমিতেই জন্মিতে দেখা যায়, কিন্তু সরস দোয়াঁশ উচ্চ ভূমিতে বেড়েলা উত্তমরূপে জন্মে ও সূতার আঁশ (Fiber) ভাল এবং পরিমাণেও অধিক উৎপন্ন হয়। গাছ সাধারণতঃ অত্যন্ত শাখাপ্রশাখা বহুল এবং ৩।৪ হস্তের উপর

দীর্ঘ হয় না কিন্তু রীতিমত চাষ করিলে ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ দীর্ঘ হইবে এরূপ আশা করা যায়।

ঢেঁড়শ সূত্র—Hibiscus

এই জাতীয় উদ্ভিদের পুষ্পের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জবাপুষ্পের ন্যায় এজন্য ইহাদিগকে ওড্রপুষ্পী বলা যাইতে পারে। এই জাতীয় অধিকাংশ উদ্ভিদ হইতেই রেশমের ন্যায় উজ্জ্বল, সূক্ষ্ম ও দীর্ঘতন্তু সূত্র পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টগুলি তিসির সূতার পরিবর্ত্তে ব্যবহার হইতে পারে; অবশিষ্টগুলি দড়ি, কাছী, সূতা, টোয়াইন, বোরা, ক্যাম্বিশ, আসন প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য বিশেষ উপযোগী। ঘনভাবে বীজবপন করিলে গাছ শাখাপ্রশাখাবিহীন সুতরাং সূত্রও দীর্ঘ হয়। যখন গাছে প্রচুর পরিমাণে ফুল ও অল্পপরিমাণে ফল ধরিতে আরম্ভ হয়, তখনই গাছগুলি সূত্র প্রস্তুতের উপযোগী হইয়াছে বুঝিতে হইবে, এই সময়ে গাছ কাটিলে সূতাও পরিমাণে অধিক পাওয়া যায়। যে সকল উদ্ভিদ হইতে সূতা পাওয়া যায় তাহাদিগকে জলে ফেলিবার পূর্ব্বে ২।১ দিবসের অধিক শুকাইতে দিলে গাছের রস অত্যধিক শোষিত হওয়ার জন্য সূত্র দাগী হয় এজন্য আবশ্যকানুযায়ী সামান্য মাত্র শুকাইয়া জলে পচানই শ্রেয়, ইহাতে সূত্র শুভ্রতর ও দৃঢ় হইয়া থাকে।

বনঢেঁড়শ—Hibiscus ficulneus.—

এই গাছ রাজমহলের জঙ্গলে প্রচুর জন্মে এবং বঙ্গেদেশের অন্যান্য স্থানেও যথেষ্ট দেখা যায়। ইহার পত্র পুষ্প ও ফলাদি উল্লিখিত লতাকস্তুরীর ন্যায়, তবে বীজ মৃগনাভি সুগন্ধি নহে। ইহার সূতা লতাকস্তুরীর মত শুভ্রবর্ণ, চিক্কণ ও দৃঢ়, পাট শণের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাছগুলি ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়। ইহার অপক্ব ফলের রস পূর্ব্ববৎ গুড় পরিষ্কারক; উত্তর পশ্চিমের বিখ্যাত কৃষিবিদ হাদী সাহেব ইহা হইতে চিনি পরিষ্কার করিয়া থাকেন। ইহার চাষ আবাদ ও সূত্র প্রস্তুত প্রণালী অবিকল ঢেঁড়শের ন্যায়; সূত্র দীর্ঘ করিতে হইলে, গাছ ঘন জন্মান আবশ্যক। বর্ষাকালে কলিকাতার উপকণ্ঠবর্ত্তী খালধারের উভয়পার্শ্বের জঙ্গলে ৩।৪ হস্ত দীর্ঘ একজাতীয় বনঢেঁড়শ স্বভাবতঃ জন্মিতে দেখা যায়; ইহার দণ্ড ও পত্র অত্যন্ত রোমবহুল, পত্র বৃহৎকায় এবং উৎপন্ন সূত্র নিকৃষ্টজাতীয় হইলেও সাধারণ বন্ধনকার্য্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এসকল গাছ যথাসময়ে আপনাপনি জন্মিতেছে, মরিতেছে, কেহ কোন তত্ত্ব লয়না।

আমলাপাট—Hibiscus cannabinus.—

এই গাছ দেখিতে অনেকটা মেস্তার মত, গাছে অল্পবিস্তর অতি সূক্ষ্ম কাঁটা আছে, পত্র অম্লাস্বাদন; গাছগুলি ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়। কেহ কেহ ইহাকেও মেস্তাপাট বলে। বিনাসারে সকল প্রকার ভূমিতে ইহা

জন্মিয়া থাকে, তবে সারযুক্ত দোয়াঁশ জমিতে ফলন অধিক হয়। রাজমহল মুর্শিদাবাদ; মালদহ, মাগুরা প্রভৃতি জিলায় ইহার প্রচুর চাষ হইয়া থাকে। সরস ভূমিতে সম্বৎসর ধরিয়া ইহার চাষ চলিতে পারে তবে বর্ষাকালেই চাষ অধিক দৃষ্ট হয়। ভাদ্র আশ্বিনমাসে গাছ তেজ করে, ৪।৫ মাসের মধ্যেই গাছ সূত্রোপযোগী হইয়া উঠে। ইহার চাষ ·আবাদ সূত্রনিষ্কাশন ও ব্যবহার প্রণালী অবিকল শণের মত; রাজমহল অঞ্চলে পাটের প্রণালী-ক্রমে সূত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার সূত্র প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং ফলন শণেরই মত। ঢেঁড়শজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে ইহার সূত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও দৃঢ়; পাটের সহিত অনেক সময় ইহার ভেজাল চলিয়া থাকে। সূত্র দৃঢ় বলিয়া শণের পরিবর্ত্তেও ব্যবহার হইয়া থাকে কিন্তু শণের দৃঢ়তা অপেক্ষা ইহার ঔজ্জ্বল্য অধিক। এই জাতীয় সূত্র হইতে নানাবিধ টোয়াইন, সূতা, বোরা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মেস্তা—Hibiscus subdariffa, Rozell.—

পশ্চিমাঞ্চলে ইহার ফলকে কুদ্রুম বলে। ইহার ফল ও পুষ্পাবরণী (calyx) অত্যন্ত মাংসল, রক্তবর্ণ ও অম্লাস্বাদ; নানাবিধ মোরব্বা, আচার ও অম্লের জন্য প্রচুর ব্যবহার হয়। ফলের কাথ হইতে মিষ্ট-সংযোগে অতি উপাদেয় আসব প্রস্তুত হয়। এই জাতীয় সূত্র আম্লাপাটের ন্যায় সূক্ষ্ম ও চিক্কণ, এই পাটে শণের কার্য্য উত্তম নির্ব্বাহ হইতে পারে এবং দড়ি, সূতা, টোয়াইন প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার চাষ আবাদও সূত্রনিষ্কাশন প্রণালী অবিকল পূর্ব্বোক্তের ন্যায়; বর্ষাকালে বীজবপন করিলেও শীতকালে গাছ বিশেষ জোর করে। পুষ্পিত অবস্থায় গাছ কাটিলে পরিমাণে অধিক সূত্র জন্মে ও উৎকৃষ্ট হয়। নোনাজলে পচাইলে সূত্র শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় এজন্য নির্ম্মলজলে ইহার সূতা প্রস্তুত করা উচিৎ।

স্থলপদ্ম—Hibiscus mutabilis.—

ইহার অধিক পরিচয় দিবার আবশ্যক করেনা। বর্ষাকালে পরিপক্ক শাখা কাটিয়া রোপণ করিলে চারা প্রস্তুত হয়। ইহার বীজ প্রায় সুপুষ্ট পাওয়া যায় না তজ্জন্য শাখার কলমই প্রশস্ত। পুরাতন গাছের শাখা গাছের শাখা ছাঁটিয়া দিলে নূতন শাখাপ্রশাখা বাহির হয়, তাহা কাটিয়া জলে পচাইয়া সূত্র প্রস্তুত করিতে হয়। বৎসরে ২।৩বার গাছ ছাঁটা যাইতে পারে। নূতন শাখার সূত্র সূক্ষ্ম ও কোমল এবং পরিপক্ক শাখার সূত্র কড়া (Coarse) হইয়া থাকে। ইহার বল্কলজাত সূত্র পাটের ন্যায় নানাবিধ কার্য্যে লাগিতে পারে।

সাময়িক কৃষি সংবাদ

বঙ্গে পশু চিকিৎসা বিদ্যালয়—

এই বিদ্যালয় কলিকাতা সহরতলি বেলগেছিয়া গ্রামে ইং ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সংলগ্নে বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রদিগের ছাত্রাবাস, পশুচিকিৎসালয় এবং আনুষঙ্গিক পরীক্ষাগার আছে। একজন পশু-চিকিৎসাবিদ ইংরাজ কর্ম্মচারী এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। এতদ্ব্যতীত একজন সহকারী অধ্যক্ষ, ৫ জন দেশীয় শিক্ষক ও অন্যান্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। এই বিদ্যালয় একটী কমিটীদ্বারা পরিচালিত হয়। প্রতি তিন মাস অন্তর একটী করিয়া সভা হয়। সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ গবর্ণমেণ্ট বহু অর্থ ব্যয়ে এই বিদ্যালয় পরিচালন করিয়া দেশের প্রভূত মঙ্গলসাধন করিতেছেন।

ভারতের সর্ব্বত্র হইতে শিক্ষার্থীগণ এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত সুদূর ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, আন্দামান দ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতেও শিক্ষার্থীগণ পড়িতে আইসে। এই বিদ্যালয়ে পড়িবার বিশেষ সুবিধা এই যে সকল শিক্ষার্থীগণকে বিনা বেতনে শিক্ষা দান করা হইয়া থাকে। অপরন্তু উপযুক্ত শিক্ষার্থীগণকে প্রতিবৎসর গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি বৃত্তি দিয়া থাকেন।

প্রত্যেক ছাত্রের আহার ও বাসস্থানের জন্য মাসিক মোট ৯।৹ ধার্য্য আছে। ছাত্রদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। পীড়িত ছাত্রদিগের জন্য গবর্ণমেণ্টের একজন উপযুক্ত চিকিৎসকের অধীনে একটী পৃথক চিকিৎসালয় আছে। ছাত্রাবাস তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত একজন ম্যানেজার ও একজন সহকারী ম্যানেজার নিযুক্ত আছেন। ছাত্রদিগের শারীরিক উন্নতিকল্পে একজন ব্যায়াম শিক্ষকের অধীনে নানাবিধ ক্রীড়া ও ব্যায়ামাদির নিয়মিত চর্চ্চা হয়।

শিক্ষার্থীদিগকে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়। তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে গ্রাজুয়েট উপাধি প্রদান করা হয়। গুণানুসারে প্রতিবৎসরই ছাত্রদিগকে মেডাল্, পুস্তক, নগদ টাকা ও অস্ত্রাদি পারিতোষিকস্বরূপ বিতরণ করা হয়। এজন্য গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক প্রায় ৬০০৲ টাকা ব্যয় পড়ে। গ্রাজুয়েট উপাধিধারিগণ গবর্ণমেণ্ট, জেলা বোর্ড, মিউনিসিপালিটি প্রভৃতির অধীনে পশু চিকিৎসক নিযুক্ত হয়েন। ১৯১২-১৩ এবং ১৯১৩-১৪ দুই বৎসরে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০৯ জন। তন্মধ্যে তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা ৫২ জন।

পশুচিকিৎসালয় বিভাগ—

গো, অশ্ব, কুকুর প্রভৃতি যাবতীয় গৃহপালিত পশুদিগের চিকিৎসার জন্য পৃথক পৃথক চিকিৎসাগার আছে তথায় গবর্ণমেণ্টের নির্দিষ্ট হারে তাহারা চিকিৎসিত হয়। দরিদ্রদিগের পশু বিনা ব্যয়ে চিকিৎসারও ব্যবস্থা আছে। উক্ত বৎসরে ৪৬১২ পশু চিকিৎসিত হইয়াছিল। চিকিৎসায় ব্যয় হইয়াছিল মোট ৪৭২২৪৲ টাকা আর ফি আদায় হইয়াছিল মোট ৩৭১৪৭৲ টাকা। কৃষি-সমাচার—১৩১৯।২০

গোবর ও গোমূত্র সংরক্ষণ —

আমাদের কৃষকগণ কখনও উপযুক্তরূপে গোবর রাখে না। গোমূত্র যে একটী বিশেষ সারবান পদার্থ তাহা হয়ত অনেকের জানাই নাই। গোবরগুলি গোয়ালঘরের নিকট অথবা অন্য কোনও অনাবৃত স্থানে স্তুপাকার ফেলিয়া রাখে। রৌদ্রে শুকাইয়া বৃষ্টিতে ধুইয়া উহার সারাংশ প্রায় বিনষ্ট হইয়া যায়, যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাতে সারের ভাগ অত্যন্ত কম। কাজেই এই ভাবে রক্ষিত গোবর যথেষ্ট ব্যবহার করিলেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। সামান্য একটু যত্ন করিলেই কিন্তু এই ক্ষতি এড়াইতে পারা যায়। নিম্নে একটী সহজ উপায়ের বিবরণ দেওয়া গেল। এই উপায় অবলম্বনে অনায়াসে গোবর ও গোমূত্রের প্রায় সমস্ত সার রক্ষা করা যায়।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগে অভিমত এই যে, গোশালার মেজে সমান করিয়া পিটিয়া এক দিক (যদি দুই সারী করিয়া গরু রাখা হয় দুই দিকেই), একটু ঢালু করিয়া লইবে। ঐ ঢালের পাদদেশ দিয়া নালা কাটিয়া দিবে এবং ঐ নালার অথবা নালাগুলির মুখ গোশালার বাহিরে একটী বড় মাটির গামলা বা অন্য কোন পাত্রে যাইয়া মিশিবে যেন গোমূত্র অনায়াসে সেই গামলায় বা পাত্রে জমা হইতে পারে। নিকটে গোবর ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য একটী বড় রকমের গর্ত্ত করিয়া উহার চারিধার ও তলদেশ খুব এটেল মাটী ও গোবরদ্বারা লেপন করিয়া লইবে যেন সহজে সারভাগ ভিতরে শুষিয়া যায়। রক্ষিত সার বৃষ্টি কিংবা রৌদ্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঐ গর্ত্তের উপর একখানা চালা উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক। চতুঃপার্শ্বস্থ জমীর জল যাহাতে ঐ গর্ত্তের ভিতর আসিয়া না পড়িতে পারে সেজন্য গর্ত্তের উপরে চারিধারে অনুমান এক হাত পরিমাণ উচ্চ করিয়া একটী দেওয়াল তুলিয়া দিবে। গর্ত্তের আয়তন গরুর সংখ্যা অর্থাৎ তদনুযায়ী গোবরের পরিমাণের উপর নির্ভর করিবে। চালাও সেই অনুসারে বড় বা ছোট হইবে। একজন সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে ৭ হাত দৈর্ঘ্য ও ৪ হাত প্রস্থ এবং দুই হাত গভীর একটী গর্ত্ত হইলেই প্রথম চলিতে পারে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গোশালার গোবর, খড়পাতা ও গৃহের অন্যান্য আবর্জ্জনা ঐ গর্ত্তে নিক্ষেপ করিবে। তৎপর উপরোক্ত গামলার গোমূত্র ঐ

আবর্জ্জনা মিশ্রিত গোবরের উপর ছিটাইয়া দিবে। ২।৪ দিন পর পর গর্ত্তস্থিত গোবর আবর্জ্জনা ইত্যাদি কোদালের সাহায্যে টানিয়া সমভাবে বিছাইয়া ও কোদালের পৃষ্ঠদ্বারা পিটাইয়া চাপিয়া যথাসম্ভব সমতল ও দৃঢ় করিয়া দিবে। সার আলগাভাবে রাখিতে নাই, কেন না তাহা হইলে উহার মূল্যবান পদার্থ উড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। দৃঢ়রূপে চাপা থাকিলে ঐগুলি আস্তে আস্তে সমভাবে পচিয়া অতি উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হয়। গোশালার মেঝেতে অনেক পরিমাণ মূত্র শুষিয়া যায় বলিয়া উহার মাটী মাঝে মাঝে কোদালিদ্বারা তুলিয়া লইয়া ঐ গর্ত্তে ফেলিলে উহা হইতেও যথেষ্ট পরিমাণ সার পাওয়া যাইতে পারে। আবার নূতন করিয়া মাটী দিয়া মেঝ পূর্ব্বমত প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ক্রমে যখন একটী গর্ত্ত পরিপূর্ণ হইয়া আসিবে তখন পূর্ব্বের ন্যায় আরও একটী গর্ত্ত করিয়া লইবে। সরকারের তরফ হইতে অনেক কৃষককে এই প্রণালীতে গোবর গোমূত্র সার রাখিতে দেখান হইতেছে। ইহার খরচ এত কম এবং লাভের আশা এত বেশী, যে আশা করা যায় খুব শীঘ্রই বিস্তৃত ভাবে ইহার প্রচলন হইবে।

আলুর রোগ ও তাহার প্রতিবিধানের জন্য বোরডো মিকশ্চার—

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের পুস্তিকা—

আলুর কাল রোগের আর এক নাম আলুর মড়ক। পার্ব্বত্য প্রদেশে এই ব্যারামে অত্যন্ত ক্ষতি হয়। অধুনা সমতল প্রদেশেও বিশেষতঃ রংপুর জিলায় এই ব্যাম দেখা দিয়াছে।

মানুষের ব্যারামের ন্যায় এই রোগও সংক্রামক। এই রোগের বীজাণু বায়ু, বৃষ্টি এবং পশু পক্ষীদ্বারা চারিদিকে বিস্তৃত হয়।

এই রোগের প্রথম লক্ষণ পাতাতেই দেখা যায়। পাতাতে কটা রঙের ছোট ছোট দাগ পড়ে তাহার পর ঐ দাগগুলি ক্রমশ বড় হইতে থাকে এবং পাতাগুলি কোঁকড়াইয়া যায়। যখন অনেকগুলি একত্রে আক্রান্ত হয় তখন পাতা ও ডগাগুলি অল্প দিনের মধ্যেই কাল হয় ও পচিয়া যায় এবং তাহা হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ বাহির হয়। অনেক আলুও রোগক্রান্ত হয়। আলু কাটিলে তাহার শাঁসের মধ্যে কাল অথবা কটা রঙের দাগ দেখা যায়, রোগক্রান্ত আলু ঘরে রাখিলে পচিয়া যায়। যদি ঐ আলু পাক করা যায় তবে রুগ্নঅংশগুলি শক্ত ও খাওয়ার অযোগ্য হয়। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে কিম্বা কুয়াশা হয় তবে এই রোগ অতি শীঘ্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং ২।১ সপ্তাহের মধ্যে মাঠের সমস্ত শস্য কাল হইয়া যায়। পাতার নীচের দিকে কটা রঙয়ের দাগের মধ্যে অনেক সরু সরু সাদা সূতা দেখা যায়। এই সাদা সূতাগুলির অগ্রভাগে বীজাণু

কোষ বা বীজ থাকে যদ্দারা উদ্ভিদাণু বৃদ্ধি পায়। বীজাণু কেবল অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা যায়, সাধারণ চক্ষে দৃষ্ট হয় না।

রোগ প্রতিবিধানের উপায়—

কেবল ভাল বীজ ব্যবহার করিতে হইবে। রোগক্রান্ত ফসল হইতে আলু সংগ্রহ করিলে যদিও উহাতে রোগের চিহ্ন দেখা না যায় তথাপি উহা বপন করা নিতান্ত অনুচিত, কারণ সজীব বীজাণু অনেক কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

একই ক্ষেত্রে প্রত্যেক বৎসর আলু বপন করা বিধেয় নহে। পাতাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের রোগ চিহ্ন সকল দেখা গেলে বোরডো মিকশ্চার দেওয়া উচিত। স্বভাবতঃ কালো রোগ হইতে যে অনিষ্ট হয় এই মিকশ্চার ব্যবহারে তাহা বহুল পরিমাণে নিবারিত হয়। গাছগুলিও ১৫ দিন কি ১ মাস কাল বেশী বাঁচিয়া থাকে এবং সেজন্য ফসলও বেশী পাওয়া হয়। রোগ দেখা না দিলেও যদি এই ঔষধ দেওয়া যায় তাহাহইলে রোগ আক্রমণের সম্ভব থাকে না, ফসলও বেশী পাওয়া যায়।

বোরডো মিকশ্চার তৈয়ার করিবার প্রণালী—

একটী বড় জালাতে ১ মণ ঠাণ্ডা জল লও। অন্য একটী পাত্রে ৫ সের হইতে ১৯ সের পর্য্যন্ত জল লইয়া তাহাতে ৮ ছটাক তুঁতিয়া ভিজাও। তার পর ৬ ছটাক চূণ অল্প জলের সহিত ভাল করিয়া গুলিয়া শেষে তুঁতিয়া ভিজাইবার জন্য যে পরিমাণ জল লওয়া হইয়াছিল সেই পরিমাণ জল উহাতে ঢালিয়া খুব ভাল করিয়া মিশাইতে হইবে। এখন বড় জালাটীতে তুঁতিয়া ও চূণ ঢালিয়া দেও। কিন্তু মনে রাখিও যে উহা সর্ব্বদা নাড়িতে হইবে। চূণ একটী মোটা কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া দিতে হইবে।

কখনও ধাতুনির্ম্মিত বাসনে এই দুই জিনিষ মিশাইও না—

এই দুইটী জিনিষ মিশাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া লইবে। পরে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে উপরের পরিষ্কার জলের নিচে ফিকা সবুজ রঙের ফাঁকি পড়িয়াছে।

পরীক্ষার নিয়ম—

ঐ মিকশ্চারে একখানি চাকু ৫ মিনিট কাল ডুবাইয়া রাখিলে যদি উহার উপর তামা জমিয়া যায় তবে আরও চূণ মিশাইতে হইবে, যদি চাকুর কোন পরিবর্ত্তন দেখা না যায় তবেই জানিবে যে মিকশ্চার ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে। মোটামুটী প্রতি বিঘাতে তিন মণ মিকশ্চার দিলেই হয়। যে দিন মিকশ্চার ক্ষেতে দিতে হইবে সেই দিনেই উহা প্রস্তুত করিবে।

রোগের আক্রমণ বেশী হইলে প্রত্যেক ২ সপ্তাহ কিম্বা ৩ সপ্তাহ পর পর তিনবার ঔষধ দিতে হইবে।

বোরডো মিকশ্চার বা অন্যান্য ঔষধ গাছে দিবার জন্য পৃথকযন্ত্র আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

১। "সাকসেস" ন্যাপ-স্যাক স্প্রেয়ার—এই যন্ত্রটী মাটিতে রাখিয়া বা পিঠে করিয়া লইয়া ঔষধ ছিটাইয়া দেওয়া যায়। ইহাতে প্রায় ২০ সের ঔষধ ধরে। ইহার দাম ৬০৲ টাকা।

২। বাকেট্ পাম্প্—কেরোছিনের টিন বালতিতে ঔষধ রাখিয়া এই যন্ত্র দ্বারা ঔষধ দেওয়া যায় ইহা অতি সাধারণ রকমের এবং বাগানে অল্প জায়গায় ঔষধ দিতে খুব উপযোগী। ইহার মূল্য ১৪৲ টাকা। ন্যাপ-স্যাক স্প্রেয়ার দ্বারা একদিনে ২ একর (৬ বিঘা) জায়গার ফসলে এবং উপযুক্ত নল হইলে ১৫ ফিট উচ্চ গাছে ঔষধ দেওয়া যায়।

এই যন্ত্রগুলি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

মেসার্স উইলকিনসন, হেউড, ক্লার্ক এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড্ ওরিয়েনণ্টাল্ বিল্ডিংস, বোম্বে কোর্ট।

বঙ্গদেশে গমের আবাদ—১৯১৪।১৫—

আলোচ্য বর্ষে ১৩৪,১০০ একর পরিমাণ জমিতে গমের চাষ হইয়াছে তৎপূর্ব্ব বর্ষে ১৪৪,১০০ একর পরিমাণ জমিতে গমের আবাদ হইয়াছিল। গম সময় মত বোনা আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টির অভাব হেতু সকল জমিতে গম বোনার সুবিধা হয় নাই এই কারণ গমের আবাদী জমি বর্ত্তমান বর্ষে কমিয়া গিয়াছে। একর প্রতি ১০॥ মণ গম জন্মিয়াছে ধরিয়া লইলে এই প্রদেশে ৩১,৬০০ টন গম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়। ইহার পূর্ব্ব বর্ষে উৎপন্ন গমের পরিমাণ ছিল ৫১,১০০ টন। বর্ত্তমান বর্ষে বৈশাখ মাসেই গমের দর সকল হাটেই ৫৸৴০ পাঁচটাকা পোণেরো আনা। বিগত বর্ষ অপেক্ষা প্রায় ১৲ টাকা চড়া এবং তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৷৷০ টাকা চড়া।

বঙ্গদেশে মসিনা, রাই, সরিষা ১৯১৪।১৫—

গমের মত বৃষ্টির অভাবে তৈল শস্যের আবাদী জমির পরিমাণ কম। বর্ত্তমান বর্ষের আবাদী জমির পরিমাণ ১,৫৪৬,০০০ একর, বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ১,৫৫৪,০০০ একর। এই হিসাবে তিলের জমি ধরা হয় নাই। একর প্রতি গড়ে ৬৴ মণ ফলন হইয়াছে ধরিলে বর্ত্তমান বর্ষে বঙ্গে তিল ভিন্ন অপরাপর তৈল শস্যের পরিমাণ ২৬৩,৭০০টন, বিগত বর্ষে ৩০৬,৭০০ টন তিল উৎপন্ন হইয়াছিল।

আসামে রাই ও সরিষার আবাদ ১৯১৪।১৫—

বৃষ্টির অভাবে আসামে রাই ও সরিষার চাষের ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমান বর্ষে কিছু অধিক পরিমাণ জমিতে রাই ও সরিষার আবাদ হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের আবাদী জমির পরিমাণ ৩০৪, ৫০০ একর, বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ২৯৯, ১০০ একর। একরে ৪॥ হন্দর (১ হন্দর = ১।৪ একমণ চোদ্দসের) ফসল উৎপন্ন হইয়াছে ধরিলে মোটের উপর ৫৮, ২০০ টন সরিষা জন্মিয়াছে। বিগতপূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা শতকরা ৫ ভাগ কম।

পঞ্জাবে আকের আবাদ ১৯১৪—

সমগ্র ভারতবর্ষে যে পরিমাণ জমিতে আকের আবাদ হয় পঞ্জাবের আকের জমির পরিমাণ তাহার প্রায় যষ্ঠাংশ। ১৯১৪ সালে পঞ্জাবে আকের আবাদী জমির পরিমাণ ৩৬৬, ২৯০ একর মাত্র। বিগত পূর্ব্ব বৎসরে ৪১০, ৯০৯ একর জমিতে আকের আবাদ হইয়াছিল। বৃষ্টি ও সেচন জলের অভাব হেতু এতদঞ্চলে আকের আবাদী জমির পরিমাণ কম হইয়াছে।

মোটের উপর ১৯১৪ সালে ২৬৫, ৮২৭ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বিগত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা উৎপন্নের মাত্রা শতকরা ১৪ ভাগ কম। কিন্তু ইতি পূর্ব্বে কয়েক বৎসরের গড় ধরিয়া হিসাব করিলে আকের ফলন বাড়িয়াছে বলিতে হইবে। উৎপন্ন চিনির মাত্রা যদিও কিছু কমিয়াছে কিন্তু দেখা যায় যে প্রায় ৩৬,০০০ একর পরিমাণ ক্ষেতের ইক্ষু চিবাইয়া খাইবার জন্য ব্যবহার হইয়াছে।

আমন ধানের ক্ষেতে হাড় সার—

প্রায় অধিকাংশ আমন ধানের ক্ষেতে জল থাকে। ঐ সকল ক্ষেতে ধান্যের জন্য হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিলে কি ফল হয় তাহা দেখিবার জন্য খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়ে অনেক পরীক্ষা হইয়াছে। আসাম কৃষি-বিভাগের স্বনাম খ্যাত মাননীয় মিঃ বি, সি, বসুর এই সম্বন্ধে মন্তব্য বিশেষ মূল্যবান বলিয়া মনে হয়। যে সকল ধানের ক্ষেতে জল থাকে তাহাতে একর প্রতি ৩/ মণ হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিলে ধানের ফলন ১০ মণ হইতে ২০॥০ মণ দাঁড়াইবে। হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিতে যাহা খরচ হয় তাহার দ্বিগুণ টাকা শস্য হইতে উঠিয়া যায়। হাড়ের গুঁড়া ব্যবহারে আর একটা গুণ এই যে এক বৎসরে হাড় সারের শক্তি ক্ষয় হইয়া যায় না। তিন বৎসর পর্য্যন্ত ইহার শক্তি থাকে সুতরাং পরপর তিন বৎসর পর্য্যন্ত যে অধিক মাত্রায় ধান পাওয়া যাইবে তাহার মূল্য অনেক। পাহাড়িরা এক্ষণে হাড়ের গুঁড়ার গুণ বুঝিতে পারিয়াছে। তাহারা এক্ষণে প্রতি বৎসর পাঁচ ছয় শত মণ হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিতেছে। মিঃ বসু বলিতেছেন যে একর প্রতি ৩/ মণ হাড়ের গুঁড়া পর্য্যাপ্ত। ধানের ক্ষেত প্রথম চষিবার সময় ইহা ক্ষেতে ছড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গুঁড়া যত মিহি হয় ততই ভাল। হাড়ের গুঁড়া গলিয়া জমির সহিত মিশিয়া গলিতে বিলম্ব হয় সেইজন্য ধান বপনের বা রোপণের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে জমিতে প্রদান করাই কর্ত্তব্য।
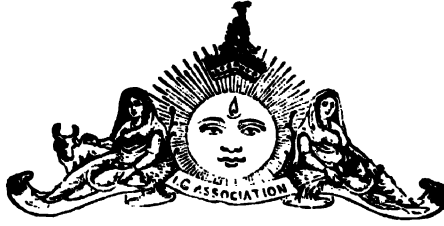
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ সাল।

ভারতীয় কৃষি-বিভাগ

আমাদের পাঠকবর্গেরা অবগত আছেন যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এক একটি কৃষি বিভাগ রহিয়াছে। এই সমুদয়ের উদ্দেশ্য স্থানীয় কৃষি বিষয়ক অভাব অভিযোগ অনুসন্ধান করিয়া সে সমুদয় নিরাকরণ ও সাধারণ কৃষির উন্নতির ব্যবস্থা করা। ভারত গবর্ণমেণ্টের ন্যায় ভারতীয় কৃষি বিভাগের অন্যতম উদ্দেশ্য প্রাদেশিক কৃষি-বিভাগ সমুদয় তত্বাবধারণ ও সমস্ত ভারতের কৃষির উন্নতি কল্পে আবশ্যকীয় কার্য্যাদির অনুষ্ঠান। বর্তমান সময়ে ভারতে ১০টি প্রাদেশিক বিভাগ রহিয়াছে—যথা বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা, আগ্রা ও অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, ব্রহ্ম, আসাম এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। এগুলি সমস্তই ভারতীয় কৃষি বিভাগের অধীন।

ভারতীয় কৃষি বিভাগের প্রধান কেন্দ্র পুষা। এই স্থানে কৃষিকলেজ, মৌলিক অনুসন্ধানাগার, পরীক্ষা ক্ষেত্র, গোচারণ ও গোজনন ক্ষেত্র রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই স্থানেই ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিষয়ক অভিজ্ঞগণ বাস করেন ও তাঁহাদের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সুতরাং পুষার ইতিহাসের সহিত ভারতীয় কৃষির ইতিহাস ঘনিষ্টভাবে জড়িত। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কুর্জ্জনের উদ্যমে এবং জনৈক মার্কিন দেশবাসী উদার হৃদয় ব্যক্তির বদান্যতায় পুষার কৃষি কেন্দ্র প্রথমতঃ অনুষ্ঠিত হয়। তাহার পর আজ দশ বৎসরের অধিক ভারত গবর্ণমেণ্টের চেষ্টার ফলে এবং প্রভূত অর্থব্যয়ে পুষা ভারতীয় কৃষির কিয়ৎ পরিমাণ উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছে। পুষা কেন্দ্রের কার্য্য যে কত বহু বিস্তৃত তাহা উক্ত স্থলে স্থাপিত বিভিন্ন

বিভাগ সমূহের তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। নিম্নলিখিত প্রত্যেক বিষয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য এক একটি বিভাগ রহিয়াছে—(১) সাধারণ তত্ত্বাবধারণ (২) কলেজ (৩) ক্ষেত্র (৪) রসায়ন (৫) উদ্ভিতত্ত্ব ও উদ্ভিদের উন্নতি সাধন (৬) জীবাণুতত্ত্ব (৭) উদ্ভিদ রোগ (৮) কীটতত্ত্ব (৯) রোগ সংক্রান্ত কীটতত্ত্ব। এতদ্ভিন্ন পুষাতে অবস্থিত না হইলেও কার্কির কার্পাস অভিজ্ঞের বিভাগ ও মুক্তেরের জীবাণুতত্ত্ব বিষয়ক বিজ্ঞানাগার পুষা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধারণ ভুক্ত।

প্রথম প্রতিষ্ঠানের সময় পুষা কৃষি কলেজে প্রাথমিক কৃষিশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়; এমন ১০টি প্রদেশের মধ্যে ৬টি প্রদেশে কৃষি শিক্ষা প্রদানের উপযোগী স্কুল কলেজ হইয়াছে। ভারতের প্রদেশ সমূহের মধ্যে কৃষি বিষয়ক স্থানীয় অবস্থাবলীর এত প্রভেদ যে সমস্ত ভারতের জন্য এক প্রকার কৃষি প্রণালীর ব্যবস্থা হইতে পারে না। সেইজন্য বিভিন্ন প্রদেশের উপযুক্ত কৃষি প্রণালী অনুসন্ধান করিয়া তদ্দেশের উপযোগী কৃষি শিক্ষা প্রাদেশিক স্কুল কলেজেই প্রদান করাই কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময় সেই-রূপই বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই সমস্ত স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া যাঁহারা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে পুষা কলেজে শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন ফল, রেশম, লাক্ষা, গোজনন ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষা প্রদান করা হয়। অবশ্য এইরূপ শিক্ষা প্রয়াসী ছাত্রের সংখ্যা নিতান্ত কম ১৯১৩—১৪ সালে এইরূপ ছাত্র রসায়ন বিভাগে ৫টি, কীটত্ত্বে ২টি, জীবাণুতত্ত্বে ১টি এবং সাধারণ কৃষিতত্ত্বে ১টি মাত্র ছিল। গোপালন ও রেশম চাষে যথাক্রমে ১টি ও ৬টি মাত্র ছাত্র ছিল। কিন্তু ছাত্রের সংখ্যা কম হওয়াতে পুষার অভিজ্ঞগণ মৌলিক অনুসন্ধানের অনেক অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ইহা আশা করা যায় যে তাঁহাদের সময় মৌলিক অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলে দেশের অনেক অধিকতর মঙ্গল হইবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কৃষি শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র বর্ত্তমান সময় প্রাদেশিক কৃষি-বিভাগ সমূহ। মান্দ্রাজে কোইম্বাটোর, পঞ্জাবে লায়ালপুর, বিহার ও উড়িষ্যায় সবর, যুক্ত প্রদেশে কাণপুর, মধ্যপ্রদেপে নাগপুর ও বোম্বায়ে পুনা—এই কয়েকটি স্থানে কৃষি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। অতীব দুঃখের বিষয় যে বঙ্গদেশ এ সম্বন্ধে এখনও সকলের পশ্চাৎবর্ত্তী। তাহার কারণ আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি না।

পুষার কৃষি কলেজ ও বিজ্ঞানাগার প্রভৃতির কর্ত্তা ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিষয়ক উপদেষ্টা। তাঁহার তত্ত্বাবধারণেই ভারতীয় কৃষি-বিজ্ঞান পরিচালিত হইয়াছে। ১৯১৩—১৪ সালের বিবরণীতে দেখা যায় যে ভারতীয় কৃষি বিভাগে (মুক্তেশ্বরের বিজ্ঞানাগারের সহিত) ব্যয় হইয়াছিল ৬,৯৯,৭৩৯৲ অর্থাৎ প্রায় সাত লক্ষ টাকা। উক্ত বৎসরে প্রাদেশিক বিজ্ঞান সমূহে ব্যয় হয় ৪৬,৩৪,১১৮৲ টাকা সুতরাং ভারতে কৃষির উন্নতি কল্পে মোট ব্যয় অর্দ্ধ কোটী টাকার উপর হইবে। ইহার মধ্যে যাহাকে

অধিক কৃষি বিষয়ক খরচ বলিতে পারা যায় না এরূপ খরচও আছে। যাহাহউক মোট ব্যয়ের পরিমাণ এইরূপ। ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের পক্ষে ব্যয়ের পরিমাণ, পাশ্চাত্য দেশ সমূহের তুলনায় অতি সামান্যই বলিতে হইবে; কিন্তু ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশের পক্ষে বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় সামান্য বলিয়া ধরিতে পারা যায় না।

এই অর্থ ব্যয়ে আমরা কতদূর উপকৃত হইয়াছি; ভারতীয় কৃষির ইহাতে কি উন্নতি হইয়াছে—তাহা আলোচনা করিতে গেলে অনেক বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার স্থান নাই। কিন্তু যে সকল প্রধান প্রধান ফসল লইয়া ভারতের কৃষি তৎসমুদয়ের উৎপাদনের ভারতীয় অথবা প্রাদেশিক বিজ্ঞান সমূহ কি কি উন্নত প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলে আমাদের অর্থ ব্যয়ের ফলাফল অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারা যাইবে।

ধান্য, কাপাস, গোধুম, ইক্ষু, পাট প্রভৃতি এতদ্দেশের অন্যতম ফসল বলিয়া ধরিতে পারা যায়। প্রথমতঃ ধান্যের বিষয় বলিতে গেলে বলিতে হয় উন্নতি অতি সামান্যই হইয়াছে। ধান্যের উৎকৃষ্ট জাতি নির্ব্বাচন, রোপণ প্রণালী ও সার এই তিনটি দিকেই সরকারী পরীক্ষা সমূহ চলিতেছে। বঙ্গদেশের ব্যবহারিক উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ আমন ধানের প্রায় ছয়টি উৎকৃষ্ট জাতি নির্ব্বাচন করিয়াছেন এতদ্ভিন্ন তিনি কয়েকটি বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক সঙ্করও প্রাপ্ত হইয়াছেন। উভয় উপায়েই যে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি হইতে পারে তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সকল পরীক্ষা এ অবস্থায় উপনীত হয় নাই যাহাতে সাধারণ লোককে উহাদের উপকারিতা বুঝাইতে পারা যায়। বরং উক্ত উদ্ভিদতত্ত্ববিদের আপেক্ষিক গুরুত্ব হিসাবে বীজ নির্ব্বাচনের প্রাণালী অনেক কৃষকের কাজে লাগিতে পারে; ইহা দ্বারা তাহারা সহজে ভাল মন্দ বীজ বাছিয়া লইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট কতিপয় বৎসর হইতে বলিয়া আসিয়াছেন যে ধান্য রোপণ গুচ্ছ হিসাবে হওয়া অপেক্ষা এক একটি হিসাবে হওয়া ভাল। মান্দ্রাজে গোদাবরী, তাঞ্জোর প্রভৃতি অঞ্চলে দেখা গিয়াছে যে এতদ্দ্বারা বিঘা প্রতি বীজের মূল্য প্রায় ১৲ হিসাবে হ্রাস পাইয়াছে এবং অনুমান করা যায় যে এই অনুপাতে এই সমস্ত দেশে বীজ চারার খরচে প্রায় দশ লক্ষ টাকা লাঘব হইয়াছে। অন্যদিকে একক চারা রোপনে উৎপাদনের পরিমানের যে অধিক হইয়াছে তাহার মূল্য সাড়ে চারি লক্ষ টাকার কম হইবে না। সার সম্বন্ধে কিন্তু এইরূপ কোন বিশেষ ফল পাওয়া যাই নাই। একদিকে সার প্রয়োগে যেরূপ ফল পাওয়া যায় অন্যদিকে সেরূপ নহে। সেইজন্য এক গোময় ভিন্ন অন্য কোন সার যে ধানের পক্ষে সকল দেশে উপযুক্ত হইবে তাহা বলিতে পারা যায় না। তুলা সম্বন্ধে পরীক্ষাবলী অনেক দিন হইতে চলিতেছে। পরীক্ষাবলীর অন্যতম উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলা উৎপাদন কিন্তু জাতির উৎকর্ষতা অপেক্ষা ফলনের আধিক্য হওয়া একান্ত আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন এই নূতন জাতীয় তুলা চাষ যাহাতে অধিকতর ব্যয় সাপেক্ষ না হয় তাহাও দেখা

দরকার। ভারতের অনেক স্থলে ইহা দেখা যায় যে বীজ নানা জাতির মিশ্রণ। সুতরাং গুণে অথবা ফলনে তুলা কখনও একটি নির্দ্দিষ্ট মান (standard) অনুযায়ী হয় না। ব্যবসায়ের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কিছুই অধিক ক্ষতি জনক হইতে পারে। ভারতীয় কৃষি বিভাগের চেষ্টায় কিন্তু স্থানে স্থানে ইতিমধ্যে একজাতীয় তুলা এক এক অঞ্চলে উৎপাদিত হইতেছে। তাহাতে তুলার মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ফলনের মাত্রাও বাড়িয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মান্দ্রাজের দক্ষিণ অঞ্চলে ক্যাম্বোডিয়া জাতীয় তুলা, বোম্বাইয়ে ব্রোচ্ তুলা, মধ্যপ্রদেশে বোজিরম জাতীয় তুলাও পঞ্জাবে মার্কিণ তুলার প্রবর্ত্তন উল্লেখ করিতে পারা যায়।

ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবহারিক উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিৎ বহুল পরীক্ষার পর "১২নং পুষা" নামক যে গোধূম উদ্ভাবিত করিয়াছেন তাহা পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা এবং অন্যান্য স্থানে উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিতেছে। ইহা বহির্ব্বাণিজ্য ও দেশীয় ব্যবহার উভয়ের পক্ষেই উপযুক্ত। বস্তুতঃ আপাততঃ যেরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এই জাতীয় গোধূম অন্যান্য ভারত উৎপাদিত গোধূম অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইবে বলিয়া বোধ হয়।

ইক্ষুর উৎকৃষ্টজাতি নির্ব্বাচনের চেষ্টা অনেক দিন হইতে চলিতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন একটি অথবা একশ্রেণী সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাতীয় ইক্ষু এখনও পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত হয় নাই। এখনও স্থানবিশেষে ইক্ষু চাষের কিছু উন্নতি হইলেও ইক্ষুচাষ ও শর্করা উৎপাদনের কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিতেছে।

১৯১৩ ১৪ সালের বিবরণী পাঠে বোধ হয় যে গবর্ণমেণ্ট চাষাবাসের উন্নতি বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইহা যে কতদূর আবশ্যকীয় বিষয় তাহা আমরা অনেকবার পাঠকবর্গকে বুঝাইয়া দিয়াছি। ফল উৎপাদন বিষয়ে উত্তর পশ্চিম ভারতে যতটা যত্ন দৃষ্ট হয় ততটা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সাহারাণপুর উদ্ভিদ্ উদ্যান এতৎসম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে যাহাতে মধ্যবিত্ত লোক ফল উৎপাদন ও সংরক্ষণে প্রবৃত্ত হন তাহারও চেষ্টা হইতেছে। পেশওয়ার অঞ্চলে পূর্ব্বে বীজ হইতে পীচ প্রভৃতি গাছ উৎপাদিত হইত। এক্ষণে ঐ সকল স্থানে জোড় কলমের প্রবর্ত্তনে চাষের অনেক উন্নতি হইয়াছে। বেলুচি স্থানে কোয়েটার নিকট ফল—বাগানে বৈজ্ঞানিক প্রথায় ফল উৎপাদিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন কার্য্যতঃ প্রতীয়মান হইতেছে যে গবর্ণমেণ্ট ফল চালানের জন্য যে নূতন প্রথায় বাক্স প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা অচিরাৎ ভারতীয় ফল ব্যবসায়ীগণের মধ্যে প্রচলিত হইয়া ফল ব্যবসায়ের ক্ষতি অনেক পরিমাণে দূরীভূত করিবে।

আমরা দুই চারিটি ফসলের উন্নতির বিষয় এস্থলে উল্লেখ করিলাম। ইহা ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট ক্ষেত্রজ ও উদ্যান জাত অন্যান্য উদ্ভিদাদির উৎকর্ষ সাধনে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন সে সমস্ত বিষয়ের সম্পূর্ণ সমালোচনা করা এস্থলে সম্ভব নহে। তবে বিবরণী পাঠে ইহা

প্রতীয়মান হয় যে কৃষি পরীক্ষা, শিক্ষা, উন্নত প্রণালী প্রদর্শন; বীজ, সার ও যন্ত্রাদি বিতরণ প্রভৃতি কৃষি বিষয়ক ব্যাপারে যে অর্থব্যয় ও লোক নিয়োগ করিয়াছেন তাহা যথেষ্ট হয় নাই। ভারতের ন্যায় বিশাল দেশে উপযুক্তভাবে উন্নত কৃষি প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে আরও সময়, অর্থ এবং পরিশ্রম আবশ্যক এবং আরও আবশ্যক দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহানুভূতি ও সহকারিতা। এই সকল বিষয়ের সংযোগেই কৃষি উন্নতি সম্ভবপর। কৃষি-বিভাগ যদি অপরাপর বিভাগের ন্যায় সাধারণ হইতে দূরত্বের ভাব ছাড়িয়া দিয়া সাধারণকে নিজ কার্য্যে উৎসাহিত করিতে পারেন তাহাহইলে কৃষির উন্নতি হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না।

ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার

আলুর ক্ষেতে বোর্দ্দো মিশ্রণ ছিটান হইতেছে। সহজে আরোক ছিটান যায়। ইহা অনায়াসে পৃষ্ঠে বহন করা যায়। আরোক কেমন বাষ্পাকারে বাহির হইতেছে, দেখুন

পত্রাদি

উই—

শ্রীকালী কুমার মজুমদার—কাঁচড়াপাড়া গোশালা

উইয়ের উৎপাতে আমার গোলাপ বাগিচা নষ্ট প্রায়, প্রতিকার বলিয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

উত্তর—

গোলাপ ক্ষেতে রেড়ির খৈল সার ব্যবহার করিবেন। ক্ষেতের মধ্যে কোন স্থানে উইয়ের ঢিপি বা বাসা থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া গর্ত্তটি জল পূর্ণ অবস্থায় কিছুক্ষণ রাখিলে উই মরিয়া যাইতে পারে। উইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া তাহাতে চিনি বা গুড় ছড়াইয়া দিলে, মিষ্টতার লোভে পিপীলিকা আসিয়া যুটে। পিপীলিকায় উইপোকা নষ্ট করে। ক্ষেতের স্থানে স্থানে গুড় বা চিনি রাখিয়া দিলে ক্ষেতময় সারি বদ্ধ পিপীলিকার গতায়াত হইবে। শত্রুর আসা যাওয়া দেখিলে উইগণ সেস্থান পরিত্যাগ করিতে পারে। শত্রু হইতে দূরে থাকা কীট পতঙ্গাদির স্বাভাবিক নিয়ম।

অনন্তমূল—

শ্রীপ্রতুল চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ কবিরাজ—কলিকাতা

আমি আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ ব্যবসায়ী, আয়ুর্ব্বেদমতে সালসা প্রস্তুতকরণার্থ আমার ভাল অনন্তমূলের আবশ্যক। কলিকাতার উপকণ্ঠ হইতে বেদেরা যে অনন্তমূল বিক্রয়ার্থ সংগ্রহ করিয়া আনে তাহা তত ভাল নহে। ইহাও ঐ শ্রেণীর উদ্ভিদ বটে কিন্তু যে অনন্তমূল ঔষধে ব্যবহার হয় তাহা অতি সুঘ্রাণযুক্ত এবং তাহার ডাঁটা ও পাতা এই অনন্ত মূল হইতে আকারে ও বর্ণে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। ভাল অনন্তমূলের দাম কত?

উত্তর—

কলিককাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজগণ কোথা হইতে অনন্তমূল সংগ্রহ করেন, খোঁজ লইতে পারেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ রাসায়নিক ঔষধাগার বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস্ যথেষ্ট পরিমাণে অনন্তমূল ব্যবহার করেন, তথায়ও খোঁজ লইতে পারেন। আমরা জানি যে, সিংভূম ও মানভূম অঞ্চলে প্রচুর অনন্তমূল পাওয়া যায় এবং সে অনন্তমূল নিশ্চয়ই ভাল জাতীয়। 'কৃষক' পত্রে বহুপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়, (students Union) পুরুলিয়া, মানভূম হইতে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি অনন্তমূল ৩০২

হইতে ৪০৲ টাকা মণ দরে সরবরাহ করিতে পারেন। তাঁহার দর কম কিম্বা অধিক যাচাই করিয়া দেখিতে পারেন এবং তাঁহাকে পত্র লিখিয়া নমুনা আনাইতে পারিবেন।

ইউক্যালিপটস—

শ্রীগোপাল কৃষ্ণ দাস,—গোপালপুর মেদিনীপুর

কত রকমের ইউক্যালিপটস্ আছে, তাহাদের ব্যবহার কি? এখানে গাছ পাওয়া যায় কি না? গাছ তৈয়ারী করিলে তাহা লাভকর হইবে কি না?

উত্তর—

ইউক্যালিপটস্ অনেক জাতীয় আছে তন্মধ্যে আমরা ভারতবর্ষে দুই জাতীয় ইউক্যালিপটসের আমদানী দেখিতে পাই। ১। সিট্রিওডোরা (Eucalyptus Citiiodora), ২। গ্লোবিউলস্ (Eucalyptus Globulus)। ইহাদের পাতায় ইউক্যালিপটস্ তৈলের গন্ধ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শুনাযায় যে ম্যালেরিয়া প্রধান স্থানে রোপণ করিলে এই গাছের হাওয়ায় দূষিত হাওয়া নষ্ট হয় ও স্বাস্থ্য ভাল হয়। এতদ্ব্যতীত ইহার কাষ্ঠ নানা কাজে লাগিতে পারে। ইহার গাত্র হইতে এক প্রকার আঠা নির্গত হয়, উহা তৈলাক্ত। ইহার নির্য্যাস হইতে তৈল প্রস্তুত হইতে পারে। এই জন্য ইউক্যালিপটস্কে গম বৃক্ষ (Gum tree) বলে। ইউক্যালিপটস্ গ্লোবিউলাস্কে ব্লুগম বৃক্ষ বলে। আঠা প্রভৃতি কাজে লাগাইতে পারিলে এবং কাষ্ঠ, গাছ বড় হইয়া ব্যবহারপোযোগী হইলে ঐ জাতীয় গাছ হইতে লাভ হইবে ইহা নিশ্চয়।

নাইট্রোজেন, ফস্ফারাস, পটাস্ সার—

শ্রীমথুরা চন্দ্র সোম—কেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট

এই সার গুলি পৃথক পৃথক ভাবে পাওয়া যায় কিনা, কোথায় পাওয়া যায় জানিতে ইচ্ছা করি।

উত্তর—

সোরা, নাইট্রোজেন প্রধান সার; হাড়ের গুঁড়া, ফস্ফারাস প্রধান সার; ছাই, পটাস প্রধান সার। সার সম্বন্ধে গত পূর্ব্ব মাসের কৃষকে আলোচনা আছে। এতদ্ভিন্ন এই সম্বন্ধে সতন্ত্র পুস্তক রহিয়াছে—শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত "কৃষি-রসায়ন" গ্রন্থ পাঠে আপনার সার সম্বন্ধে সকল জ্ঞান লাভ হইবে। এই সকল সার কলিকাতার বাজারে ও ভারতীয় কৃষি-সমিতির নিকট পাওয়া যায়।

জমির পাইট—

শ্রীকৃত্তিবাস নন্দী মোক্তার, বোলপুর।

বর্ষার শেষে জমিতে চূণ দিয়া চাষ দেওয়া ও আশ্বিন কার্ত্তিকমাসে সার খাওয়াইয়া জমি ফেলিয়া রাখিয়া পরে সময় মত ইক্ষু বসাইবার উপদেশ দিতেছেন কিন্তু আমি এই বৎসরই মাঘের প্রথম হইতে চাষের উদ্যোগ করিতেছি আপনার উপদেশ মত বর্ষার শেষে ঐ সব কাজ করিতে গেলে এবৎসর ইক্ষু বসান হয় না। আমি ইক্ষু বসাইবার মতলবে জমি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং জমি প্রায় ১৮ আঙ্গুল গভীর করিয়া কোদাল দ্বারা কোপাইয়া দেওয়ান হইয়াছে। ইহার ফলে উপরের সারযুক্ত মৃত্তিকা নিম্নে পড়িয়া গিয়াছে ও নিম্নের আঁটাল মাটী উপরে উঠিয়াছে ও তাহা মোটা মোটা চাপড়া অবস্থায় রৌদ্রে শুষ্ক হইতেছে। অদ্য ৩।৪ দিন ঐ কার্য্য করা হইয়াছে, আরও ৩।৪ দিন রৌদ্র খাওয়ার পর লাঙ্গল দিয়া ঐ মাটী উল্টাইয়া দেওয়া হইবে, পরে ৩।৪ দিন পরে ঐরূপ করিব। ইহাতে ক্রমান্বয়ে ৩।৪ দিন পরে পরে পাঁক মাটি চূণ ও গোবর সার দেওয়া হইবে ও প্রত্যেকবারে সার প্রয়োগের পর লাঙ্গল দ্বারা মাটী উল্টাইয়া মই দিয়া ভগ্ন করা হইতেছে তাহাতে যে সকল ঢেলা অভগ্ন থাকিবে তাহা লোহার খেঁটে দিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়াইয়া মাটি ও সার রীতিমত মিশ্রিত করা গেলে, প্রত্যেক চারার গোড়ায় তরলীকৃত পচনোন্মুখ রেড়ীর খৈল ৵০ ছটাক দিয়া চারা বসাইয়া সেচ দেওয়া ও পরে অন্যান্য পাইট করা ও খৈল দেওয়া হইবে।

এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে উপরোক্ত রূপে চূণ ব্যবহার করায় ইক্ষুর পক্ষে কোন ক্ষতি হইবে কি না?

চূণ ব্যবহার সম্বন্ধে আমার উদ্দেশ্য এই যে—

(১) যে আটাল মাটি উপরে উঠিয়াছে চূণের গুণে তাহা আল্গা হইবে ও তাহা হইতে বদ্ধ জোর খুলিয়া যাইবে।

(২) মাটি গভীর ভাবে খনন করা হইয়াছে হঠাৎ অত্যধিক বৃষ্টি হইলে জমিতে তলার জল সঞ্চয় হইয়া ফসলের ক্ষতি হইতে পারে, চূণ তেজস্কর ও জল শোধক, ঐ ক্ষতি নিবারণে সাহায্য করিবার সম্ভব।

উত্তর—

মাটি যে রকম বারম্বার কোপান ও কর্ষণের কথা বলিয়াছেন এত অত্যধিক বার কোপান ও কর্ষণের আবশ্যক নাই। বর্ষা শেষে "যো" থাকিতে জমিটি কোদাল দ্বারা কোপাইয়া একবার লাঙ্গল, মৈ দিলে জমির ঢিল ঢেলা সমস্ত ভাঙ্গিয়া যাইবে, যদি একান্ত না যায় তবে কাঠ বা লোহার দণ্ড দ্বারা ঢিল ঢেলা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। এই সময় এক সঙ্গে সার গোময়, নূতন মাটি ও চূণ ছিটাইয়া জমিটি চষিয়া মৈ দিয়া সমতল করিয়া লইতে

হয়। ইক্ষুচারা বসাইবার সময় রেড়ীর খৈলের তরল সার দিবার আবশ্যক নাই। চারা গজাইলে সার দিয়া গোড়ার মাটি টানিয়া দিয়া সেচ দিতে হয়। সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, সময় মত সব কাজ করিতে হয়। অতি লোভ হেতু অনাবশ্যক কাজ বা বাড়া বাড়ি কোন কাজ করিতে নাই।

এঁটেল মাটি নরম করিতে চূণের আবশ্যক, সার গলাইতেও চূণের প্রয়োজন। কিন্তু মনে থাকে যেন যে জমিতে চূণ প্রায়ই থাকে, জমিতে চূণের অভাব বোধ করিলে তবে চূণ দিবে। অত্যধিক চূণ ব্যবহারে ক্ষতি আছে।

জমিতে চূণ দিলে আখে মাজরা ধরা বা ধসাধরা রোগের প্রতিকার হয় না। সে রোগের বীজ, বীজ ইক্ষুতে থাকে। চূণ অনেক কীটাদির প্রতিষেধক বটে। ধসাধরা বা মাজরা ধরা রোগের প্রতিকার করিতে হইলে নি-রোগ বীজ ইক্ষুর সন্ধান করিতে হইবে এবং সেগুলি তুঁতের জলে কিছু কাল ডুবাইয়া রাখিয়া তার পর ক্ষেতে বসাইতে হইবে।

গোলফল পাট বীজ—

শ্রীভুজঙ্গভূষণ গোস্বামী, পোষ্ট গোকর্ণপুর, যদুপুর। মুর্শীদাবাদ।

এবার ফাইবার একস্ পাট ফিনলো সাহেব আমাদের এখানকার চাষীদের গোল-ফলের পাটবীজ লইবার জন্য আমাকে প্রবৃত্তি দিতে অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় কৃষকেরা ঐ বীজ লইতে অসম্মত। আপনার নিকট এ রকম বীজ পাওয়া যায় কি না যাহা ৩।৪ হাত বাণের জলে কাতর না হয় লিখিবেন। "ডোরাদার মারিচ" আখে সার কি দিবে? আমাদের এখানে পুড়ী ও কাজলী আখে বিঘায় মাত্র ৬০।৭০ মণ গোবর সারে উৎকৃষ্ট গুড় ১০, মণ বিঘায় ফলে, জমি খুব উর্ব্বরা। পত্রোত্তরে বাধিত করিবেন।

উত্তর—

তিনি বলিতেছেন যে তন্তুতত্ত্ববিদ্ (Fibre Expert) ফিন্‌লো সাহেব গোলফল পাটেন চাষ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। ইহা ভালজাতীয় পাট বটে, ইহার শাস্ত্রীয় নাম Corchorus Capsularis—জলা জমিতে ইহারও চাষ চলিতে পারে। গাছ যদি এক কালে ডুবিয়া না যায় তবে গোড়ায় ৩।৪ হাত জল জমিলেও ইহার গাছ মরিবে না। বীজ ভারতীয় কৃষি সমিতি হইতে পাইবেন। বর্ত্তমান বর্ষে উক্ত পাটচাষের সময় চলিয়া গিয়াছে।

ডোরাকাটা মরিসস্ ইক্ষু—

আপনার জমি উর্ব্বরা হইতে পারে কিন্তু বিঘায় ৭০।৮০ মণ গুড় উৎপন্ন করে। ইহার ক্ষেত্রে কেবল গোবর সার দিলে চলিবে না, বিঘায় ২।৩ মণ হিসাবে রেড়ীর খৈল দিবেন।

বরিশালে কৃষি-ভবন—

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট বরিশালে কৃষি প্রদর্শন-ভবন খুলিবেন, তাহার উদ্যোগ চলিতেছে,—নানা স্থানে যে সকল উৎকৃষ্ট ফসল জন্মে তাহা এই ভবনে রক্ষিত ও প্রদর্শিত হইবে। (কাশীপুর নিবাসী)

চিরুণীর কারখানা—

লর্ড কারমাইকেল আদেশ করিয়াছেন যে, অতঃপর তাঁহার নিজের জন্য আবশ্যক চিরুণী যশোহরের কারখানা হইতে গৃহীত হইবে। বঙ্গেশ্বরের স্বদেশী প্রীতির পরিচয় আমরা বহুবার পাইয়াছি;—বর্ত্তমান সহানুভূতিও তাঁহার সহৃদয়তাসূচক।

রসায়নিকের বদান্যতা—

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন সম্বন্ধে কয়েকটা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বক্তার সম্মান-বৃত্তি হিসাবে কিছু টাকা দিয়াছিলেন। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র সেই টাকা পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যেন ইহা রসায়নচর্চ্চায় ব্যয়িত হয়। ঈশ্বরানুগ্রহে প্রফুল্লচন্দ্র দীর্ঘজীবী হউন।

কৃত্রিম দুগ্ধ—

ইংরেজীতে একটা প্রচলন আছে অভাব আবিষ্কারের জনয়িত্রী। আজকাল খাঁটী দুধ পাওয়া যেরূপ দুষ্কর হইয়াছে, তাহাতে লোকে যে গব্য দুগ্ধের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম দুগ্ধ আবিষ্কারে স্বতত পরতঃ চেষ্টা করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, সোয়াবিন' নামক এক প্রকার সীম হইতে কৃত্রিম দুগ্ধ প্রস্তুত হইতে পারে। প্রস্তুত প্রণালী এই—সিমগুলিকে কিছুক্ষণ পরিষ্কার জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, তার পর তাহাকে মাত্রানুযায়ী চিনি ও ফসফেট অব পটাস

সহযোগে সিদ্ধ করিতে হয়। কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিলে উহাকে জমাট দুগ্ধের ন্যায় ঘন ও সাদা দেখায়। কি স্বাদে, কি খাদ্য হিসাবে ইহা জমাট দুগ্ধ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। অবশেষে জল মিশাইলে কৃত্রিম দুধ ও খাঁটি দুধে কোন পার্থক্য বুঝা যায় না। আজকাল বাজারে যখন সকল জিনিসেরই নকল বাহির হইয়াছে তখন দুধের নকল না কাটিবে কেন ?

তালের গুড়—

বিহারে বিস্তর তালগাছ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তালের রস হইতে কি উপায়ে গুড় প্রস্তুত হয় বিহারবাসিগণ তাহা অবগত নহেন। তাই বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের 'কৃষক' পত্রিকায় তালের গুড় প্রস্তুতের কথা আলোচিত হইয়াছে বাঙ্গালায় মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচুর তালগুড় তৈয়ারি হইয়া থাকে। ফলবান্ বৃক্ষেই রসের সঞ্চার অধিক। প্রতিবৎসর ফাল্গুন হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত তালগাছের রস পাওয়া যায়। উল্লিখিত কৃষি পত্রিকায় প্রকাশ,—বিহারে ইতর লোকেরা গুড় প্রস্তুত না করিয়া, তালের রসে তাড়ি জমাইয়া থাকে। তালরসের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে শতকরা বারভাগ শর্করা পাওয়া যায় অর্থাৎ এক সের রসে প্রায় আধপুয়া চিনি প্রস্তুত হইতে পারে। খেজুর রসে শর্করার অংশ এত অধিক নহে। এক একটী তালগাছ হইতে গড়ে বার্ষিক আড়াইমণ গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। তবে তালরস অধিক্ষণ তাজা রাখা সহজ নহে, তজ্জন্য গাছে বাঁধিবার পূর্ব্বে ভাঁড়গুলিকে ভাল করিয়া আগুনে পোড়াইয়া তাহার মধ্যে অল্প চূণের গোলা দিতে হয়। এ প্রক্রিয়া বাঙ্গালার শিউলিগণ ভালরূপ জানে। কৃষিপত্রিকায় প্রকাশ, ইহার পরিবর্ত্তে অতি অল্প মাত্রায় 'ফর্ম্মেলিন' ব্যবহার করিলে আরও সুফল পাওয়া যায়। ফলতঃ একই স্থানে প্রচুর তাল ও খেজুর গাছ থাকিলে বারমাস চিনির কারবার চালান যাইতে পারে।

টাঙ্গাইলে অন্নকষ্ট—

টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বাথুয়াজানী গ্রামে অনেক কর্ম্মকারের বাস। এবার তাহাদের ব্যবসা প্রায় বন্ধ বলিলেই হয়। যা কিছু উপার্জ্জন করে তাহা দ্বারা তাহাদের আহারের সংস্থান হইতেছে না। কর্ম্মকারবর্গ বহু কষ্টে দিন কাটাইতেছে। কেহ একাহারে, কেহ অনাহারে থাকিতেছে। রজনী এবং রাধাকৃষ্ণ কর্ম্মকারের অবস্থা এমনতরী শোচনীয় যে ইতিমধ্যে তাহারা ২ দিন উপবাস ছিল। আলিসাকান্দা গ্রামের ২ জন যুবক তাহাদের অবস্থা অবগত হইয়া অর্দ্ধ মণ চাউল সাহায্য করিয়াছেন। যুবকদ্বয় অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ইহা দ্বারা কর্ম্মকারদ্বয় ৩ দিন চালাইয়াছে

এইরূপ দুর্দ্দশা এখানে অনেকের হইয়াছে—লজ্জার ভয়ে অনেকে তাহা প্রকাশ করে না। চাউলের দর খুব চড়িয়া গিয়াছে, সমস্ত দ্রব্যই অগ্নিমূল্য—আলিসাকান্দ। সেবক সম্প্রদায় অনাহারক্লিষ্টদিগের তত্ত্বাবধান করিতেছেন কিন্তু তাঁহাদের কোন তহবিল নাই তাঁহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, এবার ভিক্ষা দিবার লোকের অভাব।

এবার এ অঞ্চলে আম নাই। এক শ্রেণীর পতঙ্গ আসিয়া আম গাছের পাতা খাইয়া ফেলিয়াছিল। আম থাকিলে বহু লোক আম খাইয়া বাঁচিত।

এতদিন বৃষ্টি না হওয়াতে আবাদের পক্ষে বড় অসুবিধা হইয়াছিল। কয়েক দিন হইল বেশ সুবৃষ্টি হইয়াছে।

বাগানের মাসিক কার্য্য

আষাঢ় মাস।

সব্জীবাগ।—শীতের চাষের জন্য এই সময় প্রস্তুত হইতে হইবে। আমন বেগুনের তলা ফেলিতে হইবে। এই সময় শাকাদি, সীম, লঙ্কা, শাতের শসা, লাউ, বিলাতী বেগুন পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই সালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী বীজ বপন করিতে হইবে।

পালম্ শাক, টমাটোর জল্দি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতি সব্জী বীজ বপনের এখনও সময় হয় নাই।

মকাই (ছোট মকাই) এবং দে-ধান চাষের এই সময়।

হলুদ, আদা, জেরুজালেম, আর্টিচোক, এরোরুট প্রভৃতির গোড়ায় মাটি দিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। দাঁড়া বাঁধিয়া দিলে গাছগুলির বৃদ্ধি হয় এবং গাছগুলি জলে গোড়া আল্গা হইয়া পড়িয়া যায় না।

ফুলবাগিচা।—দোপাটি, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা) এমারন্থস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম (Sunflower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুলবীজ লাগাইবার সময় এখন গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

গোলাপ, জবা, বেল, যূঁই প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষের কাটিং করিয়া চারা তৈয়ার করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, যূঁই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ফলের বাগান—বর্ষা নামিলে আম, লিচু, পিয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ বসাইতে হয়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন—

ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়, কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া শিকড় পচিয়া না যায়। আম, লিচু, কুল, পিচ, নানা প্রকার লেবু গাছের গুল কলম করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এই সময় কলম করা যাইতে পারে। এই প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের ঝোকা বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পিচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারী করিতে হয়। পেঁপে বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বর্ষার জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি খোঁড়া উচিত, এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। হাড়ের গুঁড়াও এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ, যথা—শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

যাঁহারা বেড়ার বীজ দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন, তাঁহারা এই বেলা সবেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তুর মত গজাইয়া উঠিবে।

শস্যক্ষেত্রে—কৃষকের এখন বড় মরশুম, বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বেহার উড়িষ্যা ও আসামের কতকস্থানে কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড়ই ব্যস্ত। পাট বোনা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন স্থানে পাট তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। তথা হইতে নূতন পাট এই সময় বাজারে আমদানী হয়। দক্ষিণ বঙ্গে পাট কিছু নাবি হয়, কিন্তু এখানেও পাট বুনিতে আর বাকি নাই। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষ হইয়া যায়।

বর্ষাকালে ঘাস এবং আগাছা ও কুগাছার বৃদ্ধি হয় সুতরাং এখন সব্জী ক্ষেতে মধ্যে মধ্যে নিড়ানি দেওয়া উচিত। ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক। ফলের বাগানের আগাছা কুগাছাগুলি উপড়াইয়া তুলিয়া দিলে ভাল হয়। আগাছাগুলির বীজ পাকিয়া মাটিতে পড়িবার পূর্ব্বে তাহাদের বিনাশ করিতে পারিলে তাহাদের বংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না।

পার্ব্বত্য প্রদেশে কপি চারা ক্ষেত্রে বসান হইতেছে। পূজার পূর্ব্বেই পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে কলিকাতায় কপি, কড়াইশুঁটী প্রভৃতি আমদানি হয়।

এই সময় পার্ব্বত্য প্রদেশে সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, কস্মকোম্ব, কেপ গাঁদা, দোপাটী প্রভৃতি ফুল বীজ বপন করা হইতেছে।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি-বিষয়ক মাসিক পত্র

ষোড়শ খণ্ড,—৩য় সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্

আষাঢ়, ১৩২২

কলিকাতা; ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৬২নং বহুবাজারষ্ট্রীট, শ্রীরাম প্রেস হইতে
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষক তৃক মুদ্রিত।

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকের" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৴৹ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

KRISHAK.

Under the Patronage of the Governments of Bengal and E. B. and Assam.

THE ONLY POPULAR PAPER OF BENGAL

Devoted to Gardening and Agriculture. Subscribed by Agriculturists, Amateur-gardeners, Native and Government States and has the largest circulator.

It reachers 1000 such people who have ample money to buy goods.

Rates of Advertising.

1 Full page Rs. 3-8. 1 Column Rs. 2.

½ Column Rs. 1-8

MANAGER—"KRISAK."

162, Bowbazar Street, Calcutta.

বিজ্ঞাপন।

আমার তত্ত্বাবধানে উৎপন্ন ১০০৲ মণ উৎকৃষ্ট পাটের বীজ বিক্রয়ের জন্য মজুত আছে। সাধারণ বীজ অপেক্ষা এই বীজের ফলন বেশী। দাম প্রতি মণ ১০৲ টাকা। বীজের শতকরা অন্ততঃ ৯৫টী অঙ্কুরিত হইবে। যাহার আবশ্যক তিনি ঢাকাফার্ম্মে মিঃ কে, ম্যাকলিন্, ডেপুটী ডাইরেক্টার অব এগ্রিকালচার সাহেবের নিকট সত্বর আবেদন করিবেন।

আর, এস, ফিনলো

ফাইবার এক্সপার্ট, বেঙ্গল।

কৃষি সহায় বা Cultivators' Guide.—শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী দত্ত M.R.A.S., প্রণীত। মূল্য ৷৷৹ আট আনা। ক্ষেত্র নির্ব্বাচন, বীজ বপনের সময়, সার প্রয়োগ, চারা রোপণ, জল সেচন ইত্যাদি চাষের সকল বিষয় জানা যায়।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, কলিকাতা।

Sowing Calendar বা বীজ বপনের সময় নিরূপণ পত্রিকা—বীজ বপনের সময় ক্ষেত্র নির্ণয়, বীজ বপন প্রণালী, সার প্রয়োগ ক্ষেত্রে জল সেচন বিধি জানা যায়। মূল্য ৵৹ দুই আনা। ৵১০ পয়সা টিকিট পাঠাইলে—একখানি পত্রিকা পাইবেন।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, কলিকাতা।

শীতকালের সজী ও ফুলবীজ—দেশী সজী বেগুন, ঢেঁড়স, লঙ্কা, মূলা, প্লাটনাই ফুলকপি, টমাটো, বরবটি, পালমশাক, ডেঙ্গো প্রভৃতি ১০ রকমে ১ প্যাক ১৵৹; ফুলবীজ আমারান্থস, বালসাম, গ্লোব আমারান্থ, কর্ণফ্লাউয়ার গাঁদা, জিনিয়া সেলোসিয়া, আইপোমিয়া, কৃষ্ণকলি প্রভৃতি ১০ রকম ফুলবীজ ১৵৹;

নাবী—পাহাড়ি বপনের উপযোগী বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, বীট ৪ রকমের এক প্যাক ৷৹ আট আনা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন কলিকাতা।

সার !! সার !! সার !!

গুয়ানো।

অত্যুৎকৃষ্ট সার। অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয়। ফুল, ফল, সজীর চাষে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। অনেক প্রশংসা পত্র আছে। ছোট টিন সায় মাশুল ৷৵৹ বড় টিন ১৷৹ আনা।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

১৯১৫ সালের ৪ আইন আমরা ভারতগভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উক্ত আইনের প্রতিলিপি প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান যুদ্ধ যতদিন চলিবে ততদিন ও তাহার পরে আরও ছয় মাসকাল পর্য্যন্ত এই আইন বলবত থাকিবে। সাধারণের বিপন্নিবারণ ও ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের শান্তিরক্ষার নিমিত্ত এই আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। মিথ্যা বা ভয়াবহ বা অসন্তোষজনক সংবাদ রটনা দ্বারা কিম্বা কার্য্যতঃ দেশের শান্তির ব্যাঘাত উৎপাদন করিলে দোষী ব্যক্তির কি প্রকারে দণ্ডবিধান করা হইবে তাহারই বিধি ব্যবস্থা হইয়াছে।

কৃষক।

সূচীপত্র।

আষাঢ় ১৩২২ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৬শ খণ্ড। { আষাঢ়, ১৩২২ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

উদ্ভিদ দেহে আলোকের প্রভাব

শ্রীশশি ভূষণ সরকার লিখিত

সূর্য্যালোক উদ্ভিদদেহের পোষোণোপযোগী শক্তি সমুচয়ের সংশ্রবে আসিয়া উদ্ভিদের জীবনী শক্তির সহয়তা করে। সচারচার দেখা যায় যে প্রায় সকল উদ্ভিদই সচ্ছন্দে বাড়িতে থাকে এবং আপনার দৈহিক সৌন্দয্য বিস্তার করিয়া মনুষ্য পশুপক্ষীর মন হরণ করে। কোন একটি উদ্ভিদকে দুইচারি দিবস আলোকান্তরালে রাখিলে ইহার বিপরীত ক্রিয়া দৃষ্ট হয়, দেখিতে দেখিতে তাহারা হরিৎ আভা বিবর্জ্জিত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কোন কোন উদ্ভিদ আবার এমন আছে যে তাহারা সূর্য্যের প্রখর আলোক সহ্য করিতে পারে না। অল্পালোকে ছায়াযুক্ত স্থানে তাহারা বেশ বাড়িতে থাকে এবং এই অবস্থায় তাহারা তাহাদের সৌন্দর্য্য অক্ষুন্ন রাখিতে পারে; দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা কয়েক জাতীয় পাম, ফার্ণ, অর্কিড, নানা জাতীয় বন্যলতার নাম উল্লেখ করিতে পারি। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে আলোকে উদ্ভিদের উত্থান হয় বটে আবার প্রয়োজানাতিরিক্ত আলোকে তাহাদের ধ্বংশ হয়। প্রয়োজনোপযোগী আলোক না পাইলে উদ্ভিদ জগতে হাহাকার পড়িয়া যায়, আবার অত্যধিক আলোকের প্রভাব উদ্ভিদ অকাতরে সহ্য করিতে পারে না। প্রয়োজনপোযোগী আলোক তাহাদের গঠন ক্রিয়ার সহায়, অতিরিক্ত আলোক তাহাদের ধ্বংশের মূল। উদ্ভিদের পত্র হরিৎ or chlorophyl অত্যধিক উত্তাপে আপনার কার্য্য করিতে অক্ষম এবং যে শক্তির উদ্বোধনে উদ্ভিদের গঠন ক্রিয়া সংসাধন হয় সে শক্তি আর জন্মিতে পারে না।

সকলেই দেখিয়াছেন যে উদ্ভিদগণ পত্র দ্বারা আলোক রশ্মি পান করিবার জন্য সর্ব্বদাই আলোকের দিকে চাহিয়া থাকে। পাতার উপরিভাগেই বৃক্ষলতাদের চোখ থাকে এই জন্য পাতার উপর ও নিম্ন ভাগের গঠন কত বিভিন্ন। কোন উদ্ভিদকে গৃহমধ্যে জানালার ধারে সংস্থাপন করিলে প্রায়ই দেখা যায় যে উদ্ভিদ ক্রমশঃ তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জানালার বাহিরের দিকে ঝুলাইবার চেষ্টা করে; ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে আলোকেই তাহাদের জীবন, আলো পাইবার জন্য তাই তাদের এত চেষ্টা।

আলোকের উত্তেজনায় উদ্ভিদ দেহ কত প্রকারের অঙ্গ ভঙ্গি করে। ডাল বাঁকাইয়া হেলিয়া দুলিয়া কখনো তাহারা আলোকের দিকে অগ্রসর হয়, আবার অবস্থা বিশেষে কখনো আলোক হইতে দূরে যাইবার জন্য চেষ্টা করে। রাত্রির অন্ধকারে বা মেঘাবৃত দিনে অনেক গাছের পাতা জোড় বাঁধিয়া জুড়িয়া যায়, আবার আলো পাইলে খুলিয়া যায়। প্রখর সূর্য্যালোকে শিরিষ তেঁতুল প্রভৃতি কতকগুলি বৃক্ষের পাতাকেও রাত্রির ন্যায় সুপ্তাবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। বিজ্ঞান আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদের উপর আলোকের প্রকৃত কার্য্য সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন তাহা এস্থলে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বলিয়া আমরা মনে করি। তাঁহার সহজ সিদ্ধান্তগুলি শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় বেশ সরল ভাষায় বুঝাইয়াছেন। আমরা বহুপূর্ব্বে "প্রবাসী" পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধ হইতে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম। তাপ, বিদ্যুৎ ও নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থের উত্তেজনা-মাত্রেরই উদ্ভিদদেহে প্রভাব এক। বসু মহাশয় আলোকের প্রভাব স্থির করিবার জন্য নানা পরীক্ষাদি করিয়া দেখাইয়াছেন ইহাও প্রায় তাপ ও বিদ্যুৎ প্রভৃতির ন্যায় উদ্ভিদকে সাড়া দেওয়ায়।

"লতানো গাছের ডাঁটার ভূসংলগ্ন অংশে আলোকপাত করিলে, সেটি ধনুকাকারে বাঁকিয়া যায় এবং ধনুর ন্যুব্জ (concavo) পৃষ্ঠ সেই ভূসংলগ্ন অংশের দিকে থাকে। এখন ডাঁটার উপরের অর্দ্ধে (অর্থাৎ যে অংশ দিবসে সূর্য্যালোকে উন্মুক্ত থাকে) পূর্ব্বের মত আলোকপাত কর, এখানেও তাহাকে ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় ভূমির দিকে ন্যুব্জ পৃষ্ঠ হইয়া বাঁকিতে দেখিবে। এই ব্যাপারটি সুখিখ্যাত পণ্ডিত ডি ভ্রায়েসের (De Vries) দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। উদ্ভিদবিদ্ স্যাক্স (Sacks) সাহেবও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, আলোকের উত্তেজনা উপর নীচে যেখানেই দেওয়া যাউক না কেন, ছায়াবৃত নীচের অংশটাকে ন্যুব্জ পৃষ্ঠে রাখিয়া লতানো গাছ বাঁকিয়া যায়।

ডি ভ্রায়েস্ সাহেব পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারে ব্যাখ্যানে বলিয়াছেন,—লতানো গাছের উপরের পৃষ্ঠ অনেক সময় সূর্য্যালোকে উন্মুক্ত থাকে, এবং নীচের অংশ ভূসংলগ্ন থাকায় তাহাতে কখনো আলোক পড়ে না। এই জন্য লতার নীচের ও উপরের পিঠের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। এখন পৃথক ভাবে উপর নীচে আলোকপাত

করিলে, উপরার্দ্ধ যে আলোক হইতে দূরে, এবং নিম্নার্দ্ধ যে আলোকের নিকটবর্ত্তী হইয়া সমগ্র লতাটিকে একই দিকে বাঁকাইয়া দিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

লতার উপরের অংশ অনেক সময় তাপালোকে উন্মুক্ত থাকে, ছায়াবৃত পৃষ্ঠের তুলনায় তাহার কতকগুলি বিশেষত্ব থাকার সম্ভাবনা ঘটে; কিন্তু সেই বিশেষত্ব যে কি, এবং আলোকের উত্তেজনা কি প্রকারে কাজ করিয়া লতার ডাঁটাকে একবার আলোক হইতে দূরে এবং আর একবার আলোকের দিকে টানিয়া লয়, ডি ভ্রায়েস সাহেবের পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যানে তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। সাধারণ লোকে সহজ বুদ্ধিতে যাহা বুঝে, তিনি তাহাই বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করিয়া নিস্কৃতিলাভের চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র।

আলোকপাতে যে কেবল লতার ছায়াবৃত অংশটাই ন্যুব্জপৃষ্ঠ (concave) হয়, তাহা নয়। আচার্য্য বসু মহাশয় নানাজাতীয় গাছের পত্রমূল* (pulvinus) উপর ও নীচে আলোকপাত করিয়া দেখিয়াছেন, এখানেও পাতাগুলির বোঁটা ঠিক্ লতারই মত নীচের দিকে ন্যুব্জ হইয়া পড়ে। সুতরাং লতা পাতা উভয়েরই ন্যুব্জতার কারণ যে এক তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। আচার্য্য বসু মহাশয় পাশ্চাত্য পণ্ডিত-দিগের ন্যায় বৃক্ষের প্রত্যেক অঙ্গকেই বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন বলিয়া মনে না করিয়া, পূর্ব্বোক্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং শেষে আলোকের সহিত ডাল পাতার বক্রতার প্রকৃত রহস্য জানিতে পারিয়াছিলেন।

উদ্ভিদের দিবা নিদ্রা (Diurnal Sleep, or paraheliotropism) পাঠক অবশ্যই দেখিয়াছেন। সন্ধ্যার সময় কতকগুলি গাছের পাতা যেমন বুজিয়া আসে, দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রেও ঐ রকম পাতা বোজা দেখা যায়। ইহাকে উদ্ভিদবিদ্গণ উদ্ভিদের দিবানিদ্রা আখ্যাপ্রদান করিয়াছেন। এই ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া আধুনিক উদ্ভিদবিদ্গণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, কোন ফলই পাওয়া যায় না। স্পষ্টভাষায় বলিতে গেলে, স্বীকার করিতেই হইবে যে, এ পর্য্যন্ত কেহই এই ব্যাপারের কারণ দেখাইতে পারেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডারুইন্ বলিয়াছিলেন,—তীব্র আলোক গাছের পক্ষে অপকারী, তাই তাহারা পাতা গুটাইয়া দ্বিপ্রহরের তীব্র আলোকের অপকারের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে। ডারুইনের এই ব্যাখ্যান কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা পাঠক বিবেচনা করুণ, এবং ঐ উক্তিটি ব্যাখ্যান পদবাচ্য হইতে পারে কিনা তাহাও দেখুন।

---

* লজ্জাবতী শিরিষ প্রভৃতি অধিকাংশ সুটি-ওয়ালা গাছের পাতা যেখানে শাখার সহিত সংলগ্ন থাকে, সেই স্থানে Pulvinus নামক এক বিশেষ অঙ্গ দেখা যায়। ইহার উৰ্দ্ধ ও নিম্নার্দ্ধ সমান উত্তেজনাশীল। পূর্ব্বোক্ত গাছগুলির পাতার উঠানামা ইত্যাদি ব্যাপার ঐ Pulvinus এর দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। আমরা পত্রের ঐ বিশেষ অঙ্গটিকে "পত্রমূল" নামে অভিহিত করিতেছি।

এখন আচার্য্য বসু মহাশয় ডালপাতার উল্লিখিত নানা প্রকার বাঁকাচোরার কি কারণ নির্দ্দেশ করেন দেখা যাউক। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, লাউ বা কুমড়া প্রভৃতি লতানো গাছের চারাকে সূর্য্যরশ্মির অন্তরালে রাখিলে, প্রথম দিন কতক সেটি সাধারণ গাছের ন্যায় খাড়া হইয়া বাড়িতে থাকে। কিন্তু ইহার পর ভারাধিক্য প্রযুক্ত বা বায়ুর আঘাতে গাছটি একবার ধরাশায়ী হইলে, তখন লতারই মত তাহাকে শায়িত অবস্থায় বাড়িতে দেখা যায়। আচার্য্য বসু মহাশয় বলেন, গাছ যখন শুইয়া পড়ে, তখন তাহার প্রত্যেক ডাঁটার উপরকার অংশটা সূর্য্যালোক উন্মুক্ত থাকায়, এই অংশের উত্তেজনশীলতা অনেক কমিয়া আসে। কাজেই উপরার্দ্ধের তুলনায় নিম্নার্দ্ধ সাধারনতঃ অধিক উত্তজনশীল হইয়া পড়ে।

মনে করা যাউক, পূর্ব্বোক্ত একটি ডাঁটার উপরার্দ্ধে আলোকপাত করা গেল। এখানে উপরটা অল্প উত্তেজনশীল বলিয়া আলোকের উত্তেজনা তাহার বৃদ্ধির কোনও পরিবর্ত্তন করিল না, এবং প্রকৃত উত্তেজনাটি আড়াআড়ি ভাবে অধিক উত্তেজনশীল নিম্নার্দ্ধে পৌছিয়া, সেখানকার বৃদ্ধি রোধ করিয়া দিল। কোন জিনিষের এক অংশ যদি অপর অংশের তুলনায় অধিক প্রসারণশীল হয়, তবে এই অসম প্রসারণের দ্বারা সেটিকে ধনুকাকারে বাঁকিয়া যাইতে দেখা যায়। ধনুর ন্যুব্জ পৃষ্ঠ (Concave) অল্পপ্রসারণশীল অংশের দিকে থাকে। এখানে ডাঁটাটির অবস্থা এই প্রকারই হওয়ার সম্ভাবনা। কারণ উহার উপরার্দ্ধের বৃদ্ধি প্রায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এখানে কেবল নিম্নার্দ্ধেরই বৃদ্ধি কমিয়া আসিতেছে, কাজেই লতাটির ধনুকাকারে বাঁকিয়া যাওয়া ব্যতীত আর উপায় নাই।

এখন মনে করা যাউক, লতার অধিক উত্তেজশীল নিম্নার্দ্ধের উপর যেন নীচে হইতে আলোক পাত করা গেল। বলা বাহুল্য আলোকের উত্তেজনা প্রাপ্তি মাত্র, ঐ অংশের বৃদ্ধি রোধ প্রাপ্ত হইবে, এবং প্রকৃত উত্তেজনা নীচে হইতে উপরদিকেও আড়াআড়ি ভাবে চলিয়াও, অসাড় উপরার্দ্ধকে উত্তেজিত করিতে পারিবে না। কাজেই এখানেও নিম্নার্দ্ধের বৃদ্ধি রোধ হওয়ায়, লতাটি ঠিক পূর্ব্বের ন্যায়ই ধনুকাকারে বাঁকিয়া যাইবে।

কুমড়া ও লজ্জাবতী প্রভৃতি গাছের শায়িত শাখার উপরে ও নীচে সুকৌশলে আলোকপাত করিয়া, শাখার বক্রতার পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যান যে অভ্রান্ত তাহা আচার্য্য বসু মহাশয় নানা পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। তা ছাড়া ক্ষেত্রজ লতাগাছের ডাঁটা প্রভাতসূর্য্যের আলোক পাইয়া, পরে আলোকের প্রখরতা অনুসারে কি ভাবে বাঁকিয়া আসে, তাহাও তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন; এবং এই সকল পর্য্যবেক্ষণের ফল তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই পোষণ করিয়াছে।"

উদ্ভিদের দিবানিদ্রার কারণ প্রসঙ্গে আচার্য্য বসু মহাশয় কি বলেন, দেখা যাউক। এই ব্যাপারটি বুঝিবার পূর্ব্বে দুইটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক।

১ম। যদি উদ্ভিদের কোন অঙ্গের এক অংশ অপর অংশ অপেক্ষা অধিক উত্তেজন-

শীল হয়, এবং উহাদের উত্তেজনা পরিবাহন শক্তি খুব প্রখর থাকে, তবে যে কোন অংশে আলোক পাত করা যাউক না কেন, সেটি ধনুকাকারে বাঁকিয়া যাইবে ও ধনুর ন্যুব্জ পৃষ্ঠে অধিক উত্তেজনশীল অংশটা থাকিবে।

২য়। উদ্ভিদদেহের পরিবাহন শক্তি অল্প হইলে যে অংশটিতে উত্তেজনা প্রয়োগ করা যায়, কেবল সেটিকেই ধনুর ন্যুব্জ পৃষ্ঠে দেখা যাইবে।

আচার্য্য বসু মহাশয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে সকল উদ্ভিদ দ্বিপ্রহরে পাতা গুটাইয়া নিদ্রিত হয়, তাহারা সকলেই পত্রমূলযুক্ত (Pulvinated) বৃক্ষ। ইহাদের প্রত্যেক পত্রমূলেরই নিম্নার্দ্ধ উপরার্দ্ধ অপেক্ষা অধিক উত্তেজনশীল। বসু মহাশয় প্রথমে পালিতা মাদার (Erythrina Indica) গাছের ছোট ছোট পাতার নিমীলন লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল, ইহার পত্রমূলের উত্তেজনা পরিবাহন শক্তি তত অধিক নয়। সুতরাং দ্বিপ্রহরে সূর্য্যালোক যখন উহার উপরের অংশে আসিয়া পড়ে, তখন তাহা আড়াআড়ি ভাবে চলিয়া অধিক উত্তেজনশীল নিম্নার্দ্ধে পৌছিতে পারে না, কাজেই উপরার্দ্ধই বক্র হইয়া পড়ে এবং ইহার ফলে পাতাগুলি মাথা উঁচু করিয়া জোড় বাঁধিতে আরম্ভ করে। পালিতা মাদার গাছ ছাড়া, আরো যে সকল গাছের পাতা ঊর্দ্ধ মুখে জোড় বাঁধিয়া ঘুমায়, তাহা লইয়াও আচার্য্য বসু মহাশয় পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং এই শ্রেণীর গাছ মাত্রেরই পত্রমূলের পরিবাহন শক্তির মাত্রা অতি অল্প দেখা গিয়াছিল। অপরাজিতা লতা (Clitoria Ternatea) এই শ্রেণীভুক্ত। দিবালোকের উত্তেজনায় ইহার পত্রমূল বাঁকিয়া গিয়া পাতাগুলিকে কি প্রকারে উঁচু করিয়া তোলে, পাঠক যে কোন দিন একটি গাছের পাতা পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। আকাশের যে স্থানে সূর্য্য অবস্থান করে, অনেক সময় অপরাজিতা পাতাগুলি সেই দিকে মুখ রাখিয়া জোড় বাঁধিবার চেষ্টা করে।

প্রখর সূর্য্যালোকে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া জোড় বাঁধা কেবল কতকগুলি গাছেরই দেখা যায়, ইহা ছাড়া অধিকাংশ পত্রমূলযুক্ত গাছের পাতাই নীচে নামিয়া জোড় বাঁধিতে চেষ্টা করে। এখন এই শেষোক্ত ব্যাপারের কারণ কি দেখা যাউক। আচার্য্য বসু মহাশয় বলেন, এই সকল গাছের পত্রমূলের পরিবাহনশক্তি অত্যন্ত অধিক। এজন্য পত্রমূলের উপরে যে সূর্য্যালোক পড়ে, তাহা আড়াআড়িভাবে বাহিত হইয়া উহার নিম্নার্দ্ধে পৌছিতে পায়। কিন্তু পত্রমূল মাত্রেরই নিম্নার্দ্ধে উত্তেজনশীলতা উপরের তুলনায় অত্যন্ত অধিক, কাজেই এস্থলে পাতাগুলি সঙ্গে লইয়া পত্রমূলগুলি নীচের দিকে নামিতে আরম্ভ করে। আলোকরশ্মি কেবল প্রত্যক্ষ ভাবে আসিয়া পড়িলেই যে গাছের পাতা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নামিয়া পড়ে, তাহা নয়, দূরের আলোক বিক্ষিপ্তভাবে আসিয়া ঐ অঙ্গে লাগিলেই; পাতা গুটাইতে আরম্ভ করে। কারণ বিক্ষিপ্ত আলোক পত্রমূলের উপর নীচে সমভাবে পড়িয়া, উত্তেজনাশীল নিম্নার্দ্ধের উপরেই অধিক কার্য্যকারী হয়, এবং তাহাতে ঐ অংশেরই বৃদ্ধি

রোধ করিয়া সেটিকে নীচের দিকে বাঁকাইয়া দেয়। আমরুল (oxalis) লজ্জাবতী ও শিরিষ প্রভৃতি গাছের পাতা খুব রৌদ্রের সময় পরীক্ষা করিলে, পাঠক ইহাদের পূর্ব্ববর্ণিত দিবা নিদ্রা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। প্রাতে রৌদ্র উঠিবা মাত্র এ সকল পাতা গোটানো দেখা যায় না, কারণ পত্রমূল পরিবাহক্ষম হইলেও আলোকপাত মাত্র তাহার উত্তেজনা নীচে পৌঁছিতে পারে না। বহুক্ষণ আলোকপাতের পর সেই উত্তেজনা ধীরে ধীরে নীচে গিয়া পৌঁছায়, এবং তখনি গাছের পাতা নীচে নামিয়া জোড় বাঁধিতে আরম্ভ করে।

পূর্ব্ব-বর্ণিত তথ্যগুলি ছাড়া, উদ্ভিদের স্বাভাবিক নিদ্রা (Nyctritopism) ও আলোকপাতে পাতার নানাপ্রকার আকার পরিবর্ত্তন প্রভৃতি ব্যাপারের অতি সুন্দর ব্যাখ্যান আচার্য্য বসু মহাশয়ের প্রসাদে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল বিষয়ের সংব্যাখ্যান এ পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিকই দিতে পারেন নাই, এবং অনেকে এগুলিকে প্রকৃতির দুর্ভেদ্য রহস্য বলিয়া স্পষ্টই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। আচার্য্য বসু মহাশয় উদ্ভিদ তত্ত্বের ঐ সকল বৃহৎ সমস্যাগুলির কি প্রকার সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিলে প্রকৃত আনন্দ অনুভব হয়।

ধান্যের ফলন বৃদ্ধি—ধান্য ক্ষেতে সার প্রদান

ভারতীয় কৃষি সমিতির উদ্যান তত্ত্ববিদ

শ্রীশশি ভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত

ধান সম্বন্ধে আমরা বিগত বর্ষের "কৃষকে" বহুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু তাহাও পর্য্যাপ্ত বলিয়া আমাদের বোধ হয় না, কারণ ধানই যে ভারতবাসীর একমাত্র ধন—ধানই যে তাহাদের জীবন। দুরদেশাগত কোন আত্মীয় বা বন্ধুর সহিত প্রথম সাক্ষাত হইলে প্রথম প্রশ্ন হইতেছে যে, ধান কেমন জন্মিয়াছে বল। পূর্ব্বকালের প্রথাও এই ছিল—তাঁহারাও বলিতেন "ধানস্য কুশলং বদ"।

. দেশে ভালরূপ ধান জন্মিলে তবে সমগ্র প্রজার কুশল হয়। সেই ধান চাষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয় ইহাই সকলের বাসনা। ধান চাষের রোপণ প্রণালী, ধান চাষের কৌশল, স্বদেশী বিদেশী ধান চাষের প্রথা সম্বন্ধে আমরা কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে ধানের ফলন বৃদ্ধির উপায় চিন্তা করিয়া দেখা যাক আমাদের চেষ্টা কতটুকু
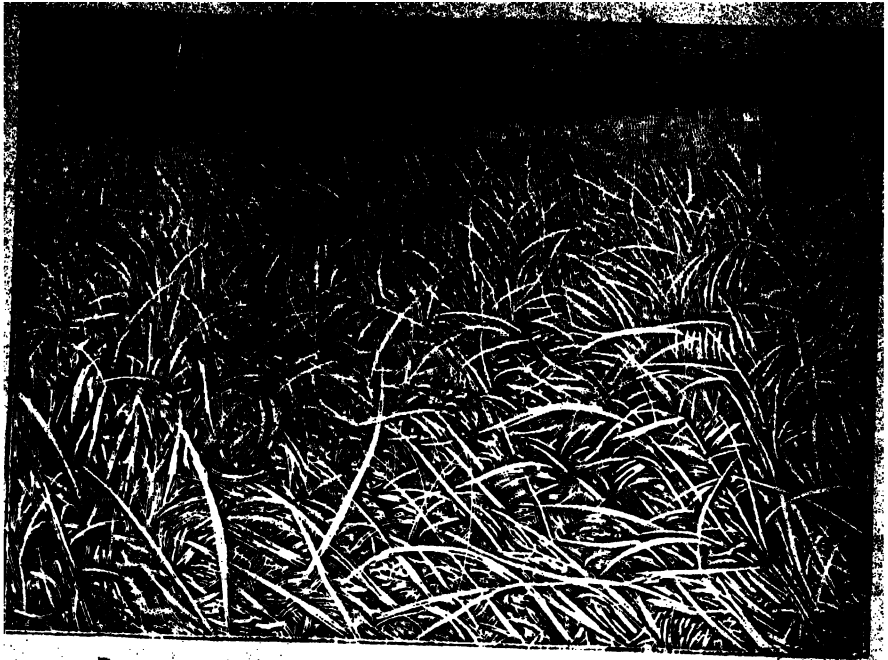
ক্ষেতটিতে কেবল মাত্র হাড় সার দেওয়া হইয়াছে। ধানের গাছের ও পাতার বৃদ্ধি বেশ হইয়াছে কিন্তু তাদৃশ শীষ উদ্গম হইতে দেখা যাইতেছে না।

ধানের ক্ষেতটি সম্পূর্ণসার, গোময় সার, হাড়ের গুঁড়া ও সোরা দ্বারা সারবান করা হইয়াছে। গাছ গুলির গঠন দৃঢ় হইয়াছে, শীষ উদ্গম হইতেছে। গাছ যেমন সতেজ হইতেছে তেমনি থোড় লইয়া উঠিতেছে।

ফলবতী হইতে পারে। অধিকাংশ ধানই জলা জমিতে হয়, ফল কথা সমধিক সরস জমি না হইলে কোন ধানই ফলবান হয় না। এখানে আমাদের আর্য্য কৃষির একটি বচন মনে পড়িল। "আশ্বিনে কার্ত্তিকে চৈব ধানস্য জল রক্ষণম। ন কৃতং যেন মূঢ়েন তস্য কা শস্য বাসনা॥ ধান ক্ষেতে জল রক্ষা করা ধান্যের বৃদ্ধির প্রধান উপায়। মিহি, মোটা হিসাবে বিভিন্ন প্রকার ধানের ক্ষেতে কম বেশী জল রক্ষা করা আবশ্যক।, মোটা ধানের গোড়ায় অধিক জল থাকা প্রয়োজন কিন্তু মিহি ধানের জমি কিঞ্চিৎ সিক্ত বা সরস থাকিলেই চলে।

গুচ্ছ মূল উদ্ভিদ মাত্রেই আবাদের জন্য জমির উপরিভাগ বিশেষ রূপে কর্ষিত হওয়া আবশ্যক। ইহাদের শিকড় নরম, কঠিন মৃত্তিকা ভেদকরা এই সকল শিকড় দ্বারা অসম্ভব। ইহারা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে অধিক দূরও শিকড় চালায় না। ৯ ইঞ্চ হইতে ১ ফুটের মধ্যে ইহাদের শিকড় অবস্থান করে সুতরাং ধান চাষের জমিতে ভাসা ভাসা চাষ দিয়া জমিটি আল্‌গা রাখার প্রয়োজন হয় এবং বারম্বার চাষ দিয়া জমিটি নিস্তৃণ না করিলে ধানের আহার, ঘাষে ও বনে খাইয়া ফেলিলে ধান গাছ গুলি কি খাইবে এবং কি খাইয়া শস্য প্রসব করিবে ইহাই সমস্যা হইয়া পড়ে। খণার বচনে বলে "শতেক চাষে মূলা, তার অর্দ্ধেক তূলা, তার অর্দ্ধেক ধান"। এত অধিকবার না হউক ধানের ক্ষেতটি শীত, গ্রীষ্মে দশ বার বার চাষ দিতে পারিলে জমির মাটি আল্‌গা ত হয়ই অধিকন্তু রৌদ্র বাতাস পাইয়া জমি সারবান হইয়া উঠে ও ঘাষাদি তৃণের মূলচ্ছেদ হয়। যে সকল ক্ষেতের এইরূপ চাষ কারকিত হয় সেই ক্ষেতের ধানের ফলন বাড়িয়া থাকে।

ক্ষেতে সার প্রদান করা ধান্যের ফলন বৃদ্ধির অন্যতম উপায়—

আমাদের দেশে সার বলিলেই আমরা গোময় সারই বুঝি,—ইহা বাস্তবিকই সারের রাজা কারণ ইহাতে নাইট্রোজেন, ফস্ফরিক অম্ল, পটাস প্রভৃতি উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য গুলি অল্লাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। এই সার প্রয়োগে আরও একটা উপকার এই যে ইহা দ্বারা মৃত্তিকার স্বাভাবিক গঠনের পরিবর্ত্তণ হয়, অতি কঠিন নিরস মৃত্তিকাও গোময় প্রদানে আল্‌গা ও সরস হয়। এই কারণেই আর্য্য ঋষিগণ গোময়ের এত গুণ কীর্ত্তণ করিয়াছেন এবং কিরূপ যত্নে গোময় রক্ষা করিতে হয় তাহার উপদেশ দিয়াছেন। আধুনা চাষীরা কিছু বিলাসী হইয়া পড়িয়াছে, তাই আজ সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে সার সংরক্ষণ বিষয়ে যত্ন করিতে তাহাদিগকে বারম্বার বলিতে হইতেছে।

গোময় যে অতি যত্নের জিনিষ তাহা নিম্নোদ্ধৃত কৃষি শাস্ত্রীয় শ্লোক হইতে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়। ভারতে কৃষকের এমন সহজলভ্য, সুলভ ও পরম হিতকর সার একটিও নাই। শাস্ত্রকারেরা বহু পূর্ব্বে তাহার সন্ধান পাইয়াছেন। শাস্ত্রে আছে—

মাঘে গোময় কূটন্তু সংপূজ্য শ্রদ্ধায়ান্বিতঃ।
সারং শুভদিনং প্রাপ্য কুদ্দালৈস্তোলয়েৎ ততঃ॥

রৌদ্রে সংশোষ্য তৎসর্ব্বং কৃত্বা গুণ্ডকরূপিণম।
ফাল্গুনে প্রতিকেদারে গর্ত্তং কৃত্বা নিধাপয়েৎ ॥
ততো বপন কালেতু কুর্য্যাৎ সার বিমোচনম্।
বিনা সারেণ যদ্ধান্যং বর্দ্ধতে ন ফত্যপি ॥

বিনা সারে ধান গাছ বাড়িলেও তাহাতে ফল হয় না। অনেকে বলিতে পারেন যে সে কালে অন্য অন্য কোন সার মিলিত না, তাই গোময়ের এত আদর ছিল। খণিজ অনেক সারের কথা তখন ভাবিবার অবসর আসে নাই বটে কিন্তু গোময় ব্যতীত হাড় প্রভৃতি সারের সন্ধান লোকে রাখিত এবং গাছ ফলবান করিবার জন্য গাছের গোড়ায় হাড় পুতিয়া দেওয়া কিম্বা উদ্ভিদ অঙ্গে হাড় বাঁধিয়া দেওয়ার প্রথা অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। এখন যত কিছু সারের আবিষ্কার হইতেছে তাহার কোনটি সংগ্রহ করা অল্প ব্যয় সাধ্য নহে এবং একাধারে এত গুণ, গোময় ব্যতীত অন্য কোন সারের দেখা যায় না। শস্যোৎপাদন ও উদ্ভিদ পালন করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে গোপালনের আবশ্যক। গো-বল ব্যতীত আমাদের ক্ষেত্রাদির চাষ কারকিৎ সহজে সুসম্পন্ন হয় না এবং তাহাদের মলমূত্র ব্যতীত ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা সহজ সাধ্য হয় না। এই কারণে ধানের ফল বৃদ্ধির কথা বলিতে বসিয়া গোময় সার সমন্ধে এত কথার অবতারনা করিলাম।

ধান্য ক্ষেত্রে গোময় কিম্বা গোময়ের অনুরূপ যে সকল সার প্রদান করা যায় তৎসমুদয় সাধারণ সার। সাধারণ সার ব্যতীত বিশেষ সার ব্যবহার করিয়া ধানের শস্য বৃদ্ধি করা যায়। বিশেষ সার প্রদান করা অভাবযুক্ত সাধারণ প্রজাবর্গের সুবিধা জনক না হইলেও যাঁহারা মূলধন লইয়া কৃষি কর্ম্মে নামিবেন তাঁহাদের পক্ষে বা জমিদারগণের পক্ষে মঙ্গল জনক। এক গুণ খরচ করিলে দশ গুণ ফল পাওয়া যায়, কিম্বা একবার খরচ করিয়া জমিতে সার দিতে পারিলে যদি জমিতে ৫ বৎসর যাবৎ সেই সারের ক্ষমতা থাকে তবে তাহা সমর্থ ব্যক্তির ভাবিয়া দেখা উচিত।

আমরা দেখিতে পাই যে চা-বাগানে, রবার বাগানে, সিংহলের নারিকেল বাগানের উর্ব্বরতা রক্ষার জন্য কতই না চেষ্টা করা হয়, কত পয়সার সার খরচ করা হয়। ধান চাষের উন্নতির জন্য তাহার শতাংশের একাংশও চেষ্টা বা খরচ হয় না। সার দিলে যে ফল হয় তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যক নাই, ফলতঃ বারম্বার তাহা দেখা হইয়াছে। অধিকাংশ ধান্য ক্ষেত একবারে সার শূন্য ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সকল জমিতে কেবল এক বৎসর সার দিয়া ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না কিম্বা প্রথম বৎসর সার প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ কোন ফল দৃষ্ট হইবে না। বৎসর বৎসর যথা বিহিত সার প্রয়োগ দ্বারা জমিটির সম্যক উন্নতি সাধন করিতে হইবে তবে মনোমত ফল পাওয়া যাইবে।

উদ্ভিদ সকলের বৃদ্ধির জন্য সূর্য্যালোক, উত্তাপ এবং আবহাওয়ার ও মৃত্তিকার সরসতা যেমন আবশ্যক তেমনি উদ্ভিদগণ আবার হাইড্রেজেন, অকসিজেন্, নাইট্রোজেন, গন্ধক, ফস্ফরস্, পটাস্, চূণ, ম্যাগ্নেসিয়া এবং লৌহ এই পদার্থ গুলি বায়ু কিম্বা মৃত্তিকা হইতে সংগ্রহ না করিয়া বাঁচিতে পারে না। সৃষ্ট জীবের মঙ্গলার্থে এই সমস্ত পদার্থ গুলির মধ্যে অনেক গুলি মৃত্তিকা কিম্বা বাতাসে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান আছে এবং সে গুলির জন্য মানুষকে কিছু ভাবিতে হয় না। যাহা আছে বা সহজ প্রাপ্য তাহার জন্য চিন্তা না থাকিলেও অভাব পুরণের চেষ্টা সর্ব্বদা আবশ্যক। কোন্ উদ্ভিদের জন্য, কোন্ শস্যের জন্য কি বিশেষ সার জমিতে প্রয়োজ্য তাহা স্থির করিবার একটি কৌশল আছে। শস্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে তাহারা জমি হইতে কি কি পদার্থ প্রধানতঃ টানিয়া লইয়াছে সুতরাং জমি তাহাদের জন্য যাহা খরচ করিল তাহা জমিতে প্রদান না করিলে জমি স্বয়ং নিঃস্ব হইয়া পড়িবে। আমরা দেখিতে পাই,

১০০ পাউণ্ড ধান্য হইতে—

নাইট্রোজেন	১·১৯ পাউণ্ড
ফস্ফরিক অম্ল	·৩২১ „
পটাস্	০·১৬ „

১০০ পাউণ্ড খড় হইতে—

নাইট্রোজেন	০·৭৫৬ „
ফস্ফরিক অম্ল	০·২৬ „
পটাস	০·৪২ „

বিশ্লেষণ দ্বারা পাওয়া যায়।

সুতরাং ভূমি নিস্ব হইয়া পড়িবার উপক্রম হইলে ভূমিতে এই সকল পদার্থ প্রদান করিয়া উদ্ভিদের আহার যোগাইতে হইবে।

নাইট্রোজেন—বৃক্ষের শরীর বৃদ্ধি করে। ইহা প্রয়োগে ডাল, পালা, পাতার বৃদ্ধি হয়। যে গাছের দেখিবে যে সুন্দর গঠন হইয়াছে, বেশ সুগঠিত ফল হইয়াছে সেই বৃক্ষের সারে নাইট্রোজের মাত্রা পর্যাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ফস্ফরিক অম্ল—প্রয়োগে লতা বৃক্ষাদি ফলবান হয় এবং ইহা বৃক্ষগুলির ফুল ও বীজ উৎপাদনের সহায়তা করে।

পটাশ—এই সার দ্বারা উদ্ভিদের অবয়ব দৃঢ় হয় এবং প্রচুর শস্য উৎপাদনের সহায়তা হয়। ধানে পটাস সার পড়িলে ধানগাছগুলি বেশ দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। পটাশ সারে গাছগুলি এমন সতেজ করে যে তাহাতে সহজে কীটাদির আক্রমণ হয় না বা সামান্য তুষার পাতে সেইগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে না। পটাসের আর একটা মহৎগুণ

এই যে ইহা প্রয়োগে উৎপন্ন ফল বা শস্যের রঙ মনোহর হয় এবং তাহাদের স্বাভাবিক সৌরভের উন্নতি সাধন হয়।

চূণের গুণ—এই যে ইহা পটাসের সহিত মিশিলে বৃক্ষ লতাদি অবয়ব সুদৃঢ় করে। চূণ প্রদানে শস্য উৎপাদনের সহায়তা হয়। শস্যে শর্করা ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। চূণ প্রয়োগে মাটির অম্লত্ব কমিয়া যায় এবং মৃত্তিকানিহিত সারাদি গলিত হইয়া বৃক্ষলতাদির গ্রহণোপযোগী হয়। সবুজ সারের সহিত চূণ প্রয়োগে সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

ধানের ক্ষেতে হাড়ের গুঁড়া একটি বিশেষ সার—হাড়ের গুঁড়া শিঘ্র গলিতে চায় না, এই কারণে উহা ধান ক্ষেতের রসা জমিতে যত শিঘ্র কার্য্য করে শুষ্ক জমিতে প্রয়োগে তত শিঘ্র কার্য্যকরী হয় না। ইহা ফস্ফেটিক সার হইলেও ইহাতে যথেষ্ট মাত্রায় চূণ আছে এই কারণে ধান ক্ষেতের পক্ষে ইহা একটি বিশিষ্ট সার। সাধারণতঃ জলা জমিতে এক প্রকার অম্ল জন্মে, হাড়সারে যে চূণ থাকে তদ্দ্বারা ক্ষেতের অম্লত্ব নাশ করে—সতন্ত্র চূণ প্রয়োগের আবশ্যক হয় না। অধিকন্তু হাড় একটি স্থায়ী সার এক বৎসর প্রয়োগ করিলে ক্রমান্বয়ে তিন চারি বৎসর ফল পাওয়া যায়।

কিন্তু ধান ক্ষেতে হাড়ের গুঁড়া ব্যবহারে একটু অন্তরায়ও আছে। হাড়ের গুঁড়ায় ফস্ফরিক অম্ল বিদ্যমান আছে তাই ইহা ধানক্ষেতে দিবার ব্যবস্থা। অনেক সময় দেখা যায় যে, কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন যুক্ত সার ব্যবহার করিলে গাছ খুব বাড়িয়া যায়, পাতার খুব বাড় হয়। কিন্তু কেবল গাছ পাতার বৃদ্ধি হইলে চলিবে না শস্য বৃদ্ধির আবশ্যক, এই কারণে চায়ের ক্ষেতে যে সার দেওয়া যায় ধানক্ষেতে সে সার ব্যবহার চলে না। দেখা গিয়াছে যে ধানের গাছের, পাতায় খুব বাড় হইলে কাস্তে দ্বারা পাতা ছাঁটিয়া দিলে ধানের গাছে থোড় হয় ও অচিরে পুষ্পোদ্গম হয়। ফস্ফরিক অম্ল ব্যবহারে এই পুষ্পোদ্গমের সুবিধা হয়—তাই লোকে হাড়ের গুঁড়ার খোঁজ করে। কিন্তু হাড়ের গুঁড়াতে যে ফস্ফরিক অম্ল আছে বা চূণ প্রভৃতি ধানক্ষেতের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় পদার্থগুলি আছে সেগুলি সহজে গলিতে চায় না। ধানের রসা জমিতে পড়িলেও প্রথম বৎসরে হাড়ের গুঁড়া দিয়া ধানের ফলন বাড়ান যায় না। তার পর দুই তিন বৎসর হাড়ের গুঁড়ার সার-উপাদানগুলি গ্রহণোপযোগী অবস্থায় আসিয়া ধানের ফলন বৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করে। বেসিক্ স্লাগ (Basic slag) নামক এক প্রকার খণিজ পদার্থ আছে যাহাতে ফস্ফরিক অম্ল ও চূণ বেশ গ্রহণোপযোগী অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তদ্দ্বারা ধানের ফশল বৃদ্ধির সম্যক সহায়তা হয়। ইহা দামে হাড়ের গুঁড়া অপেক্ষা কম—কিন্তু সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলে ইহার দাম ২৲ কিম্বা ২।।৹ টাকা মণ অপেক্ষা কথনও অধিক হইবে বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। ইহার দুষ্প্রাপ্য তাহেতু বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ হাড়ের গুঁড়ার সহিত নাইট্রেট অব পটাস বা সোরা

ব্যবহারের পরামর্শ দিয়া থাকেন। ইহা অতি সৎ পরামর্শ। সোরাতে হাড়ের গুঁড়াকে গলাইয়া দেয় এবং সোরাতে যে পটাস থাকে তদ্দারা ধানের শস্য পুষ্টি হইয়া থাকে। সোরাতে যে লবণ ভাগ আছে তাহা দ্বারা মৃত্তিকার সহিত এমোনিয়ার সংযোগ করিয়া দেয়। সোরা একা তিন কাজ করে,—হাড়ের গুঁড়া গলায়, মৃত্তিকার সহিত এমোনিয়ার সংযোগ ঘটায়, এবং নিজ অঙ্গ নিহিত পটাস দ্বারা বীজের পুষ্টি সাধন করে। কাইনিটও খনিজ পটাস প্রধান সার। কাইনিটের একটা বিশেষ গুণ এই যে, ইহা দ্বারা বৃক্ষ অঙ্গ দৃঢ় করে। ধানক্ষেতে কাইনিট দিলে ধানগাছ বড় হইয়া পড়িয়া যায় না। ধান্যগুচ্ছগুলি মধ্য বয়সে মাজাভাঙ্গা হইয়া পড়িয়া গেলে তাহাতে পর্য্যাপ্ত শস্য হইতে পায় না। কাইনিট ব্যবহারে ছত্রক রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, ইহাও এই সারের একটা প্রধান গুণ বলিতে হইবে।

এক একর জমিতে সাধারণতঃ—

১। ৩ মণ হাড়ের গুঁড়া ও ৩০ সের সোরা।
২। গোময় সার ১৫০ মণ ও বেসিক্ স্লাগ ১৷৷০ মণ।
৩। গোময় সার ১৫০ মণ ও কাইনিট ১ মণ।
৪। গোময় ও গোয়ালের আবর্জ্জনা সার ২০০ মণ ও চূণ ৩০ সের।

কাইনিট ও বেসিক স্লাগ সর্ব্বদা বাজারে আমদানী থাকে না। জ্বালানি ঘুঁটে প্রস্তুত হেতু গোময় সারের অপ্রাপ্যতা প্রায় সর্ব্বত্র অনুভূত হইতেছে। এই জন্য ধান্যক্ষেত্রের সারব লিলেই আজকাল হাড়ের গুঁড়া ও সোরা ব্যবহারের কথাই প্রবল ভাবে সর্ব্বত্র প্রতীয়মান হয়। বারান্তরে আমরা ধান্যক্ষেতে সবুজ সার প্রয়োগ ও ধানের ফলন বৃদ্ধি সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবের শেষ করিব।

সাময়িক কৃষি সংবাদ

সবুজ সার বা সব্জি সার—

পূর্ব্ব বঙ্গে ঢাকা, রাজসাহী চট্টগ্রামে সবুজ সার দ্বারা জমি উর্ব্বরা করিবার বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে সরকারী কৃষি বিভাগ ইহার উদ্যোক্তা কম খরচে জমি উর্ব্বর করিবার পক্ষে সবুজ সার বিশিষ্ট সার। সরকারী কৃষি-বিভাগ সবুজ সার সম্বন্ধে ১৩২০ সালের বিবরণীতে নিম্ন লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন— জমীতে কোন শস্যের আবাদ করিয়া কাঁচা অবস্থায়েই উহাকে কাটিয়া অথবা কোদাল বা লাঙ্গলের সাহায্যে জমীতে মিশাইয়া দিলে উহা পচিয়া সার হয়। এইরূপ সারের নাম ‘সবুজ সার’। ধইঞ্চা, শণ, অরহর, নীল, কুলতি, ছোলা, মাসকলাই ইত্যাদি যাবতীয় শীম বা মটর জাতীয় শস্যই সবুজসাররূপে ব্যবহার হইতে পারে। এই সকল গাছগুলি বায়ু মণ্ডল হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করে। কাজেই পচিয়া জমির সহিত মিশিয়া জমীকে বিশেষ সারবান করে। সবুজ সার প্রয়োগ জমীর সারবৃদ্ধি করিবার একটী অতি সহজ উপায়, ইহার খরচ অতি সামান্য অথচ সাধারণ কৃষক ইহা অবলম্বন করিতে পারে। ইহাতে যে কেবল জমীর সারবত্তা বৃদ্ধি হয় তাহা নহে ইহাদ্বারা জমীর জল ধারণ করিবার শক্তিও বৃদ্ধি পায় এবং ঘাস ও অন্যান্য আগাছা দমন থাকে। সবুজ সার, আসল ফসল বপন বা রোপণ করিবার ১ মাস পূর্ব্বে চষিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়া আবশ্যক যেন উহা পচিয়া মাটির সহিত উত্তমরূপে মিলিত হইতে পারে। সবুজ সারের প্রচলন এদেশে খুব বেশী নাই, তা বলিয়া কৃষকেরা যে একবারে এ বিষয়ে অজ্ঞ তাহাও নহে। হুগলি ও বর্দ্ধমান অঞ্চলে কৃষকেরা আলুর জন্য ধইঞ্চা, শণ, নীল, ইত্যাদির সবুজ সার ব্যবহার করে। ময়মনসিংহ, পাবনা ইত্যাদি স্থানে পাটের জন্য শণের চাষের ব্যবহার আছে, রংপুরের তামাকের চাষের জন্য মাসকলাইর ব্যবহার করা হয়। সবুজ সারের সঙ্গে জমিতে চূণ ও ছাই সমান ভাগে মিশাইয়া বিঘা প্রতি আন্দাজ ৫/০ হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিলে আরও উপকার হইবার কথা। কারণ ইহাতে সবুজ সারের পাতা ও ডালগুলি শীঘ্র পচাইয়া দেয় এবং উহাতে যে সব শস্যের অপকারী কীট থাকে তাহাও নষ্ট করে।

সবুজ সারের জন্য ধইঞ্চা শণ ও বরবটী অত্যুৎকৃষ্ট। নিম্নে ইহাদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

ধইঞ্চা।—এই দেশের পক্ষে সবিশেষ উপকারী। কারণ ইহা প্রায় সকল জমীতেই জন্মে। চারা ছোট থাকিতে গোড়ায় জল দাড়াইলে চারার একটু ক্ষতি হয় বটে কিন্তু গাছ বড় হইয়া গেলে আর বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। ধইঞ্চার গাছে বিস্তর পাতা হয় এবং বাড়িতে দিলে প্রায় ১০।১২ হাত লম্বা হয়। কিন্তু সবুজ সারের জন্য ব্যবহার করিতে হইলে গাছ এত বাড়িতে দেওয়া উচিত নহে। কেন না বড় হইলে গাছের ডাটাগুলি শক্ত হইয়া যায় এবং জমীতে পচিয়া সার হইতে অনেক দেরী হইয়া পড়ে। সবুজ সারের জন্য স্থান ও কাল ভেদে ২-৩ ফুট পর্য্যন্ত উচু হইলেই গাছগুলি কাটিয়া বা চষিয়া জমীতে পুঁতিয়া দিতে হয়। বীজের হার বিঘাপ্রতি /৬ সের; প্রথম বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই বীজ বুনা উচিত। ধান, আলু, পাট প্রভৃতি সকল ফসলেই ধইঞ্চার সবুজ সার বিশেষ উপকারী।

শণ। ধইঞ্চার ন্যায় সবুজ সারের জন্য ইহারও প্রচলন আছে। শণের চাষে যে জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায় ইহা আমাদের কৃষক বিশেষ অবগত আছে। সেই জন্য অনেক স্থলে তাহারা ইক্ষু, আলু প্রভৃতি শস্যের পূর্ব্বে উক্ত জমীতে একবার শণের চাষ করিয়া লয়, বা কখনও কখনও গাছ ছোট থাকিতেই শণগুলি চষিয়া জমীতে পচাইয়া লয়। রংপুর, পাবনা ও ময়মনসিংহ জিলাতে পাটের সারের জন্য শণ বোনা হয়। এবং পরে একটু বড় হইলেই জমীতে চষিয়া দেওয়া হয়। আবার অনেক স্থলে শণ গাছ কাটিয়া লইয়া জমীতে কেবলমাত্র শিকড়গুলি রাখিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাই পচিয়া সারের কাজ করে। বেশ উচু হালকা জমী শণের চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এঁটেল, নিচু বা সেঁতসেঁতে জমীতে শণ ভাল হয় না; দুইবার চাষ দিয়া একবার মই চালাইয়া লইলেই যথেষ্ট হইল। শণের আবাদ বৎসরে দুইবার হয়। বীজ বুনিবার সময় একবার বৈশাখ মাসে, আর একবার আশ্বিন কার্ত্তিক মাস। বীজ লাগাইবার ২ মাসের মধ্যেই গাছ ২।৩ ফুট উচু হইয়া উঠিবে তখন সেগুলি চষিয়া জমিতে মিশাইয়া দিয়া সার প্রস্তুত করিতে হয়।

(গ) বরবটী।—যে সব জমীতে জল দাড়ায় না সেই সব জমীতে বরবটী ব্যবহার-দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য রোপিত ধান্যক্ষেত্রে সবজি সারের জন্য ধইঞ্চার ব্যবস্থায়ই প্রশস্ত। রংপুরের নিকটবর্ত্তী "বুড়িরহাট" সরকারী কৃষিক্ষেত্রের জমী অত্যন্ত নিরস ছিল কিন্তু ক্রমাগত বরবটীর সবজি সারের ব্যবহারদ্বারা এই জমীর অনেকটা উন্নতি সাধন হইয়াছে। রংপুরস্থ আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে ১৯১১ সনের বরবটী সবজি সারের ব্যবহারের উপকারিতা পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তাহার ফলে এক একরে ১৫৫/ মণ আলু উৎপন্ন হইয়াছিল। উক্ত ক্ষেতে বরবটী বপনের পূর্ব্বে ১৬০/ মণ গোময় সার প্রদান করা হইয়াছিল।

দার্জ্জিলিং আলু।

সার।	উৎপন্ন আলুর পরিমাণ প্রতি একর।	উৎপন্ন ফসলের মূল্য।	খরচ।	লাভ প্রতি বৎসর।
বরবটী সবুজ সার ১৫০/০ মণ গোবর ...	২৫৫ মণ	৩৩৭৲	১৪৩৶০	১৯৩৸৶০
বীছন ধানের পর ৩০০/০ মণ গোবর ...	৩৩১।০	১৯৬৷৶০	১৩৯।১০	৫৭/১০
পাটের পর ৩০০/০ মণ গোবর ...	১১৪।৫	১৭১৸৶০	১২১।০	৯২৸৶০
পাট ...	১২৸০	১০২৲	৬০৲	

এই হিসাবে গোবরের দাম ধরা হয় নাই। ইহাতে দেখা যাইবে যে পাট এবং আলুর চাষ অপেক্ষা সবজি সার ব্যবহারের পর সুধু আলুর চাষই অধিকতর লাভজনক হইয়াছিল। এই পরীক্ষার ফলে সবজি সারের প্রচলন ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে। রংপুর এবং ঢাকা কৃষিক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে জমিতে জল দাঁড়াইলে বরবটী বাঁচিতে পারে না এবং যে সমস্ত জমী হইতে জল সহজেই বহির্গত হইতে পারে শুধু সেই সমস্ত জমীতেই বরবটীর চাষ লাভজনক। বরবটীর চাষের প্রণালী অতি সহজ। ২।৩টী চাষ এবং মৈ দিবার পর চৈত্রের প্রথম ভাগে বিঘাপ্রতি /৫ সের বরবটীর বীজ বুনিয়া দিতে হইবে। যত শীঘ্র বীজ বপন করা যায় ততই ভাল কারণ বরবটীর গাছগুলি সেই পরিমাণে বাড়িতে পারিবে। শ্রাবণ মাসের মধ্যভাগে (গাছে ফুল আসিলে) বরবটী চষিয়া মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া দিতে হইবে। ইতি মধ্যে আর কোন যত্নের আবশ্যক নাই। প্রথমত ক্ষেতে মই দিয়া গাছগুলি ভাঙ্গিয়া লইতে হইবে। তৎপর দেশী লাঙ্গল অথবা মেষ্টন লাঙ্গলদ্বারা চাষ দিয়া আড়া আড়িভাবে জমীটিকে চাষ করিতে হইবে। ২।৩ বার চাষ দিলেই অধিকাংশ গাছ মাটির সঙ্গে মিশাইয়া যাইবে। যদি মাঝে মাঝে দুই একটি উপরে থাকিয়া যায় তাহা কোদালী দিয়া ঢাকিয়া দিবে। বরবটীর গাছগুলি লতান বলিয়া প্রথম প্রথম চাষ দিতে কিছু অসুবিধা বোধ হয় কিন্তু অভ্যাসের এই অসুবিধা শীঘ্রই দূরীভূত হয়।
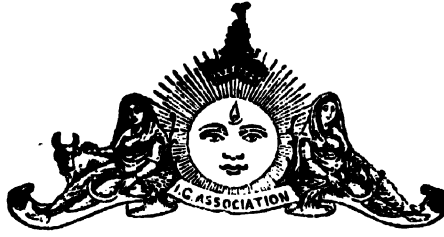
আষাঢ়, ১৩২২ সাল।

গাছ ছাঁটা

বৃক্ষ লতাদিকে আবশ্যকমত আকারে আনিবার জন্য তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সময় সময়ে ছাঁটিয়া বাদ দিবার আবশ্যক হয়।

তোমার একটি সবুজ বেড়া (বৃক্ষ লতাদি রোপণ দ্বারা যে বেড়া নির্ম্মিত হয়) প্রস্তুতের আবশ্যক হইল। তুমি বাগানের চতুর্দ্দিকে মেহ্‌দি কিম্বা ডুরেণ্টার ডাল বসাইয়া দিয়া কিম্বা বন ইমলির (Isega dulcis) বীজ বসাইয়া বেড়া প্রস্তুতের মানস করিলে। গাছগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছাড়িয়া দিলে তাহারা খুব বড় হইবে এবং আশে পাশে প্রসারিত হইয়া অনেক জায়গা আবৃত করিয়া ফেলিবে, এমন কি শীর উচ্চ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া বাগানে আলোক ও হাওয়া প্রবেশের পথ রোধ করিয়া আনিবে। এমত অবস্থায় তোমার বাগানের বেড়া ছাঁটা ভিন্ন উপায়ন্তর নাই। তোমাকে বেড়ার আশ পাশ উর্দ্ধ ছাঁটিয়া ঐ সকল বৃক্ষকে সংযত করিয়া রাখিতেই হইবে। য়্যান্টিগোনা (Antigonum leptapus) নামক একপ্রকার স্যাণ্ডুইচ দেশের লতা এদেশে আসিয়াছে ইহার বেশ ফুল হয় দুই এক গাছি লম্বা ঋজু তার খাঁটাইয়া ইহাদ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিতে পারিলে বাগানটির চারি ভিতে পুষ্প শোভায় শোভিত হয়। বেড়ার কার্য্যও বেশ সাধিত হয়, কারণ ইহার ডাটা পাতার কটু আস্বাদ হেতু ইহা গবাদিতে খায় না এবং পাতার ডাঁটার ঘণ বিন্যাস হেতু ইহার আবরণ থাকিলে গরু ছাগল সহজে বাগান মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। এইত বলিলাম লতার গুণ। লতাটিকে যদি তাহার ইচ্ছামত বাড়িতে দাও তবে ইহা অচিরে তোমার বাগান ছাইয়া ফেলিবে। ইহা প্রতি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে শিকড় চালাইয়া একা এক শত হইয়া

পড়ে, তার উপর বীজ পড়িয়া গাছ জন্মে। ইহাদ্বারা বেড়া করিতে হইলে তোমাকে কাঁচি ছুরীদ্বার সর্ব্বদাই ইহার অঙ্গছেদ করিয়া ইহাকে সংযত না রাখিলে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। গাব ভেরাণ্ডা দ্বারা যদি বেড়া করিতে চাও তবে তাহার ফল হইবার পূর্ব্বে ডাল ছাঁটিতে না পারিলে তাহার বীজ পড়িয়া তোমার বাগান পূর্ণ হইয়া যাইবে।

বেড়া ত ছাঁটা চাই—বাগানের ভিতর ফল ফুলের গাছ ছাঁটাও আবশ্যক। আমাদের দেশে কোন কোন গাছ ছাঁটার ব্যবস্থা আছে; যেমন কাঁঠালের ফল শেষ হইবার পর গাছের গায়ের ছোট ছোট পাল্‌সি ডাল ছাঁটিয়া না দিলে বা বৃক্ষ গাত্র স্থানে স্থানে ক্ষত করিয়া না দিলে তাহাতে আগামী বর্ষে পর্য্যাপ্ত ফল ধরিবে না। কাঁটালের ফল পত্র-মুকুলতে ধরে না, গুঁড়ির ত্বক ভেদ করিয়া মুকুল উদ্গত হইয়া ফল ধরে।

সজিনা গাছের পুরাতন সমস্ত ডাল কাটিয়া না দিলে তাহাতে আগামী বর্ষে ভাল ফুলফল হয় না। পুরাতন ডাল ছাঁটিবার পর নূতন ডাল বাহির হয় তাহাতে বেশী ফুল ফল হয় এবং খাড়া (ফল) বড় ও সুস্বাদু হয়। পুরাতন ডালের খাড়ার আস্বাদ তিক্ত। কুল ও আতা গাছের পুরাতন ডাল ছাঁটার বিধি আছে। ডাল না ছাঁটিয়া রাখিয়া দিলে তাহাতে যে ফল হইবে তাহা ছোট হইবেই হইবে এবং পোকা ধরিবে।

সব গাছই অল্প বিস্তর ছাঁটা আবশ্যক। গাছের শুষ্ক কিম্বা অৰ্দ্ধ শুষ্ক ডাল পালা ছাঁটিয়া দিলে বৃক্ষগণ সুস্থ ও সচ্ছন্দ বোধ করে এবং তাহাদের দেহে যেন নব বল সঞ্চার হয়। কোন্ গাছ কি পরিমাণ ছাঁটিতে হইবে বা কোন্ সময় ছাঁটিতে হইবে তাহা গাছের অবস্থা বুঝিয়া নিরুপণ করা আবশ্যক। আম লিচু গাছের ডাল পল্লব, ফল ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গে ছাঁটার কার্য্য অনেকটা শেষ হয়; সেই কারণে তাহাদিগকে আর সতন্ত্র ছাঁটিবার ব্যবস্থা আমাদের দেশে কেহ করে না। কিন্তু এসময় যে ডাল পল্লব ভাঙ্গা হয় তাহা ব্যতীত অন্যান্য মৃতপ্রায় রুগ্ন কিম্বা অনাবশ্যকীয় ডাল পালা ছেদনের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। অনবধানতা প্রযুক্ত আমাদের দেশে লোকে এ দিকে বড় লক্ষ্য রাখেন না এবং অন্যদেশের ন্যায় এতদ্দেশের উদ্যান স্বামীগণ সকল দিকে চোক দেন না বলিয়া বাগান হইতে তাঁহারা তাদৃশ লাভ করিতে পারেন না।

গাছ ছাঁটা সম্বন্ধে আমাদের দেশে কোন পুস্তক আছে বলিয়া আমার ধারণা নাই—বোধ হয়, নাই। কিন্তু ফরাসী ইংরাজী, জার্ম্মাণ ভাষার এই সম্বন্ধে রাশি রাশি লেখা আছে। এই সকল লেখা পড়িলে আমাদের যেমন উপকার হইবার সম্ভাবনা তেমনি অপকারেরও ভয় আছে। নানা মুণির নানা মত পড়িয়া কোন্ মতে চলা কর্ত্তব্য নিদ্ধারণ করা বড় সুকঠিন হইয়া পড়ে। তাঁহারা তাঁহাদের দেশের গাছের কথা বলিয়াছেন সেই মত আমাদের দেশে চলিবে কি না ঠিক করা নিতান্ত সহজ নহে। সেই জন্য সব দেশের এই সম্বন্ধে তত্ত্ব লইতে হয়, সব দেশের কার্য্য প্রণালী লক্ষ্য করিতে হয়, সেই সঙ্গে গাছছাঁটার উদ্দেশ্যটা, বিচার পুর্ব্বক বুঝিয়া লইতে হয় নতুবা বিপদ ঘটে

বিদেশী নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে দেশে খাটাইতে যাইয়া অকালে এবং অকারণে গাছ ছাঁটিয়া গাছ গুলি নষ্ট করিয়া ফেলার সম্ভাবনা যথেষ্টই বিদ্যমান থাকে।

অতএব প্রথমেই দেখিতে হইবে যে গাছ ছাঁটার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। ইহা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে বৃক্ষ লতাদির শরীরতত্ত্ব জানিতে হইবে, বিশেষতঃ তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির কার্য্য একটু বুঝিয়া না লইলে তাহাদের অঙ্গ ছেদনে আমাদের সাহস জন্মিবে না।

উদ্ভিদ শরীরের মৃত্তিকা-সংলগ্ন অঙ্গ, শিকড়ের বিষয় প্রথম আলোচনা করা যাউক। উদ্ভিদ স্বীয় দেহ মধ্যে শিকড় দ্বারা রস টানিয়া লয়। এই রস কতিপয় লবণাক্ত জল ব্যতীত আর কিছুই নহে। উদ্ভিদ, শিকড়ের যে কোন অংশ দ্বারা রস টানিয়া লইতে পারে না। শিকড়ের অগ্রভাগে চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম লোমরাজি বিদ্যমান। এই লোমবৎ শিকড়াগ্র-ভাগগুলিই ভূমি হইতে রসাকর্ষণ করে। উদ্ভিদ দেহ কতকগুলি কক্ষ (cells) সমষ্টি, কক্ষগুলি থাকে থাকে সাজান। শিকড়াগ্রভাগ আকর্ষিত রস সন্নিহিত শূন্যকক্ষ পূরণ করিতে করিতে ঊর্দ্ধমুখে পত্রে গিয়া হাজির হয়। শিকড় জল টানিয়া লইতেছে সেই জল ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে পাতায় আসিয়া পৌঁছিয়া থাকে। উদ্ভিদের শিকড় যে মৃত্তিকা হইতে জল আকর্ষণ করিয়া ঊর্দ্ধে প্রেরণ করে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পাই। আমরা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করি যখন উদ্ভিদের কাণ্ড ছেদন করা হয় তখনও শিকড় রস আকর্ষণে বিরত হয় না। রস আকর্ষিত হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং কাণ্ডমূল দিয়া উথলিয়া পড়ে। এই রসপ্রবাহ কিন্তু ভূমিস্থিত কাণ্ডাংশকে অধিক দিন জীবিত বা সরস রাখিতে পারে না, কারণ এই রসে তখনও জীবনদায়িনী শক্তি সঞ্চারিত হয় নাই।

পাতায় রস আসিয়া পৌঁছিবার পর তাহা আলোক ও বাতাস সংযোগে উদ্ভিদের খাদ্য রূপে পরিণত হয় এবং এই পরিণত পদার্থের দ্বারা উদ্ভিদ দেহের কাণ্ড, পত্র, শিকড়াদি নির্ম্মিত হয়। বায়ু হইতে অঙ্গারীয় বাষ্প (Carbon dioxide) মিলিত হইয়া এই রসের পরিণতি হয়। রসের এবম্প্রকার পরিণতি প্রক্রিয়াকে রসের পরিপাক ক্রিয়া বলা যায়। রস ক্রমে শর্করা ও অবশেষে শ্বেতসারে পরিণত হইয়া উদ্ভিদ দেহ গঠন করিয়া তোলে। নৈসর্গিক ক্রিয়া দ্বারা শ্বেত সার গলিত হইয়া বৃক্ষ শরিরে ছড়াইয়া পড়ে। ভূমি হইতে শিকড় মুখে আকর্ষিত রস বৃক্ষ শরীর অভ্যন্তরিণ কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে নীত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠে অবশেষে পরিণত রসবৃক্ষত্বক বাহিয়া নামিয়া আসে এবং সেই রস শিকড়ে, কাণ্ডে, ত্বকে কিম্বা ফলে ছড়াইয়া পড়ে। যদি কখন আমরা কোন বৃক্ষের কিয়দংশের ত্বক অপসারিত করি তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে সেই স্থানে বৃক্ষের ঊর্দ্ধদিক হইতে নূতন ত্বক নির্ম্মিত হইতেছে। ইহাতে পরিণত রসের ক্রিয়া ঊর্দ্ধদিক হইতে নিম্ন দিকে হইতেছে বুঝিতে হইবে।

গাছ যখন মুকুলিত হয়, বৃক্ষ পত্রস্থিত পরিণত রস আসিয়া সেই মুকুলগুলিকে

পরিস্ফুট করে। আলোক না পাইলে পত্রস্থিত রস তাহার কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে না। এই কারণে দেখা যায় বৃক্ষের নিম্নদিকে বা পত্রাচ্ছাদনের ভিতর যে সকল মুকুল উদ্গত হয় তাহা পরিপুষ্ট হইতে পারে না। শীতকালে যখন সূর্য্যালোকের প্রখরতা থাকে না তখনও পত্রাগ্রভাগে মুকুল দেখা দেয় কিন্তু সেগুলি সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে না পারিয়া উদ্ভিদের দেহেরই বৃদ্ধি করে, অতিঅল্পই ফলে পরিণত হয় বা হয় না। এই হেতু প্রায়ই দেখা যায় যে, গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্য্যালোকে বৃক্ষের লতা পাতার বৃদ্ধি না হইয়া বৃক্ষের ফল প্রসবের দিকেই ঝোঁক হয়। শাখার অগ্রভাগে যে পত্রমুকুল থাকে সেই মুকুল পুষ্ট হইয়া যদি ফলে পরিণত হয় তাহা হইলে ফলগুলি বেশ সুগঠিত হয় কিন্তু পল্লবের নিম্নস্তরে যে সকল মুকুল থাকে সেগুলি যদি ছাঁটিয়া বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে অগ্রভাগস্থিত মুকুল সহজে পরিপুষ্ট হয় ও ফল স্বভাবতঃ খুব বড় হইয়া থাকে।

বৃক্ষ লতাদি শাখা পল্লবে সুশোভিত থাকিতে দেখাই লোকের এক মাত্র বাসনা নহে। ফলের গাছে যদি ফল না হয় তবে লোকে সুধু গাছের বাহার দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে না। পাতা বাহার গাছগুলি শাখা পল্লবে সুসজ্জিত হইয়া থাকুক ইহা সকলের বাসনা হইলেও তবু সেগুলির মনোমত আকারে লইয়া আসিবার জন্য লোকে তাহা ছাঁটিয়া ঠিক করে। ফল ফুলের গাছের ফল ফুলের বৃদ্ধির জন্য, ফল ফুল বড় করিবার জন্য গাছ ছাঁটিবার এত আগ্রহ। গাছের ডাল পাতা ভাঙ্গিয়া দিয়া যাহাতে গাছের সকল অঙ্গে সমভাবে রৌদ্র বাতাস পায় এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে গাছ সাজান ফল ফুল হয়। গাছের নিস্তেজ মুকুলগুলি ডাল সমেত বাদ দিতে পারিলে যে মুকুলগুলি থাকিয়া যায় সেগুলি বাড়ে। যদি ডাল সমেত নিস্তেজ মুকুলগুলি বাদ দেওয়া না যায় তাহা হইলে সেগুলি অন্ততঃ পৃথক ছিড়িয়া বা কাটিয়া দিলে সতেজ মুকুলগুলি আরও সতেজ হয়। ফল কিম্বা ফুলের গাছে যদি নিস্তেজ ডালগুলি বাদ দেওয়া না যায় তবে পরবর্ত্তী বৎসরে তাহাতে ফুল হয় বটে কিন্তু সেই ফুল ছোট হয় এবং ফল গাছ হইলে তাহা মুকুলেই পর্য্যবসিত হয়, ফল ধরে না কিম্বা যদি বা ধরে তবে নিশ্চয়ই ফল ছোট হইবে। ঐ সকল পুরাতন ডালের পাতা ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসিবে এবং পাতার রস সঞ্চার হইলে বৃক্ষ পত্র তাহার কার্য্য ঠিক ঠিক করিতে পারিবে না।

আবার গাছের ডাল পাতার খুব বৃদ্ধি দেখিলে গাছের শিকড় কিছু কিছু ছাঁটিয়া দিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। শিকড় মুখে আকর্ষিত রসের পরিমাণ কিছু কমিয়া আসিলে ঐ রস অপেক্ষা বৃক্ষ পত্রে সঞ্চিত পরিপক্ক রসের মাত্রা বাড়িয়া যায়। পরিপক্ক রস সভাবতঃ ফল উদ্গমের দিকে সঞ্চালিত হয়। কি জীব জগতে কিম্বা উদ্ভিদ জগতে সকলেই আত্মরক্ষা এবং বংশ বৃদ্ধির জন্য সততঃ পরতঃ যত্নবান। অপরিপক্ক রস গাছের শাখা পল্লবের বৃদ্ধির সহায় হয় কিন্তু পরিপক্ক রস সভাবতঃ ফলের দিকে ধায়। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে, বৃক্ষ শরীর কোন কারণে ক্ষত হইলে গাছের ফল বৃদ্ধি হয়

তাহাতে কেহ যেন না মনে করেন যে গাছের ক্ষত বা রুগ্ন অবস্থাই মঙ্গলজনক, তাহ নহে। পরিপক্ক রস শিকড়ে কিম্বা পাদদেশে নামিতে গিয়া ক্ষত স্থানে বাধা প্রাপ্ত হয় এবং শাখা পল্লবে সঞ্চিত থাকিয়া ফল বৃদ্ধির অনুকূলে ব্যয়িত হয়। য়ুরোপ ও এমেরিকার অনেক বাগানে বৃক্ষ গাত্রে গুলি মারিয়া ক্ষত করিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে উদ্দেশ্য শাখা পল্লবে ফলের জন্য রস রক্ষা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। আমাদের দেশে কাঁটালের কাণ্ডে যে সকল পাল্‌শি ডাল দৃষ্ট হয় তাহা ছাঁটিয়া কাটিয়া দিতে হয় এবং বৃক্ষ মুকুলিত হইবার পূর্ব্বে কাণ্ডে অধিকাংশ স্থানে ক্ষত করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য সেই একই বলিয়া মনে হয়।

বাঙলা দেশে অধিকাংশ ফল গাছই ফল হইয়া যাইবার পর ছাঁটিয়া দিলেই ভাল হয়। আম, লিচু লকেট, জাম, জামরুল সবগুলিই বর্ষার পূর্ব্বে ছাঁটিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। কুলের, পিয়ারার ডাল ছাঁটার নিয়মও তাই কিন্তু কাঁটালের পক্ষে নিয়ম কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। কাঁটাল বর্ষার প্রারম্ভে একবার এবং বর্ষার শেষে শীতের প্রারম্ভে একবার ছাঁটিতে হয়। বেল ফুলের গাছ বর্ষা কালেই ছাঁটিতে হয় কিন্তু গোলাপ ছাঁটার সময় বর্ষা শেষে শীতের আরম্ভে। বেড়ার গাছ ছাঁটিবার ও নূতন বেড়া প্রস্তুত করিবার সময় বর্ষাকাল। সর্ব্ব প্রকার গাছ ছাঁটার ঠিক ঠিক একটা সময় আছে তাহা বিচক্ষণ উদ্যান পালক একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারেন। নারিকেল কিম্বা পাম জাতীয় গাছের পুরাতন পাতা শেষ বর্ষায় ছাড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গাছের কোন্ অংশ ছাঁটিতে হইবে, কতটুকু ছাঁটিতে হইবে ইহার একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। বৃক্ষ দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহের কার্য্য প্রণালীর কথা এই জন্য বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। জীব-শরীর বিজ্ঞান যাহার জানা আছে তিনি সহজে কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যাধি নিবারণার্থ তাহাদের অঙ্গে ছুরিকা চালাইতে পারেন, সেই রূপ উদ্ভিদ্ দেহ-বিজ্ঞান জানা থাকিলে উদ্ভিদ্ অঙ্গে অস্ত্র প্রয়োগের ভয় থাকে না বৃক্ষ লতাদির ডাল পালা ছাঁটার কৌশল সহজে আয়ত্ব হয়।

শস্য সংবাদ

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গম—১৯১৪।১৫—

বর্ত্তমান বর্ষে গমের আবাদী জমির পরিমাণ ১,১৭৫,৮০০ একর। বিগত বর্ষে ৯০১,৭০০ একর মাত্র জমিতে গমের আবাদ হইয়াছিল। উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ৩০১,০৮২ টন অর্থাৎ প্রতি একরে ৫৭৪ পাউণ্ড গম উৎপন্ন হইয়াছে। বিগত বর্ষের উৎপন্ন গমের পরিমাণ ২৫৮,৮৪৯ টন অর্থাৎ প্রতি একরে ৪৯৬ পাউণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে ৩।৫ মণ হইতে ৫।১০ মণ দরে বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিগত বর্ষে ইহা অপেক্ষা ১৲টাকা দর সস্তা ছিল।

পঞ্জাবে মসিনা ও অন্য তৈল শস্য—১৯১৪।১৫—

	১৯১৪।১৫	১৯১৩।১৪	শতকরা কম বেশী
অন্য তৈল শস্য ...	১,০৭৭,৯০৮ একর	১,০০২,৯০২ একর	+৭-৪
মসিনা ...	৪৭,২২৪ „	৩৯,০৩৯ „	+২১

উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অন্য তৈল শস্য ১৭৮,১৯৫ টন ১৯১৪ মে মাসে দর ৬৷০ আনা অন্য বৎসর অপেক্ষা ॥০ আনা অধিক। দর উঠিয়া ৭॥০ সাত টাকা আট আনা পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

পঞ্জাবে গম—১৯১৫—

আবাদী জমির পরিমাণ ৯,৭৭৮,০৫৩ একর—অন্য বৎসর [illegible] শতকরা ১৫ ভাগ অধিক জমিতে আবাদ হইয়াছে। উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ [illegible]৭,৭৬৮ টন—বিগত বর্ষ অপেক্ষা শতকরা ২১ ভাগ অধিক শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। [illegible] মাসে ১২।০ সোয়া বার সের দর ছিল তাহা ক্রমশঃ কমিয়া ফেব্রুয়ারি মাসে [illegible]ফাল্গুনে) ৭।০ সোয়া সাত সের দাঁড়ায়। গমের অবাধ রপ্তানি বন্ধ হওয়ায় দাম কিছু কমে, বৈশাখ মাসে টাকায় /৮॥০ সের দরে গম বিকাইয়াছে। কিন্তু ১৯১৪ সালে বৈশাখ মাসে ১২॥০ সের দর ছিল।

হেমন্তিক তৈল শস্য—রাই, শরিষা ও মসিনা—১৯১৪।১৫—

রাই ও শরিষার আবাদী জমির পরিমাণ বর্ত্তমান বর্ষে ৬,৪০২,০০০ একর। বিগত বর্ষ অপেক্ষা ১৩৬,০০০ একর পরিমাণ অধিক জমিতে রাই ও শরিষার আবাদ হইয়াছে। উৎপন্ন রাই ও শরিষার পরিমাণ ১,১৯৫,০০০ টন অনুমিত হইয়াছে। বিগত বর্ষে ১,০৮৭,০০০ টন মাত্র শেষ পর্য্যন্ত গোলাজাত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে মসিনার আবাদী জমির পরিমাণ ৩,৩৩২,০০০ একর; বিগত বর্ষ অপেক্ষা মসিনার আবাদী জমির পরিমাণ ৩০১,০০০ একর অধিক দেখা যাইতেছে। উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ৩৯৬,০০০ টন। বিগত বর্ষে শস্যের পরিমাণ ৩৮৬,০০০ টন মাত্র হইয়াছিল।

বিহার ও উড়িষ্যার গম—১৯১৪।১৫—

বিহারে এবং পালামোই জেলায় সমধিক পরিমাণে গমের চাষ হয়। বর্ত্তমান বর্ষের গমের আবাদী জমির পরিমাণ ১,২১৮,০০০ একর। বিগত বর্ষের ১,৩৪২,৩০০ একর।

আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে সুবৃষ্টি না হওয়ায় সকল জমিতে গমের আবাদ সুবিধা মত হয় নাই। এই সময়ে বৃষ্টির উপর গমের আবাদ এতদঞ্চলে অনেক পরিমাণ নির্ভর করে। এই সময়ের বৃষ্টিকে এ অঞ্চলের লোকে "হাতিয়া" বর্ষণ বলে।

সমগ্র প্রদেশে ৩৪৭,২০০ টন মাত্র গম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান। বিগত বর্ষের উৎপন্ন গমের পরিমাণ ছিল ৫৮৩,৫০০ টন।

গমের দর যে উত্তর উত্তর বাড়িতেছে তাহা কয়েক বৎসরের কলিকাতার বাজার দর তুলনা করিলেই বুঝা যায়।

	১৯১২	১৯১৩	১৯১৪	১৯১৫
কলিকাতা …	৯সের ৪ছটাক	১১সের ৬ছটাক	৯সের	৬সের ২ছটাক
কোন কোন জেলায় …	১২ " ৩ "	১০ " "	৮সের ৯ছটাক	৬ " ৬ "

পত্রাদি

মক্ষিকা পালন ও মধু সংগ্রহ—

স্বদেশ বন্ধু কলিকাতা।

এখানে কলিকাতার সন্নিকটে কোন কৃষি ক্ষেত্রে আছে কিনা যেখানে মধু হেতু মক্ষিকা পালন করা হয়। মক্ষিকা পালন করিতে হইলে কৃত্রিম চাক ও অন্যান্য যাহা সাজ সরঞ্জম আবশ্যক তাহা কোথায় পাওয়া যাইবে, আপনারা বা আপনাদের কৃষকের পাঠকবর্গ ইহার কোন সন্ধান দিতে পারেন কি ?

উত্তর—কলিকাতার সন্নিকটে বা বঙ্গদেশে কোন কৃষি ক্ষেত্রে, বা কাহার বাটিতে মৌমাছি পালনের কোন আড্ডা নাই। এমেরিকা ও গ্রেটবিটনে কৃত্রিম উপায়ে মধু উৎপাদনের অনেক আড্ডা আছে। বিদেশী সুবিখ্যাত বীজ ব্যবসায়ীগণ মৌমাছি ও মৌচাক নির্ম্মানের সাজসরঞ্জম কোথায় পাওয়া যাইবে তাহার সন্ধান দিতে পারিবেন। অন্য কেহ জানিলেও আপনাকে জানান যাইবে।

রবার বীজ—

মিঃ বি, এল ডুরা,—লেটিকুজান, আসাম।

রবারের বাগান করিতে চান, তাঁহার বীজের প্রয়োজন।

উত্তর—রবার বীজ ভারতীয় কৃষি সমিতির নিকট নাই। কলিকাতার বাজারে কাহারও নিকট সুপ্রসস্থ আবাদের উপযুক্ত পরিমাণ রবার বীজ মিলিবে না। প্যারা কিম্বা সিয়ারা রবারের জন্য সিংহল ও অষ্ট্রেলিয়ায় অনুসন্ধান করুণ।

বৃক্ষাদির উপর ধোঁয়ার (smoke) ক্রিয়া—

মিঃ মহম্মদ হাদী। রহিস ও জমিদার, মহল্লা চক, আমরোহা ও, আর, আর, মোরাদাবাদ।

তাঁহার ফলেরবাগানের অনতিদূরে একটি ইট পুড়াইবার জন্য উনান্ (Brick klin) করিতে চান। তাহাতে বৃক্ষাদির কোন ক্ষতি হইবে কিনা, ধোয়া লাগিলে গাছ খারাপ হইবার কারণ কি ইহাই জিজ্ঞাস্য।

উত্তর—প্রথমে ধোঁয়ার গাছের কি অপকার হয় তাহা বলা আবশ্যক। ধোঁয়া লাগিলে ঝুল পড়ে। আমরা ঝুল বলিতে কাল সূত্র গুচ্ছের মত কতকটা জিনিষ মনে করি

ঝুল প্রকৃত তাহা নহে। মাকড়সার (Spider) জালে ধোঁয়া লাগিয়া কাল হইয়া যায় এবং তাহা যখন গোছা বাঁধিয়া ঘরের উপরিভাগ হইতে পড়ে তাহাই আমরা ঝুল বলিয়া ধারণা করিয়া লই। ঝুলে প্রকৃতপক্ষে অঙ্গার অতি সুক্ষভাবে থাকে এবং তৈলের ভাগও কিঞ্চিৎ থাকে। যেখানে হাওয়া ধোঁয়া পরিপূর্ণ সেখানে প্রায়ই দেখা যায় বৃক্ষ পত্রাদি উপর ঝুলের পাত্‌লা লেপ পড়িয়াছে।

গাছের পাতায় গাছের ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় থাকে। পাতার উপর ঐ রকম লেপ পড়িলে বৃক্ষগণের বায়ুভক্ষণ ও আলোক প্রাপ্তির বিঘ্ন হয়। এই জন্য বৃক্ষগাত্রে অধিক ধোঁয়া লাগাটা ভাল নয়। নতুবা ধোঁয়ায় যে কার্ব্বনিক অম্ল আছে তাহা বৃক্ষগণের আহার্য্য বস্তু। বড় সহরে বা কল কারখানা বহুল স্থানে বৃক্ষগণের আর একটা অশান্তি হয়। তাহারা তথায় ফস্ফারাম্ল গ্যাস (Sulphurous acid Gas) দ্বারা উৎপীড়িত হইতে পারে। পাথুরে কয়লায় গন্ধক আছে, কয়লা পুড়াইবার সময় এই গ্যাস উৎপন্ন হয় ইহার গ্যাস বৃক্ষশরীরে বিষ ক্রিয়া উৎপাদন করে। সহর ছাড়িয়া পল্লী ভূমিতে গেলে ধোঁয়ার কথা ভাবিবার আবশ্যক হয় না। কারণ ধোঁয়া অবাধ বায়ু প্রবাহের সহিত মিশিয়া পাতলা হইয়া পড়ে ও বৃক্ষশরীরে ঝুলের লেপ দিতে পারে না বা গন্ধকাম্লগ্যাস তাহার বিষ ক্রিয়া উৎপাদন করিতে পারে না।

তাই বলিয়া ফলের বাগানের ৪৫০ ফিট দূরে একটি চিরস্থায়ী ইট বুড়াইবার কারখানা স্থাপন করা ভাল নহে। শীত কালে অনেক সময় বায়ু প্রবাহ থাকে না এবং উপরের হাওয়া ঘণীভূত হয় বলিয়া ধোঁয়া প্রভৃতি দূষিত হাওয়া উর্দ্ধে উঠিতে বা বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িতে পারে না; তখন সন্নিকটস্থ বৃক্ষাদির কিছু না কিছু অপকার করে এই জন্য কল কারখানা বা ইটের কারখানা হইতে বাগান যত দূরে থাকে ততই মঙ্গল।

কোচিনে চর্ম্ম পরীক্ষার কারখানা—

কোচিন রাজ্যে চর্ম্ম রপ্তানির ব্যবসায় ভাল চলিত। যুদ্ধের জন্য অবশ্যই ঐ ব্যাপারে ক্ষতি ঘটিয়াছে। চর্ম্ম পরিষ্করণের জন্য যে বৃক্ষ ত্বকের প্রয়োজন, কোচিনের জঙ্গলে সে গাছও যথেষ্ট আছে। এই সকল দেখিয়া কোচিনের রাজা চর্ম্ম পরিষ্করণের এটী কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার উপযোগিতা বুঝিতে পারেন। কিন্তু ঐ ব্যবসায়ে লাভ কি ক্ষতি হইবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া সহজে লোকে উহাতে টাকা দিতে প্রস্তুত হয় নাই। কোচিন দরবার ইহা দেখিয়া দরবার বা রাজসরকার হইতে উক্ত কারখানার কয়েকটী অংশ ক্রয় করিবেন বলিয়া প্রকাশ করেন। রাজ সরকার হইতে টাকা দেওয়া হইতেছে দেখিয়া যাঁহারা টাকা বাহির করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, তাঁহারাও টাকা বাহির করিয়াছেন। একজন সুশিক্ষিত

ব্যক্তিকে বিলাতে পাঠাইয়া চর্ম্ম পরিষ্করণ কার্য্যে শিক্ষিত করা হইয়াছে। তিনি এক্ষণে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কারখানা প্রতিষ্ঠার আয়োজনাদি করিতেছেন। সম্ভবতঃ শীঘ্রই কারখানার প্রতিষ্ঠা হইবে। কোচিন দরবার এ বিষয়ে যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যদি তাহার অনুসরণ করেন, তাহা হইলে আমাদিগের শিল্পোদ্ধার সুসাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু কতদিনে গবর্ণমেণ্টের অবাধবাণিজ্যের মোহ দূর হইবে বলিতে পারি না।

বাঁধের সংস্কার—

হাওড়া জেলার আমতা থানার অধীন গ্রাম সমূহকে দামোদর প্লাবনের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য হওড়ার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বর্ত্তমান বাঁধাটিকে আরও এক ফুট করিয়া উচ্চ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা ডিষ্টীক্ট বোর্ডের এই সাধু উদ্যম দর্শনে প্রীত হইয়াছি। গতবারে দামোদরের বন্যায় গ্রামবাসীদিগের যে শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা এখনও লোকের স্মরণ আছে। ডিষ্টীক্ট বোর্ড ঐরূপ ঘোর দুর্ঘটনার পরেও লোকের ধন প্রাণ রক্ষায় নিশ্চেষ্ট থাকিলে কলঙ্ক ও প্রত্যবায়ের ভাগী হইতেন।

বঙ্গের জলকষ্ট নিবারণ—

ইহা এক্ষণে একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং উহার সমাধান যে বহু ব্যয়সাধ্য তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু যে উপেক্ষার জন্য জল সংস্থাপন সম্বন্ধে বাঙ্গালার অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়াছে, সেই উপেক্ষা ক্রমাগত প্রশ্রয় পাইতে থাকিলে বাঙ্গালার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। বঙ্গালার জেলায় জেলায় এবং বড় বড় পল্লিতে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে, কর্ত্তৃপক্ষ যদি ঐ সকল সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত পরামর্শ করিয়া পুষ্করণীর পঙ্কোদ্ধার এবং নূতন পুষ্করণী খননের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে সুফল ফলিতে পারে। পুষ্করিণী খনন বিষয়ে সরকারী সাহায্য দানের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু নানা কারণে জনসাধারণ সে সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে না। ডিষ্টীক্ট বোর্ডগুলির উপর পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিবার ভার আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা সেই কাজ কতদূর সুসম্পন্ন করিতেছেন তাহা কর্ত্তৃপক্ষের অবিদিত নহে আমরা আশা করি, সহৃদয় বঙ্গেশ্বর আবার এ বিষয়ে সম্যক আলোচনা করিবেন এবং যাহাতে পল্লী সমূহের জলকষ্ট ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে পারে তৎ সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা করিবেন। তিনি শুভকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, কার্য্যকাল শেষ হইবার পূর্ব্বে যদি আংশিক

ভাবেও তাহা সম্পন্ন না করিতে পারেন তাহা হইলে প্রজার ক্লেশের ও মনস্তাপের সীমা থাকিবে না।

স্বদেশী শিল্পোদ্ধারে রেলওয়ে বোর্ডের চেষ্টা—

এদেশের রেলে দ্রব্যাদি প্রেরণের মাশুল অধিক বলিয়া ব্যবসায়ীদিগকে নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। রেলওয়ে বোর্ডের দৃষ্টি সংপ্রতি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য যদি আমাদিগের এই উপকার টুকু হয়, তাহা হইলেও মঙ্গলের বিষয় বলিতে হইবে। রেলওয়ে বোর্ড বলিয়াছেন যে, যে সকল ভারতীয় শিল্প বৈদেশিকদিগের প্রতিযোগিতায় বিনষ্ট প্রায় হইয়াছে, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার এবং নূতন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষে বর্ত্তমান সময় বিশেষ ভাবে উপযোগী, কারণ এ সময় জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রীয়ার আমদানি রহিত হইয়াছে, তাই ঐ বিষয়ে আনুকূল্য করিবার জন্য রেলওয়ে বোর্ড দ্রব্যাদির মাশুল কমাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমরা বোর্ডের এই চেষ্টা দর্শনে সুখী হইয়াছি। কিন্তু কেবল মালের ভাড়া হ্রাস করিলে কি হইবে? বৈদেশিকদিগের প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্প বিনষ্ট হইল কেন, যুদ্ধের শেষে আবার সেইরূপ প্রতিযোগিতার ভয় থাকিল না, এ সকল প্রশ্নের মীমাংসার উপরেই শিল্পোদ্ধারের প্রকৃত রহস্য নির্ভর করিতেছে।

নীলের কথা—

জার্ম্মানি হইতে কৃত্রিম নীলের আমদানি রহিত হওয়ায় ভারতে নীল উৎপাদন সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। ফেব্রুয়ারি মাসে এ বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য দিল্লীতে একটী কনফারেন্স বসিয়াছিল। আমরা আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে হয়ত এদেশে প্রভূত পরিমাণে নীল উৎপাদনের চেষ্টা হইবে। কিন্তু দেখিতেছি আপাততঃ তাহা করা হইবে না। যে নীল উৎপন্ন হয়, বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহা পরিষ্কার করিয়া কৃত্রিম নীলের অনুরূপ করাই কমিটির মতে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কমিটি এজন্য গবর্ণমেণ্টকে একজন বিশেষজ্ঞের নিয়োগ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এখনও পর্য্যন্ত ঐ বিশেষজ্ঞের নিয়োগ হয় নাই। আমাদিগের মতে নীলের চাষের পুণরাবাদ হউক তাহাতে আপত্য নাই কিন্তু সেই সঙ্গে এ দেশে কৃত্রিম উপায়ে নীল উৎপাদনের চেষ্টা করিলে ভাল হয়।

৫০/০ বিঘা বাগানের জন্য কৃষি-বল—

মিঃ জি হক্, ভগবান গোলা মুর্শীদাবাদ।

৫০/০ বিঘা জমিতে ফলের বাগান করিতে চান; তজ্জন্য কয়খানি হাল লাঙ্গল বা কয়জন মালী ও মজুর আবশ্যক জানিতে চান।

উত্তর—এক খানা লাঙ্গল এবং তিনটি বলদ হইলে ৫০ বিঘা ফলের বাগানের কার্য্য চলিতে পারে। কৃষিক্ষেত্র হইলে ২ খানা লাঙ্গল ৩ জোড়া বলদ না হইলে চলিবে না, কারণ কৃষি ও সব্জী ক্ষেত্রে লাঙ্গলের কার্য্যই অধিক। ফলের বাগানের অনেক কার্য্য কোদাল দ্বারা সারিতে হয়। প্রতি লাঙ্গলের সঙ্গে একটি হিসাবে জিরেন বলদ থাকিলে সকালে বিকালে লাঙ্গল চালান যাইতে পারে এবং একখানা লাঙ্গলে দুই খানা লাঙ্গলের কার্য্য হয়। একজন লাঙ্গলবাহী মজুর, একজন সর্দ্দার মালী স্থায়ী ভাবে রাখিলে চলিবে। কিন্তু বৎসরে বর্ষারম্ভে একবার এবং বর্ষাবসানে কার্ত্তিক মাসে একবার নগদ মজুর করিয়া বাগানের বন পরিষ্কার ও বাগানের ধারভিত কোপাইয়া লওয়া ও গাছের গোড়ায় নূতন মাটি দেওয়া ইত্যাদি কার্য্য করিয়া লইতে হয়। ইহাতে একশত হইতে দেড়শত টাকা বৎসরে খরচ হয়। এতদ্ব্যতীত বাগানের ফলমূলাদি বিক্রয়ার্থ হাটে বাজারে যাইবার জন্য একটি লোক প্রয়োজন। এই জন্য মাহিনাভোগী চাকর নিযুক্ত না করিয়া কমিশন এজেণ্টের মত একটি লোক রাখিলে লাভ আছে। মাহিনার চাকরের অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয় কিন্তু কমিশন এজেণ্টকে কাজ করিলে তবে পয়সা দিতে হইবে। খরচের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না করিলে বাগানে আয় করা কঠিন।

বঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠা—

যখন স্বদেশী আন্দোলন পুরাদমে চলিতেছিল তখন ধনী দরিদ্র সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে এক নূতন যুগ আসিয়াছে। মধ্য বিত্ত লোক বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছিলেন তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠায় অর্থার্জ্জনের নূতন পথ প্রস্তুত হইবে। সেই সময় পেন্সিলের, দেশালাইয়ের, সাবানের, কাপড়ের, মোজা ও গেঞ্জীর, চামড়া পরিষ্কার করিবার কল সংস্থাপিত হইয়াছিল, বড় বড় ধনীরা এই সব যৌথ কারবারে আকৃষ্ট না হইলেও মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্নগণের সঞ্চয় হইতে মূলধন সংগৃহীত হইয়াছিল। কোম্পানীগুলির ডিরেক্টার ও তত্ত্বাবধারকগণ অধিকাংশই বাঙ্গালী। যদি এই সব অনুষ্ঠান আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিত, তবে বাঙ্গালার শিল্প-প্রতিষ্ঠা-কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই। নানা কারণে এই সব অনুষ্ঠানে আশানুরূপ সাফল্য লাভ হয় নাই—অধিকাংশ কোম্পানীই কাজ বন্ধ করিয়াছে—দুই একটি এখনও কোনরূপে দাঁড়াইয়া আছে। ইহার কারণ কি?

স্বদেশী শিল্প সম্বন্ধে মিঃ সোয়ানের সিদ্ধান্ত—

মিষ্টার সোয়ান অনুসন্ধান করিয়া ও কর্ম্মকর্ত্তাদের সহিত আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উপকরণ ও শিক্ষিত শ্রমজীবী সংগ্রহে অসুবিধা এবং টাকা পাইবার অসুবিধা অনেক স্থলে ব্যবসার সর্ব্বনাশের কারণ হইলেও প্রধান কারণ—

(১) অপর্য্যাপ্ত মূলধন।

(২) অনুপযুক্ত তত্ত্বাবধান

যাহারা এইসব অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা অনভিজ্ঞতা হেতু অপর্য্যাপ্ত মূলধন লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করিবার ফল অনুমান করিতে পারেন নাই। অনেক স্থলে আবশ্যক মূলধনের অনেক টাকা সংগৃহীত হইলেও—কাজ চলিলে টাকা মিলিবে, এই আশায় কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল। ফলে মূল ধনের অভাব হেতু কাজ বন্ধ করিতে হইয়াছে।

ব্যবসাদারী শিক্ষার উপায় কি ?—

জলে না নামিলে সাঁতার শিক্ষা করা যায় না। স্বদেশে কিম্বা বিদেশে বড় বড় কল কারনায় শিক্ষানবিস্ হইয়া কিছুকাল না কাটাইলে উপায় নাই। ইহার উপায় গবর্ণমেণ্ট মনে করিলে সহজে করিতে পারেন।

মূলধনের অভাবে কোন ব্যবসাই চলিতে পারে না। আবার ভারতবাসীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ব্যবসায় পর্য্যাপ্ত মূলধন না থাকিলে কাজ কিছুতেই চলে না। কারণ, ব্যাঙ্ক এসব কারখানাকে টাকা ধার দিতে নারাজ; কলওয়ালারাও এসব কারখানায় ধারে কল বেচেন না; ইহাদিগকে নগদ দাম দিয়া উপকরণ কিনিতে হয়। যে সব কোম্পানী ধারে উপকরণ পায় না কিন্তু বেপারীদিগকে ধারে মাল দিতে বাধ্য হয় সে সব কোম্পানীর অসুবিধা অনিবার্য্য।

ভারতে টাকার বড় অভাব। বিলাতের মত এ দেশে মধ্যশ্রেণীর হস্তে প্রচুর অর্থ নাই। মাড়োয়ারীদিগকে ছাড়িয়া দিলে, এদেশের জমীদারগণ এবং জনকতক উকীল ডাক্তার প্রভৃতিই ধনী। তাঁহারা হয় টাকা দিয়া জমীদারী কিনেন নহে ত টাকা ধার দিয়া সুদে বাড়ান। ব্যবসায়ে লাভ অনিশ্চিত এবং শতকরা বার্ষিক ছয় টাকার অধিক হইবার সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু কতগুলি যৌথ-কারবারের দুর্দ্দশায় ধনীগনের আশঙ্কা ও-অবিশ্বাস বর্দ্ধিত হইয়াছে।

অনুপযুক্ত তত্ত্বাবধানে বাঙ্গালার অনেক কোম্পানীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলন সময়ে যে ভারতে কোম্পানীগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালীর অর্থে স্থাপিত ও বাঙ্গালীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হওয়াই অনিবার্য্য ছিল। কিন্তু বাঙ্গালায় ব্যববসাব্যাপারে ডিরেক্টার বা অধ্যক্ষ হইবার উপযুক্ত অভিজ্ঞতাশালী লোক ছিলেন না।

বঙ্গদেশে বুদ্ধিমান—স্ব স্ব অবলম্বিত ব্যবসায়ে প্রতিপত্তিশালী লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহারা যৌথ-ব্যবসা-ব্যাপারে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিবার অবকাশ পান নাই। ব্যবসাক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরই প্রয়োজন। ব্যবসা প্রধান দেশে ব্যবসায় অভিজ্ঞ লোক হইলে কোম্পানীর ডিরেক্টার ও অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। এরূপ লোকের অভাবে বঙ্গদেশে অনভিজ্ঞ লোককেই নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ফলে ব্যবসায় লোকসান হইতেছে। একটী কোম্পানী কল কিনিয়া পরে বুঝেন, সে কল কার্য্যোপযোগী নহে।

কারখানার অধক্ষ্য পাওয়া সহজ সাধ্য হয় নাই। যে সব যুবক য়ুরোপ, আমেরিকা, হইতে শিল্প শিক্ষালাভকরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল—অগত্যা তাহাদিগকেই কার্য্যভার দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা ভাল কারিকর হইতে পারিত কিন্তু তাহাদের উপর কর্য্যাধ্যক্ষের ভার চাপানতে সকল দিক নষ্ট হইয়াছে। জিনিষ প্রস্তুত করিতে শিখিয়া তাহারা আসিয়াছিল—জিনিষ কেনা বেচা, বাজার বুঝা—লোকখাটান—ব্যবসা পদ্ধতি বিধি বদ্ধ করা এসব বিষয়ে তাহাদের অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই তত্বাবধানের দোষে অনেক ব্যবসা নষ্ট হইয়াছে।

যশোহরের চিরুণী—

আমারা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর তাঁহার নিত্য ব্যবহার্য্য চিরুণী সরবরাহ করিবার জন্য যশোহর চিরুণী ও বোতামের কারখানায় আদেশ করিয়াছেন এবং উক্ত কোম্পানীকে লাট বাহাদুর একখানি নিয়োগ পত্র প্রদান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের একটু সহায়তা লাভ করিলে দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি অতি সহজে হইয়া থাকে। দেশীয় শিল্পের উন্নতি চেষ্টা করিয়া লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর জনসাধারনের কৃতজ্ঞ ভাজন হইয়াছেন। এই কোম্পানীর মূলধন এক্ষণে দুই লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এইবারে যশোহরের চিরুণী যাহাতে বাজারে সর্ব্বত্র পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা হইবে।

বঙ্গেশ্বর ১৯১৫ শালের ১৫ই জানুয়ারি তারিখে যশহরের কারখানাটি পরিদর্শণ করেন এবং তথাকার কার্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বলেন যে যশোহরের চিরুনি আড়াই বৎসর যাবৎ তিনি ব্যবহার করিতেছেন। ইহা ব্যবহারে সুখকর বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

উদ্ভিদ সেলুলয়েড হইতে চিরুনি প্রস্তুত হইতেছে। কর্পূর ও তুলা বৃক্ষ হইতে এই উপাদান সংগ্রহ হইতে পারে। কোম্পানি এক্ষণে বঙ্গে তুলা ও কর্পূর চাষের প্রবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কর্পূর অনেক কাজে লাগে বঙ্গে কর্পূরের আবাদ হইলে প্রভূত উপকার হইবে।

মিঃ এম, এন ঘোষ এই কারখানার কার্য্যাধক্ষ্য—তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। অনেক গণ্য মান্য অংশীদার আছেন। কারখানার উন্নতি দেখিয়া আমাদের আশার সঞ্চার

হয়। বিশেষ সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে ইহার আরও উন্নতি হইলে স্বদেশী যৌথ-কারখানার আকাশ ধ্বংশের অপকলঙ্ক তিরোহিত হইতে পারে এবং যাহা আমরা বারম্বার বলি সে দোষ স্বদেশীর নহে—দোষ কার্য্য পরিচালনের ও দোষ মূলধন অভাবের তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপন্ন হইবে।

চাউলের দুর্ম্মূল্যতা—

ভারতে সর্ব্বত্র গোধূমের মূল্যে হ্রাস পাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালায় চাউলের দর দিন দিন বাড়িতেছে। বাঙ্গালার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বরিশালে গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে চাউলের বাজার মণকরা এক টাকা চড়িয়া গিয়াছে। জ্যৈষ্ঠের সূচনায় যখন চাউলের বাজার চড়িতেছে, তখন শ্রাবণ ও ভাদ্রে বাজার যে আরও গরম হইবে ইহা অনায়াসে অনুমান করা যায়। তণ্ডুলের মূল্য বৃদ্ধির জন্য মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত লোকদিগের কষ্ট অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেঙ্গুনের চাউল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমদানি হওয়াতে লোকে এখনও এক মুঠা অন্নের মুখ দেখিতেছে, নচেৎ অবস্থা আরও সঙ্কটজনক হইয়া উঠিত।

চাঁদপুরে অন্নকষ্ট ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে। দরিদ্রভাণ্ডার নামে এক সমিতি খুলিয়া অন্নকষ্ট পীড়িত লোকদিগকে সাহায্য করিবার চেষ্টা হইতেছে।

নারায়ণ গঞ্জে দারুণ অন্নকষ্টের কথা শুনা যাইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানেই প্রজা সাধারণ অন্নকষ্টে পীড়িত এ কথা সকলেই জানেন। গবর্ণমেণ্ট প্রজার প্রাণরক্ষার্থ তাগাবী হিসাবে ধার দিবার কিছু কিছু ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সামান্য অর্থ সাহায্য বর্ত্তমান অবস্থায় পর্য্যাপ্ত নহে।

বৈদেশিক বাণিজ্য—

বিলাতে কমন্স সভার অন্যতম সভ্য মিঃ রান্সিম্যান বলিয়াছেন যে, শত্রুর সহিত বাণিজ্যসম্পর্ক রক্ষা সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত চীনদেশের জর্ম্মণ সওদাগরগণের সহিত বৃটিশের বাণিজ্য-বিনিময় একেবারে রহিত হয় নাই; তবে যাহাতে চৈনিক পণ্য জর্ম্মণ ব্যবসাদারের মারফতে না গিয়া বৃটিশ সওদাগরগণের হাতে চালান হয়, তজ্জন্য বিধিমত চেষ্টা হইতেছে। ভারতে জর্ম্মণ পণ্য প্রতিরোধ সম্পর্কে মিঃ রবার্টস বলেন—"কলিকাতায় অষ্ট্রীয় ও জর্ম্মণ পণ্যজাতের প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল—বোম্বাই ও মান্দ্রাজ সহরে সেইরূপ প্রদর্শনী খোলা হইবে, ঐ সমস্ত পণ্যের প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিবরণপূর্ণ পুস্তিকা ভারতের সর্ব্বত্র বিতরিত হইয়াছে। তা' ছাড়া ভারতজাত কাঁচামাল যাহাতে বিলাতের

বাজারে প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাণিজ্য বোর্ডের জনৈক বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন।”

গুজরাটে ষ্টীম লাঙ্গল—

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টগেজেটে প্রকাশ, গুজরাটের ধারোয়ার জেলায় মাটির নীচে এক প্রকার কীট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা জমিতে জন্মিলে ফসলের সমূল কাটিয়া অনিষ্ট করে। এই ক্ষতি নিবারণের জন্য ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তত্রত্য এগ্রিকালচারার ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শে বিলাত হইতে কলের লাঙ্গল আনাইয়। গুজরাটের জমীতে তাহার উপযোগিতা পরীক্ষা করা হয়। ষ্টীম লাঙ্গলে প্রায় আড়াই হাজার বিঘা জমী ১৬ হইতে ১৮ ইঞ্চ (১ হাত) গভীর করিয়া খোঁড়া হইয়াছিল—তাহাতে খরচ ও মুলধনের সুদ বাদে মোট ছয় শত টাকা লাভ দাঁড়াইয়াছে। পরীক্ষা সন্তোষ জনক প্রতিপন্ন হওয়ায় কইরা জেলার মাজিষ্টেটও সরকারী ব্যয়ে একটী কলের লাঙ্গল আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গুজরাটের মাটী পশ্চিমা মাটীর ন্যায় কঠিন, সুতরাং সেখানে বিলাতের মত বড় বড় কৃষিক্ষেত্র খুলিলে কলের লাঙ্গলে হয়ত উত্তম চাষ চলিতে পারে, কিন্তু গরীব প্রজার টুকরা জমী চষিতে তাহা কিরূপে কাজে লাগিবে ? বঙ্গালার পলি মাটীতে যে কলের লাঙ্গল চলিতেই পারে না তাহা সরকারী পরীক্ষায় বহুবার প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বাগানের মাসিক কার্য্য

শ্রাবণ মাস

সব্জীবাগান।—এই সময় শাকাদি সীম, ঝিঙ্গে, লঙ্কা, শসা, লাউ, বিলাতী ও দেশী কুমড়া, পুঁই, বরবটি, বেগুণ শাঁকালু, টেঁপারি প্রভৃতি, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম, ইত্যাদি দেশী সব্জী ক্রমান্বয়ে বপন করিতে হইবে।

পালম শাক ও টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতী সব্জী বীজ—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতি বপনের এখনও সময় হয় নাই।

এ বৎসর বর্ষা জলদি, তথাপি মোকাই (ছোট) এবং দে-ধান চাষের এখনও সময় যায় নাই।

ফুল বাগিচা।—দোপাটি, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা), এমারন্থাস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম, (Sun-flower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুল বীজ

লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া তাহা হইতে দুই একটী গাছ লইয়া অন্যত্র রোপন করিয়া নূতন ঝাড় তৈয়ারি করা যায়।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের কলম অর্থাৎ ডাল, কটিং করিয়া পুতিয়া চারা তৈয়ারি করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, যুঁই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ক্যানা, লিলি প্রভৃতির পট বা গাম্‌লা বদ্‌লাইবার সময় বর্ষারম্ভ, কেহ কেহ সময় না পাইলে আষাঢ় শ্রাবণ পর্য্যন্ত এই কার্য্য শেষ করেন। মূলজ ফুল গাছের মূল বর্ষায় বসাইয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। কতকগুলির মূল বর্ষাকালে গামলায় তুলিয়া না রাখিলে জল বসিয়া পচিয়া যায়। ডালিয়া এই শ্রেণীভুক্ত।

কলিয়স, ক্রোটন, আমারান্থাস, একালিফা প্রভৃতির ডাল কাটিয়া পুতিয়া এই সময় বাড়াইতে পারা যায়।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ এখন বসাইতে পারা যায়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে, কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন ঘণ ঘণ বৃষ্টি হয়ওায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া গাছ মারা না যায়। আম, লিচু, কুল, পীচ ও নানাপ্রকার লেবু গাছের গুল-কলম করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এখনও কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় কলন করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের গাছের ফেঁকড়িগুলি ভাঙ্গিয়া বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পীচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারি করিতে হয়। পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

ভরা বর্ষাতেই পেঁপে বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু চারা তৈয়ারি করিয়া ভাদ্রমাসের আগেই চারা নাড়িয়া না পুতিলে ভাদ্রের রৌদ্রে চারা বাঁচান দায় এবং জমিতে ঘাস পাতা পচানি হেতু জমি অম্লাক্ত হওয়ায় তখন চারার অনিষ্ট হয়। চারাগুলি তিন চারি পাতা হইলে, যখন বৃষ্টি হইতে থাকে তখন নাড়িয়া বসান উচিত।

যাঁহারা বেড়ার বীজের দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তুর মত গজাইতে পারে।

শস্যক্ষেত্র।—কৃষকের এখন বড় মরসুম। বিশেষতঃ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতক স্থানের কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত,।

পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানে পাট কাটা হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার দক্ষিনাংশ পাট নাবি হয়। ধান্ত রোপণ শ্রাবণের শেষে শেষ হইয়া যাইবে! আষাঢ় মাসে বীজ ধান্ত বপনের উপযুক্ত সময়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ায় মাটি বিচালিত করা কর্ত্তব্য। সুপারি গাছের গোড়ায় এই সময়ে গোবর মাটি দিতে হয়। এই সময়ে ঐ সকল গাছের গোড়ায় সামান্ত পরিমাণ কাঁচা গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। ফলের গাছে হাড়ের গুঁড়া এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুন, মেহাগ্নি, খদির, কৃষ্ণচুড়া, রাধাচুড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয় দৃষ্টি রাখা ও ক্ষেতের পয়নালা ঠিক করিয়া রাখা এই সময় বিশেষ আবশ্যক।

যদি দেখিতে পাও, কোন লতা গুল্মের গোড়ায় অনবরত অত্যধিক জল বসিয়া ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলে তাহার আইল ভাঙ্গিয়া দিয়া এরূপে নালা কাটাইয়া দিবে যেন শীঘ্র গাছের গোড়া হইতে জল সরিয়া যায়। কলার তেউড় এমাসে পুতিলেও হইতে পারে। বেগুণ, আদা ও হলুদের জমি পরিষ্কার করিয়া গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিবে। আখের গাছের কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া আর কতকগুলি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিবে। গাছগুলি যখন বেশ বড় হইয়া উঠিবে তখন নিকটস্থ চারি গাছা আখ একত্রে বাঁধিয়া দিবে, নহিলে বাতাসে গাছ হেলিয়া পড়িবে কিম্বা ভাঙ্গিয়া যাইবে। যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র পায়, সেই স্থানের উত্তমরূপে চাষ দেওয়া জমিতে সারি করিয়া লঙ্কার চারা পুতিবে। এই মাসের প্রথম পনর দিনের মধ্যে লঙ্কা পুতিতেই হইবে, নচেৎ গাছ ও ফল ভাল হয় না। রৌদ্র না পাইলে লঙ্কার ঝাল হয় না। যে দোয়াঁস মাটিতে বালির অংশ কিছু বেশী আছে সেইরূপ জমিতে এক কি দেড় হাত অন্তর দাঁড়া বাঁধিয়া ঐ দাঁড়ার উপর আধ হাত অন্তর তুইটী করিয়া শাঁকআলুর বীজ পুতিবে। শাঁকআলুর ক্ষেত সর্ব্বদা আল্গা ও পরিষ্কার রাখিবে। এই মাসের শেষ কিম্বা ভাদ্রের প্রথমে আউশ ধান কাটে।

বাগানের বেড়া।—আষাঢ় মাসে বৃষ্টি আরম্ভ হইলেই ক্ষেতের বা বাগানের চারিদিকে বেড়ার বীজ বপন করিয়া বেড়া প্রস্তুত করিয়া লওয়া আবশ্যক। লোকে বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র ঘিরিয়া রাখিতে পারে না। ক্ষেতে যখন ফসল থাকে তখন সকল চাষীই গরু বাছুর আটক করিতে চেষ্টা করে এবং গৃহস্ত গো মহিষাদি চরিতে ছাড়িয়া দিলে তাহাদের বিরুদ্ধে ঘোর আপত্য করে। কিন্তু সকলকেই বাগান ঘিরিতে হইবে নতুবা গো মহিষ ছাগলের উৎপাত হইতে রক্ষা হইবার কোন উপায়ান্তর নাই। চিরস্থায়ী বেড়ার জন্য অনেকে ভুরেণ্টা বা মেহদী, ত্রিপত্রা বা চিতার বেড়া দেন। ডাল পুতিয়া হউক বা বীজ ছড়াইয়া হউক বেড়া প্রস্তুত করিতে হইলে বর্ষাকালই উপযুক্ত সময়। জ্যৈষ্ঠ হইতে এই বিষয়ে যত্নবান হইতে হয়, শ্রাবণ পর্য্যন্ত চেষ্টায় বিরত হইতে নাই। পচা ভাদ্রে বা নিতান্ত শীত কিম্বা গ্রীষ্মে বেড়া প্রস্তুত করা চলে না।
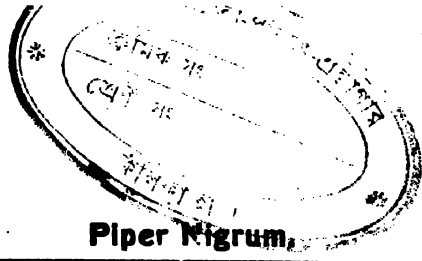
Piper Nigrum.

পিপার বা পিপুল গাছ কাঁটাল গাছে উঠিয়াছে।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৬শ খণ্ড। | শ্রাবণ, ১৩২২ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা।

মশালা

(Spices, condiments and perfume producing plants)

রসায়ন তত্ত্ববিদ্ শ্রীনলিনবিহারি মিত্র এম,এ লিখিত।

মশালা জিনিষটা য়ুরোপের লোকে অল্প স্বল্প ব্যবহার করিয়া থাকে কিন্তু ভারতে ইহার ব্যবহার অত্যধিক। ভারতের লোকে রন্ধনে মশালা ব্যবহার করে, পানে মশালা চর্ব্বন করে, গাত্রে মাখিবার তৈল মশালাদ্বারা সুগন্ধযুক্ত করে। এ দেশে ভাত, ডাল, ফলমূল তরকারির যেমন ব্যবহার তাহার সঙ্গে মশালারও আবশ্যক। দুই চারিখানা মশালা না হইলে এদেশের লোকের তরকারী রান্না হয় না। য়ুরোপ ও অন্যান্য দেশের লোকে সিদ্ধ পক্ক প্রভৃতি লবণ সংযোগে আহার করিয়া থাকে—বড় জোর তাহাতে রাই কিম্বা মরিচ গুড়া ব্যবহার করিল; মশালার অত্যধিক ব্যবহারে দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু মশালা সংযোগে যখন ব্যঞ্জনাদি সুঘ্রাণ, সুস্বাদ হয় তখন মশালা ব্যবহার গুণের, দোষের নহে। যে আহার্য্য বস্তু আঘ্রাণে মন প্রফুল্ল হয়, রসনায় রস সঞ্চার হয়, যাহা চর্ব্বণ কালে অধিকতর লালা নিঃসরণ হয় তাহাতে উপকার ব্যতীত অপকার সম্ভবে না। হরিদ্রা মরিচাদি অনেক মশালা দ্বারা শরীরের অনিষ্টকারী জীবাণু নষ্ট হয়। এই কারণে বোধ হয় এতদ্দেশে তরকারী ও মৎস্যাদিতে, হরিদ্রা লবণ মাখাইবার নিয়ম আছে। এতএব এই বহু গুণযুক্ত মশালা গুলির আত্ম পরিচয় জানিয়া রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য। কোন্ বংশে ইহাদের জন্ম, কোন্‌টি ইহাদের স্বদেশ, কোন্ কাজেই বা লাগে ইত্যাদি যথাসম্ভব পরিচয় বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শরিষা—তিন রকম শরিষা দেখিতে পাওয়া যায়, শ্বেত শরিষা, কৃষ্ণ শরিষা, পাটল বর্ণ ভারতীয় শরিষা। শ্বেত শরিষা য়ুরোপ এফ্রিকা, এসিয়া সর্ব্ব দেশেই আছে। কাল শরিষাও সর্ব্বত্র মিলে। ভারতীয় পাটল বর্ণ শরিষা ভারতেই বিশেষত দেখা যায়। কাল শরিষা অপেক্ষা শ্বেত শরিষার ঝাঁজ কম। ভারতীয় শরিষা (Brassica juncea) ইহার জন্ম ভারতে, ইহার বিস্তার এসিয়া মহাদেশে। চীন রাজ্যে এই প্রকার শরিষা বহুল জন্মে। তৈল ভাল এবং অন্য শরিষা অপেক্ষা ইহাতে তৈল অধিক। ইহা ঝোলে, ঝালে, অম্বলে সর্ব্ব রকমে মশালা রূপে ব্যবহার হয়। আচার, চাট্‌নি তৈয়ারি করিতে শরিষা না হইলে হয় না। য়ুরোপের লোকে শাদা সরিষার গুড়া বোতোলে পুরিয়া রাখে এবং কোন সিদ্ধ বা ভাজা আহার্য্য দ্রব্যে মাখাইয়া খায়। য়ুরোপে কিম্বা এমেরিকায় লোকে কোন আহার্য্য পদার্থে তৈল মাখাইয়া খাইতে জানে না। ভারতের শরিষা তৈল রন্ধনে ব্যবহার হয়, এবং ভাজা পোড়ায়, ভাতে শরিষা তৈল না মাখাইয়া কেহ খায় না। য়ুরোপ, এমেরিকার লোকে সে কাজ কাচা গুঁড়া দ্বারা সারে। শরিষার তৈলের ভেষজ গুণ আছে,—ইহা মর্দ্দনে কফ, কাশি, বাত আরোগ্য হয়। শরিষার গুড়ার প্রলেপে শারীরিক অনেক ব্যাধি সারে। ইহা মশালার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মশালা বলিলেও বলে। শরিষার শাকও ব্যঞ্জনে ব্যবহার হয়।

ভারতে শরিষার চাষ প্রচুর এবং গুণাধিক্য বশতঃ ভারতীয় শরিষা, য়ুরোপে ও এমেরিকার বাজারে চালান যায়। শরিষা, ক্রুসিফেরি (Cruciferae) জাতির অন্তর্ভূক্ত।

মির—আরব দেশের উষর জমিতে মির নামক (Myrrh) এক প্রকার ছোট গাছ জন্মে তাহার নির্য্যাশ বেশ সুগন্ধযুক্ত ও আটাবৎ তৈলাক্ত। ইজিপ্ট ও আরবদেশে ইহার প্রচুর ব্যবহার। ইহা জাতিতে বর্ষেরেসি (Bruseraceæ) এবং বর্ণে বাল্‌সাম্ (Balsam) গাঁদা শ্রেণীভুক্ত।

পিমেণ্টা—আরব দেশ থেকে যেমন মির আসিয়াছে তেমনি জ্যামেকা হইতে একটি মশালার গাছ এদেশে আসিয়াছে তাহার একাধারে অনেক গুণ। এই জন্য ইংরাজিতে নাম (Allspice), ইহাদের শাস্ত্রীয় নাম পিমেণ্টা (Pimenta)। ইহারা দুই সহোদর পিঃ অফিসিয়ানালিস্ (Officianalis) পিঃ সিট্রীফোলিয়া (Citrifolia)। দুইটি গাছই ভাল সারবান জমি মিলিলে গ্রীষ্মমণ্ডলে যথাতথা জন্মিতে পারে। গাছগুলি ছোট ছোট, সদাই সবুজবর্ণে সাজিয়া আছে। ফলগুলি বৈঁচের মত ছোট। এইগুলি শুষ্কাবস্থায় মশালা রূপে ব্যবহার হয়। ইহাতে নাকি একাধারে দারুচিনি, জায়ফল ও লবঙ্গের গন্ধ আছে। জামেকায় ইহার বন আছে। গাছগুলি ছোট হইলেও বেশ ঝাড়াল হয়। একটা গাছ হইতে বৎসরে ৭০।৭৫ সের ফল পাওয়া যাইতে পারে। জ্যামেকা হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ১০।১২ লক্ষ টাকার এই পিমেণ্টা ফল রপ্তানি হয়। ভারতের

লোকে অনেকেই হয়ত ইহার সন্ধান রাখে না কিন্তু প্রকারান্তরে ব্যবহার করিয়া থাকে। পিঃ সিষ্ট্রীফোলিয়ার পাতা ও ফুলের কুঁড়ী হইতে সুগন্ধ সুরাসার প্রস্তুত হইতে পারে। পাতাগুলি মিঠাই মিষ্টান্ন সুগন্ধ করিতে ব্যবহার হয়। যে সন্ধান লইতে জানে সে অনেক খবরই রাখে কিন্তু অধিকাংশ লোকে অনেক দ্রব্য আহার করে বটে কিন্তু কোন্‌টা কি বস্তু তত্ত্ব লইতে ইচ্ছা করে না।

হরিদ্রা (Turmric)—ব্যঞ্জনে রঙ করিবার নিমিত্ত ইহার প্রধানতঃ ব্যবহার। এতদ্দেশে এমন ব্যঞ্জন রন্ধন হয় না যাহাতে হরিদ্রা ব্যবহার না হয়। মোগলাই রন্ধনে হরিদ্রা অপেক্ষা জাফ্রাণের ব্যবহারই সমধিক। জাফ্রাণ (Safron) হরিদ্রা অপেক্ষা সুঘ্রাণ ও সুস্বাদু। ভারতে জাফ্রাণের জন্ম হিমালয়ে শৈল মালার উপরে—কাশ্মিরে ইহার বড় ক্ষেত আছে। আদা হলুদের মত ছোট ঝাড়াল গাছ হয়। গাছগুলি মুকুলিত হইলে হলুদে রঙে বাগান আলোকিত করে এবং ফুল ফুটিয়া উঠিলে চতুর্দ্দিক গন্ধে আমোদিত হয়। হলুদ, সরস মৃত্তিকায় যথাতথা হয় কিন্তু শীত প্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশ ব্যতীত জাফ্রাণ হয় না। ব্যঞ্জন রঞ্জিত করা ছাড়া অন্যান্য দ্রব্য রঞ্জনে ইহার ব্যবহার হয়। অন্য বস্তু রঞ্জনে হরিদ্রা ব্যবহারও বিশেষতঃ দেখিতে পাওয়া যায়।

অল্প ছায়া যুক্ত স্থানে হলুদ হইতে পারে কিন্তু মাঠে চাষ করিলে হলুদ বেশ রংদার হয়। চাষ সহজ।

জাফ্রাণ Saffron (crocus sativus)—চিন সাম্রাজ্য, ফ্রান্স এবং ভারতের মধ্যে কাশ্মিরে ইহার আবাদ সমধিক পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। আদা হলুদের মতই ইহার চাষ। হিন্দুরা পূজাদিতে জাফ্রাণ ব্যবহার করিয়া থাকে। খাদ্যাদি—মিঠাই পক্কান্নাদি রঙ করিতে এবং সুঘ্রাণ করিতে ইহা হিন্দু মুসলমান কর্ত্তৃক সমভাবে ব্যবহৃত হয়।

আদা (Ginger)—হলুদের মত ইহার চাষ প্রণালী। হলুদের মত দোয়াস মাটিতে ইহার আবাদ ভাল হয়। ইষৎ ছায়াযুক্ত স্থানে আদা খুব বাড়ে। ঔষধে ও রন্ধনের মশালায় ইহার ব্যবহার। এসিয়া মহাদেশে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ইহা চাষ অধিক। সরস সারবান জমি ইহার উপযুক্ত। আদার আচার করে, চাট্‌নিতে আদা ব্যবহার হয়। গ্রেটবিটেন প্রতি বৎসর ৭০।৮০ হাজার পাউণ্ড আদা আমদানি করে। চীন ও রুসিয়ার আদা, চা ও মদ্য সুঘ্রাণ করিতে প্রয়োজন হয়। ওয়েষ্টইণ্ডিসে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল আদা হয়। আদা পরম হিতকারী ইহাতে কফ্, কাশী, অজীর্ণ দোষ দূর হয়। ইহা এলোপাথি ঔষধের মশালা ও কবিরাজী ঔষধের অনুপান।

আম আদা (Mango Ginger-Curcuma Amada Roxb.)—বাঙলা মুল্লুকে বন্য অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে ইহার চাষও করে। চাট্‌নি, ডাউল প্রভৃতি

রন্ধনে ইহার আবশ্যক হয়। মিষ্টান্ন সুগন্ধ করিতেও প্রয়োজন। কলিকাতায় প্রসিদ্ধ আম সন্দেষে আম আদার রসে আম্র গন্ধ করা হয়।

ক্যারম কুরি বন্য জাফ্রাণ (Carceway seed, carum carui Liun)—কাশ্মিরে বন্য অবস্থায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে হিমালয়েব উত্তর পশ্চিম অংশে কাশ্মিরে ইহার চাষ হইতেছে। পর্ব্বতের উপত্যকায় শীতকালে ইহার চাষ হয়। বীজ আস্ত কিম্বা চূর্ণ করিয়া ব্যঞ্জনে ও মিষ্টান্নে ব্যবহার করা হয়। খাদ্য বস্তু সুঘ্রাণ করিতে ইহার প্রয়োজন। বেন্থ বীজ (carum copticum, Benth)—ইহাও ক্যারাম জাতীয়, বীজ চূর্ণ করিয়া ব্যঞ্জনাদি সুঘ্রাণ করা হয়।

আরও দুই এক জাতীয় ক্যারম আছে। তাহাদেরও ব্যবহার এই প্রকারে হয়।

লঙ্কা (Chilies and Capsicum)—বছরকি—বৎসর ফলা—ফল হইলে যাহার গাছ মরিয়া যায় ও চিরস্থায়ী এই দুই প্রকার লঙ্কা আছে। এমেরিকাই লঙ্কার স্বদেশ, এমেরিকা হইতে ভারতে আসিয়া লঙ্কা তাহার খুব আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। লঙ্কার ঝাল না হইলে ভারতবাসীর তরকারী সুস্বাদ লাগে না, লঙ্কার নামে লোকের জিহ্বায় জল আসে। এখানে বড় বড় ক্ষেতে বছরকি লঙ্কার চাষ হয়। লঙ্কা কাঁচাও তরকারিতে দেয় ও শুখাইয়া রাখা হয় এবং সারা বৎসর ধরিয়া রন্ধনের মশালা স্বরূপ ব্যবহার হয়। রন্ধনের ইহা খুব পাকা মশালা।

অনেক রকমের লঙ্কা আছে কুল লঙ্কা, লম্বা লঙ্কা (Long Chililes) টমাটো আকৃতি লঙ্কা, সূর্য্যমণি লঙ্কা, সূর্য্যমুখী লঙ্কা। সূর্য্যমণি, সূর্যামুখী ইহারা স্থায়ী লঙ্কা। বাঙলা দেশে সকল গৃহস্থের বাটিতে ইহাদের গাছ আছে। কাঁচা লঙ্কার স্বাদ অধিক, যে সময় কাচা লঙ্কা লোকে পায় না এই লঙ্কা গুলি তখন কাঁচা ব্যবহার হয়।

খুব ঝাল লঙ্কা আছে, আবার অপেক্ষাকৃত মিষ্ট লঙ্কা আছে যেমন সুইট স্পানিশ লঙ্কা (sweet spanish)। শেষোক্ত লঙ্কা ব্যঞ্জনের সজীর মত ব্যবহার করা যায়।

লঙ্কায় এক প্রকার খার পদার্থ আছে যাহার নাম কেপ্রিসিন্ (copricine)। গ্রীক কথা ক্যাপ্টো কামড়ান (kapto to bite) কথা হইতে ইহার উৎপত্তি। গালে দিলেই জ্বলিয়া উঠে। সকল প্রকার চাট্‌নিতেই লঙ্কা ব্যবহার হয়। লঙ্কার ঔষধার্থে ব্যবহার—লঙ্কা হইতে আরোক প্রস্তুত হয়। বেদনা বা ফুলা জায়গায় লঙ্কা বাটা দিলে উপকার হয়। ভারতবর্ষের লোকে ঝালে ঝোলে, অম্বলে, চাট্‌নিতে লঙ্কা ব্যবহার করে। লঙ্কার খার এদেশে খুব অধিক। পশ্চিম ভারতে গুড়া মশালার চলন খুব বেশী। সব মশালা পৃথক পৃথক গুড়া করিয়া রাখা হয়। ব্যঞ্জনে ব্যবহারের সময় মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। বঙ্গ দেশে এক প্রকার মিশ্রমশালা তৈয়ারি হয়। তাহার নাম গোটার মশালা। ইহাতে লঙ্কা, হরিদ্রা, শরিষা, মেথি, জিরে, ধনে চূর্ণ পরিমাণ মত মিশ্রিত করা হয় এবং অবশেষে আমের রস ও লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া হাড়ি পূর্ণ

Red Pepper.

Capsicum Bulnose—বুল নোজ লঙ্কা

Capsicum Baccatum—কুল লঙ্কা
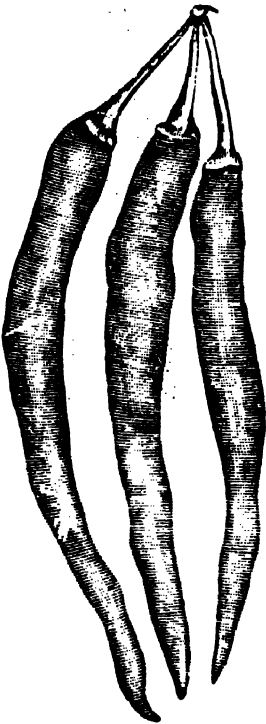
Capsicum Cayenne—কেইন লঙ্কা।
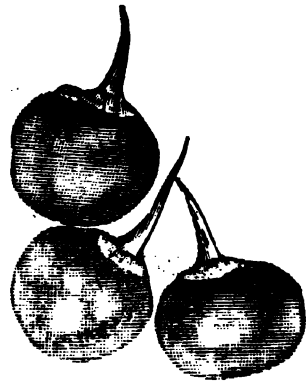
Piper Nigrum.

পিপার বা পিপুল গাছ ফল সমেত ।
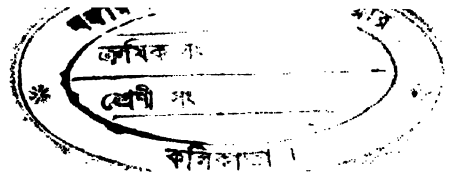
করিয়া রাখা হয়। ব্যঞ্জন সুস্বাদ করিতে ইহা অদ্বিতীয় মশালা। চাউল কিম্বা চিড়া ভাজা খাইবার সময় খাঁটি শর্ষপ তৈলে গোটার মশালা সংযোগ করিয়া লইলে অতি মুখরোচক হয়।

গোল মরিচ (Black pepper—Pepper nigrum)—ব্যঞ্জনাদি ঝাল করিবার জন্য লঙ্কার পরিবর্ত্তে গোল মরিচ ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ লোকে গোল মরিচের ঝালঅপেক্ষা লঙ্কার ঝাল অধিক সুস্বাদু বলিয়া পছন্দ করে। মরিচের ঝাল কিন্তু গুণে লঙ্কা অপেক্ষা ভাল। গোল মরিচ ব্যবহার করিলে অসুখ হয় না কিন্তু অধিক লঙ্কা ব্যবহারে উদরাময়াদি পীড়া হয়। পেটের কোন গোলযোগ বা হজম কম হইলে গোল মরিচ ও লবণ ব্যবহারে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হয়। গোল মরিচের গুঁড়া লবণ সংযোগ গরম জলের সহিত চায়ের মত ব্যবহার করিলে শরীরের জড়তা নষ্ট হয় এবং ম্যালেরিয়া প্রধান স্থানে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারত এবং মালয় দেশে ইহা বহু পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ফল শুষ্ক করতঃ খোলা সমেত গুঁড়াইয়া মশালা রূপে ব্যবহার হয়। লঙ্কার ব্যবহার কেবল ব্যঞ্জন ও চাট্‌নিতে, অন্য পক্ষে মরিচ, মিষ্টান্ন ও ব্যঞ্জন সবেই ব্যবহার করিতে পারা যায়। তথাপি দেখা যায় যে উভয়ের ক্রিয়ার অনেকটা সাদৃশ্য আছে তাই দুইটির এক রকম নাম—লাল পিপার (Red pepper লঙ্কা), কালপিপার কাল মরিচ বা গোলমরিচ। ফল গোল বলিয়া গোল মরিচ।

পিপুল লম্বা পিপার (Piper longum)—ফল লম্বা, কবিরাজী ঔষধে খুব ব্যবহার হয়। ফলগুলি শুকাইয়া ব্যবহারের নিয়ম। পানের মত গাছ, পানের মত পাতা। সারবান সরস মৃত্তিকায় জন্মে। সিংহলের পিঁপুল খুব উৎকৃষ্ট। সাধারণতঃ ফলগুলি কাল কিন্তু সাদা ফলও আছে। পিনাঙ ও সিঙ্গাপুরে সাদা পিঁপুল পাওয়া যায়। ঐ দুই স্থান হইতে প্রায় কোটি টাকার পিঁপুল ইতস্ততঃ রপ্তানি হয়। সমগ্র পৃথিবীতে ৮০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের পিঁপুল (১ পাউণ্ডের মূল্যের ১৫৲ টাকা) উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে ২ কোটি, জাভা ২ কোটি, ষ্ট্রেট্‌সেটোলমেণ্ট ১ কোটি, বর্ণিও ৪০ লক্ষ, সুমাত্রা ১॥ কোটি, শ্যামরাজ্য ৬০ লক্ষ, সিংহলে ১ কোটি পাউণ্ডের মূল্যের পিঁপুল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পিঁপুল লতানীয় গাছ বেড়ার গায়ে কিম্বা খুটির উপরে জন্মিয়া থাকে। বাঙলা দেশে ইহারা সচরাচর আম, কাঁটাল গোলামজাম ও গাবগাছের উপর চড়িয়া বসিয়া থাকে এবং বহুলতা বিস্তার করিয়া গাছকে জড়াইয়া ধরিতে চায়।

পান (Piper Bettle)—ইহাও পিপারু জাতীয় গাছ। ইহার পাতা চর্ব্বণ করিয়া খায়। ইহার স্বাদগন্ধে বেশ একটু বিশেষত্বআছে। এদেশে আহারের পর মুখশুদ্ধ করিবার জন্য অর্থাৎ মুখ হইতে তৈল ও আমিষ গন্ধাদি দূরজন্য পান চর্ব্বণের ব্যবস্থা। অন্যদেশে লোকে কেবল লবঙ্গ এলাচ প্রভৃতি মশালা চর্ব্বণ করে। ভারতের লোকের পান

না হইলেই যেন চলে না। এদেশে প্রভূত পানের দোকান। অনেক টাকার পান ভারতবাসীরা ব্যবহার করে। পান রসা জমিতে হয়। হাজার ফিট উচ্চ পাহাড়ের উপরও পান জন্মিয়া থাকে। ভারতে ও সিংহলে ইহার প্রচুর আবাদ আছে। (ক্রমশঃ)

ফল ঝরা

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত।

আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে অনেক সময় রাশিকৃত ফল ঝরিয়া পড়ে। তাহা কেন হয় ও তদ্দারা আমাদের লাভ কি লোকসান হয়, জানিয়া রাখিলে সময় বিশেষে অনেক উপকার দর্শিতে পারে। বৃক্ষ হইতে ফল ঝরিয়া পড়িবার যে কতকগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে (১) গাছের রুগ্নাবস্থা, (২) বৃক্ষের তুলনায় ফলের আধিক্য, (৩) মৃত্তিকার দৌর্ব্বল্য, (৪) সাময়িক ঝটিকা এই কয়টী প্রধান।

রুগ্নাবস্থাতেও অনেক সময় গাছে ফল ধরে। কিন্তু এই সকল ফলকে আবশ্যক মত রস জোগাইবার শক্তির অভাবে ফলের বোঁটা আল্‌গা হইয়া যায়, ফল পরিপুষ্ট হইতে পারে না, অবশেষে আপনা হইতেই গাছ হইতে খসিয়া পড়ে, ঈদৃশ রুগ্ন গাছ হইতে যে ফল খসিয়া যায় তাহাতে গাছের উপকারই হইয়া থাকে, ফল খসিয়া যাওয়াতে গাছের ফলের জন্য সে রস খরচ হইতেছিল, তাহা বাঁচিয়া যায়, এবং সেই রস উদ্ভিদের অঙ্গ পোষণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে থাকে। এই স্থলে বলিয়া রাখা উচিত, উদ্ভিদের তিনটী অবস্থা আছে। (১) শাখা প্রশাখা ও পত্রাদি বৃদ্ধি, (২) ফলন ফুলন, (৩) বিরাম। এই তিনটী ক্রিয়া ঋতু বিশেষে প্রত্যেক বৃক্ষেই চলিতেছে, কোন ঋতুতে বৃক্ষগণ শাখা প্রশাখা ও পত্রাদি দ্বারা সুশোভিত হইতেছে; আবার এক ঋতুতে উহা ফুল বা ফল ধারণ করিতেছে; অতঃপর কিছুদিনের নিমিত্ত বিরাম লাভ করিতেছে। বৃদ্ধির অবস্থায় উহাকে দেখিলে তেজাল বলিয়া মনে হয়, ফল বা ফুলের সময় প্রফুল্ল মনে হয়, আবার বিরামের সময় সাতিশয় নির্জ্জীব বলিয়া ধারণা হয়। এই শেষ সময়টা যেন উদ্ভিদের ধ্যান-মগ্নাবস্থা। উদ্ভিদের বাল্যাবস্থায় উল্লিখিত তিনটি কার্য্য দেখা যায় না। তখন কেবল বৃদ্ধি ও বিরাম এই দুই কার্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে, যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে অপর অবস্থাটীর অর্থাৎ ফলন শীতলতার অবস্থাটীর আবির্ভাব হয়। বৃদ্ধির অবস্থায় উদ্ভিদ আপন শরীরকে পরিপুষ্ট করে, কোথায় কোন শাখাটী নষ্ট হইয়াছে, তাহা হয় ত মেরামত করিবার জন্য সেখানে একটী শাখা বা উপশাখা বাহির করে, কোনখানে হয় ত সাতিশয় রৌদ্র লাগে, সেস্থানটী

ঢাকিবার জন্য সেখানে কতকগুলি পত্র বিন্যাস করিয়া দেয়, ইত্যাদি অনেক কাজ করিতে হয়। তাহা ব্যতীত শাখা প্রশাখা মূলাগ্রভাগ সকলকেও স্বীয় শক্তি মত পরিবর্দ্ধিত করিয়া লয়, এ অবস্থায় ইহার যাহা কিছু শক্তি, তাহা স্বীয় অঙ্গ বর্দ্ধনে নিয়োজিত হয়, উদ্ভিদের বর্দ্ধনোম্মুখ অবস্থায় ভূগর্ভ স্থিত মূল ও শাখা শিকড়গণের কার্য্য অতি দ্রুত ভাবে চলিয়া থাকে। এই সময়ে শিকড়েও অনেক শাখা প্রশাখা বিনির্গত হইয়া থাকে, শিকড়ের সংখ্যা দৈর্ঘ্যে যেমন বাড়িতে থাকে, বৃক্ষের উগরিভাগও তদনুরূপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, শিকড়ই উদ্ভিদের রস সংগ্রহের একমাত্র অবলম্বন, সুতরাং শিকড়ের বৃদ্ধি অনুসারে গাছেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই অবস্থায় উদ্ভিদের শাখা শিকড় হইতে পার্শ্ব-দেশে বহু পরিমাণে সূত্রবৎ সূক্ষ্ম শিকড় জন্মিয়া থাকে। এই সূত্র শিকড়ের সাহায্যে রস সংগ্রহ করিয়া উদ্ভিদ্ ফুল ফল ধারণ করিতে সক্ষম হয়। এইবার বুঝিতে হইবে যে, উদ্ভিদকে বৃদ্ধিশীল সরল স্বাস্থ্য সম্পন্ন করিতে হইলে উহার শিকড়ের পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে, সে বিষয়ে যত্নশীল হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, রুগ্ন উদ্ভিদে শিকড়ের বৃদ্ধি ও কার্য্য স্থগিতাবস্থায় থাকে, তন্নিবন্ধন বৃক্ষাবয়বশীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এবং পত্রাদির বর্ণোজ্জ্বলতা হ্রাস পাইয়া হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে, সেই সঙ্গে পত্রের সংখ্যাও অনেক সময় স্বাভাবিক আকার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতা প্রাপ্ত হয়, অনেক পাতা কুঞ্চিত হইয়া যায়। স্বাস্থ্যহীন ও রুগ্ন গাছের এইগুলি বিশেষ লক্ষণ। ঈদৃশ গাছে আদৌ ফল ধরিতে দেওয়া উচিত নহে। ফল ধরিবার কিছু পূর্ব্বে ইহার পাইট তদ্বিরাদি হইলে গাছে ফল ধরিতে পারে, কিন্তু তাহা স্বাভাবিক নহে। কৃত্রিম উপায় অবলম্বিত হওয়ায় গাছে ফল বা মুকুল দেখা দিলে, তাহা অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত; নতুবা গাছ আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। সকল সময়ে গাছে ফল আনয়ন করিবার জন্য সবিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। গাছের যথা-সময়ে পাইট করিলে যাহাতে তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, তৎপ্রতি যত্ন করিলে, সকল গাছই স্বভাবতঃ ফল প্রদানে চেষ্টা করে। তবে যে অনেক সময় সবল নীরোগ গাছে ফল ধারণ করে না, তাহার স্বতন্ত্র কারণ আছে এবং তাহার প্রতিকারেরও স্বতন্ত্র নিয়ম বা উপায় আছে।

বৃক্ষের যেরূপ আয়তন, বয়ঃক্রম ও বৃদ্ধি, উহাতে তদনুরূপ ফল হওয়া উচিত, অতিরিক্ত ফল হইলে সকল ফল সমভাবে পরিস্ফুট হইবার উপযুক্ত পরিমাণে রস আহরণ করিতে পারে না, বৃক্ষও যথা পরিমাণে ফলগুলিকে রস জোগাইয়া উঠিতে পারে না। যে ছাগলের একটি শাবক হয়, সে তাহার একমাত্র বৎসকে তাবৎ দুগ্ধই প্রদান করে, তাবৎ যত্নই প্রয়োগ করে, ফলতঃ তাহা হৃষ্টপুষ্ট হয়, কিন্তু যে ছাগলের একাধিক বৎস জন্মে, সে সকল বৎসকে কোন ক্রমেই সমভাবে লালন পালন করিতে পারে না। বৎসের সংখ্যা বাড়িয়াছে বলিয়া তাহার আহারের পরিমাণ বাড়িতে পারে না। আহারের পরিমাণ না বাড়িলে দুগ্ধের পরিমাণ বাড়িবে কিরূপে? দুগ্ধের পরিমাণ না বাড়িলে কাজেই, বৎস-

দিগের স্তন্য দুগ্ধটুকু কয়জনে ভাগ করিয়া পান করিতে হয়, কিম্বা মাতা তাহাদিগকে ভাগ করিয়া পান করায়, আবার ইহাদিগের মধ্যে যে বৎসটি অপেক্ষাকৃত সবল সে জোর জবরদস্তী করিয়া অধিক দুগ্ধ পান করে ও অপর সকলের অপেক্ষা বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট হয়, উদ্ভিদ সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ ঘটিয়া থাকে। একটী আম্র বৃক্ষে যদি পাঁচ শত ফল ধরিয়া থাকে এবং তাহার অর্দ্ধেকগুলি যদি শৈশবাবস্থায় ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে অবশিষ্টগুলি সমধিক পরিমাণে পুষ্টি লাভ করিবে, বড় হইবে, সবল হইবে ও মধুর কিম্বা অম্লমধুর আস্বাদাদি গুণেরও বৃদ্ধি হইবে। এই কারণে গাছের উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে হইলে, গাছের ফল ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গাছে ফল ফলিতেছে না কেন, ঈদৃশ কথা প্রায় শ্রুত হওয়া যায় কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় সমাগত না হইলে গাছ কেন ফলপ্রদান করিবে? বল প্রয়োগ করিলে কাজ হয় না, গাছ রোপণ করিয়াই ফলের জন্য ধামা পাতিয়া থাকিলে চলিবে কেন? গাছকে বাড়িতে দেও, হৃষ্টপুষ্ট হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিতে দেও। কৌতুকপ্রিয় কোন কোন লোক অভিনবত্ব দেখাইবার জন্য অপরিণত বয়স্ক উদ্ভিদকে ফল ধারণ করিতে দেন, আমরা কিন্তু ইহার পক্ষপাতী হইতে পারি না। আম্র, লিচু প্রভৃতি কলম গাছে দু এক বৎসরের মধ্যে দু দশটা ফল ধরিতে দেখা যায়, আমরা আগ্রহ সহকারে তাহা ভাঙ্গিয়া দিই, পাছে গাছের বল ক্ষয় হয়, কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরিলে যেমন সে বাঁশ অকর্ম্মণ্য বা অনতিকাল স্থায়ী হয়, সেইরূপ অল্প বয়সে গাছে ফল ধরিলে তাহা বড় তেজাল ও ফলন্ত হইতে পারে না। ছোট গাছের শিকড় সাতিশয় ক্রিয়াশীল; ফলতঃ যথেষ্ট রস আহরণ করিয়া ফলকে আপাততঃ পোষণ করিতে পারে, এজন্য চারা গাছ হইতে বড় একটা ফল আপনা হইতে ঝরিয়া পড়ে না। বড় বড় গাছে রাশি রাশি ফল হয়, কিন্তু তাহার অর্দ্ধেক বা ততোধিক ঝরিয়া যায়, বৃক্ষটি যতগুলিকে পোষণ করিতে পারিবে, কেবল ততগুলি গাছে থাকে। তাহার মধ্য হয়তও আবার শত শত ফল বাতাসে পড়িয়া যায়। রৌদ্রের তেজে বোঁটা শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় ফল খসিয়া যায়, আবার কোন কোন গাছে পোকার উপদ্রব আছে, ফুল ফুটিলেই প্রজাপতি জাতীয় এক প্রকার পোকা ফুলের উপর ডিম্ব প্রসব করিয়া চলিয়া যায়। সেই সকল ডিম্ব হইতে কীট উৎপন্ন হইয়া ফলের মধ্যে প্রবেশ করে ও ফল মধ্যস্থ শস্য ভক্ষণ করিয়া পুষ্ট হইতে থাকে, যখন পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়, তখন ফলটি ফাটিয়া যায় ও উহার বোঁটা আল্‌গা হইয়া যাওয়ায় খসিয়া পড়িয়া যায়। ঈদৃশ নানা কারণে বড় গাছে অধিক ফল থাকিতে পারে না। সেগুলি ঝরিবার পড়িবার পর গাছে থাকিয়া যায়, তাহারা দিন দিন বাড়িতে থাকে। যে বৎসর এইরূপ গাছের ফল, সমধিক পরিমাণে পড়িতে না পায়, সে ফল প্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। অগণ্য রাশি রাশি ক্ষুদ্র ফলের অপেক্ষা বড় সুমিষ্ট সুস্বাদু ফল অল্প হইলেও স্পৃহনীয়। গাছের যথারীতি পাইট বা মাটিতে রস বা সার না থাকিলে যদি ফল ঝরিয়া যায়, তাহা হইলে যাহাতে এরূপ

না হইতে পারে, তাহার সাধ্যমত ব্যবস্থা করা উচিত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাগানের যত্ন রক্ষিত গাছ হইতে যদি ফল ঝরিতে থাকে, তাহার জন্য হা হুতাশ করিবার আবশ্যক নাই, এরূপ অবস্থায় যে ফল ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, উদ্ভিদ আপনার শক্তিকে গুছাইয়া লইতেছে, যাহাকে পোষণ করিতে পারিবে না, তাহাকেই বর্জ্জন করিতেছে, সুতরাং তাহা উহার পক্ষে মঙ্গল জনক জানিতে হইবে।

শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত, মালদহ।

শ্রীহট্টের কমলা

উদ্যান—তত্ত্ববিদ্ শ্রীশশিভূষণ সরকার লিখিত।

কমলা দুই জায়গা হইতে কলিকাতায় আসে শ্রীহট্ট হইতে ও মধ্য-প্রদেশ হইতে। শ্রীহট্টের কমলার নাম কলিকাতার বাজারে সিলেটের কমলা, মধ্য-প্রদেশের কমলার নাম নাগপুরী কমলা বা সান্ত্রা। সিলেটের কমলারই বাজারে আদর অধিক—ইহা নাগপুরী লেবু অপেক্ষা সুমিষ্ট ও সুতার।

খাসিয়া পর্ব্বতে কমলার বড় বড় বাগান আছে। পাহাড়িয়ারা এই সকল বাগান রচনা ও পালন করে। মাটির গুণে ও অবহাওয়ার আনুকূল্যে এখানে কমলার গাছের বাড় বৃদ্ধি বেশ সুচারুরূপই হয়—সুতরাং এখানে কমলার বাগান বসান একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে। পাহাড়িয়ারা দুই প্রকারে কমলার চারা উৎপাদন করে (১) বীজ হইতে কিম্বা (২) গুলকলম করিয়া। এই উভয় প্রকার চারাই বেশ ফলবান হয় এবং বীজের গাছের কমলা কলমের গাছের কমলা অপেক্ষা আকারে ও গুণে কোন অংশে হীন নহে। তবে এই মাত্র পার্থক্য দেখা যায় যে, বীজের গাছ ফলিতে ৭।৮ বৎসর সময় অতিবাহিত করিতে হয়, কলমের গাছ ৩ বৎসরে ফলে।

পাহাড়িরা বীজ নির্ব্বাচন করিয়া লয়। খারাপ বীজ হইতে তাহারা চারা উৎপাদন করে না। গাছের সর্ব্বোচ্চ রোদপিঠে ডাল হইতে তাহারা সুপক্ক ফল, বীজের জন্য সংগ্রহ করে। ফল হইতে বীজ পৃথক করিয়া লইয়া বীজগুলি জলে ফেলিয়া পরিষ্কার করে। যে বীজগুলি খুব সুপুষ্ট হইয়াছে সেগুলি জলে ফেলিবা মাত্র ডুবিয়া যাইবে। এবম্প্রকারে পরীক্ষিত সুপুষ্ট বীজ লইয়া তাহার চারা তৈয়ারি করে। বীজ তলায় চারা প্রস্তুত করিয়া লইয়া চারা বড় হইয়া ৬।৮ ইঞ্চ হইলে বাগানে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করে। ইতি মধ্যে

বাগানে চারা বসাইবার গর্ত্তগুলি ঠিক করিয়া লইয়া থাকে। প্রায়ই ৮ হাত অন্তর চারা বসান হয়। গর্ত্তগুলি দেড় হাত গভীর ২ হাত প্রস্থ করা হয়। এইগুলি আবর্জ্জনা দ্বারা পূর্ণ করিয়া আবর্জ্জনায় আগুণ লাগাইয়া পুড়াইয়া লয়। অতঃপর গর্ত্তগুলি গোময় ও মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া ফেলিয়া রাখা হয়। শেষ শীতে মাঘ মাসে এই রূপে প্রস্তুত গর্ত্তে চারা বসান কার্য্য সম্পন্ন করে। কলমের চারাগুলিও ঐ সময় গর্ত্তে বসায়। বর্ষাকালেই কলমের চারা প্রস্তুত হয়। বর্ষা শেষে সেগুলি বৃক্ষ হইতে কাটিয়া নামাইয়া হাপরে দেয়। হাপরে পুরাতন পাতা ঝরিয়া নূতন পাতা বাহির হইলে দ্বিতীয় চৌকায় চারাগুলি একবার নাড়িয়া বসাইয়া থাকে। তারপর বাগানে নির্দ্দিষ্ট গর্ত্তে বসাইলে একটি চারাও নষ্ট হয় না। হাপর হইতে নাড়িয়া একবারে নির্দ্দিষ্ট গর্ত্তে বসাইলে অনেক চারা মরিয়া যায়, এই জন্য পাহাড়িরা পূর্ব্বে সাবধান হয় এবং চারাগুলি নাড়িয়া একবার চৌকান্তরে বসাইয়া চারাগুলিকে বেশ টেকসহি করিয়া লয়।

গোলাপ ক্ষেতের যেমন পাইট—কমলা বাগানের পাইট অনেকটা সেই রকমের। প্রত্যেক বর্ষে বর্ষা শেষে চারাগুলির গোড়া খুঁড়িয়া শিকড় বাহির করিয়া দিতে হয়। ইহারা খুব সাবধানে গাছের গোড়ার মাটি সরায়, পাছে গাছের শিকড় কাটিয়া যায় এই জন্য এত সাবধান হয়। পাঁচ আঙ্গুলযুক্ত হাতের মত যে যন্ত্র যাহাকে ফর্ক বলে তাহা শিকড়, সংলগ্ন মৃত্তিকা সঞ্চালনের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। এই যন্ত্রগুলি কাঁটা চাম্‌চের কাঁটার মত। পাহাড়িরা এই সকল উদ্যান যন্ত্রের ব্যবহারে বেশ সিদ্ধহস্ত হইয়াছে। কমলার ভাসা শিকড় মাটির নীচে অধিক দূর যায় না, এই হেতু গোড়ার মাটি সঞ্চালনের কালে অধিকতর সাবধান হইতে হয়। শিকড়গুলি দুই সপ্তাহকাল অনাবৃত রাখিয়া তাহাতে রৌদ্র বাতাস লাগায়। তার পর খৈল ও আবর্জ্জনা সার দিয়া ঢাকিয়া দিয়া থাকে। বর্ষার পূর্ব্বে একবার এবং শীতের প্রথমেই একবার বাগানের আগাছা কুগাছা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়।

পূর্ব্বে পাহাড়ের উপরেই কমলার বাগান ছিল, এখন পাহাড়ের পাদদেশে সমতল ভূমিভাগেও কমলার আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীহট্টের দক্ষিণাঞ্চলে অনেক কমলার বাগান হইয়াছে। অত্র স্থানের অধিবাসী রাঢ়গণ বিশেষ দক্ষতার সহিত কমলার বাগান বসাইতেছে। ইহারা কৃষি-ব্যবসায়ী। কমলালেবুর বাগানে লাভ দেখিয়া ইহারা শস্য-ক্ষেত্রে কমলালেবুর বাগান বসাইতেছে। ইহারা পাহাড়িয়াদের অনুকরণে কমলার আবাদ করে। কলম করিবার প্রথা একই রকম কিন্তু বীজ নির্ব্বাচনে ইহারা সাতন্ত্রতা অবলম্বন করে। পাহাড়িরা সুপক্ক কমলা হইতে বীজ সংগ্রহ করে, ইহারা সুপুষ্ট ফল পাকিবার কিছু পূর্ব্বে পাড়িয়া তাহা হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া থাকে। দুই রকম বীজের চারার মধ্যে কোনটি ভাল—তুলনায় ইহার কোন ভেদ নির্দ্ধারিত হইয়াছে কি না তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। পাহাড়িরা কিম্বা রাঢ়গণ ইহার কোন সদসৎ উত্তর দিতে

পারে না। পাহাড়ি কমলা অপেক্ষাকৃত সুমিষ্ট ও সুভার, তরাইয়ের কমলা অপেক্ষাকৃত অল্প অম্লাস্বাদযুক্ত। সেটা জল মাটির গুণেই হয় বলিয়া মনে হয়। কারণ উভয় স্থানের কলমের চারাতেও এই পার্থক্য দৃষ্ট হয় সুতরাং উভয়ত্র বীজের চারা প্রস্তুতের প্রণালীর প্রার্থক্য হেতু হইতেছে বলিয়া ধরা যায় না।

কমলা বৃক্ষ উচ্চতায় ৮।৯ হাতের অধিক এবং পরিসরে ৬।৭ হাতের অধিক প্রায়ই হয় না সুতরাং ৮ হাত অন্তর গাছ বসাইলে গাছ ঘন বসান হয় না। ৮ হাত অন্তর গাছ বসাইলে এক বিঘায় ১০০ শত গাছ বসিবে। ৫ হইতে ১০ বৎসরের বৃক্ষে প্রত্যেক গাছে ২৲ টাকা হিসাবে আয় হইতে পারে। ইহা হইতে ২৫৲ টাকা সার ও চাষ কারকিতের খরচ বাদ দিলে ১৭৫৲ টাকা একটা ১৴০ বিঘা বাগান হইতে লাভ হওয়া সম্ভব। সমপরিমাণ কোন সব্জী ক্ষেত হইতে ১৭৫৲ টাকা মুনফা করা নিতান্ত সহজ নহে; তাহার জন্য অনেক পরিশ্রম ও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। ফলের বাগানে তাদৃশ খুচরা পাইটের আবশ্যক নাই এবং এত দীর্ঘকাল ব্যাপী সতর্ক পাহারার আবশ্যকতা দেখা যায় না,—যেমন সব্জীর বাগানে করিতে হয়। এই সকল বুঝিয়া রাঢ়গণ কমলার আবাদে মন দিতেছে।

তবে কমলা গাছের শত্রু আছে সে কথা তাহারা স্বীকার করে। শুঁয়াপোকায় পাতা খাইয়া ফেলে। এই শুঁয়া পোকার প্রতিকারার্থ তাহারা কমলাগাছে শুঁটকিমাছের সার দেয়। শুঁটকি মাছের গুঁড়া তাহারা গাছের গোড়ায় ছিটাইয়া দেয়। শুঁটকি মাছের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া পালে পালে পিপীলিকা যাইয়া গাছ ছাইয়া ফেলে এবং পোকা ধরিয়া খায়। পোকা নিবারণার্থ তাহারা গাছের গায়ে জল মিশ্রিত গোমূত্র ছিটাইয়া থাকে। ইহার উপর আবার গাছের গাত্রে সুড়ঙ্গকারী মাজের পোকা আছে। সেগুলি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা গাছের গাত্র চিরিয়া বাহির করিয়া মারিয়া ফেলা ছাড়া অন্য উপায় নাই। সুধু যে কমলা বাগানে এই সকল কীটাদির উপদ্রব আছে তাহা নহে, সবজী বাগান ও ফলের বাগান মাত্রেই এই উপদ্রব। এই উপদ্রব নিবারণের কৌশল "ফসলের পোকা" নামক পুস্তক হইতে শিক্ষা করা যায়। পুস্তকখানি বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের সাহায্যে ভারতীয় কৃষিসমিতি দ্বারা প্রকাশিত। মূল্যবত্তার অনুপাতে ইহার দাম সামান্য ১৷০ টাকা মাত্র। ভারতীয় কৃষিসমিতি হইতে এই পুস্তক পাওয়া যায়।

সাময়িক কৃষিসংবাদ।

———:০:———

বীজ নির্ব্বাচন—

বীজের উপরে শস্য নির্ভর করে। ভাল বীজে ভাল ফসল ইহা একটি চলিত কথা কিন্তু ভাল বীজের অর্থ কি। দেখিতে ভাল হইলেই যে বীজ ভাল হইল তাহা নহে, ফসলের উদ্দেশ্যে বীজ, অতএব যে বীজের ভাল ফসল উৎপাদন করিবার ক্ষমতা আছে সে বীজই ভাল। ভিন্ন ভিন্ন ফসলের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন, ধানের জন্য আমরা সাধারণতঃ চাই এমন বীজ যাহা হইতে উৎপন্ন গাছে বেশী ধান হয়। পাটের জন্য চাই এমন বীজ যাহা হইতে উৎপন্ন গাছ খুব সোজা লম্বা মোটা হইবে। অতএব কোন শস্যের (ধানেরই হউক বা পাটেরই হউক) বীজ রাখিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে সেই ফসলে আমরা চাই কি? তারপর যে গাছগুলিতে সেই গুণবিশেষ বেশী মাত্রায় আছে সেগুলি হইতে বীজ রাখা। যেমন বাপ তেমনি ছেলে, যেমন গাছের বীজ ফসলও তেমনই হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে বীজ নির্ব্বাচন অর্থ গাছ নির্ব্বাচন।

ধান আমাদের সর্ব্ব প্রধান এবং সর্ব্বসাধারণ ফসল অতএব ধান লইয়াই আমরা আরম্ভ করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধানের চাষে কৃষকগণের ইচ্ছা যাহাতে "ফলন" বেশী হয় কিন্তু তাহাদের বীজ নির্ব্বাচন প্রণালী ও ইচ্ছা এই দুয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বড় কম। একজনের ১৫ বিঘা জমিতে ধান আছে, যে জমিখানার ধান মোটামুটি দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, অন্য কোন বিষয়ের উপরে লক্ষ্য না করিয়া ঐ জমির ধান পৃথক করিয়া কাটিয়া তাহা হইতে বীজ রাখা হয়। কৃষকের উদ্দেশ্য বেশী ফলন এবং সেই উদ্দেশ্যে তাহার উচিত ছিল যে গাছগুলিতে বেশী ধান হইয়াছে কেবল সেগুলিই বাছিয়া লওয়া কিন্তু সে বিষয়ে কোন মনোযোগ দেওয়া হইল না, ফলে ফসলও তেমনি হইয়া থাকে। একখানা ধানের জমিতে প্রবেশ করিলেই দেখা যায় উহার সবগুলি গাছ সমান বাড়ে নাই এবং প্রত্যেক গাছের শিষে ধানের সংখ্যাও সমান নহে। কতকগুলি গাছ সতেজ, গোছা বড়, ৫।৬ করিয়া "ফেঁকড়ি" বাহির হইয়াছে আবার কতকগুলি যেন কেমন নিস্তেজ, ২।৩টির বেশী "ফেঁকড়ি" নাই। যে গাছগুলিতে বেশী "ফেঁকড়ি", সেগুলির প্রত্যেকটার শিশে ধানের সংখ্যা ১০০। ১৫০ অথবা ২০০; যেগুলি নিস্তেজ, ২।৩টি "ফেঁকড়ি"র বেশী নাই তাহাদের শিষে ধানের সংখ্যা হয় ত ৫০।৬০এর বেশী নয়। একই জমিতে একই রকমের চাষ আবাদে একই চেষ্টার ফলে ক্ষেত্রময় ফসল হইয়াছে, এমন কিছু নয় যে সতেজ গাছগুলিতে বেশী সার দেওয়া হইয়াছিল বা উহাদের জন্য বেশী যত্ন করা গিয়াছে অথচ কতকগুলি গাছে ফল হইল বেশী আর কতকগুলিতে অন্যরূপ। একই রকম ব্যবহারে যখন কতকগুলির "ফলন" অপরগুলি হইতে বেশী তখন ইহা যুক্তিসঙ্গত যে,

বেশী "ফলন" হইয়াছে এমন গাছগুলির বীজ হইতে যে শস্য হইবে সেগুলিরও "ফলন" বেশী হইবে। অতএব ক্ষেত্রে যে গাছগুলির বেশী "ফলন" হইয়াছে সেইগুলি হইতেই বীজ রাখা কর্ত্তব্য যখন অধিক "ফলন"ই আমাদের উদ্দেশ্য। অবশ্য উৎপন্ন শস্যের সবগুলিই যে সমান হইবে তাহা নহে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে কতকগুলি ঐ প্রকারের এবং কতকগুলি খারাপও হইতে পারে। কারণ প্রত্যেক শস্যেরই দোষগুণ অল্পাধিক পরিমাণে পরবর্ত্তী শস্যে দেখা দেয়; সতর্কতার সহিত দোষ বাদ দিয়া গুণের উপরে নজর রাখিয়া যে গাছগুলি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল কেবল সেইগুলিরই বীজ লইয়া শস্য উৎপাদন করিতে থাকিলে ক্রমে দোষ কমিয়া আসিবে এবং গুণের বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং অবশেষে ঐ গুণের উন্নতির সঙ্গে একটি অত্যন্ত নহু প্রসু জাতীয় ধানের সৃষ্টি হইবে।

এই প্রকারে প্রতি বৎসর সাবধানে ও সযত্নে নির্ব্বাচিত বীজ হইতে পৃথকভাবে শস্য উৎপাদন করিয়া এবং তাহা হইতে পুনরায় ঐ প্রণালীতে বীজ বাছিয়া সেই বীজ আবার পৃথকভাবে জন্মাইয়া এবং আবার তাহা হইতে বীজ রাখিয়া ক্রমে যে কোন শস্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। যে শস্যের যে গুণ বিশেষের উৎকর্ষ প্রয়োজন সেই বিশেষ গুণের উপরে লক্ষ্য করিয়াই বীজ নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। অনেক সময় দেখা যায় সময়মত উপযুক্তরূপ বৃষ্টি না হওয়াতে ধান হইল না, দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল; যদি এমন কোন জাতীয় ধান থাকিত যাহা অনাবৃষ্টিতেও জন্মে তাহা হইলে কিন্তু অত হতাশ হইবার কারণ থাকিত না। একটু ভাবিয়া দেখিলে ও যত্ন করিলে আমরা এইরূপ ধানের সৃষ্টিও করিতে পারি। অনাবৃষ্টিতে উপযুক্তরূপ ফসল না হইলেও ক্ষেত্রের সকল গাছই যে মারা যায় তাহা নহে। ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে দেখা যায় কতকগুলি গাছ তবুও বাঁচিয়া আছে এবং যত্ন করিলে উহাদিগকে রাখিয়া সামান্য ফসলও পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু যখন মজুরি পোষাবে না তখন আর ঐগুলি, রাখিয়া কি হইবে, এই ভাবিয়া কৃষক আর ঐ গাছগুলির কোন যত্নই লয় না, সাধারণতঃ গরু বাছুর দ্বারা খাওয়াইয়া ফেলে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে ঐ গাছ ক'টা যখন উপযুক্ত জলের অভাবেও মরে নাই, তখন নিশ্চয়ই উহাদের এমন কোন গুণ আছে যাহার সাহায্যে উহারা অনাবৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াও বাঁচিয়া আছে। কৃষক কিন্তু সে গুণের আদর করিল না, গাছগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিল। যদি ঐ গাছগুলি নষ্ট না করিয়া যত্ন সহকারে রাখিয়া দেওয়া হয় এবং নিয়মিতরূপে শস্য পাকাইয়া উহা হইতে বীজ রাখা হয় তাহা হইলে এমন এক জাতীয় ধানের বীজ পাওয়া যাইতে পারে যাহা অনাবৃষ্টিতেও জন্মিবে। কখন কখন দেখা যায় ক্ষেত্রের অনেক ধান গাছ ফলের ভারে শুইয়া পড়ে। আবার সম পরিমাণ ফল থাকা সত্ত্বেও আর কতকগুলি গাছ বেশ দাঁড়াইয়া আছে। গাছ শুইয়া পড়া ফসলের পক্ষে খুব ক্ষতিজনক কেন না অনেক-

ফসল নষ্ট হইয়া যায়। বীজ রাখিবার সময় ক্ষেত্রের সমস্ত গাছের ধান না মিশাইয়া কেবল যে গাছগুলি শুইয়া পড়ে নাই বেশ দাঁড়াইয়া আছে যদি সে গাছগুলি হইতে বীজ রাখা হয় তবে দেখা যাইবে উহা হইতে উৎপন্ন গাছ কখনও শুইয়া পড়িবে না। ক্রমে ঐ গুণের উপরে নজর রাখিয়া উৎপন্ন শস্য হইতে বৎসর বৎসর যদি কেবল যে সব গাছ বেশ সোজা শক্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকে তাহা হইতে বীজ রাখা হয় তবে অবশেষে এমন এক জাতীয় ধানের সৃষ্টি হইবে যাহা আর বাস্তবিক শুইয়া পড়িবে না। শীঘ্র ও সমান পাকে এমন ধানের সৃষ্টি করিতে হইলে ক্ষেত্রে যে সকল ধান শীঘ্র ও এক সময়ে পাকিয়াছে তাহার বীজ বাছিয়া লইয়া তাহা হইতে ফসল জন্মান আবশ্যক। এই প্রকারে যাহার যে গুণের উৎকর্ষ সাধন আবশ্যক সেই গুণ বিশেষের উপর লক্ষ্য রাখিয়া ধারাবাহিকরূপে ও যত্ন সহকারে সেই গুণ যে গাছগুলিতে বিশেষ-ভাবে পরিস্ফুট আর সব গাছ বাদ দিয়া কেবল সেই গাছগুলিরই বীজ রাখা প্রয়োজন। পাট আমাদের আর একটি আয়ের ফসল অতএব পাটের জন্য এমন বীজ রাখিতে হইবে যাহাতে ভাল পাট হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পাটে চাই আমরা সোজা, শক্ত, লম্বা ও মোটা গাছ, যেন পাট বেশ লম্বা শক্ত এবং ওজনে ভারি হয়। অতএব পাটের বীজ রাখিবার সময় পাট ক্ষেতে যাইয়া যে গাছগুলিতে ঐ সব গুণ বিশেষভাবে আছে সেইগুলিকে বীজের জন্য রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কৃষকগণ বেশী দামের আশায় ভাল গাছগুলি কাটিয়া পাট করিয়া বিক্রয় করে এবং সাধারণতঃ যে সব গাছ ভাল হয় নাই তাহাই বীজের জন্য রাখিয়া দেয়। বীজের জন্য উৎকৃষ্ট গাছ বাছিয়া রাখিয়া অন্যান্য গাছ কাটিয়া পাট করিলে প্রথম একটু লোকসান বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে কিন্তু ২।১ বৎসর পরেই সে ক্ষতি পূরণ হইয়া যাইবে।

কেহ হয়ত তর্কচ্ছলে বলিবেন এইরূপ কঠিনভাবে বীজ নির্ব্বাচন করিতে গেলে বীজের অভাবে চাষ আবাদ করা কঠিন হইবে। ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড়, উপযুক্ত বীজ নির্ব্বাচন করিতে গিয়া সমস্ত জমির পরিমাণ বীজই জুটিয়া উঠিবে না। বাস্তবিক কথা তাহা নহে, সমস্ত জমীর জন্য ২।১ বৎসর যেমন বীজ রাখা হইতেছে, তেমনই চালাইতে হইবে; চলিত প্রথা হটাৎ ছাড়িয়া দিলে হইবে না তবে কিছুকাল পরে আর এ অসুবিধা থাকিবে না। উপরুক্ত প্রণালীতে নির্ব্বাচিত বীজের প্রথম বৎসরের উৎপন্ন শস্য হইতেই কতক পরিমাণে ভাল বীজ দ্বিতীয় বৎসরের ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাইবে, এইরূপে ২।৪ বৎসর পরে আর মোটেই বীজের অভাব থাকিবে না।

বীজ, মূল গাছের অনুরূপ শস্য উৎপাদন করিবে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও না হয় তাহা নহে। কতকগুলি সমগুণ বিশিষ্ট, কতকগুলি উৎকৃষ্ট, কতক-গুলি বা নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। কতকগুলি একেবারে অন্যভাবাপন্নও হইয়া পড়ে, এই গুলিকে ইংরাজীতে স্পোর্ট (sport) বা "উদ্ভট" কহে। কেন এইরূপ স্পোর্ট বা

"উদ্ভটের" উৎপত্তি হয় উহা সহজে বুঝান কঠিন কিন্তু এইরূপ সর্ব্বদাই হইতেছে। পিতা মাতা হইতে সন্তান সম্পূর্ণ সতন্ত্র আকৃতির ও প্রকৃতির ইহা বিরল নহে। এই স্পোর্ট বা উদ্ভটগুলিতে অনেক সময় বিশেষ প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয় গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বীজ লইয়া শস্য উৎপাদন করিলে এক নূতন শস্যের সৃষ্টি হইতে পারে। উৎপন্ন শস্যের মধ্যে কতকগুলি হয়ত মূল গাছের প্রকৃতি পুনরায় প্রাপ্ত হইবে কিন্তু অনেকগুলি এই স্পোর্ট বা উদ্ভটের নূতন প্রকৃতি সমূহ লাভ করিয়া তৎসমুদয় বিস্তার করিবে। এই সকল বিশেষ গুণসমূহ বদ্ধমূল হইলে তাহাদের বীজ লইয়া শস্য উৎপাদন করিলে এ গুণগুলি আরও উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকিবে, এবং অবশেষে একটী সম্পূর্ণ নূতনগুণ সমন্বিত উৎকৃষ্ট শস্যের সৃষ্টি হইবে।

ইচ্ছা করিলে যত্নসহকারে চাষ আবাদ, নির্ব্বাচিত বীজের ব্যবহার ও যথোপযুক্ত সার প্রয়োগের সাহায্যে শস্যের গুণের উৎকর্ষসাধনও দোষ বর্জ্জন সহজেই করা যাইতে পারে। এই সকল উপায়ের দ্বারা অন্যান্য দেশর কৃষকগণ দিন দিন নূতন রকমের নূতন গুণ সম্পন্ন শস্যের সৃষ্টি করিতেছে। উপরোক্ত প্রণালীতে ক্ষেতের উৎকৃষ্ট গাছ বাছিয়া বীজ (ধানের ও পাটের) রাখিতে কৃষকগণকে এ বিভাগ হইতে সরকারী কর্ম্মচারী দ্বারা দেখান হইতেছে।—সরকারী কৃষি-বিবরণী।

হৈমন্তিক তৈল শস্য (রাই, শরিষা, মসিনা) ১৯১৪-১৫ সমগ্র ভারতবর্ষে আলোচ্য বর্ষে ৬,৪০২,০০০ একর পরিমাণ ক্ষেত্রে রাই ও শরিষার আবাদ হইয়াছে। বিগত পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ১৩৬,০০০ একর অর্থাৎ শতকরা ২ভাগ অধিক। উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ১,১৯৫,০০০ টন; বিগত বর্ষের শস্যের পরিমাণ ১,০৪৬,০০০ টন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। উৎপন্নের পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগ বাড়িয়াছে।

তিসি—

আলোচ্য বর্ষে তিসির জমির পরিমাণ ৩,৩৩২,০০০ একর। উৎপন্ন শস্যে পরিমাণ ৩৯৬,০০০ টন। বিগত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা জমির পরিমাণ শতকরা ৯ ভাগ ও শস্যের পরিমাণ ২·৫ ভাগ বাড়িয়াছে। অন্যান্য দেশেও তিসি জন্মে—রোম রাজ্যে এ বৎসরে প্রায় ১২ লক্ষ টন, কানাডাতে লক্ষাধিক টন তিসি উৎপন্ন হয়। রুস রাজ্যে তিসি জন্মে কিন্তু তাহা যৎসামান্য।

বাঙ্গালায় পাটের আবাদ—

১ম বিবরণী ১৯১৫—অনুমান ২,৩৬৫,১৫১ একর পরিমাণ জমিতে পাঠের আবাদ হইয়াছে। উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিমবঙ্গ, কুচবিহার, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম সর্ব্বত্রই এবার পাটের আবাদ কম। আবাদী জমির পরিমাণ প্রায়

শতকরা ২৯ ভাগ কম। বিগত বর্ষের ফসলের অনেক পরিমাণ পাট এখনও অবিক্রিত পড়িয়া আছে।

পাঞ্জাবে গম ১৯১৪-১৫—

সমগ্র পাঞ্জাবে ৯,৭৭৮,০৫৩ একর পরিমাণ জমিতে গম জন্মিয়াছে। বিগত বর্ষ অপেক্ষা শতকরা ১৫ ভাগ অধিক। আলোচ্য বর্ষে উৎপন্ন গমের পরিমাণ ৩,৩৪৭,৭৬৮ টন, বিগত বর্ষ অপেক্ষা শতকরা ২১ ভাগ অধিক।

শিলচরে কৃষি ঋণ ও সাহায্যদান ব্যবস্থা—

সদরে দুই জন অতিরিক্ত সরকারী কমিশনার ও দুই জন সব ডেপুটী চাউলের থলিয়া লইয়া চাউল বিতরণ করিতে বাহির হইয়াছেন। গত কল্য বহু সংখ্যক গ্রামবাসী সাহায্য-ভিক্ষার জন্য কলেক্টরের নিকটে আসিয়াছিল। শীঘ্রই কৃষি-ঋণ প্রদত্ত হইবে। এ বৎসর ফসল না হওয়ায় আগামী অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ভীষণ কষ্ট হইবে। দুর্ভিক্ষ প্রশমনের জন্য একটী অর্থভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব চলিতেছে।

গবর্ণমেণ্ট কৃষকদিগকে ঋণ দিবার জন্য ১৫ হাজার টাকা এবং বন্যাপীড়িত প্রজাগণের সাহায্যার্থ ২০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে, আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের পার্ব্বত্য অংশের কাটলিচ চেরা ষ্টেশনের নিকটে বন্যার স্রোতে বহুসংখ্যক রেলওয়ের কুলী ভাসিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গে বর্ত্তমান অন্নকষ্টের প্রধান কারণ পাটের ক্ষতি—

মাননীয় মিষ্টার বিটসন বেলের অভিমত এই যে,—যুদ্ধের জন্য পাটের দর কমিয়া যাওয়ায় নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলার কৃষকগণের প্রতি মণে প্রায় চারি টাকা লোকসান হয় তাহাতে মোটের উপর দুই জেলার কৃষকগণের ২৩৮৫০৮০০৲ টাকা ক্ষতি হয়। ইহাই তাহাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার মূল কারণ। প্রত্যেক জেলায় অল্লাধিক এইরূপ ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু ত্রিপুরা ও নোয়াখালীর জেলার দুর্দ্দশার আরও কারণ আছে। ১৯১৪-১৫ সালের হৈমন্তিক ধান্য উকরা হইয়া নষ্ট হয়। চাঁদপুর ও নোয়াখালী সদর মহকুমার অন্তর্গত যায়গায় এই রোগ বেশী দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ এই দুই জেলায় মজুরের সংখ্যা খুব বেশী। তাহাদের নিজের জোতজমী কিছু নাই। অন্যান্য বৎসর তাহারা অপরের পাট ও ধান্যের জমীতে কাজ করিয়া জীবিকা-উপার্জ্জন করে। এ বৎসর পাটের আবাদ কম হওয়ার এবং সাধারণতঃ অর্থের টানাটানি হওয়ায় তাহাদের নিজ জেলায় বা অন্যত্র কাজ মিলে না। তৃতীয়তঃ এই দুই জেলাতে স্থানে স্থানে ভীষণ বন্যা হইয়াছে।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

ষোড়শ খণ্ড,—৪র্থ সংখ্যা
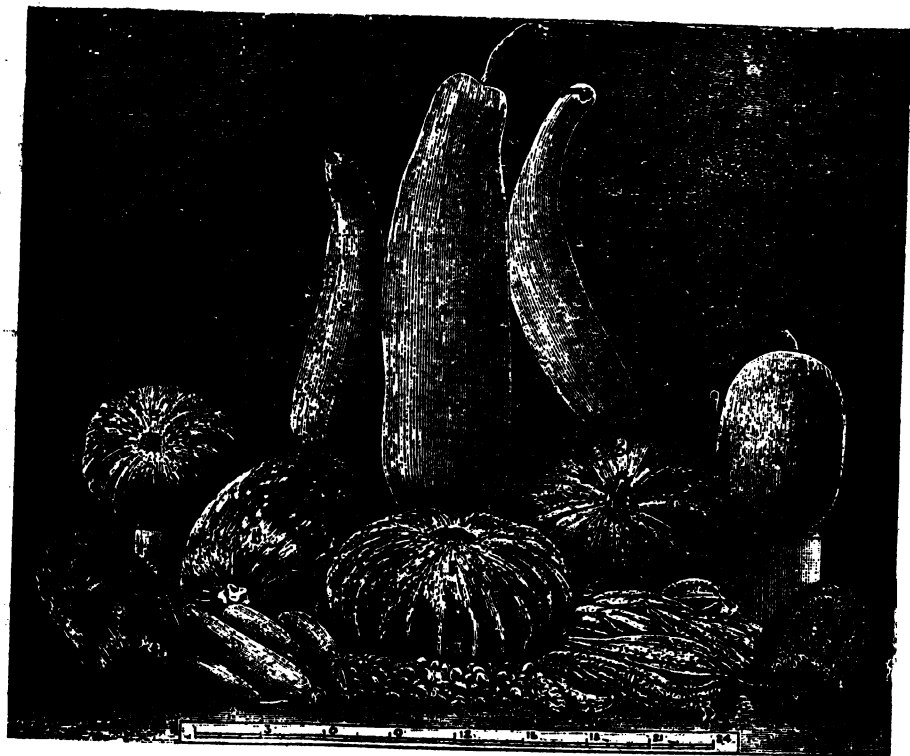
সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্

শ্রাবণ, ১৩২২

কলিকাতা; ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৬২নং বহুবাজারষ্ট্রীট, শ্রীরাম প্রেস হইতে
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কৃষক।

সূচীপত্র।

শ্রাবণ ১৩২২ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

শ্রাবণ, ১৩২২ সাল।

গাছ ছাঁটা

গাছ ছাঁটা সম্বন্ধে আরও দুই একটা কথা বলিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। তরু লতাগুলিকে ছাঁটিয়া কাটিয়া মনমত আকারের করিয়া লওয়া ও সেইগুলিতে ইচ্ছা মত, আবশ্যক মত, ফুল ফুটান, ফল ফলান, গাছ ছাঁটার প্রধান উদ্দেশ্য এ কথা কাহারও বুঝিতে বাকি নাই। ধরিয়া লও, জানুয়ারি মাসের শেষে কোন পুষ্প প্রদর্শনীতে গোলাপ ফুল যোগান দিতে হইবে। যে সকল গোলাপ গাছ সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে ছাঁটা কাটা হইয়া গিয়াছে তাহাতে ডিসেম্বর মাস পড়িতে না পড়িতেই ফুল ফুটিতে আরম্ভ হইবে। জানুয়ারি মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত তাহাতে প্রদর্শন করিবার উপযুক্ত ফুল পাওয়া কিছু অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। সুতরাং জানুয়ারি মেলায় ফুল প্রদর্শন জন্য গোলাপ গাছগুলি সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে না ছাঁটিয়া নভেম্বর মাসের শেষে ছাঁটিতে হইবে। গোড়া খোলা, শিকড় ছাঁটা, ডাল ছাঁটা ও সার দেওয়ার কার্য্য এক সঙ্গেই করা বিধি নতুবা উপযুক্ত সময়ে মনোমত ফুল পাওয়া যাইবে না।

লতানিয়া গোলাপ বৃক্ষগুলি বাঁশের বা তারের জাফ্রিতে বিনাইয়া সুনিপুণ হস্তে ছাঁটিয়া কাটিয়া যেমন ইচ্ছা বিন্যস্ত ও সুসজ্জিত করা যায়। উচ্চ দ্বিতল গৃহের বারান্দায় তাহাদিগকে তুলিয়া লইয়া যাওয়া যায়। কেবল কাণ্ডটি মাত্র ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইবে এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া মনোমত ছবির আকার ধারণ করিবে। জুঁই, চামেলী, জেস্‌মিন প্রভৃতি জেস্‌মিন্‌ জাতীয় গুল্মগুলিকে কাণ্ডটি মাত্র ভূমি সংলগ্ন রাখিয়া যথা তথা ঊর্দ্ধে বা পার্শ্বে লইয়া গিয়া ইচ্ছানুরূপ আকারের করিয়া লওয়া যায়।

কাঁঠালি চাঁপা, ঔর্ব্ব চাঁপা (uberia odorata) ও জেস্‌মিন্‌ দ্বারা বাগানের বা বাস গৃহের বেশ সুন্দর সুদৃশ্য ফটক নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে যতক্ষণ হাতে কাঁচি বা

কাটারি থাকিবে ততক্ষণ তাহাদিগকে সুদৃশ্য করিয়া রাখা সম্ভব। নতুবা ঐ সকল উদ্ভিদ ইচ্ছামত ডালপালা ছাড়িয়া বন্যভাব ধারণ করিতে ছাড়িবে না। ডুরেণ্টা বা মেহদী দ্বারা প্রাচীরের মত সবুজ রঙের বেড়া নির্ম্মাণ করা সহজ। ছাঁটিয়া কাটিয়া বেড়ার আবশ্যক মত ফাঁকে ফাঁকে তাহাদিগকে স্তম্ভাকারে দাঁড় করান বা ফটক নির্ম্মাণ করা কঠিন কথা নহে কিন্তু বৎসরে দুই তিন বার তাহাদের উপর কাঁচি চালাইতে হইবে নতুবা অভিষ্ট লাভ হইবে না।

ডুরেণ্টা ও বিলাতি মেহদি (myrtus) গুলি কখন কখন বড় ফুল বাগানের কেয়ারি মধ্যে বসাইলে বেশ শোভা হয়। তাহাদের ফল ফুলগুলি বড়ই সুদৃশ্য। কেয়ারি মধ্যে বসান গাছগুলি কিন্তু বৎসরে একবার ছাঁটিয়া না দিলে চলে না। এই গাছগুলি একবারে গোড়া ঘেঁসিয়া কাটাই উচিত। বর্ষারম্ভে এই কার্য্য করিলে গাছের সদ্য বহু শাখা প্রশাখা ছাড়িয়া অনতি বিলম্বে গোলাকার গুল্মে পরিণত হয়। এই ব্যাপারটি জানা থাকিলে তবে না গোড়া ঘেসিয়া ছাঁটায় সাহস হয়।

ঠিক সময়, আবশ্যকানুযায়ী ডাল ছাঁটা কাটা বিশেষ প্রয়োজন এবং ইহা শিখিতে হইলে হাতে হাতিয়ারে কার্য্য করিতে হইবে। আনাড়ী লোকের দ্বারা এক কার্য্য সম্ভবে না, সাধারণ জন মজুর দ্বারা এ কার্য্য করাইতে গেলে বিশেষরূপ ঠকিতে হয়। সে তোমার সাধের বাগানের সাধের বেড়া বা সাধের ফটক চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে নষ্ট করিয়া দিবে। ধার ওয়ালা কাঁচি কারিগরের সুনিপুণ হাতে পড়িলে কত গঠন গড়িয়া তুলিতে পারে কিন্তু আনাড়ির হাতে, গড়া কাজ ধ্বংস হয়।

কামিনী গাছের বেশ প্রাচীরাকৃতি বেড়া হয় এবং ঘাস মাঠের কেয়ারি মধ্যে এক একটি কামিনী বৃক্ষ লইয়া পরম রমণীয় মঠ, মন্দির, গম্বুজ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা যায়। কামিনী গাছকে স্তবকে স্তবকে ছাঁটিয়া চূড়ার উপর পেখম ধরা ময়ুর দাঁড় করাইতে কারিগরে পারে। গাছটিকে স্বভাবের উপর ছাড়িয়া দিলে তাহার এক প্রকার শ্রী হয়, গঠন হয়; ছাঁটিয়া কাটিয়া তৈয়ারি করিলে তাহার চেহারা অন্যরূপ হয়। বড় বড় বন বিহারে বৃক্ষ লতার স্বাভাবিক ক্রিয়া ও স্বভাবজাত সৌন্দর্য্য দেখিবার অবকাশ পাওয়া যায়। তথাপি তাহার মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া যে রাস্তাগুলি গিয়াছে তাহার দুই ধারের বৃক্ষ, লতা গুল্মের শাখা ছেদন না করিলে বন পথ দুর্গম হইয়া উঠিবে এবং ঐ সকল বন বিহারে যে সকল বিশ্রাম স্থান আছে সেগুলিকে মনোমত আকারে রাখিতে হইলে বৎসরে অন্ততঃ দুইবার ছুরী কাঁচি লইয়া বনানির বৃক্ষলতার উপর অস্ত্রাঘাত করিতে হয়।

জলের ধারে বেতস কুঞ্জ কবি কল্পনায়ও স্থান পাইয়াছে। এমন সুন্দর লতা কিন্তু এত তীক্ষ্ণধার কণ্টকাবৃত যে, যদি ইহাদিগকে স্বভাবের উপর ছাড়িয়া দাও তবে ইহার ধারে ঘেঁষা দায়, এমন কি হিংস্রজীব ব্যাঘ্র ভল্লুকও ইহার ধারে ঘেঁষিতে পারে না। ছুরী কাঁচি চালাইয়া ইহাকে একটি কুঞ্জাকারে গড়িয়া তুল, ইহা তোমার দারুণ

গ্রীষ্মে সাধের মধ্যাহ্ণ বিহারের স্থান হইবে। এমন যে কাঁটওয়ালা সুদৃঢ় বাঁশ, লোকে এই বাঁশ লইয়া ইচ্ছামত কত কি করে। কিন্তু বাঁশ লইয়া খেলায় একটু বিশেষ নিপুণতা আবশ্যক। তাহার ডাল নাই যে, ডাল ছাঁটিয়া কাটিয়া কিছু একটা করা যাইবে, আছে তাহার গায়ে পালা, যাকে কঞ্চি বলে, তাহা ছাঁটিয়া বা কতটুকু বাহার খুলিবে! বেড়ার বাঁশ—বেয়ুড় বাঁশ ছাঁটিয়া কিছু একটা করা যায় কিন্তু অন্য বাঁশ লইয়া উপায় কি? বাঁশের ধাত বুঝিলে উপায় নাই এমন নহে। "কচিতে না নওয়াও বাঁশ, পাকিলে করিবে 'ট্যাস্ ট্যাস্' এই প্রবাদ বাক্য স্মরণ রাখিয়া কাজ করিলেই তুমি কচি, কাঁচা, সবুজ ও সজীব বাঁশ লইয়া কত অপরূপ ফটক ও বৃক্ষ-বাটিকা বানাইয়া ফেলিতে পারিবে। তুমি বুদ্ধিজীবি মানুষ যখন আসিয়া কহার কাছে দাঁড়াইবে তখন তুমি না পারিবে কি? তখন তুমি তাহাকে কত রকম আকারে ঘুরাইতে ফিরাইতে পারিবে। পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ তোমার নিকট কখন নতশীর, কখন নতজানু, কখন শুইয়া, কখন বাঁকিয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া, কখন এদিকে ওদিকে হেলিয়া তোমার মনের ছবি ফুটাইয়া তুলিবে। তোমার ইঙ্গিতে বাঁশ পর্য্যন্ত উঠিবে বসিবে।

ক্যাক্টস্ বা মনসা জাতীয় গাছ গুলি স্বভাবতঃ বড়ই সুদৃশ্য। ইহা দ্বারাও বাগানের বেড়া হয়। ইহাদিগকে কিন্তু অবাধে বাড়িতে দিলে আর রক্ষা নাই। ফণী মনসার এমন সরু তীক্ষ্ণধার কাঁটা যে, তাহার ভয়ে চোর ডাকাইতের দলও তাহার নিকট যাইতে রাজী নহে। খুব লম্বা হাতলওয়ালা কাটারি বা ছুরী না হইলে ইহাদিগের অঙ্গ ছেদন করা যায় না। এই জাতীয় অনেকগুলি গাছের তেমন কোন কাঁটা নাই বা গাছ তাদৃশ বাড়ে না তবু তাহাদিগকে ছাঁটা আবশ্যক। কাঁটা না থাকিলেও আটা আছে সুতরাং গাছ ছাঁটিবার সময় বড় হাতওয়ালা ছুরি চাইই। চায়ের বড় বড় বাগান, সুবিস্তৃত ক্ষেত কত আয়ের। কিন্তু চা (Camelia Thea) সুসময়ে সুনিপুণ হাতে ছাঁটার কৌশলে বাগানের চায়ের ফসল বেশী হয় এবং চা ভাল মন্দ হয়। চায়ের গাছগুলি গোড়া ঘেঁসিয়া ছাঁটা চলে; তাই বলিয়া প্রতি বৎসর গোড়া ঘেঁষিয়া ছাঁটিতে গেলে চলে না। চায়ের মত কঠিন প্রাণ গুল্ম কমই দেখা যায়। এক বৎসর বন্যলতা পাতা চাপা পড়িয়া থাকিলেও মরে না। পাহাড়ের গাছ, তাই বড় কড়া জান। আমাদের সমতল ক্ষেতের বেল ফুলের মত। বেলের ঝাড় বর্ষাসময়ে গোড়া ঘেঁষিয়া বেশ করিয়া ছাঁটিয়া দাও সম্ম বৎসরে আবার ঝাড়াল হইয়া উঠিবে।

আলামাণ্ডা লতানিয়া গুল্ম বিশেষ। খুব গোড়া ঘেঁষিয়া ছাঁটিলে ইহার কোন ক্ষতি হইবে না। এণ্টিগোনা লতা গোড়া সমেত কাট বা যেমন করিয়া ছাঁট কিছুতেই মরিতে জানে না কিন্তু যতক্ষণ রসা জমিতে ততক্ষণ এই রকম, শুষ্ক শীত প্রধান দেশে এই লতাটি বড়ই ম্রিয়মান মৃতপ্রায় হইয়া থাকে। সব লতাই অল্প অধিক ছাঁটা কাটা চলে কিন্তু সব সময়েই বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে হয় নতুবা

মন্দ হয়। লতা লইয়া গৃহের, বাগানের কত রকম সাজ সজ্জা করা যায় কিন্তু যে তাহাদের স্বভাব জানে সেই পারে অন্য লোকে স্থানে অস্থানে আঘাত করিয়া সমূলে তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করে। আইভি লতা (Ivy creeper) ইহা অশ্বত্থ জাতীয় গাছ। দেওয়ালগুলি এই লতা মণ্ডিত হইলে অতি নয়ন মনোহর দৃশ্য হয় কিন্তু যদি কাঁচি ছাঁটা হয় তবে, নতুবা ইহা যথা ইচ্ছা শিকড় চালাইয়া তোমার জানালা দরজা অন্ধ রন্ধ্র সব বুজাইয়া ফেলিবে।

বাঙলা দেশে সমস্ত হিন্দুর বাটিতে তুলসী গাছ আছে। এই গাছগুলি স্বভাবতই বীজ পাকিলেই মরিয়া যায়। কিন্তু যদি ইহাদিগের মঞ্জুরীগুলি অপক্কাবস্থায় ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ইহাদিগকে আর বৎসর বৎসর মরিতে হয় না। গাছের তদ্বির মানে গাছের স্বভাব জানিয়া তাহাদের সেবা। তা জানিলে তুমি তাদের লইয়া ইচ্ছামত বেদেদের ভেল্ বাজি ও দেখাইতে পার।

দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ে রোডোডেনড্রন নামক গাছ যথা তথা দেখিতে পাওয়া যায়। গাছগুলিতে বেশ গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল হয়। ফুলগুলি শুকাইয়া ডাঁটা সমেত গাছের গায়ে তুলসী মঞ্জরির মত লাগিয়া থাকে। এই রোডোডেণ্ড্রন গাছগুলি ছাঁটা মানে তাহাদের এই শুষ্ক ফুল সমেত ফুলের বোঁটাগুলি ছাঁটা। আর দুই একটা শুষ্ক ডাল পাতা ছাঁটা ছাড়া অন্য কিছুই করিতে হয় না—এতটুকু ছাঁটকাটেই ইহারা অতি সুন্দর আকার ধারণ করে।

কনিফেরী জাতীয় গাছ স্বভাবতঃ বড়ই সুন্দর—ইহাদের ছাঁটাকাটার কার্য্য বিশেষ কিছু নাই—তথাপি পাটা ঝাউ, জুনিপিরাস্, বন ঝাউ সামান্য সামান্য না ছাঁটিলে বাগানের শোভার যেন একটু খুঁত থাকিয়া যায়। ক্রিপ্টমারিয়া এই ধরণের গাছ; পাহাড়ে বন্যাবস্থায় যখন জন্মিতেছে তখন তাহাদের অক্ষত দেহে বাড়িতে দেওয়ায় কোন হানি নাই কিন্তু বাগানে অসিয়া পড়িলে তাহাদের অঙ্গে ছুরি কাঁচি দুইই চালাইতে হয়।

আরোকেরিয়া গুলি ছাঁটিবার কোন আবশ্যক না হইলেও যদি কোন কারণে ইহারা বিকলাঙ্গ বা বিকৃতাঙ্গ হইয়া পড়ে তবে তাহাতে অস্ত্র প্রয়োগ করিতেই হইবে।

গাছ ছাঁটার জন্য বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের আবশ্যক। এক রকম খুব লম্বা হাতলওয়ালা ডাল কাটা কাঁচি আছে। উহা না হইলে উচ্চ ফল গাছ গুলি ছাঁটিবার সুবিধা হয় না। সব গাছেরই ফুল ফল হইয়া গেলে পুরাতন পল্লবগুলি যথা সম্ভব ভাঙ্গিয়া দিবার প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজন ঝড়ে অনেক সিদ্ধ হয়, ফল ভাঙ্গিবার সময় কতক হয়। বাকী কাজটুকু এইরূপ ১০।১২ ফিট হাতলওয়ালা কাঁচি দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে পারে।

আর একখানি দেড় কিম্বা দুই ফিট লম্বা হাতলওয়ালা এবং ৮ ইঞ্চি ১০ ইঞ্চি কিম্বা ১২ ইঞ্চি ফলাওয়ালা কাঁচি না হইলে বাগানের বেড়া ছাঁটার কার্য্য চলিবে না। বেড়া

ছাঁটিবার জন্য টিয়া পাখির মত ঠোঁট বাঁকান লম্বা চওড়া ফলাযুক্ত ছুরিকারও আবশ্যক। এই সকল ছুরিকার বাঁট বড় হওয়া চাই, হাতে সজোরে ধরিয়া ছুরির ফলা ডালে বাঁধাইয়া টানিয়া ডাল কাটিতে হইবে। ছুরি ছোট বড় সব রকমই আবশ্যক। সরু লম্বা ফলাযুক্ত হাত করাত বৃক্ষাদির অঙ্গ ব্যবচ্ছেদে বিশেষ প্রয়োজন। চওড়া ফলা হাত করাতে সে কার্য্য করার সুবিধা হয় না। ডাল কাটা করাতের দাঁতগুলি সাধারণ করাতের দাঁত যে দিকে থাকে কর্ত্তন কারীর সুবিধার্থ তাহার বিপরীত ভাবে সজ্জিত।

ফুলের কুঁড়ি কাটা, গোলাপের ছোট ডাল কাটার জন্য ছোট হাত কাঁচিরও প্রয়োজন। কাঁটা গাছ কাটিবার জন্য লম্বা হাতওয়ালা ৬ ইঞ্চ কিম্বা ৮ ইঞ্চ ফলাযুক্ত ছুরিকা চারি হাত বাঁটযুক্ত টাঙ্গি প্রভৃতি যন্ত্রাদির একান্ত প্রয়োজন। দুই এক খানা ছোট বড় বাটালি না হলেও চলে না। বৃক্ষের যে অঙ্গ কাটা হইল, সেই ক্ষতস্থান যদি বাটালি দ্বারা সমান করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ক্ষতস্থানটি অতি শীঘ্র ও সহজে পুরিয়া যায়। গাছ ছাঁটাকাটার জন্য স্থূলতঃ যে যে যন্ত্রের প্রয়োজন তাহা বলা হইল। কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলে সকলেই ঐ সকল যন্ত্র ব্যতীত তাহার নিজ কার্য্য চালাইবার মত নানা প্রকার যন্ত্রাদি গড়াইয়া ব্যবহার করিয়া থাকে।

গাছ ছাঁটা সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ আরও গুটিকত কথা বলা হইল ; বাগানে সাধারণতঃ কত প্রকারের বৃক্ষ লতা গুল্ম দেখিতে পাওয়া তাহাদের প্রত্যেকের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া একটা নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া দেওয়া নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। সুদক্ষ উদ্যান পালক তাহার অভিজ্ঞতার ফলটুকু মনে দৃঢ় ধারণা করিয়া রাখিলেই কার্য্যকালে সুকৌশলে বৃক্ষ অঙ্গে অস্ত্র চালনা করিতে কথন ভীত বা কুণ্ঠিত হইবে না। বৃক্ষ অঙ্গে অস্ত্র প্রয়োগেই যেন তাহার আনন্দ পর্য্যবসিত না হয়—মনে থাকে যেন বৃক্ষাঙ্গের সৌষ্টব সম্পাদন ও তাহাতে মনোমত ফল, ফুল উৎপাদন করাই তাহার উদ্দেশ্য। যেমন রমণী লইয়া খেলায় আনন্দ থাকিতে পারে কিন্তু তাহাতে সুসন্তান উৎপাদন করাই মহত উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য বিহীন হইয়া কার্য্য করিলে কোন কার্য্যে সিদ্ধি হয় না।

---

৬০ মাইল ব্যাপী গোলাপ বাগান—

ভূমধ্য সাগরের উপকূলে তুরস্ক, বুলগেরিয়া রোমানিয়া প্রভৃতি রাজ্যগুলি অবস্থিত। তুরস্কে বহুবিস্তৃত গোলাপক্ষেত আছে, বুলগেরিয়াতেও আছে। ঐ সকল স্থানের গোলাপক্ষেতের কথা এখন কেহ ভাবিতেছে না, ভাবিবার অবসরও নাই। ঐ সকল ষ্টেটস্ যুদ্ধে কি প্রকার সৌর্য্য বীর্য্য দেখাইতেছে তাহা জানিবার জন্য সমস্ত পৃথিবী সতৃষ্ণ হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে। এ হেন সময়ে আমরা

বুলগেরিয়ার একটি গোলাপক্ষেতের কথা বলিব। কথা অনেকের নিকট বেসুরো লাগিবে—কিন্তু আমাদের বেসুরো কথা ছাড়া অন্য কথা কি আছে? রাজাদের কার্য্য রাজারা করুণ, চাষীদের কার্য্য চাষীরা না করিলে রাজ্য চলিবে কেন? বুলগেরিয়া রাজ্যের মধ্য দিয়া বলকান পর্ব্বতমালা চলিয়া গিয়াছে। বলকান পর্ব্বতমালায় দক্ষিণাংশে যতদূর চক্ষু যায় কেবল গোলাপেরই ক্ষেত। এই ভূমিভাগ সমতল প্রদেশ হইতে সহস্র ফিটের অধিক উচ্চ হইবে না। দীর্ঘে ৬০ মাইলের কম হইবে না, প্রস্থেও বহু বিস্তৃত। চারিদিকে পর্ব্বতমালা বেষ্টিত, মধ্যে মধ্যে পার্ব্বতীয় নদী ক্ষেতের মধ্য দিয়া সিন্ধুর উদ্দেশে ছুটিয়াছে। ভুবন অলোকরা গোলাপের রূপ ও মন মাতোয়ারা গোলাপের গন্ধ একবারও নদীকে স্থির করিতে পারে না। জলস্রোত গোলাপের সৌরভ মাখিয়া পুলকে ফুলিয়া উঠিয়া দয়িতের উদ্দেশে আরও দ্রুত ছুটিতেছে। ভূপৃষ্ঠে পর্ব্বত-কোলে এমন মনোহর পুষ্প শোভা বোধ হয় আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কত শত বর্ষ ধরিয়া এইখানে এইভাবে ফুল ফুটিতেছে। সে মাটির যে কি সঞ্জিবনী শক্তি তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। যেন আরও কত শত বর্ষেও তাহার শক্তির হ্রাস হইবে না। কেন বা হইবে, পর্ব্বত গাত্র ধুইয়া অপরিমেয় সার পদার্থ আসিয়া ক্ষেতের উপর সঞ্চিত হইতেছে, পার্ব্বতীয় জলরাশি ক্ষেতের রস রক্ষা করিতেছে, সুউচ্চ পর্ব্বতমালা হিম তুষারের অবাধ গতিরোধ করিতেছে। প্রকৃতি আপনার স্বেচ্ছারচিত বাগানটির জন্য কত যত্ন লইতেছেন। এখানে ফুল ফুটিবে না ত কোথায় ফুল ফুটিবে! যখন ফুলের মরসুম তখন এখানকার পুষ্পগন্ধে বাতাস এত ভরপুর হইয়া উঠে যে তাহার সৌরভে মনুষ্য, পশু, পক্ষীর মন মাতিয়া উঠে এবং পত্র বৈচিত্রের মধ্যে সাদা, লাল, হল্‌দে, গোলাপী প্রভৃতি নানা রঙের ফুলের অপূর্ব্ব শোভা দেখিলে মন পুলকে ভরিয়া উঠে।

পূর্ব্বকালে পারস্যদেশ ও ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে আতর ও গোলাপ জল উৎপন্ন হইত এবং এই আতর ও গোলাপ জল পৃথিবীর নানাস্থানে চালান যাইত। এখন কিন্তু সেদিন নাই, এই দুই জায়গায় আর তাদৃশ অধিক পরিমাণে আতর গোলাপজল তৈয়ারী হয় না। ফ্রান্স, জার্ম্মানি এখন বুলগেরিয়ার গোলাপ লইয়া সস্তার আতর ও গোলাপজল তৈয়ারী করিতেছে। গুণে গন্ধে তাহা কিন্তু এখনও ভারতীয় আতর গোলাপকে পরাভূত করিতে পারে নাই। রুমানিয়ার পুর্ব্বাংশে বলকান পর্ব্বতগাত্রে যে সমতল ভূমি দৃষ্ট হয় সেই স্থানটিতেই আতর ও গোলাপজল প্রস্তুতের প্রধান কারখানা স্থাপিত। পশ্চাতে উচ্চ পাহাড়শ্রেণী চলিয়া গিয়াছে—সমতল প্রদেশেও ছোট বড় শিলাখণ্ড হেলিয়া বাঁকিয়া, উচ্চশীরে অবস্থিত রহিয়াছে অদূরে ঘণ সন্নিবিষ্ট তরুরাজী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অরণ্য আকারে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। দূর হইতে দেখিলে এই স্থানটিকে স্বর্গরাজ্য বলিয়া ভ্রম হয়। তরুশীর্ষগুলি উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া যেন ক্ষেতের মধ্যে তুষারাগমের বাধা জন্মাইতেছে। স্থানটি পরম রমনীয় ও ব্যবহারিক জগতের বিশেষ কার্য্যের উপযুক্ত।

নিম্নপ্রদেশে নানাস্থানে জলের প্রস্রবণ, তাহার ধারে বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, সুন্দর ফলের বাগান, মনুষ্যাদি জীবের যেমন নয়নমনোরম, তেমনই কাজের। এই স্থানটির শোভায় আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই এখানে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে—স্থানটি সহরে পরিণত হইয়াছে—স্থানটির আশে পাশে চারিদিকে লোক সংখ্যা ২৫।৩০ হাজারের কম হইবে না। অধিবাসীর মধ্যে তুরস্ক জাতীর সংখ্যাই অধিক, অন্যান্য অনেক জাতিই এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

সুদীর্ঘ গোলাপের ক্ষেতে স্ত্রীলোকেরা দল বাঁধিয়া ফুল তুলে। তাহারা ফুরাণ কাজ করে—হয় ঘণ্টা হিসাবে না হয় ফুলের পরিমাণ হিসাব কিম্বা জমির আয়তন অনুসারে দর চুক্তি হয়। স্ত্রীলোকের দলে ফুল তুলিতেছে দেখিতে অতি সুশোভন। ফুল তুলিতে তুলিতে তাহার ক্ষেতের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় বসিয়া সুরাপান করিতেছে ও মনের হরষে গান ধরিয়াছে, কখন বা অধীর আনন্দে অদ্ভুত নৃত্য করিতেছে—তাহাদের আনন্দ অপরিসীম—যেন পরির দল পুষ্প শোভা মধ্যে হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। পুষ্প চয়নের সময় প্রাতঃকাল, বেশ ঠাণ্ডার সময়। মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্যের উত্তাপ উঠিবার পূর্ব্বে চয়নকার্য্য শেষ করিতে হয়। প্রখর সূর্য্যের তাপ ফোটা ফুলের পাবড়িতে পড়িতে দিলে ফুলের মাধুর্য্য, রস ও গন্ধ অনেক কমিয়া যায়—ইহা অনেকের ধারণা। ইহা কতদূর সত্য তাহা কিন্তু কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই।

এতদঞ্চলে যে সকল চোলাইয়ের কারখানা আছে তথায় সমুদয় পুরাতন প্রথায় চোলাই কার্য্য (Methods of distillation) সম্পন্ন হয়। নূতন কল কৌশল অবলম্বন করিলে কম খরচে অধিক মাল উৎপন্ন হইবে ইহা তাহারা বুঝিয়াও বুঝিতে চায় না। পয়সা খরচের দিকে তাহারা অগ্রসর হইতে চায় না—সাবেক চালে যতদুর হয় তাহাই তাহাদের যথেষ্ট মনে করে।

আধফুটন্ত ফুলের পাপড়ি হইতেই আতর উৎপন্ন হয়। ফুলগুলি অধিক ফুটিয়া গেলে তাহাতে অপেক্ষাকৃত কম আতর হয় এবং ভাল আতর হয় না। দেড় কিম্বা বড় বেশী দুই হাজার ফুল হইতে অর্দ্ধ ছটাক সুগন্ধী তরলসার প্রস্তুত হয়। এই তরলসারটি কোন পাত্রে ঢালিয়া ২।৩ দিন স্থির থাকিতে দিলে উপরে হরিদ্রাভ তৈলাক্ত পদার্থ ভাসিয়া উঠে। তাহা দুধ হইতে ননী তোলার মত অন্য পাত্রে তুলিয়া লইতে হয়। ইহাই হইল গোলাপী আতর। এই প্রকারে অর্দ্ধসের আতর প্রস্তুত করিতে দুই কিম্বা তিন শত টাকা খরচ পড়ে। বুলগেরিয়ার গোলাপ চাষের সাবেক বিবরণী পাঠে জানা যায় যে এখান হইতে প্রতি বৎসর ১৫০/ মণ আতর বিদেশে রপ্তানি হইত। রপ্তানি ক্রমশঃ বাড়িতেছে, যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে বারমাসের হিসাবে দৃষ্ট হয় যে আতর রপ্তানির পরিমাণ ৩০০/ মন পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। সুতরাং ইহা অনুমান করা বিচিত্র নহে যে এই আতর বিক্রয় বাবদে বুলগেরিয়ার চাষীদের ঘরে ৫ লক্ষ টাকা ঢুকিয়াছে। ভারতে আত

গোলাপের ব্যবসা চালাইবার মত যথেষ্ট স্থান আছে। উদ্যোগীগণ চেষ্টা করিলে বোধ হয় ব্যবসায়টি পূর্ণভাবে চলিতে পারে।

গাছ কাপাস—

প্রাচীন ভারতে যে সকল স্থানে বৎসরী (annual) তুলার চাষ না হইত তথায় কিন্তু যথা তথা গৃহস্থের বাটীর আশে পাশে দুই চারিটা কাপাসের গাছ দেখা যাইত। ঐ সকল বৃক্ষের কাপাস হইতে গৃহস্থেরা প্রয়োজনীয় অনেক কাজ সারিয়া লইতেন—এই তুলা ও শিমুল তুলা দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের শয্যা দ্রব্য ও শীতের গাত্রাবরণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। আমাদের দেশের গরীব ব্রাহ্মণ পরিবারের বিধবারা এখনও চরকাদ্বারা সূতা কাটিয়া পৈতা প্রস্তুত করেন এবং উহা তাঁহাদের জীবিকার অবলম্বন হয়। তুলা বীজ পেষণ করিয়া তৈল উৎপাদনেরও ব্যবস্থা ছিল। তুলা বীজের তৈল, তিল তৈলের ন্যায় পাতলা বলিয়া বহুকার্য্যে ব্যবহারযোগ্য। এখনও তুলা বীজের তৈল হইতেছে কিন্তু এই কার্য্য এখন পল্লিতে পল্লিতে হয় না। তুলা ব্যবসায়ের কেন্দ্রে যেখানে তুলার বীজ ছাড়ান হইয়া গাঁট বাঁধা হয় সেইখানেই বীজ পেষাই হয়। অধিকাংশ বীজ কিন্তু বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায়। সুতরাং তুলা বীজ তৈল আর সহজ লভ্য বা সস্তা নাই। কাজেই এখন সকলকেই কেরোসিনের সস্তা ও অথচ অত্যুজ্জ্বল উগ্র আলোকে কার্য্য করিয়া চক্ষুর দৃষ্টি হারাইতে হইতেছে। তুলা বীজ গবাদির পুষ্টিকর খাদ্য। ইহার খৈল বা বীজ গবাদিকে খাওয়াইলে গাভীর দুধ বাড়ে। গ্রামে তুলা গাছ আর তত দেখিতে পাওয়া যায় না। সুদূর পল্লীবাসীরাও এক্ষণে সহর বাজার হইতে টাকায় পাঁচপোয়া, দেড়সের তুলা খরিদ করিয়া লেপ কাঁথা তৈয়ারি করিতে বাধ্য হইতেছেন। পুরাতনের জীর্ণ কঙ্কাল আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকাও ভাল নহে বটে কিন্তু পুরাতন বর্জ্জনকালে আত্মরক্ষার উপায়গুলি একবার ভাবিয়া দেখিতে হয়।

কলমের পেঁপে গাছ—

এমেরিকার কৃষিবিভাগ দেখাইতেছেন যে পেঁপের বীজ হইতে চারা তৈয়ারি করিয়া সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই। কলম করিয়া যে পেঁপের চারা উৎপন্ন হইতেছে তাহা বৎসর ফলা (annual) হইতেছে। একটি বড় গাছের শির ছেদন করিলে তাহাতে তিন চারি সপ্তাহের মধ্যে অসংখ্য ফেঁকড়ি ডাল বাহির হইবে। এই ফেঁকড়িগুলি দুই চারি ইঞ্চ বড় হইলেই উহাদের সহিত অন্য চারার জিভ-কলম করিয়া লইতে হয়। বীজের চারাগুলির কাণ্ড ৬ ইঞ্চ মাত্র রাখিয়া কাটিতে হইবে, তৎপরে জিভ-কলমের যে নিয়ম আছে সেইমত কলম বাঁধিতে হইবে। কলমগুলি

বাঁধিবার সময় নরম টোয়াইন বা পাটের সূতা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কলমগুলি যাহাতে কিছুদিন ছায়াতে থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

ফ্লরিডা দেশে এই রকমে প্রস্তুত পেঁপের কলম ভাদ্র আশ্বিনে জমিতে বসাইলে পৌষ মাঘ মাসে তাহাতে ফল ধরিবে এবং তাহার পরবৎসর গ্রীষ্ম ও শরৎকাল পর্য্যন্ত ফল প্রসব করিতে থাকিবে। আরও অধিকদিন রাখিলে থাকে কিন্তু ফল ছোট হইয়া আসিলেই নূতন গাছ বসান ভাল।

পত্রাদি

লঙ্কার চাষ—

শ্রীযুক্ত ভবদাশচন্দ্র ঘোষ—কাঞ্চনতলা, ধুলিয়ান।

প্রশ্ন—লঙ্কার চাষ কি বৎসরে দুইবার হয়? কোন্ কোন্ সময় চারা বসাইতে হইবে এবং কোন্ সময় ফসল অধিক হয় জানাইবেন। আমি এ বৎসর ১৷৷০ বিঘা জমিতে লঙ্কার চাষ করিয়াছি। মাঘ মাসে চারা পুতা হইয়াছে। এখন চারাগুলি বেশ বড় ও ঝাড়াল হইয়াছে। দুই একটী গাছে ফুল ও লঙ্কা দেখা দিয়াছে এক্ষণে ঐ গাছের কিরূপ তদ্বির করিলে বা সার দিলে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে? মাঝে মাঝে দুই একটা গাছের ডাল শুকাইয়া যাইতেছে।

উত্তর—লঙ্কার চাষ বৎসরে দুইবার হয়। সময় মনে রাখিবার জন্য একটা সঙ্কেত জানিয়া রাখুন। পৌষীয় বেগুণের সঙ্গে একবার এবং চৈতে বেগুণের সঙ্গে একবার লঙ্কার আবাদ হয়; অর্থাৎ বর্ষায় শ্রাবণ মাসে এবং শীতের শেষে মাঘ মাসে ইহার আবাদ আরম্ভ হয়। শীতের সময়ই ফসল অধিক হয়।

আপনার মাঘে বসান লঙ্কা ক্ষেতে ইতি পূর্ব্বে সার দেওয়া উচিত ছিল। পুরাতন ছাই মিশ্রিত গোময় সার, শুষ্ক পাঁকমাটি বেশ ভাল সার। উক্ত ক্ষেতে এখন সার দিবার সুবিধা হইবে না, বর্ষা শেষে ক্ষেতটি চষিয়া গাছের গোড়ায় খৈল ছড়াইয়া দিয়া মাটি দিলে গাছগুলি খুব তেজাল হইয়া উঠিবে ও অধিক লঙ্কা ফলিবে। পোকা লাগিয়া লঙ্কা গাছের ডাল শুকাইতেছে। পোকাক্রান্ত গাছগুলি তুলিয়া স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য।

হস্তী ও অশ্ব মল—

শ্রীযুক্ত ভবদীশচন্দ্র ঘোষ—কাঞ্চনতলা, ধুলিয়ান।

প্রশ্ন—হাতী ও অশ্বের মল মূত্র কি প্রকার সার এবং কি প্রকারে ব্যবহার করিতে হয়?

উত্তর—হাতী ও ঘোড়ার মল ও গবাদির মল প্রায় একই রকমের সার। অশ্ব মল, গরুর মল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ তেজস্কর। অশ্ব মূত্রে গোমূত্র অপেক্ষা অধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। গোমূত্রে নাইট্রোজেনের মাত্রা শতকরা '৮০, অশ্বমূত্রে ১'২ ভাগ, হাতীর মূত্র বা মল সহজ প্রাপ্য নহে বলিয়া তাহার বিশ্লেষণ হয় নাই—বোধ হয় গো-মল অপেক্ষা হস্তী-মল উৎকৃষ্ট হইবে না—কিন্তু হস্তীমূত্র অশ্বমূত্র অপেক্ষা তেজস্কর বলিয়া বোধ হয়। যে ফসলে গো-মল মূত্র ব্যবহার করা যায়, সেই সকল ফসলে হাতী বা ঘোড়ার মল মূত্র ব্যবহার করা চলে। ক্ষেতে ব্যবহারের পূর্ব্বে গো মূত্র ও মল যে প্রকারে পাকা চৌবাচ্চায় রাখিয়া পচাইয়া পরিণত করিয়া লইতে হয়, হাতী ঘোড়ার মল ঐ প্রকারে পচাইয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। "কৃষি-রসায়ন" পুস্তকে সবিশেষ বিবরণ দেখুন।

চূণ সার প্রয়োগ—

শ্রীকীর্ত্তিবাস নন্দী—বোলপুর।

প্রশ্ন—বেলে মাটি, দোয়াস মাটি, এটেল মাটি এই রকম ক্ষেতে কি পরিমাণে চূণ ব্যবহার করিতে হইবে? ফসল হিসাবে, যেমন ধান, পাট বা কলাই প্রভৃতি চাষের জন্য চূণের পরিমাণের তারতম্য করিতে হইবে কি না?

উত্তর—সচরাচর এক একরে (তিন বিঘায়) ১৴ মণ চূণ প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট হয়। দোয়াঁস মাটিতে চূণ না দিলেও চলে। এদেশের মৃত্তিকায় চূণ অল্লাধিক মাত্রায় আছেই আছে। তবে মনে রাখিবেন চূণ প্রয়োগ দ্বারা শক্ত এটেল মাটি নরম এবং নরম বেলে মাটি কিছু ঘন সম্বন্ধ হইয়া চাষের উপযুক্ত হয়। চূণের দ্বারা উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থের পচন ক্রিয়া শীঘ্র সমাধা হয়। চূণে মৃত্তিকার অম্লরস নষ্ট করে। এই সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়া চূণ দিতে হইবে।

ধানে সার—

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ পাল, এল,এম,পি—মোহিনী কুটীর, বোলপুর।

প্রশ্ন—ধানে কোন্ সার সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী—ধানে রেড়ীর খৈল দেওয়া ভাল কিনা?

উত্তর—প্রতি বিঘায় ১/ মণ হাঁড়ের গুঁড়া ও ।/০ দশ সের সোরা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। ধানের সবুজ সার ও অন্যান্য সার সম্বন্ধে বিগত কয়েক মাস হইতে "কৃষকে" বহু আলোচনা হইয়াছে। রেড়ীর খৈল মন্দ সার নহে। রেড়ীর খৈল ব্যবহারে জমির একটু জলটান হয়। জমি সরস রাখিবার জন্য জল যোগাইতে হয়। নিম্ন রসা জমিতে সে ভয় নাই। আউসের জমিতে রেড়ীর খৈল ব্যবহার করিলে জলটান হইবার ভয় আছে। কৃষি-রসায়ন পুস্তক খানি কাছে রাখিলে সার ও আবাদী জমির গুণাগুণ সম্বন্ধে অনেক বিষয় যখন তখন দেখিয়া লইবার সুবিধা হয়।

মাছের ব্যবসা—

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়—চমচমা, বেনারস সিটি।

প্রশ্ন—মাছের পেট কাটীয়া লবণ-হলুদ-মিশান জলে চুবাইয়া বরফ কি ভাবে কত পরিমাণে দিয়া কেমন করিয়া বাক্সে প্যাক করিতে হইবে বিস্তারিত জানাইলে বড়ই উপকৃত হইব। লবণ, হলুদ ও জলের পরিমাণ কত ?

উত্তর—লবণ ও হলুদ জলের সহিত কিছু অধিক মাত্রায় মিশাইতে হয়। মাছের পেটের ভিতর ও বাহিরে যেন লবণ হলুদের একটা ছোব ধরে। জীবানু দ্বারা মৃত মৎস্যে পচন ক্রিয়া আরম্ভ না হয় তাহারই ব্যবস্থা করিতে হয়। লবণ হলুদ জীবানুজ ক্রিয়ার প্রতিশেধক। অত্যন্ত শীতাবস্থায়ও জীবানুর কোন ক্রিয়া হয় না তাই বরফ দিবার ব্যবস্থা। যে বাক্সে মাছ প্যাক হইবে তাহা সমশীতল রাখিবার জন্য যে পরিমাণ বরফ আবশ্যক ততটুকু বরফ দিতে হইবে। একটি কেরোসিন বাক্সে যদি মাছ প্যাক করা হয় তবে উহাতে আট দশ সেরের কম বরফ দিলে চলিবে না। নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছান পর্য্যন্ত বাক্সে বরফ থাকা চাই। যতদূর সম্ভব বায়ুবদ্ধভাবে প্যাক করা প্রয়োজন।

ক্ষার জমির উন্নতি বিধান—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—চমচমা, বেনারস সিটি।

প্রশ্ন—সাজীমাটি সংযুক্ত পতিত জমি, যাহও অল্প সল্প জন্মে তাহাকে উর্ব্বরা করিতে হইলে, কি সার, কত পরিমাণে এবং কোন্ সময়ে কত সার দেওয়া আবশ্যক ?

উত্তর—উক্ত জমিতে গোময় ও গোয়ালের আবর্জ্জনা সার প্রদান করিয়া বর্ষার পূর্ব্বে বারম্বার চষিতে হইবে। বিঘা প্রতি এইরূপ সার ৫০/ কিম্বা ৬০/ মণ প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহার উপর শুষ্ক পুরাতন পাঁক মাটি ছড়াইতে পারিলে আরও ভাল হয়। প্রতি বিঘায় মাঝারি ঝোড়ার ৩০০ তিন শত ঝোড়া মাটি ছড়ান আবশ্যক।

বর্ষার পূর্ব্বে জমি চষা, মাটি ও সার ছড়ান কার্য্য শেষ করা কর্ত্তব্য। জমিটির আইল এরূপ ভাবে বাঁধিতে হইবে যে যাহাতে বর্ষার জলে সার ধুইয়া যাইতে না পারে।

ক্ষার জমিতে গবাদির খাদ্যশস্য কিম্বা মূলজ খন্দ—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—চমচমা বেনারস সিটি!

প্রশ্ন—আপাততঃ উক্ত জমিতে Fodder অর্থাৎ লুসার্ণ, বরু, জুয়ার, জৈ, ধঞ্চে অথবা সীম জাতিয় বা মূলজ দ্রব্য রোয়াইতে ইচ্ছা করি, অতএব কোন্ ২টা যুক্তি সঙ্গত আশা করি জানাইলে বড়ই বাধিত হইব।

উত্তর—ক্ষারভাব কাটিয়া না গেলে উক্ত জমিতে জুয়ার, জৈ, বিয়ানা, গিণি ঘাষ কিম্বা সিম কলাই প্রভৃতি কিছুই ভাল হইবে না। জমির মাটি কঠিন হইলে তাহাতে মূলজ সব্জী হয় না। পচা পাতা সারযুক্ত জঙ্গল হাসিলী জমি হইলে তাহাতে সদ্য বৎসরে মূলজ খন্দ জন্মান যাইতে পারে কিন্তু আপনি যে জমির কথা উল্লেখ করিতেছেন তাহার সংস্কার না করিয়া তাহাতে মূলজ খন্দ করিতে হইলে লোকসান হইবে। গোময় ও আবর্জ্জনা সারে জমির মাটি আল্‌গা হইবে তারপর খন্দ রোপণ সময় খৈলের সার দিবেন। বিঘা প্রতি ২॥০ আড়াই মণ খৈল এই সকল জমির পক্ষে অধিক নহে। নিজে সব দিক বুঝিয়া কার্য্য করিবেন।

কাচের কারখানা—

যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট শিল্পোন্নতি সাধনে মনোযোগী হইয়াছেন, এবং নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন বিষয়েও উদ্যম প্রকাশ করিতেছেন। সংপ্রতি তাঁহারা কাচ-শিল্প সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছেন এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন পূর্ব্বক, যুক্ত প্রদেশের কাচের কারখানার কার্য্যের উন্নতিকল্পে দুইজন নিপুণ কারিকরের নিয়োগ বিষয়ে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের শিল্পোন্নতির চেষ্টা দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। মিঃ সোয়ান, বাঙ্গালার শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টকে কয়েকটি শিল্পের উন্নতি সাধন বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট সে অনুরোধ রক্ষায় যত শীঘ্র অগ্রসর হন ততই ভাল।

বাণিজ্য কলেজ—

বোম্বায়ের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা লর্ড সাডনহামের স্মৃতিরক্ষার্থ বোম্বাই নগরে একটী স্মৃতিরক্ষিণী কমিটি গঠিত হয়। কমিটি লর্ড সীডনহামের

স্মৃতিরক্ষার্থে বোম্বাই নগরে একটি বাণিজ্য কলেজ সংস্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং উক্ত সঙ্কল্প সিদ্ধির উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্টের হস্তে ১৮৫০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ প্রদান করিয়াছেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্টে স্মৃতিসমিতির দান সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহাও তাঁহারা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন। যতদিন না কলেজ ভবন নির্ম্মিত হইবে, ততদিন গবর্ণমেণ্ট বাণিজ্য কলেজের অবস্থানের জন্য বাটী ভাড়া করিবেন এবং ভাড়ার টাকা প্রদত্ত অর্থের সুদ হইতে পরিশোধ করিবেন। অতঃপর সুবিধা বুঝিয়া গবর্ণমেণ্ট কলেজের জন্য একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবেন। কলেজটি লর্ড সীডনহাম কমার্শিয়াল কলেজ নামে অভিহিত হইবে। লর্ড সীডনহামের স্মৃতি সংরক্ষণী সমিতি যে তাহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ না করিয়া একটি কলেজ স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার স্মৃতি জাগরুক রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা অতীব আনন্দলাভ করিয়াছি। ইহাতে একদিকে যেমন লর্ড বাহাদুরের স্মৃতি রক্ষা হইবে অন্যদিকে বোম্বায়ের একটি স্থায়ী অভাব দূরীভূত হইবে। মহাজনগণের স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে এইরূপ ব্যবস্থার সমাদর হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় শাসনকর্ত্তাদিগের এবম্বিধ অনুষ্ঠান বড় অধিক দেখা যায় না।

দুগ্ধ সরবরাহ—

কলিকাতায় বিশুদ্ধ গো দুগ্ধ দুর্লভ। এই অভাব নাগরিকগণ অনেক দিন হইতে ভোগ করিতেছেন। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটী এতদিন এ অভাবের প্রতিকার বিষয়ে কোন উদ্যম প্রকাশ করেন নাই। ফলে, সহরে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা এবং নানারূপ উৎকট রোগের বৃদ্ধি হইয়াছে। যাহা হউক ইদানীং এদিকে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহারা কলিকাতায় বিশুদ্ধ ও পর্য্যাপ্ত গো দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার জন্য উদ্যম উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। সংপ্রতি মিউনিসিপ্যালিটির অনুরোধে ভারত গবর্ণমেণ্টও কলিকাতায় বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধ সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং নর্দার্ণ সারকিটের গো-শালার সহকারী ডাইরেক্টার কাপ্তেন, জে, ম্যাটশন্‌কে কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ সংক্রান্ত সকল তথ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একটি রিপোর্ট প্রেরণ করিবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। কাপ্তেন ম্যাটসন কলিকাতার দুগ্ধ সরবরাহ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তিনি শীঘ্রই এ বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট স্বীয় রিপোর্ট পেশ করিবেন। কলিকাতার বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহ সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির পথ একটু উন্মুক্ত হইল দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। আশা করি

কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ যাহাতে অচিরে সহরে বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহ বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া তৎসম্বন্ধে আশু ব্যবস্থা করিবেন।

ফস্ফরাস প্রধান সার (হাড়চূর্ণ)—

ফস্ফরাস সার বৃক্ষলতাদির ফল, ফুল ও মূল ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ইহা প্রয়োগে শস্যের বীজ শীঘ্র বাড়ে, আকারে বড় হয় ও ফল মূল সুমিষ্ট হয়। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ কয়েক বৎসর যাবৎ জমিতে হাড়চূর্ণ প্রয়োগ দ্বারা যে সিদ্ধান্ত করিতে পারিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিরবণ নিম্নে দেওয়া গেল।

হাড়ের গুড়া একটি বিশেষ সার, ইহার ব্যবহারে শস্যের ফল, ফুল, বীজ ও মূলের বৃদ্ধি হয়, ফলমূলের মিষ্টতা বাড়ে এবং শস্য শীঘ্র পাকে। ধান, গম, যব, আলু ইক্ষু, মূলা, শালগম, কপি ইত্যাদি শস্যের পক্ষে হাড়ের গুড়া বিশেষ উপকারী। রোয়া ধানে ইহার ফল অতি চমৎকার। যেখানে বিনা সারে সাধারণতঃ ৬।৭ মণ ফসল হয়, হাড়ের গুড়া ব্যবহার করিয়া সেখানে ৯।১০ মণ ফসল পাওয়া যায়। হাড়ের গুড়া বিঘা প্রতি ১৴ মণ হিসাবে ব্যবহার করিতে হয়। ইহার দাম ৩৲ টাকা মণ। হাড়ের গুড়ার সার জমিতে অন্ততঃ তিন বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। জমি প্রথম চষিবার সময় হাড়ের গুড়া আন্দাজ করিয়া জমির উপর ছিটাইয়া দিয়া ক্রমে চাষের সঙ্গে মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। যত আগে হইতে হাড়ের গুড়া জমিতে দেওয়া যায় ততই ভাল। কেন না হাড়ের গুড়া মাটির সহিত মিশিয়া গিয়া শস্যের ব্যবহারোপযোগী হইতে একটু সময় লাগে। সকল জমির পক্ষে হাড়ের গুড়া সমান উপকারী নহে। শালী বা জল জমি, লালমাটি ভিটা জমি ইত্যাদিতে অতি উত্তম ফল পাওয়া যায়। বেশী পরিমাণ জমিতে হাড়ের গুড়া ব্যবহার করিতে হইলে, পূর্ব্বে একটু পরীক্ষা করিয়া লওয়া মন্দ নহে; মাঝামাঝি একটা আইল তুলিয়া এক ভাগে হাড়ের গুড়া দিয়া ও অপর ভাগ বিনা সারে রাখিয়া এক বৎসর ধান জন্মাইলেই ঐ জমিতে হাড়ের গুড়া কেমন কাজ করিতেছে তাহা অতি সহজে বুঝা যাইবে। হাড়ের গুড়া কলিকাতায় কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুরকে লিখিলে তিনি যোগাড় করিয়া দেন। ভারতীয় কৃষি-সমিতি ও হাড়ের গুঁড়া যোগাড় করিয়া দিয়া থাকেন।

রোয়া ধানে সাররূপ হাড়ের গুড়ার উপকারীতা দেখাইবার জন্য প্রথম বৎসর প্রদর্শকের তত্বাবধানে কিছু হাড়ের গুড়া রায়াতদিগকে সরকারী কৃষি বিভাগ হইতে বিনামূল্যে দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ফল এত সন্তোষজনক হয় যে পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন স্থানে জমিদারগণ তাঁহাদিগের রায়তদিগকে হাড়ের গুড়া সরবরাহ করিবার জন্য অগ্রিম

টাকাও দিয়াছেন। এই সার ব্যবহার করিয়া রায়তগণ প্রথম বৎসরেই যে পরিমাণ ফসল পাইয়াছে তাহাতে সারের দাম উঠিয়াও লাভ রহিয়াছে।

ঢাকা, রাজসাহি ও চট্টগ্রাম বিভাগে হাড়ের গুড়া সম্বন্ধে প্রদর্শন কার্য্য ধীরভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে। হাড়ের গুড়া ব্যবহার করিয়া নানা স্থানে ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে।

ভেদ বমনের উদ্ভিজ্জ ঔষধ—

শ্বেত আপাঙ্গের শিকড় ১ একটী ও গোলমরিচ একটী একত্র বাটিয়া ৩ তিনটী বটিকা করিবে। দুই ঘণ্টা অন্তরে ইহা এক একটী করিয়া সেবন করাইবে। প্রথম ভেদের পরেই ইহা সেবন করাইতে পারিলে, রোগের অবস্থা সংঘাতিক হইতে পারে না। রোগীর বয়সের তারতম্য অনুসারে শিকড় ছোট বড় বিবেচনা করিয়া দিতে হইবে।

উচ্ছেপাতার রসে তিলতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিসূচিকা নষ্ট হয়।

ইন্দ্রযব ৪ তোলা ／১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধসের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে, এক ছটাক মাত্রায় দুই ঘণ্টা অন্তরে এই জল সেবন করাইলে ভেদ ও বমি উভয়ই নিবারিত হয়।

কচি মূলার ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে বিসূচিকা (কলেরা) নিবারিত হয়। ইহা বিসূচীকা রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ ও জঠরাগ্নি উদ্দীপক।

বেল শুঁঠা বা শুঁটক বেলের কাথ বমন ও বিসূচিকা রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কর্পূর ১ রতি, লঙ্কাচূর্ণ ১ রতি, হিং ৷৹ অৰ্দ্ধ রতি ও [illegible] ৷৹ অৰ্দ্ধ রতি, একত্র গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া একটী বটিকা করিবে। প্রত্যেক দাস্তের পরে এইরূপ একটি করিয়া বটিকা লেবুর রসযুক্ত চিনির সরবৎ সহ সেবন করাইলে ওলাউঠা নিবারিত হয়।

অতিরিক্ত ভেদ নিবারণের জন্য আফিং ঘটিত ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগী পিপাসায় কাতর হইলে কর্পূরবাসিত নির্ম্মল সুশীতল জল বিবেচনা পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে প্রদান করিবে।

কবাবচিনিচূর্ণ ১ তোলা, যষ্টিমধু চূর্ণ ৷৹ তোলা, কজ্জলী ।৹ আনা, মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্প অল্প লেহন করিতে দিবে, তাহাতেও পিপাসা নিবারিত হইবে। হিক্কা উপস্থিত হইলে কদলী মূলের রসের নস্য দিবে। রাই সরিষা বাটিয়া ঘাড়ে বা পৃষ্ঠ অংশে (মেরুদণ্ডে) প্রলেপ দিলেও হিক্কা নিবারিত হয়।

মূত্রসঞ্জনার্থ স্থলপদ্মের রস চিনির সহিত পান করিতে দিবে, পাথর কুচির পাতা ও সোরা একত্র বাটিয়া বস্তিদেশে প্রলেপ দিলেও প্রস্রাব হয়।

বাগানের মাসিক কার্য্য

আশ্বিন-মাস

সব্জীবাগান। এই সময় শীতের আবাদ ভরপুর আরম্ভ হয়। ইতিপূর্ব্বেই জলদি জাতীয় কপি, টমাটো, বিলাতি লঙ্কা প্রভৃতি বপন করা হইয়া চারা তৈয়ারী হইয়াছে। এই সময় নাবীজাতীয় বীজ বপন করিতে হয়। মূলজ সব্জীর চাষ এই সময় হইতে আরম্ভ। মূলা, সালগম, বীটের এই সময় চাষ আরম্ভ করিবে। বেগুন চারা ইতিপূর্ব্বেই ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে, সেগুলি এক্ষণে দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। সীম, মটর বীজ এই সময় বপন করিতে হইবে। জলদি কপিচারা যাহা ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাতেও এই সময় মাটি দিতে হইবে ও পাকা পাতাগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। আলুও এই সময় বসাইবে, পিঁয়াজ চাষেরও এই সময়।

ফুলের বাগান। এই সময় এষ্টার, প্যান্সি, ভার্ব্বিনা, ডালিয়া, ক্রিয়াস্থাস, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরস্থমী ফুলবীজ বপন করিতে আরম্ভ করিবে।

পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই সময় বেগোনিয়া, জেরিনিয়ম প্রভৃতি কোমল গাছগুলির বিশেষ পাট করিতে হয়। এই সকলের কাটিং বসাইতে পারা যায়, কিন্তু পাহাড়ে অত্যন্ত অধিক বৃষ্টি হয়—সুতরাং সাসি দ্বারা আবৃত স্থানে সে সকল কাটিং পোঁতা উচিত। গোলাপের কলম (Budding) এখন করা যাইতে পারে—বিশেষতঃ হাইব্রীড পার-পেচুয়াল জাতীয় গোলাপের বডিং হইবে। চীনা, টি, বুরবন জাতীয় গোলাপের কাটিংও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বসান করা যাইতে পারে। বৃষ্টির সম্পূর্ণ অবসান না হইলে পার্ব্বত্য-প্রদেশে সব্জী তৈয়ারী করা হইয়া উঠে না। তবে আচ্ছাদনের ভিতর যত্ন করিয়া করিলে কিছু কিছু হইতে পারে। পর্ব্বতে দ্রাক্ষালতার এই সময় বড় বাড় হয়। সেগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া, গোড়া খুঁড়িয়া, একটু বাড় কমাইতে হইবে।

পশ্চিম ভারতে যেখানে বৃষ্টির আতিশয্য আদৌ নাই, তথায় এই সময় গোলাপ ক্ষুপের হইতে নাড়িয়া বসাইতে পারা যায়। এই সময় উক্ত প্রদেশে লোকে ফুলকপি চারা ক্ষেত্রে বসাইতেছে। আশ্বিনমাসের শেষে কার্ত্তিমাসের প্রথমেই তথায় ফুলকপি তৈয়ারি হইয়া উঠিবে।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

ষোড়শ খণ্ড,—৫ম সংখ্যা

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত এম, আর, এ, এস্

ভাদ্র, ১৩২২

কলিকাতা; ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, শ্রীরাম প্রেস হইতে
শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কৃষক।

সূচীপত্র।

ভাদ্র ১৩২২ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৬শ খণ্ড। { ভাদ্র, ১৩২২ সাল। } ৫ম সংখ্যা।

পাথুরে কয়লার খনি

শ্রীউপেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরি লিখিত

লোকে আজ কাল সোণা রূপার খনির সন্ধান পাইলে যত না আনন্দিত হয় পাথুরে কয়লার খনির সন্ধানে ততোধিক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। এই বিজ্ঞানের যুগে কল কারখানা চালান পাথুরে কয়লা ভিন্ন আর গতি নাই। আগে স্রোতের জলের সাহায্যে লোকে কলের চাকা ঘুরাইত, সূর্য্যের আলোক ধরিয়া কারখানার উত্তাপ যোগাইত কিন্তু পাথুরে কয়লার সন্ধান পাইয়া লোকের যেন কাজটা কিছু সহজ হইয়াছে।

এই পাথুরে কয়লা জিনিষটা কি? সোণা, রূপা, লোহার মত ইহা খনিজ পদার্থ বটে কিন্তু সোণা, রূপা ইত্যাদি মূল পদার্থ—মিশ্র পদার্থ নহে। পাথুরে কয়লা মিশ্র পদার্থ তাই কোন্ কোন্ পদার্থ সংযোগে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে, জানিতে ইচ্ছা হয়। জিনিষটা নাড়াচাড়া করিলেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। বৃক্ষ লতা পাতার ছাপ ইহার গায়ে দেখিতে পাওয়া যায় এবং স্পষ্ট বুঝা যায় যে উদ্ভিদ দেহ রূপান্তরিত হইয়া কয়লার উৎপত্তি হইয়াছে। কয়লার ন্যায় কেরোসিনও জীব দেহ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সকলেরই ধারণা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই ধারণা ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

জগদ্বিখ্যাত রুস পণ্ডিত মেণ্ডেলিফ্ অনেক গবেষণা করিয়া কেরোসিনকে জীবমূলক পদার্থ বলিতে পারেন নাই। কয়লার খনিতে কেরোসিন পাওয়া যায়, যেখানে কয়লা নাই তথায়ও কেরোসিন্ মিলিতে পারে। ইহাঁর মতে অঙ্গার ও লৌহ ইত্যাদি ধাতু ঘটিত যৌগিক পদার্থগুলিই কেরোসিনের উৎপাদক। এইগুলি ভূগর্ভের গভীরতম অংশে অত্যন্ত উষ্ণ অবস্থায় থাকে। কোন গতিকে ইহাদের গায়ে জল লাগিলে জলের

হাইড্রোজেন ধাতুমিশ্রিত অঙ্গারকে টানিয়া লইয়া কেরোসিনের উৎপত্তি করে। এই প্রকারে যখন কেরোসিন উৎপন্ন হয় তখন তাহা সেই অত্যুষ্ণ স্থানে কখনই তরলাকারে থাকিতে পারে না—তাহাকে সম্ভবতঃ বাষ্পাকারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। তার পর সেই বাষ্প ভূগর্ভের নিম্নস্তর হইতে ক্রমে উপরের শীতল স্তরে আসিয়া জমাট বাঁধিলেই তাহা কেরোসিন্ হইয়া দাঁড়ায়।

কয়লার খনির উল্লেখ করিয়া আমরা দুইটা বহু প্রয়োজনীয় পদার্থের উল্লেখ করিলাম কিন্তু আমরা এক্ষণে দেখাইব যে কয়লার খনিতে আরও অসংখ্য জিনিষ পাওয়া যায়—এমন কি রাজা রাজওয়ার শীরোভূষণ হিরক পর্য্যন্ত কয়লার খনিতে পাওয়া যায়।

ইতিপূর্ব্বে পত্রান্তরে ডাক্তার চুনিলাল বসু মহাশয় পাথুরে কয়লা হইতে প্রস্তুত দ্রব্যের একটা কুর্চী নামা দিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত সেই তালিকা অবলম্বন করিয়া আমরা পাথুরে কয়লার খনিজ দ্রব্যগুলির গুণাগুণ বিচার করিব।

কে জানিত যে এই কৃষ্ণবর্ণ কদাকার পদার্থের মধ্যে নয়নরঞ্জন নীল, পীত, লোহিত, হরিৎ প্রভৃতি বিবিধ বর্ণ সৌন্দর্য্যের অনন্ত ভাণ্ডার লুক্কায়িত রহিয়াছে! এক্ষণে আমরা যে বহুবিধ সুন্দর বর্ণ (Aniline and Alizarine colors) পাথুরে কয়লা হইতে উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছি, তদ্দ্বারা রেশম পশম ও কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্রাদি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিস্তৃত ভাবে রঞ্জিত হইতেছে। আবার এই কৃষ্ণবর্ণ কঠিন পদার্থ হইতে প্যারাফিন্ (Parafin) নামাক শ্বেতবর্ণ মোমের ন্যায় কোমল এক প্রকার বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধুনা জ্বালাইবার জন্য মোমবাতির ন্যায় এক প্রকার বাত্তি এই প্যারাফিন হইতে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। কে জানিত যে এই কঠিন কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের মধ্যে জল অপেক্ষা লঘু, স্বচ্ছ, বর্ণহীন, সহজ দাহ্য বেঞ্জিন্ (Benzene) নামক তরল পদার্থ নিহিত রহিয়াছে! বেঞ্জিন্ অধুনা নানাবিধ শিল্পকার্য্যে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং ইহা হইতে প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা নানাবিধ রঙ প্রস্তুত হইয়া থাকে। নির্গন্ধ পাথুরে কয়লা হইতে যে উগ্র গন্ধযুক্ত এমোনিয়া (Ammonia) নামক অদৃশ্য বায়বীয় পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, ইহা কেহ কখনও মনে করে নাই। এমোনিয়া হইতে উৎপন্ন নানাবিধ লবণ শিল্পকার্য্যে ও ঔষধের নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এমোনিয়া ঘটিত সমস্ত পদার্থই আমরা পাথুরে কয়লা চোয়াইয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আবার পাথুরে কয়লার মধ্যে চিনি অপেক্ষা মিষ্ট ও শুভ্রতর সাকারিন্ (Sacharine) নামক পদার্থ যে বিদ্যমান আছে, তাহা কখনও কাহারও কল্পনার মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা এই সুমিষ্ট পদার্থ পাথুরে কয়লা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। বহুমূত্র রোগে চিনির ব্যবহার নিষিদ্ধ; চিনির পরিবর্ত্তে সাকারিন্ এই রোগে পথ্য রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কার্ব্বলিক এসিড্ (Carbolic acid), সালিসিলিক এসিড্ (Salicyllic acid), সালল্ (Salol) এন্টিফেব্রিন

(Antifebrin), এণ্টিপাইরিন (Antipyrin) ফিনাসিটিন্ (Phenacetin) প্রভৃতি যে কত মহোপকারী ঔষধ আমরা পাথুরে কয়লা হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহার সংখ্যা করা যায় না। সেই জন্যই পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পাথুরে কয়লা কৃষ্ণবর্ণ কদাকার হইলেও উহা অশেষ মহৎ গুণের আধার।
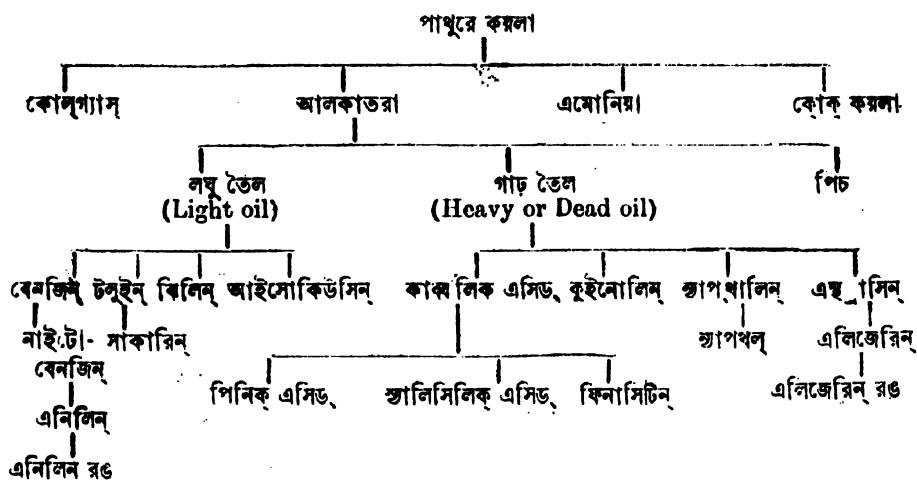
ইতিপূর্ব্বে যে সকল পদার্থের উল্লেখ করা গিয়াছে পাথুরে কয়লা চোয়াইলে তাহারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কলিকাতার গ্যাসের কারখানায় দেখিতে পাই যে, একটি রুদ্ধ লৌহপাত্রের মধ্যে পাথুরে কয়লা রাখিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করাত হয়। পাত্রের উপরিভাগে একটি মাত্র ছিদ্র আছে এবং উহাতে লৌহনির্ম্মিত একটি নল সংযুক্ত থাকে। ঐ নলের অপর মুখ জলপূর্ণ অপর একটি পাত্রের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। পাথুরে কয়লায় উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ তিন প্রকার পদার্থ উৎপাদন করে, যথা—

(১) কোলগ্যাস্ (Coal-gas)—ইহা নলের মধ্য দিয়া দ্বিতীয় পাত্রস্থিত জল হইতে বুদ্‌বুদাকারে নির্গত হয় এবং প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া বৃহদাকার পাত্রে সঞ্চিত হয় এবং তথা হইতে নল দ্বারা সহরের রাজপথে নীত হইয়া রাত্রিকালে আলোক প্রদান করে।

(২) এমোনিয়া বাষ্প (Ammonia gas)—ইহা দ্বিতীয় পাত্রস্থিত জলের মধ্যে দ্রব হইয়া থাকে; প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা এই দ্রাবণ হইতে এমোনিয়ার নানাবিধ লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(৩) কোল্টার (Coal-tar) বা আলকাতরা—ইহা দ্বিতীয় পাত্রস্থিত জলের তলদেশে সঞ্চিত হইয়া থাকে; ইহা নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হয় এবং ইহা হইতে বহুবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত হয়।

উত্তাপ সংযোগে পাথুরে কয়লা হইতে এই তিন পদার্থ বহির্গত হইয়া গেলে পর পূর্ব্বোক্ত লৌহ পাত্রের মধ্যে যে কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম কোক্ কয়লা (Coke)। ইহা আমরা রন্ধনের নিমিত্ত ইন্ধন রূপে ব্যবহার করি।

তবেই দেখা যাইতেছে যে পাথুরে কয়লা চোয়াইয়া আমরা কোল্‌গ্যাস, এমোনিয়া, আলকাতরা এবং কোক্ কয়লা প্রধানতঃ এই চারিটি পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আমরা ক্রমশঃ জানিতে পারিব যে আবার এই আলকাতরাকে চোয়াইলে বহু সংখ্যক শিল্পে ব্যবহার্য্য ও ঔষধোপযোগী দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদিগের বিষয় সংক্ষেপে পরে বর্ণিত হইবে। পাথুরে কয়লা হইতে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, উপরে তাহাদিগের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল। পাথুরে কয়লা হইতে অধঃস্তন সপ্তম পুরুষের নাম ও তাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ এই তালিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে বলা উচিত যে, এই তালিকাটি সম্পূর্ণ নহে। বাহুল্য ভয়ে সপ্তমাধিক নিম্নতর পুরুষদিগের পরিচয় এ প্রবন্ধে উল্লিখিত হইল না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পাথুরে কয়লাকে চোয়াইয়া যে জ্বালানি বাষ্প নির্গত হয় তাহার নাম কোলগ্যাস। বড় বড় সহরের রাস্তায় ও অবাস গৃহে আলোক প্রদানের নিমিত্ত এই বাষ্প প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সম্প্রতি গ্যাসের পরিবর্ত্তে তাড়িতালোক অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইতেছে—কলিকাতা সহরের হারিসন রোড, হাবড়ার পোল প্রভৃতি এবং সহরের অনেক বড়লোকের বাটী এক্ষণে তাড়িতালোক দ্বারা আলোকিত।

১৭৯২ খৃঃ অব্দে উইলিয়ম মার্ডক্ (William Murdak) নামক একজন ইংরাজ আলোক প্রদানের নিমিত্ত প্রথমে কোল্ গ্যাস প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং ১৭৯৮খৃঃ অব্দে বার্মিংহামের নিকট সোলিস্ (Solis) নামক স্থানে একটি কারখানা গ্যাসের আলোক দ্বারা উজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। ১৮০৭ খৃঃ অব্দে লণ্ডন নগরের রাজপথ গ্যাসের আলোকে ভূষিত হইয়াছিল এবং ১৮২২ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্রই এই আলোকের প্রচলন হয়। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে কলিকাতা সহরের রাজপথগুলিকে গ্যাসের আলোকে উজ্জ্বলিত করা হয়।

কেহ কেহ বলেন মিঙ্কেলার্স (Minckelar) নামক একজন ওলন্দাজ রসায়ন তত্ত্ববিদ্ কোল্‌গ্যাস্ আবিষ্কার করেন।

আমাদের সহরের পূর্ব্বাংশে সিয়ালদহের নিকট কোল্‌গ্যাস্ প্রস্তুত করিবার প্রকাণ্ড কারখানাটি স্থাপিত। ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানী এই কারখানার সত্বাধিকারী। এই স্থানে পাথুরে কয়লা চোয়াইয়া যে গ্যাস প্রস্তুত হয় তাহাই সহর ও সহরের উপকণ্ঠে আলোক প্রদান করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কার্য্যে যে, আল্‌কাতরা ও কোক্ কয়লা প্রস্তুত হয়, তাহা ইহারা বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহারা যদি

আলকাতরা হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত নানাবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করেন; তাহা হইলে তাঁহারা বিস্তর লাভ করিতে পারেন এবং অনেক শ্রমজিবী লোকও এইরূপে প্রতিপালিত হইতে পারে। এ বিষয়ে আমরা তাঁহাদিগের মনোযোগ প্রদানে অনুরোধ করিতেছি। এমন কি যদি অন্য কেহ ইঁহাদিগের নিকট হইতে আলকাতরা ক্রয় করিয়া এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেও তাহা লাভের ব্যবসা হইবে বলিয়া মনে হয়।

জর্ম্মাণির একটি কারখানায় শুদ্ধ আলকাতরা হইতে নানাবিধ রঙ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কারখানায় প্রত্যহ ৫০০০ লোক কার্য্য করে এবং ২৫০ জন রসায়ন শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তি এই সকল পদার্থ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এই কারখানায় নিযুক্ত আছেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে, যে শুদ্ধ আলকাতরা হইতে নানাবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্তুত করিবার ব্যবসা কতদূর লাভজনক।

পাথুরে কয়লা চোয়াইলে যে এমোনিয়া বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা প্রথমতঃ জলে দ্রব হইয়া থাকে। এই দ্রাবণের সহিত হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড মিশ্রিত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইলে এমোনিয়ন্ ক্লোরাইড্ (নিসাদল) নামক এমোনিয়ার একটি লবণ প্রস্তুত হয়। নিসাদলের সহিত কলিচুণ মিশাইয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে বিশুদ্ধ এমোনিয়া বাষ্প প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং উহার সহিত ভিন্ন ভিন্ন দ্রাবক সংযুক্ত হইলে এমোনিয়ার বিবিধ লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল লবণ ঔষধ ও শিল্পকার্য্যে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে পাথুরে কয়লা হইতে আমরা আলকাতরা (Coal-tar) প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আলকাতরা একটি মিশ্র পদার্থ অর্থাৎ ইহা অনেকগুলি পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন। উত্তাপ প্রয়োগ করিলে এই সকল পদার্থ একে একে পৃথক্ হইয়া পড়ে। একটি মাত্র ছিদ্রযুক্ত লৌহ নির্ম্মিত রুদ্ধ পাত্রের মধ্যে আলকাতরা রাখিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে প্রথমতঃ ঈষৎ পাটলবর্ণের এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ পৃথক হইয়া আইসে। ইহা জলের উপর ভাসে বলিয়া ইহাকে "লঘু তৈল" (Light-oil) কহে।

এই "লঘুতৈল" পুনরুত্তপ্ত হইলে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বেঞ্জিন্ নামক (Benzene) পদার্থ টী সর্ব্ব প্রধান।

বেঞ্জিন্ একটি বর্ণহীন, তরল পদার্থ; ইহা জল অপেক্ষা লঘু এবং তৈলের ন্যায় জলের সহিত মিশ্রিত হয় না। ইহার গন্ধ আলকাতরার ন্যায়; ইহা একটি উদ্বায়ী (Volatile) পদার্থ অর্থাৎ খোলা পাত্রে রাখিলে শীঘ্র উড়িয়া যায়। রবর, নানাবিধ বৃক্ষনির্য্যাস (Resin) এবং অন্যান্য তৈলময় পদার্থ দ্রব করিবার নিমিত্ত বেঞ্জিন্ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইহার প্রধান ব্যবহার বহুবিধ এনিলিন্ রঙ (Aniline colors) প্রস্তুত করিবার জন্য।

এনিলিন্ রঙ প্রস্তুত করিতে হইলে বেঞ্জিনের সহিত প্রথমতঃ নাইট্রিক্ এসিড্ মিশ্রিত

করিতে হয়। এইরূপে বাদামের গন্ধযুক্ত একটি ঘন তৈলাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহার নাম নাইট্রোবেঞ্জিন্ (Nitrobenzene); ইহা সাধারণতঃ এসেন্স্ অব্ মার্বেণ্ (Essence of Mirbane) নামে পরিচিত। ইহা গন্ধদ্রব্য রূপে নানাবিধ পদার্থের সহিত মিশ্রিত করা হয়। বিস্কুট, কেক্ ও অন্যান্য বিলাতী খাদ্যদ্রব্যে এবং নানাপ্রকার সাবানে যে আমরা বাদামের গন্ধ পাই, তাহার কারণ এই পদার্থ উহাদিগের সহিত মিশ্রিত থাকে বলিয়া। ইহা অধিক মাত্রায় শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলে বিষের কার্য্য করে, এজন্য ইহা দ্বারা কোন খাদ্যদ্রব্য গন্ধযুক্ত করা উচিত নহে।

নাইট্রোবেঞ্জিনকে এসিটিক্ এসিড্ (Acetic Acid) ও লৌহচূর্ণের সহিত একত্র করিয়া উত্তপ্ত করিলে একপ্রকার বর্ণহীন তৈলাক্ত পদার্থ পৃথক হইয়া পড়ে। ইহার নাম এনিলিন্ (Aniline)। ইহার সহিত ভিন্ন ভিন্ন ধাতব পদার্থ মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে বহুবিধ বিবিধ বর্ণের রঙ উৎপন্ন হয়। ম্যাজেণ্টা একটি এনিলিন রং, ইহা দেখিতে সবুজ বর্ণ ও চিক্কণ, কিন্তু জলের সহিত মিশ্রিত হইলে রক্তবর্ণের দ্রাবণ প্রস্তুত হয়। এনিলিন এবং পার্ক্লোরাইড্ অব্ মার্কারি নামক পারদ ঘটিত লবণ একত্রে উত্তপ্ত করিলে ম্যাজেণ্টা প্রস্তুত হয়। এইরূপে অন্যান্য ধাতব পদার্থের সহিত এনিলিন উত্তপ্ত হইলে বহুসংখ্যক বর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যত প্রকার রঙ্গিন রেশমী বিলাতী ফিতা আমরা দেখিতে পাই তাহারা সমস্তই এনিলিন্ বর্ণে রঞ্জিত। অধুনা এই বর্ণ দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত আল্‌কাতরা হইতে উৎপন্ন এলিজেরিন (Alizarin colors) নামক আর এক প্রকার রঙ বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে সাকারিণ (Sacharin) নামক যে সুমিষ্ট পদার্থের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাও পূর্ব্বোক্ত "লঘুতৈল" হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা শুভ্রবর্ণ, দানাযুক্ত ও আস্বাদনে অত্যন্ত মিষ্ট; বহুমূত্র রোগে চিনির পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহৃত হয়।

কৃষ্ণমুগকলাইয়ের চাষ

শ্রীশীতলদাস রায়

মেন্থার, মেদিনীপুর জেলা কৃষি সমিতি।

মুগকলাই দুই জাতীয় আছে—সোনা ও কৃষ্ণ মুগ। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল অঞ্চলে সোনামুগের চাষ কেহ করে না। ইহার চাষ প্রণালী এখানে কেহ জানে না। তদ্ভিন্ন এতদ্দেশের মাটী সোনামুগের উপযোগীও নয়। এতদঞ্চলে কৃষ্ণ বা কাল মুগ

প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। মেদিনীপুর, চন্দ্রকোনা প্রভৃতি মোকামে কটকী কৃষ্ণমুগ একপ্রকার আমদানি হয়। কটকদেশজাত বলিয়া ইহা কটকী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু দেশী কালমুগ অপেক্ষা ইহার দানা ক্ষুদ্রাবয়ব এবং স্বাদে হীন। আবার ইহার সহিত মাষকলাই সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত থাকায় ইহা দেবকার্য্যে ব্যবহৃত হয় না। দেশী কৃষ্ণমুগ অপেক্ষা ইহা কিছু সস্তা দরে বিক্রয় হয়। দেশী কৃষ্ণমুগের দানা বেশ পুষ্ট এবং স্বাদু। ইহার চাষ প্রণালী অতি সহজ। এই কলাই উৎপন্ন করিতে অধিক পরিশ্রম বা যত্ন করিতে হয় না। স্বল্পায়াসে এবং একরূপ বিনা অর্থব্যয়ে উৎপাদিত হয়। ইহা রবিজাতীয় শস্য। দোয়াঁস, বেলে, মেটেল, পলি এক কথায় তৃণহীন শুষ্ক ও কঙ্করময় জমি ব্যতীত ইহা সর্ব্বপ্রকার মৃত্তিকাতেই জন্মে। ইহার চাষের জন্য জমিতে পৃথক্‌ভাবে সার প্রদান করিতে হয় না। আশ্বিন বা কার্ত্তিকমাসে কালা জমি হইতে আশু ও ঝাঁজ্রি ধান্য কাটা হইয়া গেলে জমি সিক্ত বা আর্দ্র থাকিলে একবার মাত্র লাঙ্গল দিয়া বীজকলাই ছিটাইয়া বপন করিতে হয়। আর্দ্র জমির রসে বীজকলাই ২।৩ দিনের মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়। যদি জমি সরস না থাকে তবে সেচের দ্বারা সামান্য পরিমাণ জল সিক্ত করিয়া দিতে হয়। অধিক জল বীজের উপর দিলে বা বপন করিবার পর বৃষ্টির আধিক্য হইলে বীজকলাই পচিয়া যায় এবং যদিইবা অঙ্কুর বহির্গত হয় তাহা তত তেজস্কর হয় না। কাজেই ফসলও ভাল জন্মায় না।

উপযুক্ত সময়ে এবং সরস জমিতে বীজ বপন করিতে পারিলে ষোলআনা কলাই জন্মিবার কোন সন্দেহ থাকে না। বীজ বপন করিবার পর হইতে শস্য সংগ্রহের সময় পর্য্যন্ত এই কলাই ক্ষেতে চাষীর আর কোন কাজ নাই। গাছ অঙ্কুরিত হইয়া ৩।৪টা পত্রবিশিষ্ট হইবার পর যদি ২।১ বার অল্প বৃষ্টি হয় তাহা হইলে সম্পূর্ণ ফসল পাইবার পক্ষে চাষী নিশ্চিন্ত থাকে।

আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে কার্ত্তিক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত কৃষ্ণমুগ কলাই বপনের উপযুক্ত সময়। কেহ কেহ আশ্বিনের প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যে জমিতে যো পাইলেই কলাই বুনিয়া থাকে বটে, কিন্তু দেখা গিয়াছে যে তাহাতে গাছ খুব ঝাড়াল ও চওড়া পত্রবিশিষ্ট হয়, কলাইয়ের শুঁটী অধিক হয় না। অপর পক্ষে উপরের লিখিত সময়ের মধ্যে বীজ উপ্ত হইয়া ২।১ পশ্‌লা সামান্য বৃষ্টি হইয়া যাইলে গাছ তেজস্কর, ঝাড়াল, বিরল পত্রবিশিষ্ট, লম্বা ও সুপুষ্ট শুঁটাধারী হয়। অধিক বা উপর্য্যুপরি বৃষ্টি হইতে থাকিলে এবং জমিতে জল বসিয়া যাইলে গাছ হীনতেজা হইয়া লালবর্ণ হইয়া যায়। সেইজন্য বৃষ্টির জল জমি হইতে অবাধে নির্গত হইবার জন্য আইলে নালা কাটিয়া দিতে হয়। শিম্বিজাতীয় উদ্ভিদ্ যে জমিতে উৎপন্ন হয় নিজদেহ পুষ্টির জন্য সেই জমির সার এত অধিক পরিমাণে গ্রহণ করেনা যদ্দ্বারা জমিকে অসার করিয়া ফেলে। বরং এই জাতীয় উদ্ভিদের স্বভাব এই যে নৈসর্গিক নিয়মানুসারে বায়ু হইতে নিজদেহের

পোষণোপযোগী উপাদান গ্রহণ করিয়া জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। এজন্য অন্য প্রকার শস্যের পক্ষে যাহাই হউক শিম্বিজাতীয় ফশলের পক্ষে একই জমিতে ধান কলাই এই দুই প্রকার ফসল প্রতি বৎসর জন্মাইলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি নষ্ট হয় না এবং প্রচুর ফশল জন্মাইবার পক্ষেও বাধা হয় না। মশুর কলাই জন্মিবার পর বৎসর সেই জমিতে মুগকলাই এবং মুগকলাইয়ের জমিতে মশুর কলাই বুনিয়া আমরা উভয় শস্যই কম পাইয়াছি। ইহাতে আমার অনুমান যে কলাই ক্ষেতে ধান, ধানক্ষেতে কলাই এই প্রকার পর্য্যায় বপন সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

অগ্রহায়ণ মাসে মুগকলাই গাছ পুষ্পিত হয়। এই সময় বৃষ্টিপাত হইলে শুঁটী ধারণের পক্ষে বড়ই ব্যাঘাত হয়। পৌষমাসে কলাই পাকিয়া থাকে। উক্ত মাসের শেষ বা মাঘমাসের প্রথমেই কলাই গাছ সংগৃহীত হয়। তৎপরে ২।৪ দিন রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া যষ্টি দ্বারা আঘাত বা গরুর দ্বারা মাড়াই করিয়া ও কুলা দ্বারা পাছুড়িয়া লইলেই শস্য গৃহজাত হইয়া গেল। পরিত্যক্ত ভ্রষ্টা বা খোসা গবাদি পশু অতি আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকে। বপনের পর ৩ মাসের কমে রবিশস্য সুপক্ক হয় না। প্রতি বিঘায় ৪।৫ মন কলাই অবাধে উৎপন্ন হয়। এক বিঘা জমির কলাই ১৬ টাকা হইতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। খরচ প্রতি বিঘা ২ টাকার অধিক নয়।

নিমকি ও চুক

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত

দরিদ্রের গুণ থাকিলেও তাহার গুণের স্ফুরণ হয় না,
দরিদ্রস্য গুণাঃ সর্ব্বে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ।

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা দেশের অধিবাসী হইয়াও বাঙ্গালী প্রকৃতই এক্ষণে অন্নের কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে এদেশে দিন দিন লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে, জীবিকার্জ্জনের অনেক দ্বার ক্রমশঃই রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, পূর্ব্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লোকের নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় ছিল, সকলেই স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসায়ে সন্তুষ্ট ছিল, এখন সমাজ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই জীবন যাত্রার সুবিধা জনক পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু লোক সংখ্যার আধিক্য এবং চাকরী ও ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বশতঃ অনেকেই কৃষি, জীবনের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিতেছেন। ফলতঃ কৃষি সম্বন্ধে সমধিক জ্ঞান

না থাকিলে আশানুরূপ ফললাভ সম্ভবপর নহে। একারণে এ সময়ে কৃষিবিষয়ক সাধারণ জ্ঞানের আলোচনা করিলে জনসমাজের উপকার হইতে পারে, এবং কি উপায় করিলে কৃষিজীবির অভাব মোচন হইতে পারে, সব জিনিষই যেন নূতন করিয়া গড়িবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

লেবুর চাষ একটি অল্প আয়াস সাধ্য লাভজনক কৃষি। ভারতবর্ষের নানাদেশে নানা প্রকারের লেবু জন্মিয়া থাকে। কোন স্থানে কমলা, কোথাও কাগজী, পাতি, কোথাও গোঁড়া, বাতাবি ইত্যাদি। এক এক দেশের জল বায়ু বিশেষে এক বা ততোধিক প্রকারের লেবু স্বাভাবিক ভাবে জন্মিয়া থাকে। লেবু যে বিশেষ উপকারী জিনিস, তাহা সকলেই অবগত আছেন। ইহার বিস্তৃত আবাদ খুব অল্প স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহস্থ বাটীতে অম্লের জন্য ২।৪টী গাছ রোপণ করা হইয়াই থাকে। যে সকল স্থানে ইহার বিস্তৃত আবাদ হয়, এখন দেখা যায় যে, সেখান হইতে ফল সমূহ বহুপরিমাণে বাজারে আমদানী হওয়া সুকঠিন ফলতঃ অনেক লেবু অনর্থক নষ্ট হইয়া যায়। লেবুর ব্যবহার জানিলে এরূপ হইত না। লেবু যে কেবল কাঁচা খাইবার জিনিস তাহা নহে। কমলা লেবু সদৃশ এমন উপাদেয় ফলও আসামের সুদুর পূর্ব্ব সীমাস্থিত নানা পাহাড়ে অনেক গাছেই পাকিয়া, গাছে থাকিয়া নষ্ট হয়। রপ্তানী করিবার সুবিধা নাই, স্থানীয় বাজারে মূল্য নাই। তদ্ব্যতীত স্থানীয় লোকেরা উহা হইতে অপর কোন জিনিস প্রস্তুত করিতে জানেনা, কিম্বা করেনা। অনেকের বাগানে কাগজী ও পাতি লেবু প্রতি বৎসর বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া থাকে। উৎসাহ ও উদ্যমশীল ব্যক্তি অভাবে রাশিকৃত লেবুর কোন উপায় হয়না। তাহা ছাড়া দেশমধ্যে এত পতিত জমী আছে, যেখানে কোন না কোন জাতীয় লেবুর বিশেষরূপে আবাদ করা চলিতে পারে। কাগজী, পাতি ও গোঁড়া লেবু তো যেখানে সেখানে ও অল্প আয়াসে জন্মিতে পারে। পতিত জমী হইতে একটী আয়ের উপায় উদ্ভাবন করিবার অনেক পন্থা আছে। তন্মধ্যে লেবুর আশুলাভ একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তিন জাতীয় লেবু গাছ প্রতি বিঘায় ৬০টি জন্মিতে পারে। চারি বৎসর বেশ যত্ন ও পাইট করিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে পঞ্চম বৎসর হইতে যে উহারা ফল প্রদান করিবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক গাছ হইতে ন্যূন কল্পে এক টাকা মূল্যের ফল উৎপন্ন হইলে, বিঘা প্রতি ৬০৲ টাকা আমদানী হইতে পারে। এই আয় হইতে প্রতি বিঘার জন্য খরচা হিসাবে দশ টাকা বাদ দিলেও বৎসরে ৫০৲ টাকা আয় হওয়া বড় সহজ লাভ নহে, এইরূপ দশ বিঘা আওলাত থাকিলে একটী অনতি বৃহৎ গৃহস্থ পরিবারের নির্ভাবনায় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহিত হইতে পারে। বলা বাহুল্য গাছের বয়স আরও কিছু বৃদ্ধি হইলে ফলের পরিমাণ ও আয় বাড়া সম্ভব।

ফল যাহাতে নষ্ট হইতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করা উচিত। গাছে যাহাতে অধিকদিন ফল থাকিতে পারে সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতিই দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ফলের গাছের আমরা বড় একটা যত্ন করিতে পারিনা বলিয়া ফল অতি শীঘ্রই পাকিয়া যায়। আবার অনেক সময় অপরিপক্কাবস্থায় গাছ হইতে খসিয়া যায়। মাটির রস রক্ষা করিতে পারিলে ইহার প্রতিবিধান হয়। মাটীতে রস বজায় রাখিতে হইলে অবস্থা বুঝিয়া ফলের সময় মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ায় জল সেচন করা বিধেয়। জমি সিক্ত হইবার পর জমির 'যো' হইলে মৃত্তিকার উপর স্তর কর্ষণ ও হস্ত বা মৈ প্রভৃতিদ্বারা ঢিল গুলা ভাঙ্গিয়া সমতল করিয়া মৃত্তিকা ঈষৎ চাপিয়া দিলে মাটির রস রক্ষা করা যায়। মৃত্তিকা নীরস হইয়া গেলে ফল পরিপুষ্ট হইতে পারে না। ফলের ছাল বা খোসা মোটা হয়, শাঁসের পরিমাণ অল্প হয়, আস্বাদ বিকৃত হয়, বীজ অধিক ও বড় হয়।

স্বভাবতঃ যে সময় গাছের ফল পরিপুষ্ট ও পরিপক্ক হইয়া উঠে, সে সময়ে বাজারে ফলের প্রচুর আমদানী হইয়া থাকে। সুতরাং ফলও তখন সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। দূরদেশ হইতে সহরে কোন ফল চালান দিতে হইলে অনেক খরচ পড়িয়া থাকে, এবং সে সমুদয় খরচ দিয়া নিকট হইতে আমদানী ফলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সুবিধাজনক নহে। এসময়ে নিকটের ফলে বরং দূরের ফল অপেক্ষা অধিক লাভ পড়িয়া যায়। ফলের প্রথমাবস্থাতেই বাজারে ইহার অধিক আমদানী হয়, এবং অতি শীঘ্রই ক্রমে উহা দুষ্প্রাপ্য হইতে থাকে, ফলতঃ ফলের মূল্যও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কৃত্রিম উপায়ে অপেক্ষাকৃত অধিকদিন বৃক্ষে জল সেচনাদি কার্য্য করিয়া বৃক্ষে ফল মজুত রাখিতে পারিলে এই কারণে বিশেষ লাভ হইতে পারে। সহরের নিকট যাহাদের বাগ বাগিচা, তাহারা বেশী অধিকদিন ফল মজুত রাখিতে পারে না, তাহার কারণ সুদূর পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহর নিকটস্থ স্থানে সকল বিষয়েই খরচ বেশী, কাজেই যত শীঘ্র সম্ভব সেই ফল বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা ঘরে আনিবার জন্য উদ্যান স্বামীর বিশেষ চেষ্টা থাকে। এতদ্ব্যতীত পাইকারগণও নিকটস্থ বাগানের ফল ইজারা লইতে বা খুচরা নগদ ক্রয় করিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় উদ্যান স্বামী সে সুযোগ পরিত্যাগ করেন না।

এমতাবস্থায় লেবুর আরক কিম্বা নিমকি প্রস্তুত করিতে পারিলেই লেবুর সদ্ব্যবহার হয়। লেবু হইতে নিম্‌কি অর্থাৎ জারকলেবু ও চুক, অর্থাৎ লেবুর আরক কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাই বিবৃত হইতেছে। লেবু হইতে এই দুইটী জিনিস প্রস্তুত করিতে পারিলে এবং চেষ্টা করিয়া বিক্রয় করিবার সুবিধা করিতে পারিলে, টাট্‌কা ফল অপেক্ষা ইহাতে অধিক লাভের সম্ভাবনা। যত্ন করিয়া রাখিলে নিমকি ও চুক দুই জিনিষই দুই চারি বৎসর অবিকৃত থাকিতে পারে; এমন কি যত পুরাতন হইতে থাকে, ততই বিশেষ উপকারী হয়। এই দুই জিনিসই মুখরোচক, অগ্নি বৃদ্ধি কর ও পাচক সুতরাং রোগী ও ভোগী উভয়েরই তুল্য রূপে ব্যবহার্য্য।

কাগজী ও পাতি এই উভয় লেবু নিম্‌কী বা জারক লেবু প্রস্তুতের উপযুক্ত। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে লেবু সকল পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া পাকিতে আরম্ভ হয়। সেই

সময় যত্নসহকারে লেবু সংগ্রহ করিতে হইবে। গাছ হইতে লেবুগুলিকে পাড়িয়া লইবার সময়ে যাহাতে উহা ভূমিতে না পড়িয়া যায়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। লেবু সজোরে ভূমিতে পড়িলে ইহার আস্বাদ বিকৃত হইয়া যায়। পরন্তু লেবুর গাত্রে আঘাত লাগে, এতন্নিবন্ধন দাগী হইয়া পচিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। লেবুগুলি সংগৃহীত হইলে একখানি অপিচ্ছিল প্রস্তর খণ্ডে বা মশলা বাটা শীলে এক একটী লেবুকে স্বতন্ত্ররূপে ধীরে ধীরে ঘসিয়া লইতে হইবে। ঘর্ষণকালে যেন উহার কোন স্থান অতিশয় ঘর্ষিত না হয়। কেবলমাত্র উহার গাত্রের স্বাভাবিক বর্ণটী উঠিয়া যায়, এবং তন্নিম্নস্থ ত্বকে বিশেষ আঘাত না লাগে। যে শীলা বা প্রস্তর খণ্ডে লেবুকে ঘর্ষণ করিতে হইবে, উহাতে যেন আদৌ কোনরূপ ময়লা বা রঙ না থাকে। মশলা বাটা শীলা হইলে উহাকে গরম জলে উত্তমরূপে বিধৌত করা আবশ্যক। এতৎ সংক্রান্ত কার্য্যে যে কোন পাত্র ব্যবহৃত হইবে, তাহাই যেন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হয়। কারণ পাত্রে কোনরূপ ময়লা বা গন্ধ থাকিলে ঘর্ষিত লেবু সকল বিবর্ণ হইয়া যায়, অথবা দুর্গন্ধযুক্ত হয়। এইরূপে লেবুগুলি উত্তমরূপে ঘর্ষিত হইলে নির্ম্মল জলে হস্ত দ্বারা উত্তমরূপে রগড়াইয়া বিধৌত করিয়া পরিস্কৃত মৃণ্ময় বা কাঁচের কিম্বা শীলা পাত্রে রাখিয়া দিবে। পাত্রে যাহাতে অধিকক্ষণ জল না থাকে, এজন্য লেবু সমেত পাত্রকে অল্পক্ষণ এমনভাবে হেলাইয়া রাখা কর্ত্তব্য যে শীঘ্রই লেবুর গাত্রস্থিত জল বাহির হইয়া যায়। অধিকক্ষণ লেবু ভিজিয়া থাকিলে বায়ুমণ্ডলস্থিত ধূলারাশি আসিয়া উহাতে সঞ্চিত হয়, তাহাতে লেবুর বর্ণ মলিন হইয়া যায়। সুতরাং বিধৌত হইবার অব্যবহিত পরেই উহাকে রৌদ্রে দিতে হয়। এইরূপে ৫।৭ দিবস রৌদ্রে রাখিয়া দিলে লেবুগুলি অনেকটা শুষ্ক হইয়া যায়। লেবুর গাত্রও অনেকটা চুপসাইয়া আইসে। যদি এই কয়দিবসের মধ্যে লেবুগুলি বেশ চুপসাইয়া না যায়, তবে আরও কয়েক দিবস রৌদ্রে রাখিতে হইবে। তৎপরে শুষ্ক লেবুগুলিকে রসে ফেলিতে হইবে। রসের জন্য কাগজী, পাতি ও গোঁড়া তিনপ্রকার লেবুই ব্যবহার হইতে পারে, কিন্তু গোঁড়া লেবুতে রস অধিক থাকে বলিয়া অল্প লেবুতে অনেক রস পাওয়া যায়, এজন্য গোঁড়া লেবুর রসই প্রসিদ্ধ। যাহা হউক একটা কোন পরিষ্কার পাত্রে রস বাহির করিয়া একখণ্ড পরিষ্কার কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া সেই রসটী একটী হাঁড়িতে ঢালিতে হইবে। অনন্তর তাহাতে আবশ্যক মত লবণ দিতে হইবে। প্রতি একশত লেবুর জন্য একসের লবণ দিতে হয়। রসের পরিমাণ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, যাহাতে সমুদায় ফলগুলি রসে নিমজ্জিত থাকিতে পারে, সেই পরিমাণ আপাততঃ দিলেই ভাল হয়। আর নূতন হাঁড়ি অপেক্ষা পুরাতন ঘৃতের হাঁড়ি গ্রহণীয়, নূতন হাঁড়িতে প্রথমতঃ রস বড় শোষিত হইয়া যায়, তাহা ব্যতীত অনেক রস চুয়াইয়া বাহির হইয়া যায়। ঘৃতের হাঁড়িতে এ সকল উৎপাত ঘটেনা, হাঁড়ির মধ্যে লেবু রক্ষিত হইলে, উহার উপরে একখণ্ড সূক্ষ্ম কাপড় ঢাকিয়া বান্ধিয়া দিতে হইবে। হাঁড়ির মুখ খোলা থাকিলে উহাতে ধূলা ও নানাবিধ

কীট পতঙ্গ আসিয়া পড়ে, হাঁড়ির মুখ কাপড় দিয়া ঢাকিবার পরে উহাকে ক্রমাগত কিছুদিন রৌদ্রে রাখিতে হইবে, এবং প্রতিদিন অন্ততঃ একবার হাঁড়িটি ধরিয়া নাড়িয়া লবণাক্ত রস লেবুর গাত্রে মাখাইয়া সুবিধা করিয়া লইতে হইবে। রস কমিয়া গেলে দ্বিতীয়বার রস ও লবণ দিয়া পূর্ব্ববৎ হাঁড়িটাকে কয়েকদিন রৌদ্রে রাখিতে হয়, এইবার রস ঘন হইয়া আসিলে হাঁড়ির মুখে কোন পাত্র ঢাকা দিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। চীনে মাটীর জার অথবা মুখ ফাঁদালো কাচের শিশিতে রাখিতে পারিলে আরও ভাল হয়। কারণ এরূপ পাত্রে রাখিলে রস শুষ্ক হইতে পারেনা, হাঁড়িতে থাকিলে রস শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়, রস শুষ্ক হইয়া গেলে পুনরায় রস জোগাইতে না পারিলে লেবুতে "ছাতা" ধরিয়া যায়। যে সকল লেবুতে "ছাতা" ধরিয়া যায়, তাহা দেখিবামাত্র স্বতন্ত্র না করিয়া ফেলিলে অপরাপর লেবুতেও সেই রোগ সংক্রামিত হয়, ক্রমে তাবৎ লেবুই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

লেবুর রস হইতে যে আর একটী মহোপকারী দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারা যায় তাহার নাম চুক বা লেবুর আরক, সচরাচর ইহা গোঁড়া লেবুরই হইয়া থাকে, পাতি ও কাগজি লেবুর রসেও হইতে পারে; গোঁড়াতে অম্লের ভাগ অধিক, তন্নিবন্ধন অধিকতর জারক ও পাচক। চুক প্রস্তুত করিবার জন্য বেশী হাঙ্গাম করিতে হয় না, লেবু সংগ্রহ করিয়া পরিষ্কার জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লইয়া একটী মৃণ্ময় বা প্রস্তর কি কাচ পাত্রে উহার রস বাহির করিতে হয়। রসকে একখণ্ড কাপড়ে ছাঁকিয়া মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাত্রে অগ্ন্যুত্তাপে কিছুক্ষণ জ্বাল দিতে হয়। জ্বাল দিতে দিতে যখন সেই রস ঘন হইয়া গুড়ের মতন হইবে, তখনই চুক প্রস্তুত করা হইল। ইহাতে কিছু বিট লবণ, সৈন্ধব ও জুয়ান চূর্ণ মিশাইয়া পাক করিয়া রাখিতে পারিলে আরও উপাদেয় ও উপকারী হয়। চুক প্রস্তুত হইলে একটী কাচের বোতলে পুরিয়া রাখিয়া দিবে। যত্ন করিয়া রাখিলে চুক অনেকদিন থাকিতে পারে। যোয়ান চূর্ণের সহিত লেবুর রস ও লবণ মিশ্রিত করিয়া বারম্বার রৌদ্রে দিয়া কথঞ্চিৎ নিরস হইয়া আসিলে যে চূরণ প্রস্তুত হয় তাহা খাইতে অতি মুখরোচক ও পরম হিতকারী। ইহা রাখিলে অধিকদিন ঠিক থাকে এবং তাহাতে গুণের কোন ব্যতিক্রম হয় না। যাহাদিগের অম্লরোগ ও তজ্জনিত বুক জ্বালা করে, তাহাদিগের পক্ষে চুক বা লবণ যেমন উপকারী, ইহা পেট ফাঁপা, চোঁয়া ঢেকুর, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতিতেও তদনুযায়ী ফলপ্রদ। অনেকে তরকারীকে অম্লাস্বাদী করিবার জন্য দাইল, মৎস্য ও অম্বলে চুক ব্যবহার করেন। তাহাতেও বেশ মুখরোচক স্বল্প অম্লাস্বাদী অতি উপাদেয় ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়। চুক হউক বা জারক লেবু (নিমকি) হউক ইহাদিগের জন্য কোন সময়ে কোন অবস্থায় ধাতু পাত্র ব্যবহার করা একেবারেই নিষিদ্ধ। কারণ ধাতু সংযোগে উহা বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্বাদের বৈলক্ষণ্য হইয়া যায়, এবং অনেক সময় বিষাক্ত হইয়া পড়ে। লৌহ কটাহে চুক প্রস্তুত করিলে তাহাতে দুইটী দোষ ঘটে, প্রথম চুকের রস

ঘন হইলে বর্ণ মসীবর্ণ হইয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ চুকে যে লোহের গুণ আসিয়া পড়ে তাহাতে অল্লাধিক কোষ্ঠবদ্ধতা গুণ আশ্রয় লয়। বিস্তৃতরূপে লেবুর চাষ করিয়া তাহাতে নিমকি ও চুক প্রস্তুত করতঃ বিক্রয় করিতে পারিলে অনায়াসে একটী ব্যবসায়ের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে।

দার্জ্জিলিঙ্গে আলু

শ্রীনিবারণ চন্দ্র চৌধুরী, এম্, আর্, এ, এস্ লিখিত

দার্জ্জিলিঙ্গে বহুদিন হইল আলুর চাষ প্রবর্ত্তন হইয়াছে। তথায় প্রথমতঃ দুই প্রকার আলুর চাষ হয়। ইহাদের একটীর ছাল ঈষৎরক্তাভাবিশিষ্ট, অন্যটীর ছালের বর্ণ শুভ্র। বর্ত্তমানে দার্জ্জিলিঙ্গে এই উভয় প্রকার আলুকেই পাহাড়িয়া আলু কহে। প্রথোমক্ত আলুর নাম রেত আলু ও অন্যটীর নাম শ্বেত আলু। পাটনায় ইহারা দার্জ্জিলিঙ্গা আলু নামে কথিত হয়। পাটনার কৃষকগণ প্রথোমক্ত প্রকারের আলুকেই চাষের নিমিত্ত মনোনয়ন করে। কারণ এই আলু অধিকদিন ঘরে রাখা যায় এবং ইহার ফলন অন্য প্রকারের অপেক্ষা অধিক। এই আলুর পাটনায় উৎপন্ন ফসলকে কানপুরী আলু কহে। পাটনাতে ইহার চাষের অবস্থা ও কাল অনুযায়ী আবার ইহা বিভিন্ন নামে কথিত হয়। তৎসম্বন্ধে ইতঃপরে আলোচনা করিব বাসনা আছে।

দার্জিলিঙ লাল আলু যাহা পাটনা ও কানপুরে চাষ হইতেছে।

দার্জ্জিলিঙ্গে এবং অন্তত্র মৃত্তিকার অবস্থাভেদে প্রথমোক্ত *রেত আলুর বর্ণভেদ ঘটিয়া থাকে। কেওয়াল মাটীতে ইহার বর্ণ কিঞ্চিৎ গাঢ় হয় এবং বালু মাটীতে কিঞ্চিৎ ফ্যাকাসে হইয়া থাকে। গাঢ় রঙ্গের আলুকেই কৃষকগণ অধিক পছন্দ করে। অভ্যন্তরে উভয় প্রকার আলুর বর্ণই ঈষৎ হরিদ্রাভা বিশিষ্ট এবং আঠাল ; নইনীতাল আলুর মত, সিদ্ধ করিলে, বালীর মত হইয়া গলিয়া যায় না। দার্জ্জিলিঙ্গে বহু ইংরেজের বাস থাকা সত্বেও তথায় নইনিতাল আলু অপেক্ষা এই আলুর মূল্য অধিক।
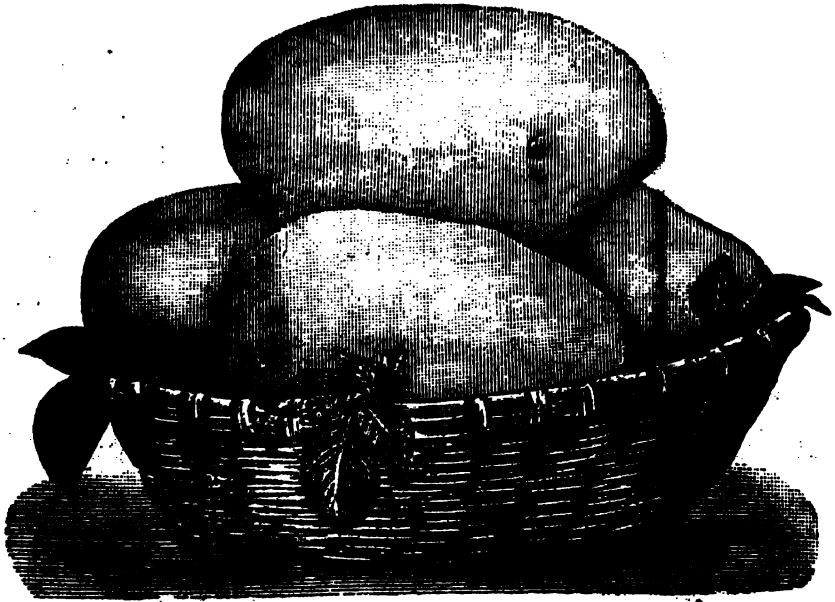
ডিম্বাকৃত নৈনিতাল আলু

বালি মাটিতে চাষ করিলে নৈনিতালের গাত্র বেশ মসৃণ হয় এবং আকৃতি সুডৌল হয়।

প্রায় ৩০ বা ৩৫ বৎসর হইল দার্জ্জিলিঙ্গে একপ্রকার আলুর রোগ উপস্থিত হয়। ইহার ল্যাটিন্ নাম ফাইটোপ্ থোরা। ইহার আক্রমণে সতেজ গাছ চারি বা পাঁচদিনের মধ্যে ঢলিয়া পড়ে। প্রথমতঃ পত্রে টিপ টিপ দাগ দেখা যায়, এইজন্য ইহাকে বাঙ্গলা কথায় টিপিরোগ বলা যাইতে পারে। প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে এই ব্যাধি হুগলি জেলার ফসল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংশ করিয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই রোগ সমতল ভূমিতে স্থায়ীত্বলাভ করিতে পারে না। কিন্তু পার্ব্বত্যদেশে একবার উপস্থিত হইলে আর সে দেশ পরিত্যাগ করে না। দার্জ্জিলিঙ্গে এই ব্যাধি উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্ট নইনিতাল অর্থাৎ খাস বিলাতী আলুর চাষ প্রবর্ত্তন করেন। প্রথম প্রথম এই আলু টিপি রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইত না। কিন্তু এখন অল্প বিস্তর প্রতি বৎসরই বৃষ্টিপাত ও জমীর অবস্থা অনুসারে এই আলুও (তথাকার লোক ইহাকে বিলাতী আলু নাম প্রদান করিয়াছে) টিপিরোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে। অধিক বৃষ্টিপাত, এবং জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত না থাকিলে ইহার আক্রমণ প্রবল হইয়া থাকে।
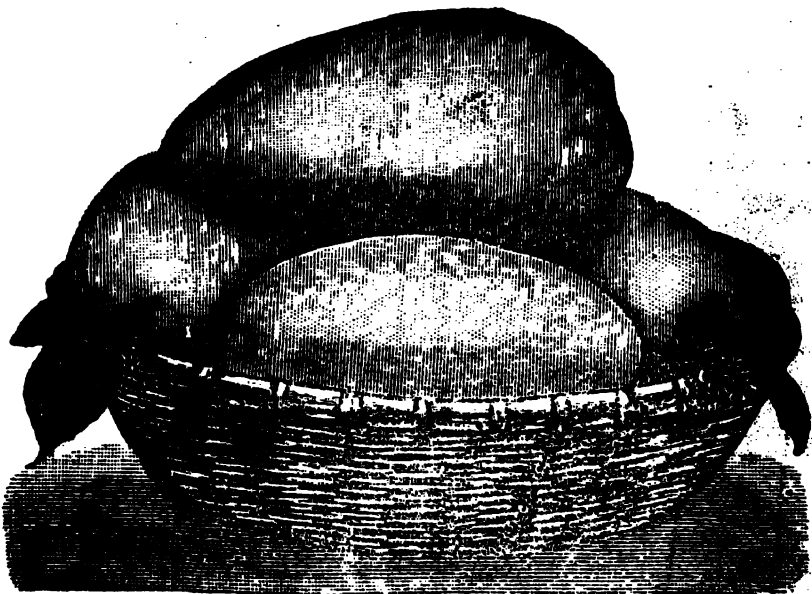
বন্ধুর গাত্র—নৈনিতাল আলু

পাহাড়িয়া কাঁকর মাটিতে নৈনিতাল আলুর গাত্র বন্ধুর হয়।

দার্জ্জিলিঙ্গের পাহাড়ী আলু সমতলক্ষেত্রে তিন হইতে সাড়ে তিন মাসে প্রস্তুত হয় কিন্তু তথায় পাঁচ মাসের কমে আলু পরিপক্ক হয় না। কিন্তু বিলাতী (নইনিতাল) আলু পক্কতা লাভ করিতে পার্ব্বত্য ও সমতল ভূমিতে প্রায় একই রূপ সময় অর্থাৎ পাঁচমাসের প্রয়োজন হয়।

পরবর্ত্তী সংখ্যায় দার্জ্জিলিঙ্গে আলুর চাষ ও সার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে আশা রহিল। আলু অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য। ইহার চাষ ও খাদ্য গুণ-সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিবরণ পাঠকগণ আগ্রহের সহিত পাঠ করিবেন অনুরোধ করি।

রেশম শিল্প—সেদিন বহরমপুরে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে লর্ড কারমাইকেল এদেশের রেশম শিল্প সম্বন্ধে বহু পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—একদিন জঙ্গীপুর, বহরমপুর কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেশমী কুঠী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমশঃ সেগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখনও গবর্ণমেণ্ট এদেশের রেশম শিল্প পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে চেষ্টায় সফলতা দেখা যায় নাই। শুধু রেশম বলিয়া নহে, অনেক গৃহ—শিল্প অযত্নে নষ্ট হইতেছে। লাট সাহেব বলিয়াছেন, এবার কলিকাতায় একটী শিল্পশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া বিভিন্ন দেশীয় উটজ শিল্প রক্ষার ব্যবস্থা হইবে। আশার কথা বটে, দেখা যাউক ফলে কি হয়।

সাময়িক কৃষি সংবাদ

উন্নত কৃষি যন্ত্র—বাষ্প বা বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত কলের লাঙ্গল প্রভৃতি কর্ষণ যন্ত্র, শস্য কাটা যন্ত্র, শস্য ঝাড়া মাড়া যন্ত্র অনেকই আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং অনেকগুলি বেশকার্য্যকরী হইয়াছে। কিন্তু বহুব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া এবং ভারতে অনতি আয়তন ক্ষেত্র সমূহে সর্ব্বত্র ইহাদের ব্যবহার বাঞ্ছনীয় নহে। একটি ছোট খাট কৃষি যন্ত্রের (যাহা সাধারণ চাষীতে ব্যবহার করিতে পারে) নাম করিতে গেলে প্লেনেট জুনিয়ার হোর নামোল্লেখ করিতে হয়। হাতে চালাইবার হোর দাম ২৫৲ মাত্র বলদে চালাইবার হোর দাম অধিক, ৩০৲ টাকা হইতে ছোট বড় হিসাবে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগও এই যন্ত্র ব্যবহারে পরামর্শ দিয়া থাকেন। তামাক, আদা, হলুদ, আখ, আলু ইত্যাদি সা'র বন্ধি করিয়া আবাদ করা হয়, এমন যে কোন ফসলের জন্য এই যন্ত্র বিশেষ উপকারী। ইহাদ্বারা উপরের মাটি আলগা করিয়া দেওয়া যায়, ঘাস নিড়ান যায় এবং অতি সুন্দররূপে সা'রের গাছগুলির গোড়ায় মাটি দেওয়ার কাজ করা যাইত পারে। দশজন লোক নিড়ানির সাহায্যে হাতে যে কাজ করিবে এক জন লোক একখানা "হোর" সাহায্যে তাহা অপেক্ষা বেশী কাজ করিবে। ইহা এমেরিকার প্লেনেট জুনিয়ার কোম্পানীর প্রস্তুত।

পাটের ঘোঁড়াপোকা—এই পোকা বৎসর বৎসর বর্ষাকালে পাটে লাগিতে দেখা যায় এবং পাটের বিশেষ ক্ষতি করে। ইহা ছোট শবুজ রঙের কীড়া এবং গায়ে কাল কাল ফোটা আছে। যশোহরে ইহাকে 'ঘোড়াপোকা' বলে এবং 'ডকরা', 'ডোরাপোকা, "তিড়িং', 'ছাটপোকা', 'বাগদিপোকা' ইত্যাদি নামেও ইহা পরিচিত। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে এই পোকা গাছের ডগের পাতা খাইয়া নষ্ট করে কাজেই ডগের নীচ হইতে নূতন ডাল গজায় এবং গাছ আর বাড়িতে পারে না।

জীবন বৃত্তান্ত—স্ত্রী প্রজাপতি রাত্রে পাতার নীচে একটী করিয়া পৃথকভাবে ডিম পাড়ে। একটী প্রজাপতি ১৫০—২০০ পর্য্যন্ত ডিম দেয়। ডিমগুলি ছোট ও গোল এবং দেখিতে অনেকটা জলের ক্ষুদ্র ফোটার ন্যায়। ২।৩ দিন পরে ডিম ফুটিয়া ছোট সবুজ কীড়া বাহির হয়, কীড়াগুলি গাছের কচিপাতা খায়। ইহার রঙ সবুজ বলিয়া সহজে দেখা যায় না। প্রায় দুই সপ্তাহ পরে কীড়া সম্পূর্ণ বড় হয়, তখন লম্বায় প্রায় এক একের দুই ইঞ্চ হয়, পরে ইহা মাটীর মধ্যে যাইয়া পুত্তলি আকার ধারণ করে, প্রায় এক সপ্তাহ পরে প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়। পাট কাটা হইলে খুব সম্ভব ইহা কীড়া অথবা পুত্তলি অবস্থায় নিদ্রিত থাকে, আবার পাটের সময় প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়। ইহাকে অন্য কোন ফসল আক্রমণ করিতে দেখা যায় না।

প্রতিকার—পোকা যখন ক্ষেতে প্রথম দেখা দেয় তখন হাত দিয়া বাছিয়া মারা ভিন্ন অন্য কোন সন্তোষজনক প্রতিকার নাই। আর এক কাজ করা যাইতে পারে একটা দড়িতে কেরোসিন মাখাইয়া দুইজন লোকে দুইদিক ধরিয়া ক্ষেতের উপর টানিবে। ইহাতে পোকাগুলি বিরক্ত হইবে এবং আগের পাতাগুলিও বিস্বাদ হইবে। আগের পাতা না খাইতে পারিলে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না। পাট কাটার পর যেখানে সম্ভব ক্ষেতটি চষিয়া দিলে, মাটীর নীচের কীড়া ও পুত্তলিগুলি উপরে উঠিবে এবং তখন পাখীরা উহাদিগকে খাইতে পারিবে।

চা-বাগানের সার—চা-বাগানে শুঁটীধারী শস্যের চাস করিলে জমির উর্ব্বরতা বাড়ে। এই জন্য চা-ক্ষেতে শণ, ধঞ্চে, বরবটী, মুগ, মসুর, সয় শীমের চাষ করা হয়। বাবুল (Acacia arabica), খদির (Acacia catechu), পলাশ (Butea frondosa), বক (Agati), সজিনা (Moringa pherygosperma), তেঁতুল (Tamarindas indica) প্রভৃতি স্থায়ী শুঁটী বৃক্ষ চা-ক্ষেতে বসাইলেও জমির উর্ব্বরতা বাড়ে। ইহার মধ্যে তেঁতুল ও সজিনা শুঁটীধারী বৃক্ষ হইলেও সজিনার শিকড়ের ছালের অত্যন্ত ঝাঁজহেতু এবং তেঁতুলের পাতা প্রভৃতির অম্লত্বহেতু ইহাদিগের দ্বারা উপকার অপেক্ষা অপকার অধিক হয়। শিরিশ (Albizia Lebbek or A. Molucana) শুঁটীধারী বৃক্ষ হইলেও ইহার এত ঘন ছায়া হয় যে তাহাতে চা-ফসলের অপকার হয়।

সিংহলে গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষা-ক্ষেত্রে চা-ক্ষেতে সবুজ সার ব্যবহারের বিশেষ পরীক্ষা হইয়াছে। এক একর একটি ক্ষেতে যেখানে কোনক্রমে ৭০০ পাউণ্ড চা পাওয়া যাইত না, সবুজ সার ব্যবহার করিয়া সেই ক্ষেত হইতে বৎসরে ১৭৫০ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইতেছে। ফস্ফরিক অম্ল ও পটাস ব্যবহারেও এত অধিক ফসল হয় না। ইহাতে সবুজ সারের প্রাধান্য প্রমাণ হইতেছে।

সবুজ সারের পক্ষে ধঞ্চে বিশেষ উপযোগী ও সহজ প্রাপ্য এবং অন্যান্য সবুজ সার অপেক্ষা কম খরচে হয়। আবার যদি বিবেচনা পূর্ব্বক শুঁটীধারী স্থায়ী বৃক্ষ রোপণ করা যায় তাহা হইলে চা-ক্ষেতে সার দিবার কার্য্য খুব সহজ হইয়া আসে।

উড়িষ্যা ও বিহারে তিলের আবাদ—১৯১৫—বর্ত্তমান বর্ষের আবাদী জমির পরিমাণ ১১,৫০০ একর; বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ১৩,০০০ একর। তিল বোনার সময় মাটিতে রস অভাব হেতু এত কম জমিতে আবাদ হইয়াছে।

প্রতি একরে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ৪।৫ মণ ধরিয়া লইলে ১৭০০ টন তিল পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। বিগত বর্ষে সমগ্র প্রদেশে ২০০০ টন তিল উৎপন্ন হইয়াছিল।

বিহার ও উড়িষ্যাতে পাটের আবাদ—১৯১৫—বিগত পাঁচ বৎসরের হিসাব দেখিলে এই প্রদেশের পাটের জমির পরিমাণের একটা ধারণা হয়—

১৯১১—২৫৮,১০০ একর
১৯১২—২৯৮,৩০০ „
১৯১৩—৩১৮,৪০০ „
১৯১৪—৩৩০,১০০ „
১৯১৫—২১৫,৩০০ „

বিগত বর্ষের উৎপন্ন পাটের দর খুব কম ছিল বলিয়া এতদঞ্চলে পাটের আবাদ কম হইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে পূর্ণিয়া, ভগলপুর, কটকে পাট খুব ভাল জন্মিয়াছে—অন্যান্য জেলায়ও মন্দ নহে। পূর্ণিয়াতে বিগত বর্ষের পাট বিস্তর মজুত আছে, অন্যান্য স্থানে তত অধিক নাই।

গমের দর—৩০ জুন, ১৯১৫—

করাচি বন্দর—দুধেগম—	৪।৫৲	টাকা	মণ
বোম্বাই „ দিল্লিগম ১নং	৪॥/১৫	টাকা	„
কলিকাতা „ ক্লব ২নং	৪॥০	টাকা	„

সিংহলে নারিকেল ব্যবসা—য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভকালে সিংহলের নারিকেল রপ্তানি কিছু মন্দা হইয়াছিল এবং দামও কমিয়া গিয়াছিল। যেখানে প্রায় ১০০৲ এক শত টাকা কাণ্ডি বিক্রয় হয় তাহার দর ৩০৲ টাকা হইয়া গিয়াছিল। ১ কাণ্ডি নারিকেলের ওজন = ১ টন = ২৭॥০ মণ। যুক্ত রাজ্যের লোকের হাত দিয়া নারিকেল রপ্তানি করা হইয়াছিল। এখন উদ্যান-পালকগণ নিজে নিজেই রপ্তানি করিতেছেন, দর অপেক্ষাকৃত অনেক বাড়িয়াছে। লণ্ডনে নারিকেল পাঠাইয়া টন প্রতি ২৫ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৩৭৫৲ টাকা দর মিলিতেছে। কাণ্ডির দর তাহা হইলে ৯৩৲ টাকা দাঁড়ায়।

ভাদ্র, ১৩২২ সাল।

বঙ্গদেশের শ্রমশিল্প

আমাদের পাঠকবর্গেরা অবগত আছেন যে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত সোয়ান সাহেবকে এতদ্দেশীয় শ্রমশিল্পাদির বর্ত্তমান অবস্থা অনুসন্ধান এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি এতৎ সম্বন্ধে যে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ইতি পূর্ব্বেই "কৃষকে" আলোচিত হইয়াছে এবং সারাংশও উদ্ধৃত হইয়াছে। সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে শ্রীযুক্ত সোয়ানসাহেবের অনুমোদিত বিষয়গুলি গবর্ণমেণ্ট কার্য্যে পরিণত করুন। সরকারী সভ্য মাননীয় শ্রীযুক্ত বিটসন্ বেল এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন এবং তাঁহার বক্তৃতায় এই কার্য্যে যে তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন।

এতদ্দেশীয় শ্রমশিল্প সম্বন্ধে সরকার পক্ষ হইতে এইরূপ অনুসন্ধান কিছু নূতন নহে। ইতি পূর্ব্বে মিঃ কমিংস এবং তৎপূর্ব্বে মিঃ কলিনস্‌ও এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারও যে দুইটি বিবরণী প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতেও জ্ঞাতব্য বিষয়ের অভাব নাই। প্রত্যেক বিবরণী প্রকাশিত হওয়ার পরেই একটা শিল্প বিষয়ক আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়াছে, সরকারী ও বেসরকারী কর্ত্তাগণের মধ্যে 'এবার কিছু করিতে হইবে' ভাবের একটা প্রবল আবেগ দেখা দিয়াছে, কিন্তু সকলেই অচিরাৎ বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। যে কঠিন প্রাণপণ চেষ্টায় স্থায়ী শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়, যে অকাতর অর্থ ব্যয় শিল্পের প্রথম অবস্থায় আবশ্যক হয় এবং যে অভিজ্ঞতা ও উদ্যমের বলে শিল্প বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সফলতায় পরিণত হয়, যে সমুদয় আমাদের নাই অথবা থাকিলেও আমরা ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত।

যাহা হউক এবারে নূতন আশার মধ্যে এইমাত্র দেখা যাইতেছে যে, বাংলা গবর্ণমেণ্ট শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য Director of Industris অথবা শিল্প বিভাগের একজন বড় কর্ত্তা নিয়োগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বড়কর্ত্তা অবশ্য হয় একজন সিবিলিয়ান কিম্বা অন্য কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত সাহেব হইবেন। যদি শিল্প বিভাগ সেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে কেবল ডাইরেক্টার যে কতদূর শিল্প বিষয়ে দেশকে অগ্রসর করিতে পারিবেন তাহা বলা যায় না। মাননীয় শ্রীযুক্ত বিটসন বেলের বক্তৃতায় আমরা কেবল একজন বড় কর্ত্তা নিয়োগের উল্লেখই দেখিতে পাই। কিন্তু উক্ত বড়কর্ত্তা যে কি উপায়ে এবং কিপ্রকার বিভাগ গঠন করিয়া কার্য্য করিবেন তাহার কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। তিনি বলেন যে সে সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্ট যাহা করিবেন তাহাই হইবে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেকবারই দেখাইয়াছি যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের স্বগৃহ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে ভারত গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ সকল সময় সুফল প্রসব করে না। অবশ্য ভারত গবর্ণমেণ্টের নিদর্শিত পথ হয় ত বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ভালই হইতে পারে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে প্রাদেশিক বিষয়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের যতদূর ঘনিষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ আছে ভারত গবর্ণমেণ্টের তাহা নাই। সুতরাং সাধারণ পথ দেখাইয়া দিয়া বিশেষ বিশেষ প্রথা অবলম্বনের ভার স্থানীয় শাসনকর্ত্তার উপর দেওয়াই উচিত! মাননীয় শ্রীযুক্ত বিটসন্ বেল ইঙ্গিতে এই কথাই বলিয়াছিলেন তাঁহার উক্তি এই যে,—"We do not care who is appointed so long as he is a trained businessman and a man who will deal sympathetically with the people of this country * * * I want to have a Director with large funds and a free hand." অর্থাৎ কোন ব্যক্তি (ডাইরেক্টার) নিযুক্ত হন, তাহা আমাদের দেখিবার আবশ্যক নাই, তিনি একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী হইলেই হইল এবং এতদ্দেশীয় লোকের সহিত তাঁহার ব্যবহার সহানুভূতি সূচক হইলেই হইল। ডিরেক্টরকে যথেষ্ট অর্থ-বল-যুক্ত এবং স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হয় ইহাই আমার ইচ্ছা। আমাদের ইচ্ছাও তাহাই। কিন্তু শুধু ডিরেক্টর হইলেই হইল না। তিনি যে বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেন তাহার গঠন প্রণালী কিরূপ হয় তাহাও দেখা আবশ্যক—কিম্বা তাহা দেখাই প্রথম প্রয়োজনীয় বিষয়। কারিকর যতই ভাল হউক না কেন, উপযুক্ত যন্ত্র না পাইলে তাহার সমস্ত বুদ্ধি ও কৌশল ব্যর্থ হইয়া যায়। জাপান, আমেরিকা কিম্বা জর্ম্মণি, যে সমস্ত দেশে শিল্পাদির উন্নতি উচ্চ শীর্ষে অধিরোহণ করিয়াছে, সে সমুদয় দেশে দেখা যায় যে সরকারী অথবা বেসরকারী শিল্প বিভাগ, শিল্প বিষয়ক সভা, সমিতি প্রভৃতি এরূপ শৃঙ্খলার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে, যে কোন শিল্প সম্বন্ধে কোন জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় না।

তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে প্রত্যেক শিল্পের অভাব অভিযোগ, উন্নতি অবনতির কারণ, প্রতিকারের উপায় ও নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগ—এ সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধানের পর কর্তৃপক্ষগণ সকল সময়েই যাহাতে দেশের শিল্প কোন রকমে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, পরন্তু উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে থাকে, তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া আছেন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত বিটসন বেল সভাস্থলে দুইটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান সময়ে শ্রমশিল্পীগণের ও কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে একটি সুগভীর ব্যবধান রহিয়াছে। উক্তিটি যে অতিব সত্য তাহার কোন সন্দেহ নাই। সুদূর ইংলণ্ড হইতে আসিয়া কোন ইংরাজ দশ বিশ বৎসর কাল এতদ্দেশে বাস সত্বেও দেশীয় শিল্প সমূহের আদি স্থান জানিতে ও ব্যবসায়ীগণের সহিত পরিচিত হইতে পারেন না, সেটা তত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে আমাদের সমাজেই অনেক শিক্ষিত বয়োঃবৃদ্ধ ব্যক্তি আছেন যাঁহারা অতি সাধারণ দৈনন্দিন ব্যবহারের বস্তুর উৎপত্তির ইতিহাস অবগত নহেন। ইহার প্রধান কারণ দুইটি—প্রথমতঃ আমাদের শিল্পাদির মধ্যে অধিকাংশই বড় বড় সহর হইতে দূরে ব্যবস্থিত পল্লীতে প্রস্তুত হয়। প্রস্তুতকারীরা কাহাকে বিজ্ঞাপন ও কাহাকে পণ্য বিক্রয়ের সমবেত চেষ্টা বলে তাহা জীবনে ভাবিবার অবসর পায় নাই। যাহারা নির্দ্দিষ্ট ক্রেতা আছে তাহারা যদি কখন না আসে তাহা হইলে দ্রব্যজাত যে অন্য স্থানে চেষ্টা করিলে বিক্রয় হইতে পাবে সেরূপ ধারণা তাহা'দর মনে আসে না। দ্বিতীয় কারণ—আমাদের গভীর আলস্য। কোন পণ্যের উৎপত্তি স্থান, ব্যবসায়ের প্রথা ও মূল্যাদি হ্রাস বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে অনেক পরিশ্রম আবশ্যক হয়—তত্দূর ক্লেশ স্বীকার করিতে যাওয়া অনেক বাঙ্গালীই বাতুলতার কার্য্য বলিয়া মনে করেন।

আমাদের শিল্পের অবনতি কিছু এক দিবসেই হয় নাই, কিম্বা এক সরকারের অবহেলাতেও হয় নাই। বৎসরের পর বৎসর আমরা বসিয়া বসিয়া দেখিতেছি যে বিদেশী আসিয়া দেশীয় বণিকের স্থান অধিকার করিতেছে, বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া সকলেই দিন দিন দেশীয় দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া সাধারণ সুলভ বিলাতী পণ্যেরদিকে ছুটিতেছে এবং কোনরূপ কায়িকশ্রম নীচজনোচিত কার্য্য মনে করিয়া শিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ চাকরীর আশায় প্রাণধারণ করিয়া রহিয়াছে এই সমুদয়ই শুধু শিল্পের নহে, দেশের অধঃপতনেরও প্রধান কারণ। দেশের শিল্পবিভাগের প্রতিষ্ঠা হইলে এবং সেরূপ সহানুভূতি, দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার সহিত পরিচালিত হইলে উন্নতির আশা আছে বটে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে যতদিন না জনসাধারণের অন্ততঃ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আন্তরিক ভাবের পরিবর্ত্তন না হয়, ততদিন কোন স্থায়ী উন্নতির আশা নাই। যে সকল দেশে শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে সে সমুদয় স্থানে কোন শিল্পজাত পণ্য প্রস্তুত কিম্বা ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জণ করা, কোন খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করা একটা গৌরবের বিষয়

বলিয়া বিবেচিত হয়।" এতদ্দেশে যে সমুদয় যুবক অথবা প্রৌঢ়ের ওকালতী, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারীং অথবা মাষ্টারী কোনটাতেই কিছু হইল না—তাহাদের পক্ষেই শিল্প কিম্বা ব্যবসায় শেষ আশ্রয় স্থল বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ধনীর ধন, জ্ঞানীর জ্ঞান, কর্ম্মিষ্ঠের কর্ম্ম ও তাহার উপর অপরিমিত অধ্যবসায় ও উদ্যমের সম্মিলনে যে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা অনেকে বুঝিয়াও বুঝেন না। এখন আমাদের প্রধান অভাব লোক শিক্ষার। প্রকৃত রূপে শিক্ষিত হইলে জনসাধারণ শিল্পের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে এবং তখন শিল্প প্রতিষ্ঠার কিম্বা সংস্কারের পথও সুগম হইবে।

গোধন—শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও কিশোরগঞ্জ হইতে শ্রীনবীনচন্দ্র গোপ কর্ত্তৃক প্রকাশিত—মূল্য ২৲ টাকা।

আমাদের দেশে গো-জাতি যে দিনে দিনে অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে এবং তজ্জন্য দেশবাসীগণেরও যে ক্রমশঃ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে জনসাধারণ উন্নত উপায়ে গোপালনের অত্যন্ত আবশ্যকীয়তা এ পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। গিরিশবাবু কিশোরগঞ্জের একজন সুপরিচিত ব্যক্তি এবং নানাবিধ সাধারণ কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ ও উদ্যমও দেখিতে পাওয়া যায়। গোপালন ও পশুতত্ত্বে অভিজ্ঞ না হইয়াই তিনি যে অসামান্য ক্লেশ স্বীকার করিয়া গোজাতি সম্বন্ধে এত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া 'গোধন' রচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার গোজাতির উন্নতির চেষ্টার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। পুস্তকটি প্রধানতঃ সাতভাগে বিভক্ত—১ম হিন্দুশাস্ত্রে ও প্রাচীন সাহিত্যে গোজাতির উপায়। ২য় ভারতে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত গো ও গোজাতীয় পশুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ৩য় উত্তম গাভী ও বলীবর্দ্দের লক্ষণাদি ও জীবন ইতিহাস এবং ৪র্থ গোপালন। ৫ম ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ডে যথাক্রমে গব্য, এবং গোজাতির রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। আমাদের বোধ হয় যে পুস্তকের উপকারিতার কিছুমাত্র লাঘব না করিয়া উহার কলেবর কিয়ৎপরিমাণে সংক্ষিপ্ত করিতে পারা যাইত। গ্রন্থকার পুস্তকের কোন কোন স্থানে নিজের মত সমর্থনের জন্য যে সমুদয় অঙ্কাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন সেগুলিও একবারে হালের নহে। গোধনের ন্যায় বিস্তৃত গ্রন্থে গোজাতির শ্রেণী বিভাগ—জাতি, উপজাতি, প্রকার ভেদ, আরও বৈজ্ঞানিক প্রথায় ও সঠিকভাবে লিখিত হওয়া উচিত ছিল। গ্রন্থকার ভারতে গোজাতির অবনতির যে ২৩টি কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে গুলিকে স্থূলতঃ ৫টি প্রধান কারণের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়, যথা—(১) বৈজ্ঞানিক প্রথায় গোজননের অভাব। (২) ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, উপযুক্ত অনুপযুক্ত নির্ব্বিশেষে অবাধ গোহত্যা (৩) পশু খাদ্য ও গোচারণ ভূমির অভাব (৪) গোপালন"

ও চিকিৎসার সম্বন্ধে দেশীয় ব্যক্তিবর্গের অসম্পূর্ণ জ্ঞান অথবা একবারেই জ্ঞানাভাব এবং (৫) অর্থশালী ও শিক্ষিত জনসাধারণের গোজনন, পালন ও বংশ বৃদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য। এই কয়েকটিই যে মুখ্য কারণ তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই সমুদয়ের নিরাকরণের উপরই এতদ্দেশে গোজাতির ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে। যাহা হউক সুখের বিষয় এই যে গবর্ণমেণ্ট ও স্থানে স্থানে ২।৪ জন শিক্ষিত ব্যক্তি গো-জনন ও পালন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। গিরিশবাবুর পুস্তকের কতিপয় স্থলে বর্ণনা বাহুল্য আছে বটে কিন্তু তাঁহার পুস্তক যে সময়োপযুক্ত হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা আধুনিক প্রথায় গোপালনে প্রবৃত্ত হইতে চান অথচ এতদ্বিষয়ে বড় বড় ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিবার সময় অথবা সামর্থ্য নাই তাঁহাদিগের পক্ষে 'গোধন' একটি অত্যাবশ্যকীয় গ্রন্থ। পুস্তকটি আরও কিছু সংক্ষিপ্ত করিয়া মূল্য হ্রাস করিলে ইহা যে সর্ব্বসাধারণের নিকট আদৃত হইত তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

বিদেশী চিনির আমদানী বন্ধ—এবার যুদ্ধের জন্য বিদেশী চিনির আমদানী বন্ধ হইয়াছে—ফলে চিনি ও গুড়ের দর চড়িয়াছে। বাঙ্গালা সরকার বাঙ্গালায় খেজুর চিনি বাড়াইবার জন্য অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ফল কি হইয়াছে, বলিতে পারি না। তবে চিনির ব্যবসায় বিন্দুমাত্র উন্নতি হয় নাই। যুক্তপ্রদেশে এবার ইক্ষুর চাষ ভাল হইয়াছে। আগ্রায় ও মিরাটে বর্ষণাল্পতাহেতু সামান্য ক্ষতি হইলেও মোটের উপর ফসল ভাল হইয়াছে—গুড়ও অধিক হইবার সম্ভাবনা।

বিদেশী কাগজ—এবার জর্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়া হইতে যেমন কাগজের আমানী বন্ধ হইয়াছে, নরওয়ে ও সুইডেন হইতে তেমনই আমদানী হইতেছে। নরওয়ে সুইডেনে যে এত কাগজের কল ছিল, তাহা কিন্তু আগে জানা ছিল না। এই সুযোগে ইটালীও এ দেশে কাগজ পাটাইতেছেন। কেবল আমরাই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলাম না! আমাদের কেবল কাদায় গুণ ফেলিয়া বসিয়া কাঁদাই সার।

মাদ্রাজে মৎস্য বৃদ্ধি করার চিন্তা—মাদ্রাজ সরকার মৎস্যের চাষের জন্য একটা নূতন ব্যবস্থা করিতেছেন। যে সব নদীতে মাছ অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, সে সব নদীতে কিছু দিনের জন্য মাছ ধরা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। একটি নদীতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর কয়েকটিতে বন্ধ করা হইবে। সার উইলিয়ম হাণ্টার বলিয়াছেন, এ দেশে মাছ যত কমিতেছে জেলেরা জালের ছিদ্র তত ছোট করিতেছে—ছোট মাছও না পলায়। ক্রমে মাছের বংশ ধ্বংশ হইতেছে। এ অবস্থায় মাছ ধরা বন্ধ করিয়া আবার মাছ বাড়ান মন্দ নহে। কিন্তু বাঙ্গালা সরকারের মৎস্য-চাষ-বিভাগ

হইতে যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্যবৃদ্ধির নানা কথার রিপোর্টের উপর রিপোর্ট লেখা হইতেছে তাহা কি রিপোর্টেই পর্য্যবষিত হইবে? বেঙ্গল গবর্মেণ্ট বাঙ্গালা দেশে মৎস্য-বিভাগের ডিরেক্টারের একজন 'ডেপুটী' বা সহকারী নিযুক্ত করিবার জন্য ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্টের অনুমতি চাহিতেছেন। বাঙ্গালায় মৎস্যবিভাগ আছে, একজন ডিরেক্টার সেই বিভাগে নিযুক্ত আছেন। এ বিভাগে বিশেষ ফল হইতেছে না; বাঙ্গালী ভাতের পাতে মাছে মাছের আঁসও দেখিতে পাইতেছে না।

রেশম কীট পালনে বিলাতী তুঁত—রেশম কীটের খোলস ছাড়ার পর দেশী তুঁতের সরস, নরম পাতা খাওয়াইলে কীটগুলি রসারোগে আক্রান্ত হয় কিন্তু বিলাতী তুঁতে পাতায় তাহাদের কোন অপকার হয় না বরং রসা রোগগ্রস্ত হইলে বিলাতী তুঁত পাতা খাওনর ফলে ঐ রোগের উপসম হয়। ইটালী দেশীয় তুঁতকে এখানে বিলাতী তুঁত বলিয়া উল্লেখ করা যাইতেছে।

এদেশের তুঁতের পক্ষে যেমন হাড়ের গুড়া কিম্বা পুষ্করিণীর পলি মাটি উৎকৃষ্ট সার, ইটালী দেশীয় তুঁতের পক্ষেও উক্ত সার উপযোগী।

পত্রাদি

রাস্তার ধারে বসাইবার গাছ—

শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, মহোলিয়া, সিংভুম।

প্রশ্ন—এ দেশে দারুণ গ্রীষ্মের সময় কাঁকরময় মাটি তাতিয়া আগুণ হইয়া উঠে—রৌদ্রের সময় চলাফেরা করা বড়ই সুকঠিন। রাস্তার ধারে ধারে কি গাছ বসাইলে আশু ছায়া লাভ হইতে পারে অথচ রাস্তার ধারের গাছগুলি হইতে একটা আয় হওয়া সম্ভব হয়?

উত্তর—আশু ছায়া পাইতে হইলে কৃষ্ণচূড়া (Poinciana regia), শিরিষ (Albizzia Lebbek), বর্ষণ বৃক্ষ (Pithecolobiom Salmon) প্রভৃতি বৃক্ষ বসাইতে হইবে। এই জাতীয় (Leguminosæ order) বৃক্ষাদির বাড় খুব, তিন চারি বৎসরে বিস্তৃত ছায়া প্রদানকারী বৃক্ষে পরিণত হয়। কিন্তু এই সকল বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ ব্যতীত অন্য কোন আয় হওয়ার সম্ভব নাই। শিশু, মেহগ্নি প্রভৃতির কাষ্ঠ অধিক দামী কিন্তু ইহাদের বাড় কম—১২। ১৪ বৎসরের কম ইহারা পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং আশুছায়া পাইতে হইলে এই প্রকার গাছ বসান চলে না। ফলের গাছ বসাইলে.

একটা স্থায়ী আয় হয় কিন্তু সেগুলিকে বড় করিয়া তুলিতে অনেক সময় অতিবাহিত করিতে হয় ও অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। ঐ অঞ্চলে মহুয়া গাছ বেশ ভাল জন্মিয়া থাকে। মহুয়া গাছ রোপণ করিলেও স্থায়ী আয় হয় কিন্তু মহুয়া গাছের বাড়ও অতি অল্প।

ইক্ষু চিনির কারখানা—

শ্রীমদনমোহন দেওয়ান, রাঙামাটি, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন—বিস্তৃত পরিমানে ইক্ষুর চাষ করিয়া তথায় একটি বড় রকমের কারখানা স্থাপন আবশ্যক, চিনি গুড় রাবগুড় ইত্যাদি জিনিষাদি প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ উক্ত বিষয় কোথায় শিক্ষা দেওয়া হয় কিছু অবগত নাই। আপনার এমন কোন Farm জানা আছে কিনা যাহাতে ইক্ষুর চাষ এবং ইক্ষুর রস হইতে চিনি গুড় ইত্যাদি শিক্ষা করা যাইতে পারে। কোথায় Sugar compressing machine চালনা করা শিক্ষা করিতে কোন খরচ হইবে কি না?

ইক্ষু চাষ চিনি গুড় প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করা যাইতে পারে বাঙ্গালা ভাষায় এমন কোন বহি আছে কিনা? যদি থাকে মূল্য কত জানাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি—

উত্তর—কলিকাতা কাশিপুর, সাজিহানপুর, কানপুর, পাটনা, গয়ায় অনেক স্থানেই চিনির কারখানা আছে। কোথাও গুড় হইতে কেবল চিনি প্রস্তুত হয়, কোথাও বা ইক্ষু পেষণ হইতে আরম্ভ করিয়া গুড়, চিনি, রাব সবই প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই সকল কারখানায় বাহিরের লোকের প্রবেশাধিকার নাই কিম্বা তথায় বাহিরের লোককে শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। আপনি দেখিতেছি বিস্তৃত আবাদ ও সুবৃহৎ কারখানা স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। আপনি ইচ্ছা করিলে, বিশেষজ্ঞ লোক পাঠাইয়া আপনার স্বস্থানেই ইক্ষুমড়া, রস জ্বাল দেওয়া, গুড়, চিনি তৈয়ারি করা শিখাইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বিস্তৃত ক্ষেত্র অর্থে আপনি কি বুঝিয়াছেন আমরা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না—অন্ততঃ ১০০০ একর, তিন হাজার বিঘা ইক্ষুর আবাদ না থাকিলে একটা ভাল রকম কারখানা চলিবে না, এবং আধুনিক উন্নত প্রণালীর কলকব্জা না আনাইলে উপস্থিত বাজারে লাভবান হওয়া সুকঠিন। তবে স্থানীয় অভাব মোচনের জন্য ছোট খাঠ কারখানা এবং তৎসঙ্গে অনতিবিস্তৃত ক্ষেত্র স্থাপন করা বরং সুবুদ্ধির কার্য্য। আমাদের দেশে ছোট ছোট আরম্ভগুলিই বরং টেঁকিয়া যায়।

এরারুটের চাষ—

শ্রীকীর্ত্তিবাস নন্দী, বোলপুর

প্রশ্ন—এখানে এরারুটের আবাদ কেহ করে না, আবাদ, হরিদ্রা বা আদার ন্যায় কৃষি সহায়ে এই কথা উঠিয়াছে মাত্র, যে বীজগুলি পাঠাইয়াছেন তাহা গোটাই (মূল) বসাইতে হইবে, অথবা খণ্ড খণ্ড করিয়া বসাইলে চলিতে পারে।

উত্তর—এক একটি মূল আস্ত বসাইতে হইবে, কাটিয়া বসান উচিত নহে। অঙ্কুর পাইট আদা হলুদের মত।—

প্লেনেট জুনিয়ার হো—

শ্রীকীর্ত্তিবাস নন্দী বোলপুর

প্রশ্ন—"প্লেনেট জুনিয়ার হো, আপনাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় কি না, কৃষি সমাচারে দেখিলাম ইহার সাহায্যে ১ জন লোক ১০ জন লোকের কাজ করিতে পারে, অত না হউক যদি ৫ জনেরও কার্য্য হয় তবে কিনিয়া লাভ বই লোকসান নয় কিন্তু ইহার ব্যবহার আমরা জানি না কিন্তু আপনার নিকট ইহার ব্যবহার শিক্ষা পাইতে পারি কি ?

উত্তর—যদিও এখন আমাদের স্বক্ষেত্রে প্লানেট জুনিয়ার হো ব্যবহার হইতেছে না কিন্তু আমরা ইহা ব্যবহার করিয়াছি এবং অনেককে ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। আমাদের কথামত কেহ কেহ ইহা ব্যবহার করিতেছেন। ইহাতে এক সঙ্গে কোদাল ও লাঙ্গলের কার্য্য হয়। অধিক না হউক অনায়াসে চারিজনের কাজ একজনের দ্বারা সম্পন্ন হয়; জমি বেলে দোঁয়াস ও বেশ 'যো' হইলে ইহার কার্য্য ভাল রকম হয়। কর্দ্দমাক্ত কঠিন মাটিতে বা রসা জমিতে ইহা ভাল চলে না। ইহা চালাইতে এমন কোন কৌশল আবশ্যক নাই যে দেখিয়া শিখিতে হইবে। চেষ্টা করিলে অনায়াসে যে সে চালাইতে পারে। প্লানেট জুনিয়ার হাতে চালান যায়, আবার গরুদ্বারা চালান যায়। হাতে চালাইবার প্লানেট জুনিয়ার হো পিছনে ঠেলিয়া চালাইতে হয়।

তাজা গোময়সার—

শ্রীকীর্ত্তিবাস নন্দী, বোলপুর

প্রশ্ন—নাইট্রোজেন্ বা ফস্ফরাস্ প্রধান সারের সহিত কাঁচা গোবর প্রয়োগ করিলে সারের অধিকাংশ নাইট্রোজেন নষ্ট হয় ইহা কৃষি রসায়নে পাঠ করিলাম এজন্য জিজ্ঞাস্য এই যে, কত দিন অন্তরে সারের প্রয়োগ করিতে হইবে, গোবর সার দিবার ৫। ৭ দিন পরে ফস্ফরস প্রধান সার দিলে কোনও ক্ষতি হইবে কি ?

উত্তর—ক্ষেত্রে তাজা গোময় সার ব্যবহার অপেক্ষা পরিণত গোময় সার ব্যবহারই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। যদি একান্তই তাজা গোময় ব্যবহারের আবশ্যক হয় তবে প্রথম জমি কর্ষণের সময়ে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য তাহার মাসাধিক পরে কিম্বা শস্য রোপণ বা বপনের সময়ে সময়ে নাইট্রেজেন বা ফস্ফরাস প্রধান ধাতব বা বিশেষ সার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। জলা বা বিল ধান্য ক্ষেত্রে তাজা গোময় সার প্রয়োগে অপকার নাই। নাইট্রোজেন বা ফস্ফরাস প্রধান বিশেষ সারের সহিত তাজা গোময় ব্যবহার করিলে ক্ষতি হয়।

ফস্ফরাস ও সব্জীসার—

শ্রীকীর্ত্তিবাস নন্দী বোলপুর

প্রশ্ন—ফস্ফরস প্রধান সার প্রয়োগ করিয়া ১০।১২ দিন পরে উক্ত জমিতে সব্জী সারের জন্য ধঞ্চে বুনিলে ও তাহা সময় মত চাষ দিয়া পচাইলে কোন ক্ষতি হইবে কি না?

যখন চাষ দিয়া ধঞ্চে ভাঙ্গাইয়া (পচাইবার জন্য) দেওয়া হইবে ঐ সময়ে চুন প্রয়োগ করিলে কোনও ক্ষতি আছে কি না?

উত্তর—ফস্ফরাস প্রধান সার গাছের ডাল পাতা আদি অবয়ব বৃদ্ধির অনুকূল নহে সুতরাং তাহাতে শণ, ধঞ্চে যাহা সব্জী সারের জন্য অব্যবহিত পরেই বোনা হয় তাহার উপকার না হোক কোন অপকার হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। শণ ধঞ্চে জমিতে চষিবার সময় চূণ প্রয়োগ করা বরং ভাল চূণ সব্জীকে পচাইয়া ও তৎপূর্ব্বে প্রদত্ত হাড় চূর্ণাদি ফস্ফরাসকে গলাইয়া শস্যের গ্রহণপযোগী অবস্থায় লইয়া আইসে।

সার সংগ্রহ

বাঙলার শাঁখের শাখা—১৫ শত বৎসর ধরিয়া শাঁখারী ঘরে বসিয়া তাহার পূর্ব্বপুরুষেরই মত দু'মুখো করাতে শঙ্খ কাটিয়া শাঁখার চক্র প্রস্তুত করে। তাহার পর কোন কারীগর তাহাতে নক্সা কাটে; কেহ তাহা পালিশ করে। এইরূপে শাঁখার ব্যবসায় অনেক বাঙ্গালীর অন্নের উপায় হয়। প্রতি বৎসর দক্ষিণ মাদ্রাজ ও কাথিবাড় হইতে দুই হইতে আড়াই লক্ষ টাকার শঙ্খ বাঙ্গালায় আমদানী হয়। আর সেই শঙ্খ হইতে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার শাঁখা প্রস্তুত হইয়া বাঙ্গালার বরবর্ণিনীদিগের বরাঙ্গের শোভা বর্দ্ধিত করে। বাঙ্গালার শাঁখা শিল্প-নৈপুণ্যে এমনই মনোহর হয় যে, তাহা কেবল বাঙ্গালায় নহে ভারতের সর্ব্বত্র আদৃত ও ব্যবহৃত হয়। এখন ভারতের বাহিরেও বাঙ্গালার শাঁখার আদর হইতেছে। মাদ্রাজে মৎস্য-বিভাগের অন্যতম কর্ম্মচারী মিষ্টার জেমস হর্নেল বরোদা দরবারের জন্য শঙ্খের সম্বন্ধে যে পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, য়ুরোপে ও আমেরিকায় শাঁখার আদর হইতেছে। বিদেশ হইতে যে সব ভ্রমণকারী শীতকালে ভারত-ভ্রমণে আসিয়া থাকেন—তাঁহারা ভারতের স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে লইয়া যান। তাঁহাদের জন্য পিত্তলের খেলনা, মীনা করা ফুলদানী, শৃঙ্গের বাক্স প্রভৃতির মূল্য চড়িয়া গিয়াছে। আর তাঁহাদের রুচির অনুরূপ দ্রব্য যোগাইবার জন্য ভারতের শিল্পীরা বৈশিষ্টবর্জ্জিত

পণ্য প্রস্তুত করিতেছেন। তাঁহারা বাঙ্গালার শাঁখার সৌন্দর্য্যে ও মূল্যাল্পতায় আকৃষ্ট হইয়া শাঁখা খরিদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ফ্যাসানের খেয়ালের গতি কেহ নির্দ্দিষ্ট করিতে পারে না। যদি ক্রমে বিদেশিনী বিলাসিনীদিগের বরাঙ্গে বাঙ্গালার শাঁখা শোভা পাওয়াই ফ্যাসান হয়—যদি "গোরা গায়" গোরা শাঁখা সভা-সভাসমিতিতে, রঙ্গালয়ে, নৃত্যশালায় গর্ব্বের বস্তু হয় তবে এ ব্যবসার প্রসারবৃদ্ধিও অনিবার্য্য।

মিষ্টার হর্ণেল কিন্তু একটা কথা বলিয়াছেন,—সেটা বাঙ্গালীর ভাবিবার বিষয়। তিনি বরোদারাজ্যে শাঁখার ব্যবসা বসাইতে বলিতেছেন। বরোদারাজ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় শঙ্খের উৎপত্তিস্থান। তিনি বলেন, কাথিবাড়ের অধিবাসীরা বাঙ্গালায় চালান না দিয়া, শাঁখা প্রস্তুত করুক না কেন? বাঙ্গালার শাঁখারীরা সেকেলে যন্ত্রে যেরূপ শাঁখ প্রস্তুত করে, এ কালের কল বসাইয়া সেইরূপ শাঁখা প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করা হউক। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এ কালের কলে যে জিনিস উৎপন্ন হইবে, তাহা সেকেলে যন্ত্রে—বংশপরম্পরাক্রমে শাঁখারীর কাজে অভ্যস্ত শিল্পীর দ্বারা প্রস্তুত শাঁখার মত সুন্দর হইবে না; কলের কাপড়ে তাঁতের কাপড়ের পাড়ের নকল হয়—কিন্তু তাঁতের কাপড়ের মত কলের কাপড় সুন্দর হয় না। কলের পণ্য পণ্যমাত্র, হাতের কাজ শিল্প-সৌন্দর্য্যে সুন্দর। কলে মানুষের বুদ্ধি—আগ্রহ—সৌন্দর্য্যবোধ—সৌন্দর্য্যবিকাশচেষ্টা ত আর সঞ্চারিত হয় না। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? শিল্পের সৌন্দর্য্য বুঝিবার ক্ষমতা সকলের থাকে না; অধিকাংশ লোক সস্তার ভক্ত। নহিলে এ দেশের শালের, কাপড়ের, বাসনের ব্যবসার দুর্দ্দশা ঘটিত না। কাজেই সস্তা শাঁখার চল্‌তি হইলে বাঙ্গালার একটা পুরাতন শিল্পের সর্ব্বনাশ হওয়া অসম্ভব নহে। হাতের শিল্প—উটজ শিল্প যে অনেক স্থলে কলের পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে—তাহার প্রমাণেরও অভাব নাই। জাপানের অনেক শিল্পের সমৃদ্ধিতে ইহার পূর্ণ পরিচয়। ভারতের অনেক শিল্পও উটজ বলিয়াই আজও টিকিয়া আছে। নহিলে কৃষ্ণনগরের পুতুল, আমেদাবাদের বিদরী, ঢাকার শাঁখা, শান্তিপুরের কাপড়, মুর্শিদাবাদের রেশম, খাগড়ার বাসন, ভাগলপুরের মটকা ভিজাগাপটমের হাতির দাঁতের জিনিস, কটকের সোণা রূপার তারের কাজ, লক্ষ্ণৌয়ের ছিট, এ সব এত দিনে সার জর্জ্জ বার্ডউডের পুস্তকের পৃষ্ঠায় থাকিয়া স্মৃতিগত হইত। সুতরাং উটজ শিল্পও আবশ্যক উৎসাহ ও উন্নতি পাইলে প্রতিযোগিতা-ক্ষম হয়। শাঁখার ব্যবসা—বাঙ্গালার একটা অতি পুরাতন ব্যবসা—একটা শিল্প—একটা গৌরবের—একটা দেখিবার ও দেখাইবার জিনিস। তাহাতে নিরন্ন বাঙ্গালীর উপায়ও হয়। সুতরাং যাহাতে তাহার সর্ব্বনাশ না হয়, পরন্তু উন্নতি হয়—বিপজ্জনক শ্রীহীন কাচের চুড়ীর পরিবর্ত্তে আবার দেশে শাঁখার চলন হয়, তাহা করা বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য;—শিল্পের জন্যও কর্ত্তব্য—সৌন্দর্য্যের জন্যও কর্ত্তব্য আর অন্নের জন্যও কর্ত্তব্য।

"বসুমতী"

বাঙলার দুধের অভাব—তেলে জলে দুধে ঘিয়ে ও মাছে ভাতে বাঙ্গালী মানুষ হয়। বাঙ্গালীর দেহের পুষ্টিবিধানে এগুলির প্রয়োজনীয়তা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এমনই যে, জলে আগুণ লাগিয়াছে, মাছের বংশ লুপ্ত হইতে বসিয়াছে, এবং তেলে ও দুধে বিষম ভেজাল আরম্ভ হইয়াছে।

আনন্দের কথা এই যে, এতদিনে কলিকাতা কর্পোরেশনের দৃষ্টি এই খাঁটি দুধ সরবরাহের দিকে পতিত হইয়াছে। সহরে যাহাতে বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহ হয়, কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটী তাহার ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু সমস্যা বড় জটিল। তাঁহারা এই জটিল সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে, কেবল কলিকাতার লোকেই যে উপকৃত হইবে, তাহা নহে; মফঃস্বলের অধিবাসীরাও উপকৃত হইবেন। কারণ, কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল-কর্ত্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা করেন, মফস্বলের মিউনিসিপ্যালিটী-সমূহ প্রধানতঃ তাহারই অনুসরণে প্রবৃত্ত হইবেন।

কলিকাতা কর্পোরেশন বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য এক কমিটী গঠিত করিয়াছেন। কিরূপে খাঁটী দুধ যোগান দেওয়া যাইতে পারে, কমিটী সে বিষয়ে জনসাধারণের অভিমত গ্রহণ করিতেছেন।

যেরূপ বুঝা যাইতেছে, তাহাতে কলিকাতা সহরের মধ্যে গোয়ালাদিকে আর থাকিতে দেওয়া হইবে না। কলিকাতার উপকণ্ঠে খোলা যায়গায় গোশালা নির্ম্মিত হইবে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রশস্ত বায়ু সঞ্চারের উপায়বিশিষ্ট 'গোয়াল' থাকিবে, গোচারণের পর্য্যাপ্ত ভূমি থাকিবে। সেই ভূমিখণ্ডে গাভীগণ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারিবে, গো-বৎসগণ ছুটিয়া বেড়াইবার অবকাশ পাইবে। মোট কথা,—এই গোশালায় গাভীদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে। এই সকল গোশালা হইতে সহরে দুধ যোগান দেওয়া হইবে। "বাঙ্গালী"

পঙ্গপাল—

সিমলা শৈলে পঙ্গপাল উড়িয়াছে। প্রারম্ভেই প্রতিকারের আয়োজন করা কর্ত্তব্য। একে অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিতে দেশের প্রভুত শস্য হানি হইয়াছে তার উপর আবার হওয়া শস্তে পঙ্গপাল পড়িলে দেশ রক্ষা হইবে না।

গুজরাটে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা—

গুজরাট ও কাথিয়াড়ে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। সম্প্রতি বর্ষা নামিয়াছে; একটু আশার অবকাশ হইয়াছে। গৃহপালিত পশুদের খাদ্যাভাব ঘটিয়াছিল। তাহাদিগকে জঙ্গলে পাঠান হইয়াছে। সেখানে ঘাস-জলের

সংস্থান আছে। গুজরাটে ক্ষেতের ধান শুকাইয়া যাইতেছে। অন্য শস্যের অবস্থাও তদ্রূপ। সময়ে সময়ে দুই এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছিল, তাই ক্ষেত একেবারে জ্বলিয়া যায় নাই। কিন্তু জোর বৃষ্টি না হইলে ফসল ফলিবে না। "বাঙ্গালী" ২৮।৮।১৫

পঞ্জাবে অনাবৃষ্টি—

পঞ্জাব, রাজপুতনা, উত্তর-পশ্চিম প্রান্তসীমায় এখনও বৃষ্টি হয় নাই। সুবৃষ্টির অভাবে কৃষির ক্ষতি হইতেছে। পঞ্জাবে কৃষির অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা আশাপ্রদ বটে।—মারবাড়ের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতেছে। শারদশস্য শুকাইয়া যাইতেছে। বৃষ্টির অভাবে কৃষকেরা বপন করিতে পারিতেছে না। ভারতের অন্যান্য স্থানে এমনতর শঙ্কার কারণ নাই। "বাঙ্গালী" ২৯।৮।১৫

পাবনায় প্লাবন—

পাবনা বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে। একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন,—এই বানে অনিষ্ট হয় নাই। কৃষকেরা বানের পূর্ব্বেই ক্ষেত হইতে ভাদুই শস্য গৃহে তুলিয়াছিল। বানের জল ক্ষেতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে শস্যের উপকার হইবে, অপকারের শঙ্কা নাই। বরং দুর্ভিক্ষের ভয় ঘুচিয়াছে। আর সমস্ত জেলা বানের স্রোতের ধৌত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং আশা করা যায়, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমিবে। তাঁতিরবন্দ অঞ্চলে এখনও অন্নকষ্ট আছে।

বাগানের মাসিক কার্য্য

——:০:——

কার্ত্তিক মাস

আশ্বিন মাস গত হইল, বিলাতী সজী বপন করিতে আর বাকী রাখা উচিত নহে। কপি, সালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মটর, মূলা এবং নাবী জাতীয় সীম, সালগম, বীট, গাজর, পিঁয়াজ ও শসা প্রভৃতি বীজের বপনকার্য্য আশ্বিন মাসের শেষেই আরম্ভ করা উচিত। নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখনও তাহাদের চাষ চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐ সমস্ত বিলাতী বীজ বপন যেন আর বাকী না থাকে। বীজ আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। পিঁয়াজ ও পটল চাষের এই সময়। আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধ গত হইলে রবিশস্যের জন্য জমি তৈয়ারি করিতে হইবে এবং আশ্বিন মাস গত হইতে না হইতেই মসুরী, মুগ, তিল, খেঁসারী প্রভৃতি রবিশস্যের বীজ বপন করিলে ফল মন্দ হয় না। কিন্তু আকাশের অবস্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষা শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবেই রবিফসলের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত, নচেৎ বৃষ্টিতে ক্ষতি

হইবার সম্ভাবনা। সচরাচর দেখা যায় যে, আশ্বিন মাসের শেষেই বর্ষা শেষ হইয়া যায়, সুতরাং বঙ্গদেশে কার্ত্তিক মাসেই উক্ত ফসলের কার্য্য আরম্ভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধনে—যেমন তেমন জমি একটু নামাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে। ধনে এই সময় বুনিতে হয়।

মুল্লাদি—মুল্ল, মেথি, কালজিরা, মৌরী, রাঁধুনি ইত্যাদি এতৎ প্রদেশে ভাল ফলে না; কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়। এই সকল বপনেরও এই সময়।

কার্পাস গাছ—কার্পাসের দুই চারিটি গাছ, বাগানের এক পাশে রাখিতে পারিলে গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে। উহার বীজ এখন বপন করে।

তরমুজাদি—তরমুজাদি, বালুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয়, তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। তরমুজ মাটি চাপা দিলে বড় হয়। তরমুজ বীজ বসাইবার এই সময়।

উচ্ছে—৪ হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটী মাদায় ৩।৪টার অধিক পুতিবে না। উচ্ছে বীজ এই মাসের মধ্যে বসাও।

পটোল—পটলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্পজলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন কল বাহির হইলেই ভূমিতে পুতিবে। পুনঃ পুনঃ খুসিয়া ও নিড়াইয়া দেওয়াই পটলক্ষেত্রের প্রধান পাইট। পটল চাষ এই মাসে আরম্ভ হয়।

পলাণ্ডু—কল সমেত একটী পিঁয়াজ আধ হাত অন্তর পুতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটির "যো" হইলে খুঁড়িয়া দিবে। এই মাসে পিঁয়াজ বসাইবে।

মটরাদি—শুঁটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটি ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

ক্ষেত্রের পাইট—যে সকল ক্ষেতে আলু, কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে জল দিয়া আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদিগের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান—এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল বীজ—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে এষ্টার, প্যান্সি, দোপাটি, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে। এতদিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইলে আর বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং এখন আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বপনে কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

গোলাপের পাইট—গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া এই সময় রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হইবে। ৪।৫ দিন এইরূপ করিয়া পরে ডাল ছাঁটিয়া গোড়ায় নূতন মাটি, গোবরসার প্রভৃতি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিলে শীতকালে প্রচুর ফুল ফুটে। গাছের গোড়া খোলা থাকাকালে কলিচুণের ছিটা দিলে বিশেষ উপকার হয়। বাঙলাদেশের মাটি বড় রসা এই কারণে এখানে এই প্রথা অবলম্বনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

দারুচিনির বাগানে দারুচিনি সংগ্রহ করিতেছে।

কৃষক।

সূচীপত্র।

আশ্বিন ১৩২২ সাল।

[লেথকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৬শ খণ্ড। { আশ্বিন, ১৩২২ সাল। } ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

গয়ায় বেগুনের চাষ

কৃষি-তত্বাভিজ্ঞ শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, এম, এ, এল, বি লিখিত—

গয়া জেলা একটি খুব উর্ব্বর প্রদেশ। ইহা গঙ্গার দক্ষিণদিকে অবস্থিত। এখানকার চাষীগণ খুব পরিশ্রমী। এদেশে সকল প্রকার ফশলই জন্মায়। সজী সকল রকমের উৎপন্ন হয় এবং বাজারে বেশ সস্তায় বিক্রয় হয়। কোপি, আলু, বীট, গাজর, বেগুন, কলা ইত্যাদি সকল প্রকার তরকারী এইখানে জন্মিয়া থাকে। এদেশের বেগুন চাষ সম্বন্ধে ২।৪ কথা এই প্রবন্ধে বলিব। বেগুন চাষ এদেশে প্রায়ই আমাদের বঙ্গদেশের মত সমাহিত হইয়া থাকে; কিন্তু তথাপি একটু সাতন্ত্রতা রক্ষা করিতে হয়। গয়া জেলায় গ্রীষ্ম খুব বেশী বলিয়া বেগুন গাছে শীতের সময় এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের সময় সময় সেচ্ দিতে হয়। এ দেশের কৃষকাদি গাছে পোকা ধরিলে হলুদ জল, ছাই, দোক্তা জল ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকে।

এখানকার মৃত্তিকা—বাঙলা দেশের ন্যায় এখানেও দোঁয়াস জমিতে যে জায়গায় বর্ষার জল দাঁড়ায় না তাহাই বেগুণ চাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়।

উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহের জন্য এ দেশের লোক স্বভাবতই সচেষ্ট। বীজ হইতে চারা প্রস্তুত প্রণালী মামুলি—কোন বিষেত্ব দেখা যায় না। বেগুণের ক্ষেত কর্ষণাদি কার্য্য বাঙলা দেশের ন্যায় মাঘ মাস হইতে আরম্ভ হয়। ক্ষেতের চাষ কারকিৎ একই নিয়মে সম্পাদিত হয়। বৈশাখে আশু বেগুণের চারা রোপিত হয় এবং এখানেও চারাগুলি 'হাপর' হইতে তুলিয়া মূল শিকড়ের কিয়দংশ কাটিয়া জমিতে রোপণ করা হয়। অধিকন্তু রোপণের সময় প্রত্যেক চারার গোড়ায় সার দিতে হয়। এদেশের লোক আস্তাবলের ও

গো-শালার সারই বেশী ব্যবহার করে এবং ছাই ও মাঠের গাছ পচা সারই বেগুন ক্ষেতে প্রদান করিয়া থাকে। এদেশের বেগুন যেমন বড়, তেমনি সুস্বাদু হয়। আজকালকার বাঙলায় চাষীগণ ল্যাণ্ডেথের বীজ, আমেরিকা হইতে আনাইয়া চাষ করিতেছে; কিন্তু এদেশে পাটকীলে এবং কাঁটাযুক্ত মুক্তকেশী বেগুণের বীজ চাষিরাই ঘরে উৎপাদন করে, গাছেই বীজ বেগুণ শুখাইয়া পরে তাহা উঠাইয়া রাখিয়া দেয়। সময় উপস্থিত হইলে তাহা ছাড়াইয়া বীজ বাহির করে। গয়ার বেগুণ আকারে, স্বাদে ও গুণে কোন অংশে আমেরিকান বেগুণ অপেক্ষা কম নহে। আমেরিকান বেগুণ অপেক্ষা যদিও কিছু ছোট হয় কিন্তু ফলনে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক।

এতদঞ্চলে বেগুণ বিজের সার—বিঘা প্রতি ২/ মণ খৈল, ১/ মণ ছাই ও।• দশ সের চুণ* উত্তমরূপে মিশ্রিত করা আবশ্যক। চারা, জমিতে রোপণের পূর্ব্বে প্রতেক চারার গোড়ায় উক্ত সার কিয়ৎ পরিমাণে দিয়া চারাগুলি রোপিত হয়। এক সপ্তাহ পরে জুলিগুলি মাটি ভরিয়া দিতে হয় ও যেখানে যে চারাগুলি মরিয়া যায় সেইখানে নূতন চারা রোপণ করা হয়।

বেগুণের শত্রু—(১) এখানেও জঙলা পাখীতে অনেক সময় কচি বেগুণ ঠোক্‌রাইয়া নষ্ট করে। এজন্য এখানকার চাষীরা ভূসামাখান হাঁড়িতে চুণের ফোঁটা দিয়া বেগুণ ক্ষেত্রে দাঁড় করিয়া দিয়া থাকে। খড়ের মনুষ্যাকৃতি পুত্তলিকাও ক্ষেত্র মধ্যে দাঁড় করাইয়া রাখা হয়। ইহাতে পাখীতে তেমন অনিষ্ট করিতে পারে না। এদেশের অনেকের বিশ্বাস যে ডাইনে প্রথম মারণ বিদ্যা শিক্ষা করিবার সময় বেগুণ গাছের উপর মন্ত্র সফল হইল কিনা তাহা বুঝিয়া লয়। ভূসামাখান হাঁড়িতে চুণের ফোঁটা দিয়া ক্ষেত্রে রাখিলে ডাইনে নাকি গাছ মারিতে পারে না।

(২) গয়া জেলাতে তিন প্রকার-গুটিপোকা শ্রেণীর কীট বেগুণ গাছ নষ্ট করিতে দেখা যায়। প্রায় কীটাবস্থায় উহাদের দেখিতে প্রায় একরূপ। এখানে একজাতীয় কীট বেগুণগাছের মূলকাণ্ড ছিদ্র করে, তাহারা প্রায়ই মাটির উপরে বেগুণগাছের ডাটার মধ্যে ছিদ্র করে, বেগুণ গাছের ইহারা প্রধান শত্রু। পুরাতন গাছ অধিকাংশ এই কীটাক্রান্ত হইতে দেখা যায়। ইহারা Pyralidæ শাখাভুক্ত এবং Euzophera Perticella নামে অভিহিত। আর একরূপ কীট সাধারণতঃ বেগুণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রজাপতিগুলির রঙ্ সাদা ও পালকে মেটে ও কাল রঙের দাগ আছে। ইহারাও Pyralidæ শাখাভুক্ত ও Leucinodes orbonalis নামে অভিহিত। বাঙলায়ও এই জাতীয় কীটের অভাব নাই। এই প্রজাপতির কীট বেগুণের ও

* এতদঞ্চলে মাটিতে স্বভাবতঃ চুণ অধিক বলিয়া পূরণায় মসয়ের সহিত চুণ প্রয়োগ অনাবশ্যক বলিয়া মনে হয়। কৃঃ সঃ

বেগুণগাছের কচি 'ডগার' অনিষ্টকারী। তৃতীয় প্রজাপতির কীট বেগুণগাছের পাতার কাছে নরম ডাটায় ছিদ্র করিয়া থাকে। এ শ্রেণীর কীট তেমন অনিষ্ট করে না। এ প্রজাপতিগুলি শ্বেতবর্ণ, উপরোক্ত দুই প্রকার প্রজাপতি অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও পালকে হরিদ্বর্ণ রেখা বিশিষ্ট। ইহারা Noctudae শ্রেণীভুক্ত ও Eublemma Oblivacea নামে অভিহিত।

এখানকার লোকে কীট নিবারণের জন্য হলুদ জল, ছাই, তামাকের ধোঁ ও অন্য আরক ও দ্রাবক ব্যবহার করে কিন্তু কীটাক্রান্ত বেগুণগাছ সমূলে উৎপাটন করিয়া একেবারে পুড়াইয়া ফেলা আবশ্যক তাহা জানে না। এ প্রণালীতে কীট ধ্বংশ হইলে নূতন কীট জন্মায় না সুতরাং পরে আর গাছেরও অনিষ্ট হয় না।

এখানেও বেগুণগাছ প্রায় 'ধসা লাগা' ও তুলসীমারা রোগে আক্রান্ত হয়। সাধারণ চাষীরা বলে যে বেগুণচারা ক্ষেত্রে রোপণ করিবার সময় মূল শিকড় কাটিয়া যাওয়ায় এই রোগ উৎপত্তির প্রধান কারণ। ইহা কিন্তু প্রকৃত কারণ নয়। শিকড় কাটিয়া যাইলে ও পরে জল ক্ষেত্রে দাঁড়াইলে রোগের কীটানু গাছ আক্রণের সুবিধা পায় বটে কিন্তু ইহার মূল কারণ এই যে রোগের কীটানু পূর্ব্বে হইতেই বেগুণ বীজে থাকে পরে বর্দ্ধিত হইলে গাছ আক্রান্ত হয়। এই জন্যই উত্তম বীজ সংগ্রহ করা আবশ্যক। এ রোগেরও দমনোপায়—রোগাক্রান্ত গাছগুলি সমূলে উৎপাটন করিয়া পোড়ান।

এখানকার চাষীরা বেগুণ ক্ষেতে প্রথম একবার ফল হইয়া গেলে দ্বিতীয়বার গাছ ফলিতে আরম্ভ হইলে ক্ষেত্র মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলগুলি পাকিতে দেওয়া আবশ্যক মনে করে। ফলগুলি স্বর্ণাভ হইলে গাছ হইতে পাড়িয়া মধ্যে চিরিয়া দুই দিন গাদা করিয়া রাখে। পরে বীজগুলি ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লয়।

এখানে বেগুণ চাষে বিঘা প্রতি ২৫৲ টাকা খরচ পড়ে। "পাইকপাড়া নগরীতে বেগুণ চাষ করিরা ১ বিঘা জমি হইতে ১ সপ্তাহে প্রায় ৪০।৫০ টাকার বেগুণ বিক্রয় হইয়াছিল" ইহাতে বোঝা যায় যে অন্যান্য ফললের ন্যায় বেগুণ চাসেও বেশ লাভ আছে।

মশালা

(Spices, Condiments and perfume producing plants.)

(২)

রসায়ন তত্ত্ববিদ্ শ্রীনলিন বিহারি মিত্র এম, এ লিখিত।

মশালা সম্বন্ধে আলোচনা বিগতবারে আমি শেষ করিতে পারি নাই কারণ ব্যবহারোপযোগী মশলা অনেক ও বহু প্রকারের সুতরাং সহজে তাহাদের তালিকা

করিয়া ফেলা বা সংক্ষেপে তাহাদের কথা নিঃশেষ করিয়া ফেলা যায় না। মশলা গুলিকে আমরা ব্যবহার অনুসারে চারিশ্রেণীতে বিভাগ করিয়া ফেলিতে পারি যথা—রন্ধনের মশলা, পানে খাইবার মশালা, রঙের মশালা ও সুগন্ধি মশালা।

রন্ধনের মশালা বলিলে আমরা হলুদ, লঙ্কা, জিরা, মরিচ, মৌরি, চন্দনী বা শরিষা, তেজপত্র, দারুচিনি, লবঙ্গ, বড় এলাচ, ছোট এলাচ, জায়ফল, ধনে, কালজিরা, মেথি, সা-জিরা, সা-মরিচ, আদা, পিয়াজ, রসুন প্রভৃতি জিনিষগুলিই বুঝি।

সুল্‌কা (Furnaria parviflora) মেথি, থাইম, মার্জ্জোরাম, ল্যাভেণ্ডার, সেজ, ধনে, মৌরি মিণ্ট সুইট ফ্লাগ (Sweet Flag) পচাপাতা (Patchouli) দোনা এইগুলিও মশালা বিশেষ। ইহাদের পাতা ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি সুঘ্রাণ করিতে প্রয়োজন হয়। মিণ্ট, ল্যাভেণ্ডার, মার্জ্জোরাম পচাপাতা প্রভৃতির পাতা তৈল সুগন্ধি করিবার নিমিত্ত ব্যবহার দেখা যায়। বেসিলও (Basil) বাবুই তুলসী সুগন্ধি মশালা রূপে লোকের কাজে লাগে। সেজ, থাইম, মেথি, মিণ্টের মত ইহারও পাতার আবশ্যক। গরম জলের সহিত ইহার পাতা সিদ্ধ করিয়া খাইলে জ্বরনাশ হয়। সাধারণতঃ যেখানে সেখানে ইহার চাস হয়। ইহা একদিকে ভারত হইতে আরম্ভ হইয়া অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত তথা হইতে সমুদ্র বাহিয়া আফ্রিকার মধ্য দিয় এমেরিকায় গাইয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহার বীজ তোকমারি, যাহার ব্যবহার ঔষধ রূপে ও সরবতের সহিত ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত। যে সব মশালার পাতা ব্যবহার হয় সেগুলিকে ইংরাজী ভাষায় পট হার্ব্ব (Pot Herbs) বলিয়া থাকে। সুলফা, থাইম মার্জ্জোরাম প্রভৃতি শেষোক্ত সব মশলাগুলি পট হার্ব্ব।

পানের মশলা যথা—শুপারি, যোয়ান, ধনে, চন্দনী. মৌরি, লবঙ্গ, দারুচিনি দুই রকম এলাচ, জৈত্রি, জায়ফল, কর্পূর, কাবাবচিনি, খদির ইত্যাদি।

সুগন্ধি মশলা যথা—অগরু (Aquilaria Agallocha) কাষ্ঠ ধূপকাষ্ঠ, নাগকেশর ফুল, জটামাংসীয় শিকড়, কুটমূল (কাশ্মির), মুথা, দেবদারুকাষ্ঠ, শ্বেতচন্দন, দোলন চাঁপার ফুল (Hedychium Spicatum) আয়ুর্ব্বল (Juniper berries) খস্ খস্ মূল, রোজাঘাষ (Rosagrass) দোনা, মেথী, একাঙ্গী, কস্তুরি (Hibiscus abelmoschus), পচাপাতা, পচা তৃণ বা লেবুঘাষের পাতা, কেতকিপত্র, কেতকী ফুল, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, পিমেণ্টা (এতদ্দেশে এ গাছ নাই, ভূমধ্যসাগরের উপকূলে জন্মে) আম আদা।

রঙের মশলা যথা—জাফ্রাণ, এলকালিরুট (alkanet) হলুদ, কুসুম ফুল, সেফালিকা, দারুচিনি, খদির, লটকান, পলাশ, কমলাগুড়ি, ডালিম খোসা, লোধ ছাল, ধাইফুল (woodfordia Floribunda)।

রন্ধনের মশালার মধ্যে সরিষা, হলুদ, লঙ্কা, মরিচ, বেন্নবীজ সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দিয়াছি বাকী রন্ধনের মশালাগুলির পরিচয় আবশ্যক। অনেকগুলি রন্ধনের মশালা আবার মিষ্টান্নাদি রঙ করিতে, বা তেল রঙ করিতে অথবা তৈল, মিষ্টান্নাদি সুগন্ধ করিতে ব্যবহার হয়। জাফ্রাণে ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন উভয়ই রঞ্জিত হয়। জাফ্রাণ সুঘ্রাণও প্রদান করে। মেথি তৈলের মশালা আবার রাঁধিবার মশালা। ধনে পানের মশালা রূপে ব্যবহার হয়, আবার ইহা রন্ধনের মশালা। এইরূপ এক মশালার দুই অথবা ততোধিক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

জিরা (Cuminum Cyminum)—বাঙলাদেশে ইহার বহুল ব্যবহার হয় বটে কিন্তু বাঙলার লোকে ইহার চাষ জানেনা—বাঙলায় ইহা জন্মায় না। উত্তর পশ্চিম পঞ্জাব ও আফ্‌গানিস্থান ইহার উৎপত্তিস্থান। বাজারে বেনের দোকানে যে জিরা পাওয়া যায় তাহা বপন করিয়া দেখা হইয়াছে যে তাহা অঙ্কুরিত হয় না। নূতন বীজ সংগ্রহ করিয়া বাঙলায় ইহার চাষ প্রবর্ত্তন করা মন্দ নহে। বরদা রাজ্যে ইহার চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অগ্রহায়ণে ইহার বীজ বপন করিতে হয়।

রাঁধুনি—ইহা বন্য সেলেরি (Celery) বীজ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বাঙলা দেশের সেলেরির চাষে বিশেষ কোন যত্নের আবশ্যক নাই—সামান্য চেষ্টাতে যথা তথা জন্মিতে পারে। আজকাল এ দেশে বিলাতী সেলেরির চাষ হইতেছে। ইহাদের জন্য একটু যত্ন আবশ্যক। সেলেরির পাতা ব্যঞ্জন, মিষ্টান্নাদি সুঘ্রাণ করিতে আবশ্যক হয় সেলেরীর বীজ জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে। এই বীজগুলি রাঁধুনি অথবা চন্দনী নামে অভিহিত।

কালজিরা—ইহাও একটি রন্ধনের মশালা। চাটনি আচার প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে তাহাতে কালজিরা দিতে হয়। কালজিরার একটা তীব্র গন্ধ আছে, তাহার ঝাঁজে কীটাদি নিকটে ঘেঁসিতে পারে না। এইজন্য গরম কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে পোকায় কাটিবার ভয়ে কালজিরা দিয়া রাখা হয়। কালজিরার এত ঝাঁঝ যে ইহা হাতে একটু রগ্‌ড়াইয়া কাপড়ের পুটুলির মধ্যে রাখিয়া আঘ্রাণ লইলে মস্তিষ্কে সাড়া পৌঁছায় এবং শিরঃপীড়া হইলে ইহার নাশে শীরবেদনা আরাম হয়। শাদা জিরা ও শাদা মরিচ পোলাও বা পকান্নাদি রন্ধনের মশালা। শাদা জিরা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রকারভেদে দুই প্রকার। বড় জাতীয় শাদা জিরার চাষ পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে হইয়া থাকে। আর এক প্রকার শা-জীরা আছে যাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। ইহা কাল রঙের—শাদা রঙের নহে। ইহা প্রধানতঃ কাশ্মিরে ও শিমলা পাহাড়ের উত্তরস্থিত রামপুর বুসায়ার প্রভৃতি অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে। শাদা মরিচ বিভিন্ন জাতীয় মরিচ নহে—কাল মরিচের খোসা ছাড়ান মাত্র।

মৌরি (Anise) ইহাও জোয়ান রাধুনির মত পানের মশালা এবং রন্ধনের মশালা

ভারতের অনেক জায়গায় ইহার রিতিমত চাষ হইয়া থাকে, চৈত্র বৈশাখে বীজ পাকে। এক বিঘা জমিতে চাষ করিতে তিন চারি সের বীজের আবশ্যক হয়। জোয়ান, রাঁধুনি, ধনে, মৌরির ক্ষেত নিড়াইয়া না দিলে ভাল ফসল হয় না।

জোয়ান (Carum Copticum) ক্যারমের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে একটু বলিয়াছি। বেন্থ বীজ যা জোয়ানও তাই, প্রায়ই এক রকমের জিনিষ। পানের মশালা রূপেই ইহার ব্যবহার বেশী; রন্ধনেও ব্যবহার হয়। লেবুর রস দিয়া জারক বা চূর্ণ প্রস্তুত করিতে জোয়ান চাই; গাঁদালপাতা ও জোয়ান বাটিয়া একপ্রকার ঝোল (Curry) প্রস্তুত হয়। ইহা উদরাময় রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সুপথ্য। জোয়ান, মৌরি প্রভৃতি সুরাসার সুঘ্রাণ করিতে এবং তাহাতে ভেষজ গুণ সংযোগ করিতে আবশ্যক হয়।

গোটার মশালা (Curry powder) নামক এতদ্দেশে যে একপ্রকার মিশ্র গুঁড়া মশালা প্রস্তুত হয় তাহাতে জোয়ানের আবশ্যক। গোটার মশালা সম্বন্ধে স্থানান্তরে আলোচনা করিব। জোয়ানের সমধিক ব্যবহার কিন্তু আরোক প্রস্তুতে, এই আরোক গর হজমের মহৌষধ। জোয়ান হইতে উৎপাদিত থাইমল (Thymol) সর্ব্বোৎকৃষ্ট কীট ও জীবাণুনাশক। বর্ত্তমান মহাসমরে সৈনিকদিগের পরিধেয় বস্ত্র, তাহাদের ছাউনি ও গাত্র পরিষ্কারার্থে ইহার বহুল আবশ্যক হইতেছে।

ধনে (Coriander) ইহার চাষ ভারতে সর্ব্বত্র। য়ুরোপেও ইহার চাষ আছে। ইহা রন্ধনে আবশ্যক এবং পান সাজিবার সময় আবশ্যক। বিলাতে জিন মদ্য সুগন্ধ করিতে ইহার প্রয়োজন হয়। গোটার মশালা (Curry powder) প্রস্তুতে ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষ হইতে ব্যঞ্জনে ইহার প্রয়োগ পারশ্য ও ইজিপ্ট পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে লঘু তৈল ভাগ যথেষ্ট আছে; তাহার বায়ু প্রশমন ও রেচক গুণ হিসাবে ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। ধনের চাষ জোয়ান, রাধুনি, মৌরি প্রভৃতির মত।

দারুচিনি (Cinnamonum Zelanicum) গ্রীষ্ম প্রধান দেশে জাভা, সিংহল, মালয় দ্বীপপুঞ্জ মালবার উপকূল, উত্তর ভারত এবং অন্যত্র ইহা জন্মিতেছে। ইহার ছাল সুগন্ধযুক্ত। ব্যঞ্জন সুঘ্রাণ করিতে, খাদ্য সুগন্ধ করিতে এবং তৈলাদি সুগন্ধ ও রন্ধন করিতে ইহা ব্যবহার হয়। গাছের ছাল কাটিয়া ক্রমশঃ খসিয়া যায়। এই ছালগুলিই দারুচিনি। ইহার ব্যবসা খুব ফালাও। দারুচিনির তৈলের আদরও খুব।

সিংহল দারুচিনির আদি জন্মস্থান বলিয়া মনে হয়। সিংহলের অরণ্যে দারুচিনির গাছ প্রচুর। পর্টুগীজ ও ডচগণ যখন ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য জাহাজ লইয়া আসিলেন তখন হইতে সিংহলের দারুচিনি ব্যবসা জাঁকিয়া উঠিল। ডচগণ সিংহলে দারুচিনির বাগান বসাইতেও আরম্ভ করিলেন। অদ্যাপিও সিংহলে ডচদের ১৫,০০০

একর (১ একর=৩ বিঘা) বাগান আছে। এই বাগান হইতে বৎসরে প্রায় ৬,০০,০০০ পাউণ্ড (১ পাউণ্ড=॥০ অর্দ্ধসের) দারুচিনি উৎপন্ন হয়। রপ্তানি মূল্য প্রতি পাউণ্ড ৮ সিলিং। য়ুরোপের দারুচিনির বিক্রয় খুব অধিক—

যুক্তরাজ্যে	প্রতিবৎসর	৫০০০০০ পাউণ্ড
জার্ম্মানি	„	২০০০০০০ „
হলণ্ড	„	৫০০০০০ „
ফ্রান্স	„	৭৫০০০০ „
বেলজিয়ম	„	৫০০০০০ „
স্পেন	„	৭৫০০০০ „
ইটালি	„	৫০০০০০ „
এমেরিকা যুক্তরাজ্য	„	১০০০০০ „

বীজ হইতে দারুচিনির গাছ জন্মান যায় কিম্বা বড় গাছের শিকড় মাটির ভিতর চলিয়া গিয়া চারা উৎপন্ন হয়, যেমন বাঙলাদেশে বেলের চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই চারাগুলি স্থানান্তরিত করিয়াও নূতন তৈয়ারি করিয়া লওয়া যায়। দুই হাজার ফিটেরও উচ্চে দারুচিনির গাছ হইতে পারে কিন্তু সিংহলে সমতল ভূমিতে বেলেমাটির উপর ইহাদিকে সচ্ছন্দে জন্মিতে দেখা যায়। যে ছালগুলি গোলাকার পেন্সিলাকৃতি সেইগুলিই বেশ দরে বিক্রয় হয়। প্রতি বৎসর এক গাছ হইতে ছাল সংগ্রহ হয় না এক বৎসর অন্তর যথোপযুক্ত ছাল সংগ্রহ হয়। যে ছালগুলি ফাটিয়া বক্র হইয়া যায় এবং বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িবার উপক্রম হয়—সেইগুলিই সংগ্রহের উপযুক্ত। এক একর একটা বাগান হইতে প্রতি বৎসর ১০০ হইতে ১২০ পাউণ্ড দারুচিনি সংগ্রহ হইতে পারে। চীনদেশেও দারুচিনির আবাদ আছে। দক্ষিণ ভারতে মালাবার, কানাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে C. Zeylanicum দারুচিনি ও উত্তর ভারতে সতদ্রু হইতে ভুটান পর্য্যন্ত C. Tamala দারুচিনির জঙ্গল আছে। দারচিনি পাতা হইতেও সুগন্ধ তৈল নিষ্কাষিত করা হয়।

তেজপত্র (Cinnamonum tomala and Cinamonum obtusifolium) দারুচিনি ও তেজপত্র এক বর্গীয় গাছ, কেবল বর্ণগত বিভন্নতা আছে। যেমন দারুচিনি বর্ণে ব্রাহ্মণ এবং তেজপত্র বর্ণে শুদ্র। হিমালয়ের মধ্যেদেশে ইহারা জন্মায়। ৩০০০ হাজার হইতে ৭০০০ ফিট্ উচ্চ পর্ব্বতমালায় তেজপাতার বন আছে। তেজপাতা পর্ব্বতবাসে অভ্যস্ত হইলেও নিম্ন সমতল সরস ভূমিতে আসিয়া নিতান্ত অসুবিধা বোধ করে না। বাঙলায় নানাস্থানে ইহা বহুশাখা বিস্তার করিয়া সুন্দর সুঠাম দেহ ধারণ করিয়া আছে। তেজপাতার ফুলের গন্ধও মনোহর। আমাদের কবিকল্পনার তমাল কিন্তু এই তমাল নহে। সে তমালের নাম Diospyros Tamala (Tomentosa).

গাছগুলি বড় সুন্দর। বৃন্দাবনে এই তমালের বন আছে। এই তমাল পাতার সহিত সৌসাদৃশ্যবশতঃ তেজপাতার নাম তমাল হইয়াছে। রন্ধনে ও মিষ্টান্ন, পকান্ন, পলান্নাদিতে ইহার পাতা ব্যবহার করা হয়।

পিঁয়াজ রসুন—আদা যে হিসাবে রন্ধনের, কিম্বা চাটনি, আচারাদি প্রস্তুতের মশালা, পিঁয়াজ, রসুন, লিককেও সেই হিসাবে মশালার মধ্যে ফেলা যায় নতুবা ইহা বস্তুতঃ তরকারি বিশেষ। বেনেরা যদি বা রসুন মশালা বলিয়া দোকানে রাখে কিন্তু পিঁয়াজ কখন রাখে না। খাদ্যরূপে যাহার সতন্ত্র ব্যবহার চলে তাহাকে সবজী বলা যায়। পিঁয়াজ, রসুন, আলু প্রভৃতি তরকারির মত সিদ্ধ পক্ক করিয়া খাওয়া যায় কিন্তু মশালার ঐ প্রকার ব্যবহার বিরল। ধনে হলুদ লঙ্কা দারুচিনি কিম্বা আদা কেহ কখন সিদ্ধ পক্ক করিয়া খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করেনা। কিন্তু পিঁয়াজাদি ব্যঞ্জন ও আচার প্রভৃতি সুঘ্রাণ সুস্বাদু করে বলিয়া ইহাদিগকে মশালা বলিয়াও ধরা যায়।
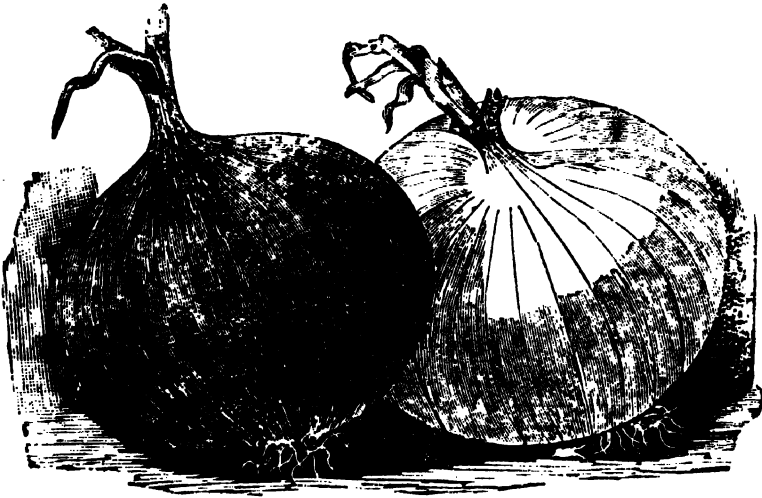
শাদা ও লাল পিয়াজ

উদ্ভিদশাস্ত্রে পিঁয়াজ, রসুন, লিক, আসপারেগাস লিলিয়াসি বর্গের অন্তর্গত সুতরাং ইহাদের চাষ প্রণালী প্রায় একই ধরণের।

মৃত্তিকা—বিশেষ সারযুক্ত হাল্কা দোয়াঁস মাটি। চাষের জমী ছায়াবিহীন স্থানে নির্ব্বাচন করা উচিত এইমাত্র।

রসুন (Garlic) পলাণ্ডু ও রসুনের আবাদ প্রণালী একই প্রকার। ইহার চাষের জন্য মাটি উচ্চ ও হাল্কা হওয়া আবশ্যক। আবাদের সময় আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে বর্ষা শেষ হইয়া গেলে জমীতে রসুন বসাইতে হয়।

গদিনা—গদিনার মূলের ও পাতার গন্ধ রসুনের ন্যায়। মূল হইতে ইহার গাছ জন্মে। মূল তরকারিতে ব্যবহৃত হয়। আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে ইহার মূল জমিতে লাগাইতে হয় কিন্তু শীত প্রদেশে ফাল্গুন হইতে বৈশাখ মাস অবধি মূল পুতিবার সময়। আবাদ প্রণালী পিয়াঁজ বা রসুনের মত। পৌষ মাসে ইহার মূল বা কালি খাইবার উপযুক্ত হইতে পারে।

লীক্—চাষের সময় আশ্বিন, কার্ত্তিক মাস। চাষের প্রণালী পিয়াঁজ রসুনের মত।

তামাকের চাষের উন্নতি বিধান

(শিল্প সমিতি প্রবন্ধ অবলম্বনে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত)

চাষের সকল বিভাগেই পাশ্চাত্য জগতে এত নূতন উন্নত প্রণালী অনুসৃত হইতেছে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, যেহেতু পুরাতন যেমন তেমন উপায়ে চাষ করিলে সেই চাষোৎপন্ন দ্রব্য প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে কখন আমল পাইতে পারে না। আমাদের দেশ কৃষি-প্রধান দেশ; আমাদের দেশের প্রধান কর্ত্তব্য, সঞ্চয় হইলেও আধুনিক জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ-উপযোগী পদার্থ সমস্তই আমাদের দেশে পাওয়া যায় না বলিয়া পরদেশের সহিত আদান প্রদানের সম্বন্ধ প্রমুক্ত রাখিতে আমরা বাধ্য। শিল্পজাত ও সোণা রূপা লোহা প্রভৃতি খনিজ পদার্থ কিছু কিছু আমাদের পরদেশ হইতে লইতেই হইবে, এবং তৎপরিবর্ত্তে অস্মদ্দেশসুলভ কৃষিজাত দ্রব্য পরদেশকে দিতেই হইবে। কিন্তু যদি পরদেশ জাত কৃষিজাত দ্রব্যের সমকক্ষ দ্রব্য আমরা উৎপন্ন করিতে না পারি তবে আমরা কখনই লাভবান হইতে পারিব না। পুরাতন যেমন তেমন চাষে কৃষিদ্রব্য ত ভালো হয়ই না, অধিকন্তু উৎপন্ন পরিমাণের অনুপাতে অন্যদেশ অপেক্ষা খরচ বেশি পড়ে, খারাপ জিনিষ বেশি দাম দিয়া লইবার গরজ কাহারো নাই, অতএব সংশোধন উপায় করিতে না পারিলে প্রতিযোগিতায় পরাজয় অনিবার্য্য। এই জন্য চাল, গম, চা, পাট, তামাক, প্রভৃতি সকল কৃষিবিভাগে চাষপদ্ধতি পরিবর্ত্তন ও উন্নতি অত্যাবশ্যক হইয়াছে। যে শস্যের চাষ করিতে হইবে তাহা কোন দেশে অধিক গৃহিত হয় তাহা জানিয়া সেই দেশের উপযোগী করিয়া উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেই প্রকৃত লাভবান হওয়া যায়। সকল কৃষিদ্রব্য অপেক্ষা তামাকের চাষ অন্যান্য দেশে এমন উন্নত হইয়াছে যে শীঘ্র ভারতে ইহার চাষের উন্নতি না করিলে এই ব্যবসায় একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের

অনুষ্ঠিত প্রণালী আমাদের দেশেও প্রবর্ত্তিত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। তামাকের পাতা এক প্রকারের হইলে আদৃত হয়; কিন্তু নানাপ্রকারের পাতা একত্র করিয়া কোন খরিদার লইতে চাহে না।

এক রকম পাতা উৎপন্ন করিবার উপায়—সগোত্রে বিবাহ অপেক্ষা ভিন্নগোত্রে পাত্র পাত্রীর সংযোগ ঘটিলে সন্তান সন্ততি ভাল হয়। তামাক কিন্তু প্রাকৃতিক ব্যাপক নিয়মের বহির্ভূত, তামাকের আত্মপরাগনিষিক্তপুষ্প হইতে যেমন উত্তম সমগুণময়, সতেজ পাতা প্রচুর জন্মে, পরসঙ্গমোৎপন্ন গাছ হইতে তেমন হয় না। বিশেষ উদ্দেশ্য বা বিশেষ দেশের উপযোগী করিয়া তামাক উৎপন্ন করিতে হইলে দুইটি বিষয়ে মনোযোগ আবশ্যক—(১) সযত্ন পরীক্ষার দ্বারা ক্ষেত্রে, বাঞ্ছিত গুণসম্পন্ন চারাগুলিকে নির্ব্বাচন করা এবং (২) সেই চারাগুলিকে বীজের জন্য রক্ষা করা এবং অপছন্দ অকর্ম্মণ্য নিকৃষ্ট চারার পুষ্পরাগ যাহাতে নির্ব্বাচিত চারাগুলির পুষ্পমধ্যে নিষিক্ত হইয়া সাঙ্কর্য্য উৎপাদন না করিতে পারে এজন্য হাল্কা অথচ দৃঢ় কাগজের ঠুঙ্গি তৈয়ার করিয়া নির্ব্বাচিত চারার ফুলগুলিকে ঢাকিয়া দেওয়া। ইহাতে বহিঃসঙ্গম নিবারিত হইবে। আত্মপরাগ নিষেক দ্বারা তামাকের যে বীজ উৎপন্ন হইবে তাহা সাঙ্কর্য্য-বিরহিত ও বাঞ্ছিত গুণসম্পন্ন হইবে।

আমেরিকার চাষবিভাগের বিবরণীতে এই বিষয়ে অনেক মূল্যবান উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সামান্য অংশের ভাবার্থ মাত্র এখানে লিখিত হইতেছে। কৌতূহলী পাঠক বা ইচ্ছুক চাষী সেই বিবরণী পুস্তিকা পাইতে অভিলাষী হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিলে পাইবেন :—

B. T. Galoway Esq., Chief of the Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture, Washington, U. S. A., for a copy of Bulletin No. 96 on the subject of 'Tobaco Breeding.'

যে ক্ষেত্রে তামাক প্রতিবৎসর উৎপন্ন হয়, সেই ক্ষেত্রের কোন অংশ অনুর্ব্বর হইলে চাষী তাহা সহজেই ধরিতে পারে এবং সার দিয়া বা চাষের পাইট করিয়া জমির সে দোষ সংশোধন করিয়া লওয়া যায়। জমি সর্ব্বত্র সমান উর্ব্বর হইলেও তামাকের চারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে সর্ব্বত্র চারা ঠিক এক প্রকারেরই হয় নাই। তামাক পাতার সংখ্যা, আকার, পাকিবার সময়, ফুলেরগঠন ও আকার প্রভৃতি সকল গাছে সমান দেখা যায় না। সমগুণসম্পন্ন তামাক পাতা উৎপন্ন করিবার পক্ষে এই সকল ব্যাঘাত উপেক্ষনীয় নহে। তামাকপাতা বিভিন্ন প্রকার উৎপন্ন হইলে, একত্র বিক্রয় করিলে দাম হয় না, বাছিয়া বিক্রয় করিতে গেলেও খরচ ও শ্রম পোষায় না। অতএব একই ক্ষেত্রে যাহাতে একইবিধ তামাকপাতা উৎপন্ন হয় তাহারই চেষ্টা করা উচিত।

তামাকপাতার অসমতার প্রধান কারণ, পারস্পরিক সঙ্গম; উদ্ভিজ্জ জগতেও জীব

জগতের মত পুং ও স্ত্রী জাতির সঙ্গম ব্যতিরিক্ত সন্তান উৎপন্ন হয় না। পুং পুষ্পের পরাগ স্ত্রী পুষ্পের গর্ভ কেশরে নিষিক্ত হইলে তবে সন্তানভ্রূণ অর্থাৎ বীজ জন্মে। পারস্পরিক সঙ্গম অর্থে এক গাছের পুং পুষ্প হইতে পরাগ অন্যগাছের স্ত্রী পুষ্পে নিষিক্ত হওয়া বুঝিতে হইবে। পারস্পরিক সঙ্গমোৎপন্ন উদ্ভিদ, সাঙ্কর্য্য প্রাপ্ত হয়, সন্তান পিতা বা মাতা কাহারো মতনই হয় না। এজন্য সঙ্করবীজ ফসলের সমতা পাইবার পক্ষে বিঘ্নকারী। ক্ষেত্রে পতঙ্গ বা বায়ু দ্বারা এক ফুল হইতে অন্য ফুলে পরাগ বাহিত হয়; যে সকল চারা অকর্ম্মণ্য তাহার সহিত ভালো গাছের সঙ্গম হইলে সঙ্কর সন্তান উদ্দেশ্য-উপযোগী ভালো হয় না। দুইটি ভালো গাছের সঙ্গমোৎপন্ন সন্তানও অনেক সময় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ভাল ভাল কয়েকটি চারার ফুল রাখিয়া সকল গাছের ফুল ফুটিবার পূর্ব্বেই কুঁড়ি থাকিতেই ভাঙ্গিয়া দিয়াও নিস্তার পাওয়া যায় না। অন্য চারার হয়ত একটি অসময়ে ফুল ফুটিয়া সকল গাছগুলিকে নষ্ট করিয়া দেয়। এইরূপ পারস্পরিক সঙ্গম দ্বারা বহুবিধ চারা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

তামাকের অসমতার আর একটি কারণ অপরিপক্ক বীজ ব্যবহার। বীজ ভাল করিয়া পাকিবার পূর্ব্বেই ফসল কাটিয়া ফেলা হয়। অপরিপক্ক গুটিগুলি মাড়িয়া বা হাতে রগড়াইয়া বীজদানা বাহির করা হয়। পুষ্ট বীজের সহিত অপুষ্ট বীজ মিশিয়া যায়; সেই মিশ্রিত বীজ উপ্ত হইলে প্রথমে অপুষ্ট বীজ হইতেই সতেজ চারা নির্গত হয়; এবং যে চারা প্রথমে নির্গত হয়, তাহাই উঠাইয়া ক্ষেত্রে পুনর্বপন করা হয়। এই চারার পাতা ছোট, কর্কশ, কোকড়ান ও অকেজো হয়। অপুষ্ট বীজের চারা নানাবিধ রোগাদি দ্বারাও আক্রান্ত হইয়া থাকে।

জমিতে অত্যধিক সার প্রয়োগ করিলেও তামাকপাতার অসমতা ঘটে। সারালো জমির পাতা খুব বড় হয়, কিন্তু রঙ, গন্ধ ও তেজ ভালো হয় না। সার দিয়া প্রচুর ফসল পাইবার ইচ্ছা করিলে বীজ নির্ব্বাচনে বিশেষ সতর্ক না হইলে বাঞ্ছিত ফসল পাওয়া দুষ্কর।

জমি বা আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনেও তামাকপাতার অসমতা ঘটে। গরম দেশ হইতে শীতের দেশে বীজ লইয়া গেলে ফসল সমান হয় না। কয়েক বৎসর ধরিয়া বীজগুলিকে সেই দেশে আবহাওয়ার অভ্যস্ত করিয়া লইলে পর বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায়।

জমিতে যেগুলি উৎকৃষ্ট চারা থাকে সেইগুলি রাখিয়া অপকৃষ্টগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়। উৎকৃষ্ট চারার সন্ততি নিতান্ত অপকৃষ্ট হয় না। ক্রমাগত এইরূপ সযত্ন সংজনন দ্বারা উৎকৃষ্ট ফসল পাওয়া সম্ভব হইতে পারে।

পারস্পরিক সঙ্গম দ্বারা নানা প্রকারের তামাক উৎপন্ন করা যাইতে পারে। দুইটি উৎকৃষ্টজাতীয় চারার সাঙ্কর্য্য সাধন করিয়া দোষশূন্য উৎকৃষ্ট চারাও উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। পারস্পরিক সঙ্গম দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিবার জন্য নিম্নলিখিত উপায়টি

অনুষ্ঠিত হইতে পারে—যে সকল ফুল ১২।১৩ ঘণ্টার মধ্যে ফুটা সম্ভব সেইগুলি রাখিয়া আর সকল ফুলের বৃতি (বাটির মত অংশ যাহার উপর ফুলের পাপড়ি থাকে), প্রস্ফুটিত ফুল, কুঁড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিতে হয়। অবশিষ্ট ফুলগুলি সযত্নে প্রস্ফুটিত করিয়া খাসি করিয়া দিতে হয়, অর্থাৎ চিমটা দিয়া ধরিয়া কাঁচি দিয়া পুষ্পকেশরের শিরোভাগ কাটিয়া পরাগ-কোষ দূর করিয়া দিতে হয়। বৈকাল বেলা খাসি করিতে হয়। খাসি করিয়া কাগজের ঠুসি দ্বারা ফুলগুলিকে ঢাকিয়া দিতে হয়, যেন পতঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা অন্যপুষ্পের রেণু পুষ্প মধ্যে নিষিক্ত না হয়। পরদিন প্রাতঃকালে খাসি করা ফুলগুলিতে পরাগ-নিষেকের সময় হয়; কিন্তু কেশরের ডগায় আঠালো রস সঞ্চিত হইয়াছে কি না দেখিয়া প্রতিপুষ্পে পরাগনিষেক করিতে হয়। পুং চারা হইতে নরুণের ডগায় করিয়া পরাগ লইয়া কেশরোদ্গত আঠালো রসে লাগাইয়া দিতে হয়। তুলি বা তুলা দ্বারা পরাগ দিলে সমস্ত পরাগ নিঃশেক করিয়া দেওয়া যায় না কিছু না কিছু তুলিতে লাগিয়া থাকে; ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন গাছের পরাগ একত্র মিশ্রিত হইয়া অবাঞ্ছিত সাঙ্কর্য্য উৎপন্ন করিতে পারে। নরুণ দ্বারা পরাগনিষেক করিলে প্রত্যেক বারেই নরুণ পরিষ্কার করিয়া লওয়া যায়। পরাগ নিষিক্ত হইলেই ফুলগুলিকে কাগজের ঠুলি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়, এবং যতদিন না বীজ বাঁধে এবং পারস্পরিক সঙ্গম সম্ভাবনা তিরোহিত হয়, ততদিন ফুল ঢাকিয়া রাখিতে হয়।

তামাকের একটা বীজগুটির মধ্যে বহু বীজদানা থাকে। নির্ব্বাচন দ্বারা বীজ সংগ্রহ করিলে যথাভিলষিত ফসল উৎপন্ন করা কঠিন হয় না। সাধারণ আকারের একটা বীজগুটির মধ্যে ৪০০০ হইতে ৮০০০ বীজ দানা থাকে এবং একটা গাছ হইতে ৫ লক্ষ হইতে ১০ লক্ষ বীজ দানা পাওয়া যায়। এই অসংখ্য বীজের মধ্য হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীজ বাছিয়া লইলে সুফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যে চারার পাতা বড় বা সংখ্যায় অধিক হয় তাহাতে বীজ অল্প হয়। কিন্তু তাহা হইলেও উক্ত গাছ যে বীজ উৎপন্ন করে তাহা একটা ফসলের পক্ষে যথেষ্ট। ভাল গাছের বীজ লইয়া পারস্পরিক সঙ্গম রোধ করিয়া চাষ করিলে অত্যুৎকৃষ্ট তামাক পাওয়া যাইতে পারে।

তামাকের ব্যবহার—ভারতবর্ষে প্রায় অনেক স্থানেই তামাক পাতা কুটিয়া তাহাতে গুড় মাখাইয়া পচাইয়া তামাক প্রস্তুত করা হয় এবং এই প্রকারে প্রস্তুত তামাক হুঁকায় সাজিয়া ধুমপান করা হইয়া থাকে। ইহার জন্য যে তামাক নির্ব্বাচিত হয় তাহা স্বাদে গন্ধে ভাল হইলেই হইল এবং তাহাতে তেজ থাকিলেই যথেষ্ট হইল। কিন্তু চুরুটের তামাকের আরও অনেক গুণ থাকা চাই—

(১) তামাক পাতাগুলি বেশ নরম ও নমনীয় হইবে;

(২) তামাকের পাতাতে কোন রকম অতৃপ্তিকর গন্ধ থাকিবে না;

(৩) তামাক পাতা যাহাতে সুঘ্রাণ হয়;

(৪) তামাক পাতা বেশ রহিয়া পুড়িবে ;

(৫) তামাক পাতার রঙ ভাল হইবে।

এই জন্য তামাকের বীজ নির্ব্বাচনের দিকে এত দৃঢ়দৃষ্টি রাখিতে হয় এবং চাষের এত তদ্বির করিতে হয়।

তামাকপাতা ক্ষেত হইতে সংগ্রহ করিয়া ঘরের মধ্যে না শুকাইলে খারাপ হইয়া যায়, তাহার স্বাদ গন্ধ নষ্ট হয়। ঘরের মধ্যে দড়ি বা তার ঝুলাইয়া তামাক পাতা শুকান হয়। আবশ্যকমত অগ্নির উত্তাপ দিয়া তাহাতে রঙ ধরান হইয়া থাকে। অগ্নির উত্তাপ দেওয়া সুকৌশলে সংসাধিত না হইলে তামাক খারাপ হইয়া যায়। তামাকপাতার রঙ করা শেষ হইলে ডাঁটা হইতে তামাক পাতা ভাঙ্গিয়া লইয়া ছোট বড় মাঝারি অনুসারে বাছিয়া থাকে থাকে গাদি দিতে হইবে। গাদিতে তামাক পাতাগুলি জাঁতে জাঁতে বসিলে তবে সেগুলি সিগার বা সিগারেট প্রস্তুতের উপযোগী হইবে। ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে তামাক হইতে যে চুরুট প্রস্তুত হয় তাহাতে কলবল যন্ত্রাদির ব্যবহার খুবই কম। কাঠের একখানি ছোট তক্তা, একখানা কাঁচি, আড়াই তিনসের ভারি একখানি সমতল পাথর যন্ত্রের মধ্যে এই কয়টি তাহাদের প্রয়োজনে আসে। প্রথমে তামাক পাতার মধ্য শির ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়া লওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে যাহা চুরুটের আবরণ হইবে এবং যাহা চুরুটের মধ্যেয় তামাক হইবে ভাল মন্দ বাছিয়া পৃথক করিয়া রাখা হয়। অতঃপর আবরণের নিমিত্ত রক্ষিত পত্রগুলি লইয়া গোলাকারে পাকাইয়া এক একটি বাণ্ডিল প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হয়। ইহাতে পাতার কোঁকড়ান ভাব অনেকটা শোধরাইয়া রাখিয়া থাকে। অবশেষে প্রস্তরখণ্ড দ্বারা বাণ্ডিলগুলি পিটিলে পত্রস্থিত শীরা চাপে চেপ্টাইয়া যায় এবং পাতা চুরুটের আবরণেরপক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হয় এবং আবরণ জড়াইতে কোন কষ্ট থাকে না। চুরুটের মধ্যে ব্যবহারের জন্য তামাক পাতাগুলি হইতে কেবল মাত্র মধ্য শীর ফেলিয়া দিয়া এক একটি পেন্সিলের মত বর্ত্তুলাকারে সাজাইয়া অপেক্ষাকৃত অনাস্থণ পাতাদ্বারা ঢাকিয়া অবশেষে বহিরাবরণের জন্য প্রস্তুত তামাক পত্র দ্বারা আবৃত করিবার জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

ইংলণ্ড ও এমেরিকার অধিকাংশ চুরুটই কলে প্রস্তুত হয়। কিন্তু কলে প্রস্তুত চুরুট অপেক্ষা হাতে প্রস্তুত অনেকাংশে ভাল। কলে প্রস্তুত চুরুটের মধ্যে তামাক চাপাধিক্য হেতু অনেক সময় ঠিক সমভাবে পুড়ে না—কিন্তু হাতে প্রস্তুত চুরুট সাবধানে প্রস্তুত হইলে খুব ভালই হয়।

সাময়িক কৃষি সংবাদ

গুজরাটে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা হইয়াছে, এতকাল গুজরাট হইতে বোম্বাই সহরে গবাদির ঘাস খড় চালান করা হইত। এক্ষণে ঐ খড় গুজরাটের দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে পাঠান হইতেছে। বরোদাষ্টেট বোম্বাই হইতে ৬০ হাজার টাকার খড় ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

গোধুম কনেফারেন্স—সিমলায় গোধূম সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিবর্গ সমিতির কার্য্যে যোগদান এবং দেশে মজুত গোধুমের হিসাব দাখিল করেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই সভায় গোধূমের বাজার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা এখনও জানা যায় নাই। গোধূমের ভাবী ফসল কিরূপ হইবে তাহা না জানিয়া সম্ভবতঃ কর্ত্তৃপক্ষ গোধূমের ক্রয় বিক্রয় ও রপ্তানী প্রভৃতি বিষয়ে অবলম্বিত নীতির পরিবর্ত্তন করিবেন না, অনেকে এরূপ অনুমান করিতেছেন

বৃষ্টি ও শস্য—উত্তর ভারতের শস্যের অবস্থা সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ যে সপ্তাহিক বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম যে, রাজপুতনায় কিঞ্চিৎ বৃষ্টিপাত হইয়াছে, কিন্তু গবাদি গৃহপালিত পশুর আহার্য্য তৃণাদির অবস্থা মন্দ। অনেক স্থানেই তৃণাদি দুর্লভ হইয়াছে। ইন্দোর ও মারওয়াড় এজেন্সীতেও তৃণাদির অভাব লক্ষিত হইতেছে। সংপ্রতি বৃষ্টিপাত হওয়াতে পঞ্চনদের পূর্ব্বাঞ্চলে শস্যের অবস্থা অনেকটা ভাল হইয়াছে। পশ্চিম পঞ্জাবের অবস্থা তাদৃশ আশাপ্রদ নহে। বোম্বাই প্রদেশের আমেদাবাদ ও কাঠিয়াওয়াড় অঞ্চলে এখনও বৃষ্টিপাত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন ভারতের অন্যান্য স্থান সমূহে শস্যের অবস্থা মোটের উপর মন্দ নহে। তবে যুক্ত-প্রদেশে বন্যা হওয়াতে স্থানে স্থানে শস্যহানি ঘটিয়াছে।

লক্ষ্ণৌয়ে বন্যা—লক্ষ্ণৌয়ের ভীষণ বন্যা হওয়ার "খারিফ" ফসল নষ্ট হইলেও এ বৎসর রবিশস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিবে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। খেরী জেলায় বন্যার সবিশেষ ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু লক্ষ্ণৌ জেলায় তিনটী তহশীলেই যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ তহশীলে গোমতী, মহিলাবাদে বেতা ও গোমতী নদীতে প্রবল বন্যা হইয়াছিল গোমতীর তীরবর্ত্তী ২০ খানি গ্রাম একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল এবং ৪০ খানি গ্রামে জল প্রবেশ করিয়াছিল। বেতার তীরবর্ত্তী গ্রামে ১৮৯৪ সালের বন্যা অপেক্ষা এবার বন্যার জল খুবই বাড়িয়াছিল। মহিনাচাদ ৩০০খানি গ্রামের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে, তন্মধ্যে একখানি গ্রাম একেবারে জলমগ্ন হইয়াছিল। সেখানে শতকরা ৮০ খানি কাঁচা ঘর

পড়িয়া গিয়াছে; মোহনলাল গংয়ে বন্যার প্রাবল্য অল্প হইলেও শতকরা ৪০ খানি ঘর ভূমিসাৎ হইয়াছে। জমিদারগণ বিপন্ন জনগণকে সাহায্য করিতেছেন, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড সমূহের কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়াছেন যে রাস্তার অদূরবর্ত্তী বৃক্ষ সমূহের শাখা প্রশাখা সকলে কাটিয়া লইতে পারিবে। উনাও নামক স্থানে ১৮ জন মারা গিয়াছে। ১৬৫০০ ঘর নষ্ট হইয়াছে এবং গবাদি গৃহপালিত পশুও অনেক মরিয়াছে। কানপুরে প্রত্যহ ৫০০ হইতে ১০০০ কুলি গৃহাদি নির্ম্মাণের কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে।

বর্দ্ধমান কালী পাহাড়ী—লোকের ধারণা বর্ষায় বৃষ্টির অভাব হওয়ার ধান্য ফসল আদৌ জন্মায় নাই বটে, কিন্তু সেই বর্ষার জল মজুত আছে, আশ্বিন কার্ত্তিকে দেবতা তাহা ঢালিয়া দিবেন। ঠিক তাহাই ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। ১লা আশ্বিন হইতে উপর্য্যুপরি বর্ষার ন্যায় কয়েক দিন প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তাহার পর আবার ২ দিন "ধরণ" হইয়াছিল। অদ্য আকাশ আবার মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে। শীঘ্রই বৃষ্টি হইতে পারে। এখন পুকুর, ডোবা ভরিয়া যাইবার আশা হইয়াছে। অন্নকষ্টের উপর জলকষ্ট হইবার তাদৃশ ভয় নাই। মধ্যমরাশি চাউলের দর এক্ষণে প্রতি মণ ৬৸০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। মোটা চাউলের মণ ৬৲ টাকার কমে পাওয়া যায় না। আসানসোল মহকুমায় বিস্তর কয়লা কুঠি এবং বিবিধ প্রকার কারখানা আছে বলিয়া লোকে এখনও উচ্চদরে চাউল কিনিয়া খাইতে সমর্থ হইতেছে সত্য, কিন্তু শ্রমশিল্প ও ব্যবসায়ের যথেষ্ট অবনতি হওয়ার সকল কারবারেই লোক কমান হইতেছে। সুতরাং অল্পে অল্পে লোকের অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে। যাহারা কৃষি কার্য্যের উপর নির্ভর করে, আজকাল তাহাদের সংসার চলা দুরূহ হইয়াছে।

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ—দেশের অধিকাংশ লোকই আহারের কষ্ট পাইতেছে। বৃষ্টির অবস্থা এরূপ যে, এখন পর্য্যন্ত পুকুর প্রভৃতি শুষ্কপ্রায়; বোধ হয় আর কিছুদিন জল না হইলে জলকষ্ট পর্য্যন্ত আরম্ভ হইবে। একে ত জলের অভাবে অধিকংশ জমীই পতিত আছে, তাহায় উপর যে দুই এক কিতা জমী বহু কষ্টে লোকে আবাদ করিয়াছিল, তাহাও জলাভাবে শুকাইয়া গিয়াছে। এ বৎসর আদৌ ধান্য জন্মিবে না।

ইহার উপর গত বৎসর ধান্য ভাল না হওয়ার এখন হইতে সকলকেই ধান্য বাড়ি লইতে হইয়াছে। কিন্তু আর বাড়িও পাওয়া যাইতেছে না। পূর্ব্বে যাহারা অন্য লোককে ধান্য বাড়ি ও টাকা দাদন দিয়াছে এখন তাহাদেরই ধান্য বাড়ি জুটিতেছে না, এই ত মধ্যবিত্ত লোকের কথা। গরিব লোকদের অবস্থার কথা বর্ণনাতীত। তাহাদের প্রত্যহ আহার জুটিতেছে না। এক একদিন তাহাদিগকেই উপবাসেই কাটাইতে হয়।

এখানে চালের দর ছয় সের হইতে ৬।০ সাড়ে ছয় সের পর্য্যন্ত, তাহাও প্রায় পাওয়া যায় না।

বঙ্গে আমনধানের অবস্থা—কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ ব্ল্যাকউড গত গত বুধবারে কলিকাতা গেজেটে এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন যে গত বৎসর ৪,৫২,৫২,০০০ বিঘা জমিতে আমনধান হইয়াছিল, বর্ত্তমান বর্ষে ৪,৪৯,২২,০০০ বিঘা জমিতে আমনধান বপন করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি বিঘা জমিতে আমনের চাষ কম হইয়াছে। বৃষ্টির অভাবে বর্দ্ধমান বিভাগের অনেক জমিতে ধান বপন করা হয় নাই।

বন্যাতে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থান জলে ডুবিয়া আছে, সুতরাং সেখানকার অনেক জমিতে রোপণ অসম্ভব হইয়াছে। বাঁকুড়ার অবস্থা অতি শোচনীয়। গত বৎসর ১৪, ৪৪, ৫০০ বিঘা জমিতে আমন রোপণ করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে কেবলমাত্র ৫, ১৬, ০০ বিঘাতে ধান রোপণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ অর্দ্ধেকের বেশী জমি পতিত রহিয়াছে

ত্রিপুরা জেলায় গত বৎসর ২৪,৩০,০০০ বিঘা জমিতে ধান বপন করা হইয়াছিল, বর্ত্তমানবর্ষে ২১৪২,৯০০ বিঘাতে ধান রোয়া হইয়াছে। কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মণবাড়ীতে শতকরা ৯০ ভাগ শস্য বন্যায় নষ্ট হইয়াছে।

বঙ্গে পাটের আবাদ ১৯১৫—শেষ বিবরণী (বিগত ৫বৎসরের হিসাব ধরিয়া দেখা যায় যে সমগ্র ভারতে উৎপন্ন পাটের শতকরা ৮৭·১ ভাগ পাট বাঙলা দেশে উৎপন্ন হয়)

বাঙলা দেশে বর্ত্তমান বর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে নিম্নলিখিত তালিকাস্বরূপ পাটের আবাদ হইয়াছে বলিয়া স্থির হইয়াছে—

প্রদেশ—	একর—		কম—
	১৯১৪	১৯১৫	
বঙ্গদেশ—			
পশ্চিমবঙ্গ—	৪৬৭,১৯৯	৩২৫,৮৫৮	১৪১,৩৪১
উত্তর „	৮৫৫,৫১১	৬০১,৬১৪	২৫৩,৮৯৭
পূর্ব্ব „	১,৫৪৯,৮৯৪	১,১৫৮,৭৯৮	৩৯১,০৯৬
কুচবিহার—	৪৪,৪১৩	২৭,৫৫৬	১৬,৮৫৭
বিহার ও উড়িষ্যা—	৩৩০,১২০	১৮৮,০৯০	১৪২,০৩০
আসাম —	১১১,৬০০	৭৫,৪০০	৩৬,২০০
মোট	৩,৩৫৮,৭৩৭	২,৩৭৭,৩১৬	৯৮১,৪২১

বিগতবর্ষে য়ুরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভকালে পাটের দর অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় বর্ত্তমান বৎসরে পাটের আবাদ এত কমিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে পাট বোনার পর হইতে নিচু জমির পাট অনেক স্থলে বন্যায় নষ্ট হইয়াছে।

ফলন—

প্রদেশ—	বেল—		কম—
	১৯১৪	১৯১৫	
বঙ্গদেশ—			
পশ্চিমবঙ্গ—	১,৩৩৭,৩৯৮	১,০৫১,১৯৯	২৮৬,২৯৯
উত্তর "	২,৭৩৪,৪৩৩	১,৯৭৫,৫৩৯	৭৫৪,৮৯৪
পূর্ব্ব "	৫,২৩৫,৮৮৭	৩,৪৭৯,১২৮	১,৭৫৬,৭৫৯
কুচবিহার—	১৩৫,২৩৭	৭২,৩৩৫	৬২,৯০২
বিহার ও উড়িষ্যা—	৭৮০,৭৮৭	৬৯২,৮৭৩	৮৭,৯১৪
আসাম—	৩০৭,৪৬৩	১৫৭,৪৫৯	১৫০,০০৪
মোট	১০,৫৩১,৫০৫	৭,৪২৮,৭৩৩	৩,১০২,৭৭২

দেশী পাট এ বৎসর ভাল জন্মিয়াছে, উত্তরবঙ্গে মধ্যম রকম কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের জলপ্লাবনহেতু পূর্ব্ববঙ্গে পাটের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

আশ্বিন, ১৩২২ সাল।

আসামের রেশম-শিল্প

সম্প্রতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ভূপাল চন্দ্র বসু প্রণীত আসাম দেশে রেশম-শিল্প সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা আসাম গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে এড়ী, মুগা ও পাট রেশম চাষের বর্ত্তমান-প্রচলিত পদ্ধতি, রেশম সূত্র ও বস্ত্র বয়ন, আসামের বিভিন্ন স্থানে রেশম ব্যবসায় ও ভবিষ্যতে তাহার উন্নতির উপায় প্রভৃতি বিষয় বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। পুস্তিকাটি যে সময়োপযুক্ত হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই এবং পুস্তিকায় বিবৃত তথ্য সমূহ সংগ্রহে গ্রন্থকর্ত্তাকে যে যথেষ্ঠ শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহাও পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারেন। আমরা এস্থলে পুস্তিকার মুখ্য বিষয় গুলি সমালোচনা করিলাম।

কত কাল হইতে যে আসামে রেশম শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা ঠিক নির্দ্ধারণ করা যায় না। পাট অর্থাৎ তুঁত পোকা প্রসূত রেশম যে আসামে অন্য দেশ হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে খৃষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এই জাতীয় রেশম প্রথমে আইসে। এখনও পর্য্যন্ত ইহার চাষ যুগী অথবা কাটনি জাতির মধ্যে আবদ্ধ; অপর কোন হিন্দু জাতি সামাজিক লাঘবতার ভয়ে ইহার চাষ করে না। কিন্তু এড়ী ও মুগা সম্বন্ধে এরূপ কোন অনুমান করা যায় না। এড়ী ও মুগা কীটের অতি ঘনিষ্ট সম্পর্কীয় কীট আসামের অরণ্য অঞ্চলে পাওয়া যায়। ইহারাই সম্ভবতঃ বর্ত্তমান গৃহপালিত কীটের পূর্ব্ব পুরুষ। এড়ির চাষ ভারতের অন্যত্র দুই একটি স্থানে দৃষ্ট হইলেও এড়ি ও মুগা, উভয়কেই খাঁটি আসামী রেশম বলিতে পারা যায়। মুগার চাষ আর কোথাও হয় না। বিদেশে এই দুই জাতীয় রেশম আসামী রেশম নামে প্রসিদ্ধ অতি পুরাকাল হইতে যে আসামীগণ এই দুই জাতীয় রেশম

উৎপাদন করিয়া আসিতেছে তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। রেশমী বস্ত্রের প্রচলন আজকাল অনেক কমিয়া গেলেও, রেশম উৎপাদন ও বস্ত্র বয়ন এক স্থরমা উপত্যকা ব্যতীত আসামের প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

ব্যবসায়ের আধিক্যে এবং চাষের ব্যাপ্তিতে এড়িকেই আসামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রেশম বলিতে পারা যায়। আসাম অঞ্চল ছাড়াইয়াও উত্তর বঙ্গে বগুড়া, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় এড়ির চাষ বিস্তৃত হইয়াছে। আসামে এড়ির চাষের প্রধান কেন্দ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দক্ষিন ও উত্তর সীমাংশ। উত্তরে কাছাড়ী ও মেচগণের মধ্যে ও দক্ষিণ সীমায় কাছাড়ী, ত্রিপুরা, রভা, সিংটেং ও গারো জাতীসমূহের মধ্যে এড়ী উৎপাদন বহু প্রচলিত। স্থানে স্থানে এড়ীর চাষই প্রজাগণের রাজস্ব প্রদানের প্রধান উপায়।

তুঁত ও মুগা গুটির সহিত এড়ী গুটির পার্থক্য এই যে ইহা চতুঃপার্শে বন্ধ নহে। একদিকে গুটীর কিয়দংশ উন্মুক্ত থাকে। এ পথ দিয়াই পতঙ্গ বহির্গত হইয়া যায়। সেই জন্য তুলার ন্যায় এড়ীর সূত্র নিষ্কাষণ ও বয়ন করিতে পারা যায়। এড়ীর গুটি দুই প্রকার ১ম ঈষৎ পীতাভ শ্বেতবর্ণ ও ২য় ফিকে রক্তবর্ণ (সুরকির রং)। একই কীড়া দুইপ্রকার গুটিতে পরিণত হয় এবং বর্ণের পার্থক্যের মূল কারণ কি তাহা এখনও স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। পুষার কীট তত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন যে বহুকাল পূর্ব্বে বন্য ও গৃহ পালিত এড়ীর সংমিশ্রন হইয়াছিল এবং উক্ত সঙ্কর জাতীয় কীট হইতেই দ্বিবিধ বর্ণের গুটি প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৎসরে এড়ীর ক্রমান্বয়ে সাতটি বংশ উৎপাদিত হইতে পারে কিন্তু কার্য্যতঃ দুইটি বংশ অর্থাৎ আশ্বিন-কার্ত্তিক ও ফাল্গুন-চৈত্রের কীট লইয়াই চাষ হয়। এড়ী কীটের প্রধান খাদ্য রেড়ীর পাতা—তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না পাওয়া গেলে কেসেরু গাছের পাতা। এতদ্ভিন্ন সিমুল আলু, গোলঞ্চ চাঁপা, গাস্তার, প্রভৃতি গাছের পাতাও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এগুলি প্রশস্ত খাদ্য নহে এবং ইহাদের ব্যবহারে অনেক সময় কুফল ফলিয়া থাকে।

সমস্ত আসাম অঞ্চলে কত পরিমাণ এড়ী রেশম উৎপাদিত হয়, তাহা সঠিক নিদ্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। তবে যে সকল জাতি এড়ীর চাষে করে, তৎসমুদয়ের সংখ্যা, ঘর প্রতি উৎপাদনের হার হিসাবে ধরিলে উৎপন্ন গুটির পরিমান বৎসরে প্রায় ৫৩২৫ মণ হইবে। গড় পড়তা ১০০৲ টাকা হিসাবে মণ ধরিলে ইহার মূল্য ৫,৩২,৫০০৲ টাকা হয়। ইহার মধ্যে প্রায় ১,০৮,০০০৲ টাকার গুটি (১০৮০ মণ) বিদেশে রপ্তানি হয়। অবশিষ্ট ৪,২৪৫ মণ গুটি দেশে থাকে এবং ইহা হইতে প্রস্তুত সূত্রের পরিমাণ ৩,১৮০ মণ হইবে। এতদ্ভিন্ন উত্তর বঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও বৎসরে প্রায় ১৫০ মণ এড়ী সূত্র আসামে আমদানি হয়। সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ এড়ী সূত্রের পরিমাণ ৩৩৩০ মণ হইবে। ১৯১২–১৩ সালে আসাম হইতে ৩০৯৬ মণ এড়ীসূত্র (মূল্য ২,০৯,০০০৲ টাকা) ভুটানে যায়। বাকি যে ২,২৩৪ মণ সূত্র দেশে থাকে তাহার

মূল্য ২৪০৲ টাকা মণ হিসাবে ৫,৩৬,০০০৲ টাকা হইবে এবং উহা হইতে উৎপাদিত বস্ত্রের মূল্য ১০,৭২,০০০৲ টাকা হইবে। বস্তুতঃ সমস্ত হিসাব করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে আসামে উৎপন্ন এড়ীজাত পণ্যের মূল্য মোট ১২,৮১,০০০৲ টাকা।

ইহা এস্থলে বলা আবশ্যক যে অপেক্ষাকৃত অতি অল্প পরিমাণ গুটিই বাহিরে চালান যায়। অধিকাংশ গুটিই আসামের সীমার মধ্যে বস্ত্রবয়নে ব্যবহার হয়। গুটি রপ্তানির পূর্ব্বদিকের প্রধান কেন্দ্র—যমুনা-মুখ ও ছপর মুখ ও পশ্চিমে পলাসবাড়ী। মাড়োয়ারী মহাজনেরাই অধিকাংশ গুটি ক্রয় করে এবং গৌহাটি কিম্বা পলাসবাড়ী পথে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে চালান দেয় এবং কিয়দংশ পলাসবাড়ীর সন্নিকটস্থ গ্রাম সমূহে বিক্রয় করে। এ স্থলে কতিপয় পল্লীতে এড়ীর বস্ত্র প্রস্তুত একটি প্রধান ব্যবসায়। অন্যত্র রপ্তানির মধ্যে নবগ্রাম ও উত্তর কাছাড় পার্ব্বত্য দেশ হইতে মণিপুরে সূত্র রপ্তানি উল্লেখ যোগ্য। উত্তর কামরূপ ও মঙ্গলদাই হইতে এবং দারঙ্গ ও উদলগুড়ির মেলায় ভুটিয়াগণ অনেক পরিমাণ সূত্র ক্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু শেষোক্ত দুইটি স্থানে যে সূত্র বিক্রয় হয় তাহার অধিকাংশই বগুড়া জেলা জাত।

বহুল পরিমাণে এড়ি রেশম উৎপাদন করিয়া আধুনিক কলকব্জার সাহায্যে একটি বড় ব্যবসায় স্থাপন করিতে পারা যায় কি না তৎসম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে নানাবিধ কারণে কোনটিই কৃতকার্য্য হয় নাই। ইহাতে বোধ হয় যে এড়ী যেরূপ অনাদি কাল হইতে কুটির শিল্প রূপে চলিয়া আসিতেছে সেই রূপেই চলিবে। লোকসানের অনুপাতে ইহাতে সেরূপ লাভের আশা নাই। গ্রামবাসী ক্ষুদ্র ধনীগণ অপর কার্য্যের সহিত ইহার চাষে লাভবান হইতে পারেন, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে ইহার চাষে ক্ষতির আশঙ্কা অনেক।

এড়ি অপেক্ষা আসামে মুগা রেশম চাষের পরিসর অনেক কম। বস্তুতঃ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ভিন্ন আর কুত্রাপি ইহার চাষ দেখিতে পাওয়া যায় না। মুগা ও তসর এক গোত্রজ হইলেও তসর অপেক্ষা মুগার সূত্র উজ্জ্বলতর। এতদ্ভিন্ন ইহার সূত্র স্বভাবতঃ যেরূপ সুবর্ণ পীতাভ সেরূপ আর কোন রেশমই নহে। সেই জন্যই নক্সার কাজে কিম্বা বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র বয়নে ইহার আদর এত অধিক।

ছোট ও বড় হিসাবে দুই জাতীয় মুগা কীট আছে। কিন্তু ছোট জাতি অধিকতর কষ্টসহিষ্ণু বলিয়া ইহার চাষের প্রচলনই অধিক। সুম ও হাওনলা এই দুই জাতীয় গাছের পাতাই মুগা কীটের পক্ষে প্রশস্ত। বস্তুতঃ সুমের সহিত মুগা কীটের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে সুম গাছ উৎপাদনের জমির পরিমাণ হইতে মুগা চাষের পরিমাণ অনুমিত হইয়াছে। বিগত দশ বৎসরের হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে আসামের ছয়টি জেলায় গড় পড়তায় মোট ২২০০০ একর পরিমিত জমিতে সুম উৎপাদিত হয়। ইহার সমস্তই অবশ্য মুগা রেশম চাষে নিযুক্ত হয় না। যাহা হউক, এই পরিমাণ জমির এক-তৃতীয়াংশ বাদ

দিয়া, বৎসরে একবার মাত্র কীট উৎপাদন ধরিয়া এবং বিঘা প্রতি ১০ পাউন (১০,০০০) গুটি হিসাব করিয়া মোট উৎপাদিত মুগাসূত্রের পরিমাণ বাৎসরিক ১,৪০০ মণ বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার মধ্যে ৫৯২ মণ বিদেশে চালান যায় (১৯১১-১২)। মণকরা ৪০০৲ টাকা হিসাবে ইহার মূল্য ২,৩৭,০০০ টাকা হইবে। অবশিষ্ট যে পরিমাণ সূত্র অর্থাৎ ৮০৮ মণ, দেশে থাকে তাহার দাম মণকরা ৬০০৲ হিঃ ধরিলে ৪,৮৫,০০০৲ টাকা হয় এবং উহা হইতে প্রস্তুত বস্ত্রের মূল্য ৯,৭০,০০০৲ টাকা হয়। দেশস্থিত সূত্রের অধিক মূল্য ধরিবার কারণ এই যে উৎপাদনের খরচ হ্রাসের জন্য মুগার মূল্য অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে টাকায় ৫০০ হইতে ৬০০ গুটি পাওয়া যাইত। ১৯১৩ সালের শেষে টাকায় ৩০০—৪০০ গুটিও সর্ব্বস্থলে পাওয়া যায় নাই। মুগার ছাঁট হইতেও যে সমুদয় বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহার মূল্য অন্যন ১,৯৬,০০০ টাকা হইবে। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে মোট মুগাজাত দ্রব্যাদির মূল্য ১৪,০৩,০০০৲ টাকা। এড়ি হইতে মুগাজাত দ্রব্যাদির মূল্য অধিক। ইহাতে কেহ কেহ বিস্মিত হইতে পারেন, কিন্তু স্মরণ রাখা আবশ্যক যে ওজনের তুলনায় এড়ী অপেক্ষা মুগার দাম তিনগুণ অধিক। এতদ্ভিন্ন এড়ীর চাষ বহু স্থান ব্যাপ্ত হইলেও একস্থানে আবাদের হিসাবে মুগার আবাদ অধিকতর বিস্তৃত ও আসামবাসীগণের পরিধেয়ের মধ্যে মুগার প্রচলন অধিক। পক্ষান্তরে কতক পরিমাণ এড়ি, গুটি ও সূত্র অবস্থায় বিদেশে চলিয়া যায়। তজ্জন্য দেশীয় লোকগণ তাহা হইতে পূরা অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে না।

মুগাগুটি বিদেশে চালান যায় না কিন্তু দেশে ব্যবহারের জন্য স্থানে স্থানে মুগাগুটি বিক্রয় হয়। কামরূপের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে এবং গোয়ালপাড়ার পূর্ব্বাংশে কাছাড়ী, রাভা ও গারোজাতিগণ নিজেরা সূত্র প্রভৃত না করিয়া গুটি হাটে বিক্রয় করে। এইরূপ হাটের মধ্যে ছাইগাঁ ও পলাশবাড়ীই প্রধান। গৌহাটি, পলাশবাড়ী, শিবসাগর, নাজিরা ও দিব্রুগড়—এই কয়েকটি স্থানই মুগাসূত্র ও বস্ত্র রপ্তানির প্রধান কেন্দ্র। এই সকল স্থান হইতে কলিকাতা ও ঢাকায় অনেক পরিমাণ রেশম যায়। হায়দ্রাবাদ ও মান্দ্রাজে অল্প-বিস্তর পরিমাণে চালান হইয়া থাকে। যে সমুদয় মুগাসূত্র বিদেশে রপ্তানি হয় তাহার প্রায় অধিকাংশই অপকৃষ্ট জাতীয়। কারণ যে উদ্দেশে উহা ব্যবহার হয়—যথা কাসিদা কাপড়, ধৃতি ও সাড়ীর পাড়, নক্সার কাজ ও মাছ ধরার সূতা প্রস্তুত—সে সমুদয়ের জন্য উৎকৃষ্ট মুগাসূত্র আবশ্যক হয় না। এড়ীর ন্যায় মুগাসূত্রের ক্রয় ও চালানের কাজ মাড়োয়ারী মহাজনগণের হাতে এবং কোন কোন স্থানে, বিশেষতঃ দিব্রুগড়ের জামিরা ও ধেমাজি মৌজায়, ইহার মহাজনগণ দাদনও দিয়া থাকেন।

পাট অথবা তুঁত কীটের চাষ আসামে কম। এতদ্দেশের ন্যায় আসামেও প্রধানতঃ দুই জাতীয় তুঁতকীট পালিত হয়—বড় পোলু ও ছোট (হরু) পোলু। শেষোক্তটি আমাদের দেশের ঠিক ছোটপলু কি না সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। শিবসাগর, দারং, নগাঁও ও কামরূপ এই কয় জেলাতেই তুঁত রেশমের চাষ হয় এবং এই সমস্ত জেলায় যে সকল

পরিবার তুঁতকীট পালন করে তাহাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৬৯, ৪৮৫, ২৭৫২ এবং ২০। কীট পালনের জন্য পালাজাতীয় তুঁতের চাষ হয়। তুঁতের আসাম প্রচলিত নাম "নুনী" ও "মেস্‌কুড়ী"। যাহারা নিজে তুঁতের চাষ করিতে পারে না তাহাদিগকে মোট অথবা গাছ প্রতি দুই আনা হইতে আট আনা মূল্য দিয়া পাতা ক্রয় করিতে হয়। অনেক স্থলেই লোকেরা উত্তমরূপ তুঁতের চাষ করিতে জানে না এবং তুঁত রেশম উৎপাদন অতি নীচ কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় রেশম উৎপাদকগণ কোনরূপ উৎসাহ পায় না। আপাততঃ আসামে যে তুঁত রেশম উৎপাদিত হয় তাহার পরিমাণ ১৫০ মণের অধিক হইবে না। কিন্তু চীন হইতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় রেশম আমদানি হইতেছে। ইহার পরিমাণও বাৎসরিক প্রায় ১০০ মণ। তুঁত রেশম আসাম হইতে আদৌ রপ্তানি হয় না। সুতরাং এই ২৫০ মণ রেশমজাত দ্রব্য দেশে ব্যবহৃত হয়। ইহার মূল্য প্রায় ৩,১২,০০০৲ টাকা।

এ পর্য্যন্ত স্থানীয় ব্যক্তিগণ কিম্বা গবর্ণমেণ্ট আসামে তুঁত রেশম চাষের বিস্তৃতি এবং উন্নতি কল্পে কোন চেষ্টাই করেন নাই। পূর্ব্বে এই জাতীয় রেশম চাষের যে অবস্থা ছিল বর্ত্তমান সময়ে তাহা হইতে বরঃ অবনতি হইয়াছে। ইহার উন্নতির পথে অনেক প্রতিবন্ধক আছে বটে এবং বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রতিবন্ধক আসামীগণের শিক্ষার অভাব। কিন্তু ক্রমশঃ সময়ের পরিবর্ত্তনে এবং আধুনিক সভ্যতার সংঘর্ষে দেশের অবস্থা উন্নত হইতেছে। এই অবসরে তুঁত রেশম চাষের ন্যায় একটি লাভবান ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তন হওয়াই উচিত। আসামের জল বায়ু এই চাষের অনুকুল, অভাব কেবল সমবেত চেষ্টার।

আমরা ইতি পূর্ব্বে এড়ী মূগা ও তুঁত রেশম ও রেশমজাত দ্রব্যাদির মূল্য সম্বন্ধে যে সমুদয় অঙ্কাদি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে আসামে মোট রেশমজাত পণ্যের মূল্য ৩১,০৪,০০০ টাকা। ইহার মধ্যে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা গুটি ও রেশম বিক্রয় দ্বারা দেশে আইসে এবং বাকি সাড়ে পঁচিশ লক্ষ টাকার রেশমজাত বস্ত্রাদি দেশে ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য যে রেশম চাষ না থাকিলে এই পরিমিত অর্থ মূল্যের বস্ত্রাদি বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে হইত। অন্য দিকে দেখিতে গেলেও আসামে রেশমজাত দ্রব্যের মূল্য কিছু সামান্য নহে। কারণ আসামে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয় রেশমজাত পণ্যের মূল্য অনুপাতে তাহার দুই তৃতীয়াংশের কম হইবে না।

ভূপালবাবুর পুস্তিকার শেষাংশে রেশম চাষের উন্নতি কল্পে কতিপয় বিশেষ বিশেষ প্রথার অনুষ্ঠান অনুমোদিত হইয়াছে। উহাদের উদ্দেশ্য কীট পালন, রোগ নিবারণ, খাদ্য বৃক্ষ উৎপাদন সূত্র প্রস্তুত করণ রঞ্জন ও রপ্তানি প্রভৃতি বিষয়ে আসাম প্রচলিত বর্ত্তমান পদ্ধতি সমূহের সংস্কার। বলা বাহুল্য এই অনুমোদিত প্রথাসমূহ কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ বিবেচনা যোগ্য। কিন্তু পুস্তিকার কোন কোন স্থান পাঠ করিয়া আমাদের মনে হয় যে কর্ত্তৃপক্ষগণ আসামে রেশম চাষের উন্নতির জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত নহেন। ভবি-

ষ্যতে রেশম চাষ সম্বন্ধীয় তথ্যাদি গবেষণা ও প্রসারের জন্য পরীক্ষা ও প্রদর্শনী ক্ষেত্রাদি প্রতিষ্ঠার কথাবার্ত্তা চলিতেছে বটে, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহাদের দ্বারা যে কতদূর উপকার হয় তাহা এখনও বলা যায়। কারণ কৃষি ও শ্রমশিল্পাদি সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তৃওক্ষগণের কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণা আছে এবং উহাদের উন্নতি, বিস্তৃতি ও অবনতির প্রতিকার সাধনের কতকগুলি পেটেণ্ট প্রথাও আছে! তাঁহারা সেই সমস্ত চিরন্তন পথ ত্যাগ করিয়া দেশ কাল ও পাত্র ভেদে যে অভিনব এবং কার্য্যকরী প্রথা অবলম্বন করিবেন এবং স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অভাব অভিযোগ বুঝিয়া কার্য্য করিবেন তাহা বোধ হয় না। আমরা আপাততঃ সেই জন্য অধিক কিছু আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া আসামগবর্ণমেণ্ট ভূপালবাবুর বহুশ্রম সিদ্ধ ও সুযুক্তিপূর্ণ বিবরণীর ফলে রেশম চাষের উন্নতি কল্পে কোন পন্থা অবলম্বন করেন তাহা দেখিবার জন্য ব্যগ্র থাকিলাম।

পত্রাদি

নূতন কলম বসান দোষের কি ?—

"উদ্যান পালক" বালিগঞ্জ।

কয় বৎসরের পুরাণ গাছ হইলে ভাল হয়।

উত্তর—গাছ হইতে সদ্য কলম কাটিয়া বসাইলে কি ক্ষতি আছে এইরূপ প্রশ্ন আমাদিগকে শুনিতে হয়। নূতন কলমের তাত বাত সহিষ্ণুতা কম। সেই জন্য তাহাদিগকে একাধিক বৎসর হাপরে রাখিয়া তাত বাত সহ্য করিবার মত টিকসহি করিয়া লইতে হয়, নতুবা ঐ কলমগুলি একবারে বাগানের নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইলে অনেক চারা মরিয়া যাইবে।—কিন্তু হাপরে কিছুকাল রাখিলে পাতা ঝরিয়া গিয়া নূতন পাতা বাহির হয় এবং যেটি মরিবার, যেটি টেঁকিয়া যাইবার হাপর হইতে বাছাই করিয়া লওয়া যায়। হাপর হইতে হাপরান্তরে নাড়িবার সময় চারার মূলশিকড় অল্পবিস্তর ছাঁটা পড়ে ইহাতে এই উপকার হয় যে, চারার ভূমধ্যস্থ মূলদেশ হইতে আশে, পাশে অনেক শিকড় বাহির হইয়া গাছটিকে বেশ ঝাড়াল করিয়া তুলে। হাপরে চারা ২ বৎসরের অধিক কাল রাখিতে নাই, গাছের বৃদ্ধির সময় বাধা পাইলে গাছ খারাপ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। গুপারি নারিকেলের ১ বৎসরের চারা রোপণ করিলে একটা চারাও মরে না। আমের

ও কাঁটালের বীজের চারা নাড়িয়া রোপণ করিতে নাই, একবারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আঁটি (বীজ) বসাইয়া গাছ তৈয়ারি করিতে হয়। নাড়িয়া বসাইলে আম ছোট হয় এবং কাঁঠাল ভো (শস্ত শূন্য) হয়। একটা প্রবাদবাক্যও এই সম্বন্ধে আছে—আম টুঁটুরে কাঁঠাল ভো, গো, নারিকেল নেড়ে রো। আমরা এই প্রবাদবাক্যের সত্যতায় কিছু মাত্র আস্থা স্থাপন করি না। নাড়িয়া বসাইলেও ইহাদের ফসলের ব্যতিক্রম হয় না।

ব্যাঙ (frogs) তাড়াইবার উপায় কি ?—

জনৈক সাহেব, মজফরপুর।

ব্যাঙের ডাকে জ্বালাতন হইতে হয় এবং নিদ্রা যাওয়া কঠিন। ব্যাঙ দেখিয়া তাহার অনুসরণ-কারী সাপ ঘরে প্রবেশ করে।

উত্তর—কার্ব্বলিক এসিড জলের সহিত মিলাইয়া ছিটাইলে তাহার সন্নিকটে ব্যাঙ কিম্বা সাপ বিছা আদি জীবজন্তু ঘেঁসে না। টাটকা গোময়ের গন্ধেও ঐ রকম কাজ হয়। হিন্দুরা ঐ কারণে বাটির চারিদিকে গোময় জল নিত্য ছিটায়। য়ুরোপীয়গণ ইহা কিন্তু কদর্য্য প্রথা মনে করেন। গোময় বস্তুটাই তাঁহাদের নিকট মনুষ্য-মলবৎ পরিত্যাজ্য। ব্যাঙের ডাকে ঘুমের ব্যাঘাত হয় বটে কিন্তু ব্যাঙ নিতান্ত অনপকারী নহে। ইহারা পোকা মাকড় ধরিয়া খাইয়া বাস গৃহের চারি ভিতের অনেক উপদ্রব নষ্ট করে। ব্যাঙ দেখিলে সাপ আসে বটে এবং না পাইলে ঘরে সাপ ঢুকিতেও পারে।

রবারের আবাদ সম্বন্ধে—

শ্রীশশাঙ্কমোহন ওঝা, বাগবাজার, কলিকাতা।

প্রশ্ন—জানিতে চান যে সিংভূমের অন্তর্গত হলুদ পুকুর নামক পরগণায় রবারের আবাদ চলিতে পারে কি না? গাছ কত বড় হইলে তাহা হইতে আঠা সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য? আঠা সংগ্রহের প্রণালী সম্বন্ধে কিছু উপদেশ চাই। রবারের শত্রু উই নিবারণের উপায় কি? উই গাছের গোড়ায় লাগিলে চারা গাছ মারিয়া ফেলে। আবার গাছ যদি কোন ক্রমে বড় হইল তাহা হইলে গাছের কাণ্ডে উই লাগিয়া গাছগুলিকে এমন নিরস করিয়া ফেলে যে ঐ সকল গাছ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ আঠা পাওয়া যায় না।

উত্তর—ময়ুরভঞ্জে যখন রবারের আবাদ হইতেছে তখন তাহার সন্নিহিত হলুদপুকুর পরগণায় রবারের আবাদ না হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। ময়ুরভঞ্জের আবাদগুলি নব প্রতিষ্ঠিত, ব্যবসার হিসাবে সেগুলি কি রকম লাভজনক হয় তাহার বিবরণী আমরা অদ্যাপিও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন কোন্ সময়ে গাছ চিরিয়া রস গ্রহণ করা উচিত?—ঐ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলে গাছ অন্ততঃ ছয় বৎসরের না হইলে তাহা হইতে রস সংগ্রহ করা বিধেয় নহে। অপর একদল বলেন যে গাছের বয়স কত দেখিবার আবশ্যক নাই, গাছগুলির কি রকম

বৃদ্ধি হইয়াছে দেখ। যদি দেখ যে কাণ্ডের বেড় বা পরিধি ২৬ ইঞ্চ হইয়াছে তাহা হইতে নির্ভাবনায় রস নির্গত করা যাইতে পারে। খেজুর গাছ হইতে যে প্রকারে রস নির্গত করা হয় রবার গাছের কাণ্ড সেই রকম ত্রিকোণাকারে চাঁচিয়া ও চিরিয়া রস নির্গত করিয়া লওয়া হয়। যে গাছগুলি উপযুক্ত পরিমাণে বাড়ে নাই সে রকম চারা গাছের নির্য্যাস প্রায়ই পাতলা হয় এবং তাহাতে জলীয় ভাগ অধিক থাকে। অতএব হয় গাছগুলি পূর্ণ ছয় বৎসর হইলে অথবা তাহাদের বেড় ছাব্বিশ ইঞ্চ হইলে তবে গাছ নির্যাস প্রদানের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে। দুই মতের যে কোন মত অবলম্বন করা যাইতে পারে, মোট কথা রস একটু গাড় হওয়া চাই।

খেজুরের যেমন বাকলা ছড়াইয়া চিরিয়া চাঁচিয়া তাহাতে নল পরাইয়া দিলে তাহা হইতে রস টপিতে থাকে। ইহারও ত্বক ত্রিকোণাকারে চিরিয়া দিয়া উপরি ভাগ কিঞ্চিৎ চাঁচিয়া নল পরাইয়া দিলেই হইল। খেজুর গাছে বাঁশের নল পরান থাকে, রবার গাছে টিনের ডোঙা বা নল পরান হয়। সেই নলমুখে নির্য্যাস বহিয়া আসিয়া নিম্নদেশে স্থাপিত একটি বৃহৎ টীন পাত্রে পড়িতে থাকে। এইগুলি একটি বৃহৎ কটাহে সংগৃহিত হয় এবং তাহাতে দ্রাবক মিশাইয়া জমাট বাঁধিলে রোলার সাহায্যে পিষিয়া পাতে পরিণত করা হয়। বাজারে রবার বলিলে এই পাতগুলিই বুঝায়।

বাগানের জঙ্গল সাফ্ করা, কোপাইয়া নিড়াইয়া উইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া দেওয়া ভিন্ন উই তাড়াইবার অন্য উপায় নাই। বড় উৎপাত হইলে উইয়ের বড় বড় ঢিপি (এক একটি প্রকাণ্ড মৃন্ময় দুর্গ বিশেষ) ভাঙ্গিয়া তাহাতে বিষাক্ত দ্রাবক ঢালিয়া দিয়া উই মারিতে হয়। গাছের গোড়ায় রেড়ী তৈলের লেপ মাঝে মাঝে লাগাইলে গাছের কাণ্ডে আর উই বাহিয়া উঠিতে পারে না। উই পোকা রেড়ীর তীব্র আঘ্রাণ সহ্য করিতে পারে না।

গাছের ত্বক চিরিবার সময় বা চাঁচিবার কিম্বা নল পরাইবার সময় যেন তাহাদের হাড়ে বা মজ্জায় আঘাত না লাগে।

সার সংগ্রহ

কার্পেট বয়ন শিক্ষা—

মহীশূরের ইকনমিক কন্ফারেন্স গঠিত সব-কমিটি মহীশূর রাজ্যে বার্ষিক সাড়ে সাত হাজার টাকা ব্যয়ে কার্পেট বয়ন শিক্ষা দিবার জন্য একটী শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—বয়ন-শিল্পীদিগকে সরকার হইতে অর্থসাহায্য-প্রদান, তাহাদের উৎপন্ন শিল্পের বিজ্ঞাপন-প্রচার ও কো-অপারেটিভ-পদ্ধতি অনুসারে এই সকল শিল্পের প্রবর্ত্তন করিলে কল্যাণ হইতে পারে। কমিটীর পরামর্শ এমন সার্ব্বভৌমিক যে, ভারতের সর্ব্বত্র তাহা পরিগৃহীত হইতে বাধা নাই।

মহিশূরের পেন্সিল প্রস্তুতের উদ্যোগ—

কিছুদিন পূর্ব্বে, মহীশূরে পেন্সিল প্রস্তুত হইতে পারে কি না, অনুসন্ধান করিবার জন্য মহীশূর গবর্মেণ্ট একজন পেন্সিল-নির্ম্মাণে ব্যুৎপন্ন বিশেষবিৎকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি রিপোর্ট দিয়াছেন,—মহীশূরের শিমোন জঙ্গলে পেন্সিল নির্ম্মাণের উপযোগী কাষ্ঠের অভাব নাই। দক্ষিণ-ভারতে পেন্সিলের যথেষ্ট চাহিদাও আছে। বিশেষবিৎ মহীশূর দরবারকে দেড় লক্ষ টাকা মূলধনে একটি পেন্সিলের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। মহীশূর গবর্মেণ্ট বলিয়াছেন,—যদি মূলধনীরা অগ্রসর না হন, তাহা হইলে, মহীশূর দরবার এ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন।

পোকার আহার—

যদি কোন শিশুর ক্ষুদ্র আলুপোকার ন্যায় ক্ষুধাশক্তি থাকিত তাহা হইলে শিশুটি প্রত্যেক দিন ২৫ সের হইতে ৫০ সের পর্য্যন্ত খাদ্য খাইতে পারিত। যদি কোন অশ্ব একটি রেশমপোকার ন্যায় খাইতে পারিত, তাহা হইলে ঘোড়াটি প্রত্যেক দিন ২৮ মণ ঘাস জীর্ণ করিত। একটি রেশমপোকা প্রত্যেকদিন তাহার দেহের ভারের দ্বিগুণ খাদ্য খাইয়া থাকে এবং আলুপোকা পাঁচগুণ খাইয়া থাকে। সকল পতঙ্গ অপেক্ষা গঙ্গা ফড়িঙ অধিক আহারে পটু। যখন ইহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, তখন ইহারা দেহের ভারের দশগুণ খাদ্য জীর্ণ করিয়া ফেলে।

যেমন আহারের শক্তি তাহাদের বংশ বৃদ্ধির ততোধিক। তাহারা প্রজাপতি অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া বংশবৃদ্ধি করে। যে কোন প্রজাপতি ৫০০ শত ডিম পাড়ে। এই সকল ডিম ফুটিয়া আবার এক কিম্বা দেড় মাসের মধ্যেই প্রজাপতি হয়। ৫০০ শতের মধ্যে ২৫০ শত পুং প্রজাপতি বাদ দিয়া ধরিলে ২৫০ স্ত্রী প্রজাপতি সংখ্যায় ১২৫০০০ ডিম পাড়িবে। উহার প্রায় অর্দ্ধ সংখ্যা স্ত্রী প্রজাপতি হইবে এবং তাহারা প্রত্যেক ৫০০ হিসাবে ডিম পাড়িতে থাকিবে। কোন কোন পোকা বৎসরের ভিতর তিনবার এবং তিন জন্মে। এইরূপ একটা পোকা একটা মৌজা বা গ্রাম ছাইয়া ফেলিতে পারে। বহুসংখ্যক গঙ্গা ফড়িঙ একটি দেশকে যে উৎসন্ন করিয়া ফেলিতে পারে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পোকা প্রাকৃতিক নিয়মে অনেক মরিয়া যায়। তাহাদের স্বাভাবিক শক্রও বিস্তর তথাপি তাহাদের মারিবার ব্যবস্থা ও কৌশল জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। যাহাদের এত বাড় তাহা একবার কোন ক্রমে প্রকৃতি হাত এড়াইয়া তাহাদের বংশ বৃদ্ধি করিয়া লইতে পারিলে তাহারা চাষীর ক্ষেতের সমুদয় শস্য গ্রাস করিয়া বসিবে। মানুষের আহার কীটের কবলে যাইবে।

বাঙ্গালার শিল্প—তাঁতিবন্দে এক সময় বহু তাঁতির বাস ছিল। বোধ হয় তাঁতিদের হইতেই তাঁতিবন্দ নাম হইয়া থাকিবে। এখনও তাঁতিবন্দের তাঁতিরা সুন্দর সুন্দর গায়ের চাদর প্রস্তুত করিয়া থাকে।

পাবনার দোগাছি সাতুল্যাপুর মাণিকদির নিশ্চিন্তপুর প্রভৃতি স্থানের জেলারা সুন্দর সুন্দর কাপড়, বিছানার চাদর, ছিট্, প্রস্তুত করিয়া থাকে। দোগাছি কাপড়ের পাড়ের নমুনা লইয়াই বিলাতী পাবনা পাড়ের কাপড় হইয়াছিল।

দোগাছির নিকট ঙোড়াদহ গ্রামের বৈরাগীরা সুন্দর সুন্দর বেলের মালা প্রস্তুত করে। ফরিদপুর, নদীয়া প্রভৃতি স্থামের লোক আসিয়া এই সমস্ত মালা লইয়া ব্যবসা করে। পুরুষেরা মালা প্রস্তুত করে এবং স্ত্রীলোকেরা গাঁথিয়া থাকে।

কাশীনাথপুরের নিকট নাড়ুরিয়া একটি পল্লীগ্রাম। এই খয়রাতীরয়া রং করা সুন্দর সুন্দর কাঠের বৈঠক, কৌটা, নোলা, চুষিকাঠী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে

সিরাজগঞ্জের নিকট ছোটধুল বলিা একটী পল্লী আছে। এই স্থানের মুসলমান কারিকরেরা যে বস্ত্র বয়ন করে, তাহাকে ছোটধুলের চাদর বলে। উহা লোকের খুব পছন্দ সহী এবং বাজারে খুব বেশী মূল্যে বিক্রয় হয়।

সিরাজগঞ্জ টাউনের ১ মাইল দক্ষিণে কালিছাকান্দা পাড়াতে মহাজনদিগের খাতার জন্য খুব ভাল কাগজ প্রস্তুত হয়। উহা বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়। এই কাগজের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে লিখিবার সময় ব্লটিং কাগজের আবশ্য হয় না। লিখিবামত্র কালি শুকাইয়া যায়। মাড়ওয়ারী ব্যবসায়িগণ ইহা খুব পছন্দ করেন।

ভারতের সহিত বাণিজ্য—ভারত কখনও শিল্পোন্নতি করিয়া আপন অভাবের মোচন আপনি করিবে, জাপান এ কথায় বিশ্বাস করে না। আমাদিগের দেশের অবস্থা ও গবর্ণমেণ্টের অবাধ বাণিজ্যনীতির ফল দর্শমে জাপানীদিগের মনে এ ধারণা হওয়া বিচিত্র নহে। তাহার ইহাও স্থির করিয়া লইয়াছে যে ইউরোপে শ্রমজীবী-দিগের পারিশ্রমিকের হার অধিক বলিয়া কোন পাশ্চাত্য রাজ্য জাপানের ন্যায় অল্প মূল্যে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারিবেনা। সুতরাং ভারতে বাজারে জাপানী দ্রব্যের মূল্যাই নর্ব্বাপেক্ষা সুলভ হইবে; কাজেই উহাই অধিক বিকাইবে। তাই জাপান যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বে শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে যতদূর সম্ভব আপন প্রসার বর্দ্ধনে মনোযোগী হইয়াছে। যুদ্ধ ঘোষণার পরেই যেমন ভারত হইতে কাঁচা মাল অর্থাৎ তুলা, পাট, চর্ম্ম প্রভৃতির রপ্তানি বন্ধ হওয়ায় ঐ দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইল; জাপান জাপান অমনি

প্রচুর পরিমাণে ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে লাগিল। এইরূপে জাপান অল্প মূল্যে প্রভূত দ্রব্য ক্রয় করিয়াছে। এক্ষণে সেই সকল দ্রব্য হইতে বিবিধ প্রকার পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আমাদিগেরই দেশে পাঠাইতেছে। জর্ম্মনি ও অষ্ট্রীয়া হইতে যে সকল দ্রব্য আসিত, জাপান এক্ষণে সেই সকল দ্রব্য পাঠাইতেছে। উভয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু জাপান যে মাল পাঠাতেছে, তাহাতে কার্য্য চলিয়া যাইতেছে। কাজেই ভারতের বাজান এক প্রকার আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। যুদ্ধ যদি আরও এক বৎসর চলে তাহা হইলে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্র হইতে জাপানকে বিতাড়িত করা কোন মতে সম্ভবপর হইবে না। হিতবাদী—

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক ক্যানেল—কলিকাতার পণ্যবাহী নৌকার গমনাগমনের সুবিধা জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট একটি নূতন খাল কাটিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই খাল গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক কেনেল নামে অভিহিত হইবে। বরাহনগর কুটীঘাটার নিম্নবাহিনী গঙ্গা হইতে খাল কাটা আরম্ভ হইবে। খালটি কুটিঘাটা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ বরাহনগরের নন্দলালাদের ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া রোড ও গোপালনাথ ঠাকুরের ষ্ট্রীট ভেদ করিয়া বারাকপুর ট্রাঙ্করোডে সিঁথি পর্য্যন্ত যাইবে। তাহার পর দক্ষিণাভিমুখে দমদমা রোড অতিক্রম করিয়া ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে উত্তীর্ণ হইয়া যাত্রাগাছি পর্য্যন্ত যাইবে। পূর্ব্বে কালীঘাট ও টালিগঞ্জের নিম্নবর্ত্তিনী আদিগঙ্গাকে লইয়া খাল কাটিবার প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমরা আশা করি, বঙ্গের "ওয়াটার ওয়েজ" কমিটী অচিরে আদিগঙ্গার সংস্কার সাধনের ব্যবস্থা করিবেন। কারণ আদিগঙ্গা ক্রমশঃ মজিয়া যাইতেছে।

চাউলের গুড়ার রুটী।—ইউরোপীয় সমরে সৈন্যদের রুটীর জন্য ময়দার ব্যয় কমাইবার জন্য প্যারিনগরের একাডিমি ডি মেডিসিন নামক সমিতির ডাঃ মরেল একপ্রকার ভেজালের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, শতকরা ৮০ ভাগ ময়দা আর ২০ ভাগ চাউলের গুঁড়া মিশাইয়া রুটী তৈয়ারী করা যাইতে পারে। এইরূপ ভেজালে প্রস্তুত রুটীতে শরীরে অপকারী কিছুই নাই এবং কেবলমাত্র ময়দা দ্বারা প্রস্তুত রুটী অপেক্ষা সারাংশে ন্যূন নহে।

ভারতে কৃষি—গত দশ বৎসরের মধ্যে সরকারী কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারী বাড়িয়াছে বিস্তর; তাঁহাদের গবেষণাপ্রসূত বহু পুস্তক পুস্তিকা মুদ্রিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার ফলে এদেশের কৃষকসম্প্রদায় কতটুকু উন্নত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, গত দশ বৎসরের মধ্যে ১১৭ জন ছাত্র পুসা কৃষিকলেজের পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কলেজী ডিপ্লোমার বলে তাঁহারা অনেকে সরকারী চাকরী লাভ করিয়াছেন, আবার অনেকের অদৃষ্টে সে "প্রাংশুলভ্য" ফল জুটে নাই। ফলে কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা সহযোগী "পাইয়োনিয়রে"র মুখে শুনুন—

"At present the demand for an agricultural education is very slight indeed, but should Government decide to create a regular department with Agricultural Inspectors and Sub-Inspectors, as has been done in the case of the Education Department for instance, then the diploma of an Agricultural College will be greatly sought after as an essential condition to obtaining an appointment in Government service."

অর্থাৎ আজকাল অতি অল্পসংখ্যক লোক কৃষিশিক্ষালাভে উৎসুক; কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিভাগের ন্যায় কৃষিবিভাগেও ইন্‌স্পেক্টর সব-ইন্‌স্পেক্টর, প্রভৃতি কর্ম্মচারী নিয়োগ করেন, তবে সরকারী চাকরির মোহে অনেকে আবার কৃষিকলেজে নাম লেখাইতে পারে।

পুস্তকে অধিত বিদ্যায় ও হাতে হাতিয়ারে কার্য্যকরী বিদ্যায় যে তফাৎ সেই খুঁতটি থাকিয়া গেলেও কৃষক তাহার সহজাত জ্ঞানের সাহায্যে সহজে বুঝিতে পারে কোন্ ক্ষেত্রে 'আমন' ফলিবে আর কোন্ ক্ষেত্রে 'আউস' জন্মিবে, কোথায় পটোল আর কোথায় পানের 'লতি' লাগাইতে হইবে, কোন্ সময়ে কোন্ ফসল রোপণ করিতে বা কাটিতে হইবে—এসকল তথ্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত কৃষক সন্তানকে পুস্তকের পাতা উল্টাইতে হয় না। তবে তাহার সকল জ্ঞান যে সম্পূর্ণ ভ্রম প্রমাদপরিবর্জ্জিত, এমন কথা সাহস করিয়া বলা যায় না, তাই তাহাদের পক্ষে কৃষি শিক্ষার প্রয়োজন। কৃষকের সন্তান কৃষিবিদ্যা শিখিলে—তাহার সহজাত জ্ঞানটুকুকে পরিমার্জ্জিত করিয়া দিতে পারিলে—কৃষি শিক্ষার সার্থকতা হয়। নচেৎ গবর্ণমেণ্ট কৃষি কলেজগুলিতে বৎসর বৎসর যে সকল ভদ্র-কৃষক প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহারা স্বভাবতঃ সরকারী চাকুরীর উমেদার হইবে, কিন্তু কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হইলে হাতে হাতিয়ারে প্রকৃত কৃষির উন্নতি সাধনে তাঁহারা কতটা সক্ষম তাহা অদ্যাপিও স্থির করা যায় নাই।

বাঙ্গালা দেশে আমরা রাজসাহী, বর্দ্ধমান, রঙ্গপুর, ঢাকা প্রভৃতি কয়েকটী মফঃস্বল সহরে গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত আদর্শ কৃষিক্ষেত্র দেখিতে পাই। সকল ক্ষেত্রে এক একজন ডিপ্লোমাধারী অধ্যক্ষ আছেন তাঁহারই তত্ত্বাবধানে কৃষিক্ষেত্রের কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে।

আদর্শ সরকারী ক্ষেত্রে অপর্য্যাপ্ত সার প্রয়োগ, প্রয়োজনাতিরিক্ত সরঞ্জামী খরচ, প্রাসাদতুল্য গৃহাদি নির্ম্মাণ দেখিয়া সাধারণ কৃষকের ধাঁধা লাগিয়া যায়। তাহারা মনে করে সাতপালী তৈল তাহাদের জুটিবেনা, রাধাও নাচিবে না। এত তৈল খরচ করিয়া

সরকারী ক্ষেত্রেই রাধা নাচিতেছে কি? সুতরাং সেখানে ভারতের ন্যায় দারিদ্র পীড়িত কৃষকের শিক্ষণীয় বিষয় অতি অল্প। আমাদের তখন জিজ্ঞাস্য এই যে আদর্শ ক্ষেত্রগুলি কিসের আদর্শ—প্রচুর অর্থ ব্যয়ে কি প্রকারে নয়ন শোভন কৃষিক্ষেত্র রচনা হয় সেই আদর্শ। সাফল্য লইয়া কৃষকের কথা, শ্রম সার্থকতা তাহার উদ্দেশ্য। কৃষির নব নব কৌশল সে শিখিতে চায় যদি তাহা তাহার সাধ্যায়ত্ব হয়, যদি তাহাতে তাহার অবস্থার উন্নতি হয়। সে আদর্শ সে যে কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছে না! [বঙ্গবাসী]

আদর্শ ক্ষেত্রগুলি একেবারে অকেজো তাহা বলিতে কেহ সাহস করিবে না তবে সেগুলি স্বাবলম্বী হয় ইহা সকলেরই প্রার্থনীয়। বিভিন্ন অনুশীলন ও পরীক্ষায় অনেক বাজে খরচ আছে। একটা কিছু তথ্য তত্বতঃ বুঝিতে গেলে আগে অনেক খরচ করিতে হয়। রাজ সরকার হইতে অর্থব্যয় করিয়া কৃষির নব নব কৌশল উদ্ভাবন চেষ্টা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। উদ্ভাবিত চেষ্টায় ফলগুলি চাষীদের জানাইতে ত কোন অর্থব্যয় হয় না অতএব এ ব্যবস্থা একেবারে মন্দ বলা যায় না। তবে চাষীদের লইয়া আদর্শক্ষেত্র স্থাপন করা অথবা তাদের ক্ষেতে যাইয়া তাহাদের সহিত যোগ দেওয়া অধিক বাঞ্ছনীয় বলিয়া আমরা মনে করি।

বহুপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ভুপাল চন্দ্র বসু বাহাদুরের (যিনি তখন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের সহকারী ডিরেক্টর), প্ররোচনায় আমরা কৃষক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া জানিতে চাহিয়াছিলাম যে কয়জন কৃষি শিক্ষিত যুবক ১৫/ বিঘা মাত্র দোফসলী বা তে-ফসলী জমি লইয়া তাহার স্ত্রী পুত্র পালন করিতেছেন। কৃষির কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া অনেকে পিতৃ অর্থ ব্যয় করিয়া কৃষিকর্ম্মে নিরত আছেন দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের ক্ষেত্রটি সুশোভন হইতে পারে তাহাদের রচিত বাগান মনোরম হওয়া বিচিত্র নহে কিন্তু তাহা প্রায়ই লাভজনক হয় না। পরের ধন লইয়া অনেকেও কৃষি কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া কিছুদিন ধনীকে বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ করেন, অবশেষে হাল ছাড়িয়া দেন। এ সকল দৃষ্টান্তই অনেক। তাই ভুপালবাবু প্রকৃত অন্ন সংস্থানের জন্য কৃষি কর্ম্মে নিরত শিক্ষিত যুবকবৃন্দের সংখ্যা করিতে মানস করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি প্রথম পুরস্কার ২০০৲ টাকা নিজে দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং ভারতীয় কৃষি সমিতিকে (Innian Garding Association) ১৫০৲ টাকা দ্বিতীয় পুরস্কার ঘোষণা করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সময়ে সমগ্র বাঙলাদেশের কোথাও হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। মানুষ কৃষি কর্ম্ম লইয়া যদি জীবন সংগ্রামে নিযুক্ত হয় তবে কৌশল আপনা হইতে উদ্ভূত হইবে। একদল তত্ত্ব অনুসন্ধানে নিযুক্ত হউন। একদল সেগুলি কাজে খাটান এবং একদল অর্থ যোগান। এই তিনদলের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক।

বাগানের মাসিক কার্য্য

—:০:—

অগ্রহায়ণ মাস

সব্জীবাগান।—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতির চারা বসান শেষ হইয়া গিয়াছে। সীম, মটর, মূলা প্রভৃতি বোনাও শেষ হইয়াছে। যদি কার্ত্তিকের শেষেও মটর, মূলা, বিলাতি সীম, বোনার কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নাবী জাতীয় উক্ত প্রকারের বীজ এই মাসেও বোনা যাইতে পারে। নাবী আলু অর্থাৎ নৈনিতাল, বোম্বাই প্রভৃতি এই সময় বসান যাইতে পারে। পটল চাষের সময় এখনও যায় নাই। শীতপ্রধান দেশে কিম্বা যথায় জমিতে রস অধিক দিন থাকে—যথা উত্তর-আসামে বা হিমালয়ের তরাই প্রদেশে এই মাস পর্য্যন্ত বাঁধাকপি, ফুলকপি বীজ বোনা যায়। নিম্নবঙ্গে কপিচারা ক্ষেত্রে বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

দেশী সব্জী।—বেগুন, শাকাদি, তরমুজ, লঙ্কা, ভুঁই শসা, লাউ, কুমড়া, যাহার চৈত্র বৈশাখ মাসে ফল হইবে তাহা এই সময়ে বসাইতে হয়। বালি আঁস জমিতে যেখানে অধিক দিন জমিতে রস থাকে তথায় তরমুজ বসাইতে হয়।

ফুলের বাগান।—হলিহক, পিঙ্ক, মিগ্নোনেট, ভাবিনা, ক্রিসন্থিমম, ফ্লক্স, পিটুনিয়া ন্যাষ্টারসম, সুইটপী ও অন্যান্য মরসুমী ফুল বীজ বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। অগ্রহায়ণের প্রথমে না বসাইলে শীতের মধ্যে তাহাদের ফুল হওয়া অসম্ভব হইবে। যে সকল মরসুমী ফুলের বীজের চারা তৈয়ারি হইয়াছে, তাহার চারা এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিতে হইবে বা টবে বসাইয়া দিতে হইবে।

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে যে সকল গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, কার্ত্তিক মাসে তাহাদের গোড়ায় নূতন মাটি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, যদি না হইয়া থাকে তবে এ মাসে উক্ত কার্য্য আর ফেলিয়া রাখা হইবে না, পাঁকমাটি চূর্ণ করিয়া তাহাতে পুরাতন গোবর সার মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিলে অধিক ফুল ফল প্রসব করে।

কৃষি-ক্ষেত্রে।—মুগ, মসুর, গম, যব, ছোলা প্রভৃতির আবাদ যদি কার্ত্তিক মাসের মধ্যে শেষ হইয়া না থাকে, তবে এমাসের প্রথমেই শেষ করা কর্ত্তব্য। একেবারে না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া বরং ভাল, তাহাতে ষোল আনা না হউক কতক পরিমাণে ফসল হইবেই। পশুখাদ্যের মধ্যে ম্যাঙ্গোল্ড বীটের আবাদ এখনও করা যাইতে পারে। কার্পাস ও বেগুন গাছের গোড়ায় ও নব রোপিত চারার আইল বান্ধিয়া দেওয়া এ মাসেও চলিতে পারে। যব, যই, মুগ, কলাই, মটর এই সকল

রবি শস্যের বীজ বপন এবং পরে গমের বীজ বপন; আলু ও বিলাতি সব্জীর বীজ লাগান এ মাসেও চলিতে পারে; কপির চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাদের তদ্বির করাই এখন কার্য্য। তরমুজ ও খরমুজের বীজ বপন; মূলা, বীট, কুমড়া, লাউ, শসা, পেঁয়াজ ও বরবটীর বীজ বপন করা হইয়াছে ঐ সকল ক্ষেত্রে কোদালী দ্বারা ইহাদের গোড়া আল্গা করিয়া দেওয়া; আলুর ক্ষেত্রে জল দেওয়া এই মাসে আরম্ভ হইতে পারে; বিলাতী সব্জীর ভাঁটিতে জল সিঞ্চন, প্রাতে বেলা ৯টার সময় উহাদের আবরণ দিয়া সন্ধ্যায় আবরণ খুলিয়া দেওয়া; বার্ত্তাকু, কার্পাস ও লঙ্কা চয়ন ও বিক্রয়; ইক্ষুর ক্ষেত্রে জল সেচন ও কোপান এই সময়ের কার্য্য।

গোলাপের পাইট।—কার্ত্তিক মাসে যদি গোলাপের গাছ ছাঁটা না হইয়া থাকে, তবে এ মাসে আর বাকি রাখা উচিত নহে। বঙ্গদেশে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনায় সময় কাটিয়াছে। কালী পূজার পর ঐ কার্য্য করিলে ভাল হয়, উত্তর পশ্চিম ও পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক আগে ঐ কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে। গোলাপের ডাল, "ডাল কাটা" কাঁচি দ্বারা কাটিলে ভাল হয়। ডাল ছাঁটিবার সময় ডাল চিরিয়া না যায় এইটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাইব্রিড গোলাপের ডাল বড় হয়, সেই গুলি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিতে হয়। টীগোলাপ খুব ঘেঁসিয়া ছাঁটীতে হয় না। মারসাল নীল প্রভৃতি লতানীয়া গোলাপের ডাল ছাঁটিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, তবে নিতান্ত পুরাতন ডাল বা শুষ্কপ্রায় ডাঁল কিছু কিছু বাদ দিতে হয়। ডাল ছাঁটার সঙ্গে গোড়া খুঁড়িয়া আবশ্যক মত ৪ হইতে ১০ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া সার দিতে হয়। জমি নিরস থাকিলে তরল সার, জমি সরস থাকিলে গুঁড়া সার ব্যবহার করা বিধেয়। গামলায় পোড়ামাটি, সরিষার খৈল, গোমূত্র ও অল্প পরিমাণে এঁটেল মাটি একত্র পচাইয়া সেই সার জলে গুলিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। সার-জল নাতি তরল নাতি ঘন হইবে। গুঁড়া সার সরিষার খৈল এক ভাগ, পচা গোময় সার এক ভাগ, পোড়ামাটি এক ভাগ এবং এঁটেল মাটি দুই ভাগ একত্র করিয়া মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। গাছ বুঝিয়া প্রত্যেক গাছে সিকি পাউণ্ড হইতে এক পাউণ্ড পর্য্যন্ত এই সার দিতে হয়। ঐ মিশ্র সারে একটু ভুষা মিশাইলে মন্দ হয় না, ভুষা কলিকাতার বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। প্রতি পাউণ্ড মিশ্র সারে এক প্যাকেট ভুষা যথেষ্ট, ভুষা দিলে গোলাপের রঙ বেশ ভাল হয়। পাকা ছাদের রাবিশের গুঁড়া কিঞ্চিৎ, অভাবে পোড়ামাটি ও গুঁড়া চুণ সামান্য পরিমাণে মিশাইয়া লইলে গাছে ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

সূচীপত্র।

কার্ত্তিক ১৩২২ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৬শ খণ্ড। { কার্ত্তিক, ১৩২২ সাল। { ৭ম সংখ্যা।

কুসুম ফুল

যে অবধি য়ুরোপে কৃত্রিম রঙ্গের প্রচলন হইয়াছে, তদবধি ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ রঙ্গের কাটতি একেবারে কমিয়া গিয়াছে। যখন নীলের মত একটা বৃহৎ কারবার নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন ছোট ছোট কারবারের যে আর দাঁড়াইবার স্থল নাই তাহা কি আর বলিতে হইবে! ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশ হইতে য়ুরোপ ও মার্কিণে মঞ্জিষ্ঠা ও কুসুমফুল যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানি হইত, কিন্তু এখন এই উভয়বিধ উদ্ভিজ্জ রঙ্গেরই রপ্তানি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস চিরদিন এরূপ থাকিবে না। কৃত্রিম রঙ্গের পশার যেন একটু একটু করিয়া কমিয়া আসিতেছে। নকল নীল অপেক্ষা আসল নীলের প্রতি আবার লোকের দৃষ্টি পড়িতেছে। ইহাতে বোধ হয় অন্যান্য স্বাভাবিক রঙ্গের পুনরায় আদর হইবে।

কুসুমফুল ভারতের সর্ব্বত্রই জন্মিয়া থাকে। তবে নিম্নবঙ্গ অপেক্ষা বিহার প্রদেশেই ইহার অধিক আবাদ হইয়া থাকে। নিম্নবঙ্গের বর্দ্ধমান কোন কোন স্থানে ইহার অল্প পরিমাণ আবাদ আমরা দেখিয়াছি। পূর্ব্বে ঢাকা জেলাতে ইহার যথেষ্ট আবাদ হইত। বিহার অঞ্চলের মজঃফরপুরে ইহার যথেষ্ট আবাদ দেখা যায়; কিন্তু পূর্ব্বে ইহার আবাদ যে পরিমাণ হইত, এখন তাহার দশভাগের একভাগ জমিতেও তাহা দেখা যায় না।

কুসুমফুলের গাছ দুই জাতীয়। একপ্রকার গাছে কাঁটা আছে তাহাকে বিহার অঞ্চলে কুঠি বলে, আর মুর্দ্দি নামে এক জাতীয় গাছ আছে তাহাতে কাঁটা নাই।

সাধারণতঃ আলু, সরিষা, অহিফেন, যব, গম, তিসি ও ছোলার সহিত কুসুমফুলের আবাদ করা হইয়া থাকে। ইহা সকল রকম মাটিতেই জন্মিয়া থাকে, তবে বেলে মাটিতে বা দোয়াঁশ মাটিতে ভাল জন্মে।

কুসুমফুলের চাষে সার দিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না, তবে অহিফেন বা পোস্তর সহিত বপন করিলে শেষোক্ত ফসলের জন্য গোময় সার দিতে হয়। যদি অন্য কোন ফসলের সহিত কুসুমফুল বপন করা না হয়, তাহা হইলে, বিঘা প্রতি ৩॥০ সের বীজ ছড়াইলে যথেষ্ট হয়, কিন্তু অন্য ফসলের সহিত বপন করিলে বিঘা করা দুই সের বীজ বপন করা যাইতে পারে। ইহা সচারাচর কার্ত্তিক মাসেই বপন করা হয়। ইহার চারা এক হাত অন্তর জন্মিলেই ভাল হয়, এই জন্য ঘন জন্মিলে গাছ উপাড়িয়া পাতলা করিয়া দেওয়া হয়। গাছ একটু বড় হইলে উহার ডালের অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে গাছগুলি বেশ ঝাঁকড়াল হয়। গাছে কুঁড়ি ধরিবার পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হইলে বড় ভাল হয় কিন্তু অতিবৃষ্টি হইলে ফুল নষ্ট হইয়া যায়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে গাছে লাহি নামক একপ্রকার পোকা ধরে, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

সচরাচর মাঘ মাসের শেষ ভাগে বা ফাল্গুন মাসের প্রথমে কুসুমফুল ফুটিতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে যদি একটু পশ্চিমে বাতাস বয়, তাহা হইলে ফুলের রঙ্গ ভাল হয়। ফুল তুলিবার উপযুক্ত হইলে, স্ত্রীলোক বা বালক বালিকারা ছোট ছোট টুকরি করিয়া এই ফুল তুলিয়া থাকে। অবশ্য ক্ষেত্র বড় হইলে ফুল তুলিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিতে হয়। এই সকল লোক ১৬টি ফুল তুলিলে একটি ফুল পাইয়া থাকে। কখন কখন ধান বা ভুট্টা পারিশ্রমিক স্বরূপ দেওয়া হইয়া থাকে। শস্যে পারিশ্রমিক দিতে হইলে যে পরিমাণ ওজনের ফুল তুলে, তাহার অর্দ্ধেক শস্য পায়। অর্থাৎ পাঁচ সের ফুল তুলিলে আড়াই সের ধান বা ভুট্টা দেওয়া হয়। এই ফুল প্রাতঃকালেই তোলা হয় এবং দিনের বেলায় ছায়াযুক্ত স্থানে উহাকে শুকান হয়। সন্ধ্যা কালে ফুলগুলি সামান্যরূপ রগ্‌ড়াইয়া গুঁড়া করিয়া খাটিয়ার উপর শুকাইতে দেওয়া হয়; এইরূপ গুঁড়া না করিলে, ফুলগুলি জড়াইয়া ডেলা পাকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। তিন বিঘা জমীতে যদি কেবলমাত্র কুসুমফুলের আবাদকরা হয় তাহা হইলে এইরূপ ব্যয় হইয়া থাকে—

তিন বিঘা জমীর খাজনা	১২৲
রোডসেস ইত্যাদি	৸৹
ছয়বার লাঙ্গল দিবার খরচা	৩৸৹
দশ সের বীজ	১।৹
ভূমি খনন	১৲
	১৮৸৹

তিন বিঘা জমীতে প্রায় এক মণ ফুল হয় ও সাড়ে বার মণ বীজ উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে ফুল টাকায় দুই সের দরে বিক্রয় হইত কিন্তু বিলাতী রঙ্গের চলন হওয়াতে টাকায় ছয় সের করিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহাতে দেখা যাইতেছে এখনও কুসুম ফুলের আবাদে বেশ লাভ আছে।

পূর্ব্বে ঢাকা জেলাতে যথেষ্ট কুসুম ফুলের আবাদ হইত। পুরাতন একটি হিসাবে প্রকাশ যে ১৮২৪।২৫ সালে কলিকাতার পরমিট হইতে যে ৮৪৪৮ মণ কুসুম ফুল রপ্তানি হইয়াছিল, তাহার তিন ভাগের দুই ভাগ ঢাকার নিকটে উৎপন্ন হইয়াছিল। সে সময়ে এই ৮৪৪৮ মণ কুসুম ফুলের মূল্য ২,৯০,৬৫৫ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল। এখন ঢাকাতে এ আবাদ নাই বলিলেই হয়। এখন কেবলমাত্র নবাবগঞ্জ থানার এলাকায় কিছু কিছু চাষ হইয়া থাকে। শুনা যায় পূর্ব্বে পাথরঘাটার কুসুম ফুল হইতে উৎকৃষ্ট রঙ প্রস্তুত হইত।

বাঙ্গালা দেশে অতি সহজ প্রণালীতে কুসুম ফুলের রঙ্গ প্রস্তুত করা হয়। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ফুলগুলি ছায়াযুক্ত স্থানে শুকান হইয়া থাকে, কেন না রৌদ্রে দিলে রঙ্গ নষ্ট হইয়া যায়। ফুল শুকান হইলে উহা কলসীতে পুরিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়, অধিক ফুল হইলে একটি ক্ষুদ্র চোরকুটারীর মত ঘর প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতর রাখিয়া দেওয়া যায়। যথাসময়ে ফুলগুলিকে বাহির করিয়া একটি উখড়ি বা উদ্‌খলে ঢালিয়া উহা চূর্ণ করা হয়। যখন উহা উপযুক্ত রূপে চূর্ণ হয়, তখন চারিধারে চারিটি খোঁটা পুতিয়া তাহাতে একখানি কাপড় ঝুলাইয়া বাঁধা হয়। ফুলগুলি সেই কাপড়ে ঢালিয়া দিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। ফুলে যে পীত রঙ্গ থাকে তাহা ধুইয়া ফেলিবার জন্য এইরূপ করা হইয়া থাকে। তাহার পর সেগুলিকে রগড়াইয়া গোল গোল ফেনিবাতাসার আকারে পাকান হয় এবং রেড়ীর পাতার উপর রাখিয়া আর একটি পাতা চাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। পরদিন ঢাকা খুলিয়া মাদুর বা চেটাইয়ের উপর বিছাইয়া শুকাইতে দেওয়া হয় ও উপযুক্তরূপ শুকাইলে উহা বিক্রয় করা হয়। যদি ফুলের পরিমাণ অধিক হয় তাহা হইলে চূর্ণ করিবার সময় কলাগাছের ক্ষার বা সাজিমাটি মিশান হয়। এক সের ফুলে দুই ছটাক পরিমাণ মিশাইলেই যথেষ্ট হয়। মাটি সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইলে পূর্ব্বো-ল্লিখিত নিয়মে কাপড়ে ছাঁকা হইয়া থাকে। যে ফুলগুলা একবারমাত্র জল ঢালিয়া ছাঁকা হয় তাহাতে ঘোর লাল রঙ হইয়া থাকে, দ্বিতীয়বার ছাঁকিলে তদপেক্ষা ফিকা রঙ হয়, তৃতীয়বার ছাঁকিলে আরও ফিকা হয়। এরূপ ছাঁকিবার সময় তেঁতুল, লেবু, আম বা দধির মত অম্ল সামগ্রী মিশান হইয়া থাকে। এক সেরে চারি ছটাক পরিমাণ অম্ল দেওয়া হয়। কুসুমফুল হইতে নানা প্রকার রঙ উৎপন্ন হয় যথা :—(১) লাল বা এক রঙা (২) গোলাপী (৩) বেগুনি (৪) বাদামী (৫) নওরঙ্গী বা কমলালেবুর রঙ (৬) চাঁপাফুলের রঙ ইত্যাদি। এই সকল বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করিতে হইলে অন্যবিধ রঙ উহার সহিত মিশাইতে হয়।

—

বিহার অঞ্চলে বিবাহাদি শুভকার্য্যে কুসুম ফুলে রঞ্জিত বস্ত্রাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই জন্য উক্ত প্রদেশে যে সময়ে বিবাহাদি হয় সে সময় বস্ত্ররঞ্জকেরা যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়া থাকে। মুঙ্গের এইরূপ বস্ত্রাদি রঙ করিবার প্রধান স্থান।

কুসুমফুলের বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই তৈল অনেক স্থানে দীপ জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত। বিহার ও উত্তর পশ্চিমে কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য যে এক প্রকার চামড়ার ডোল ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাতে কুসুমবীজের তৈল মাখান হয়; এরূপ করিলে মূষিক বা কীটে উহা নষ্ট করিতে পারে না। সরিষা তিসি তিল প্রভৃতি বীজ হইতে যেরূপে তৈল বাহির করা হয় কুসুমবীজ হইতেও সচরাচর সেই প্রথায় তৈল বাহির করা হইয়া থাকে। কিন্তু কোথাও কোথাও আর এক প্রথায় তৈল বাহির করা হয়। একটি কলসীর উপর এক তৃতীয়াংশের এক অংশ পুরু করিয়া মাটি লেপিয়া দেওয়া হয়, তাহার পর কলসীতে বীজ রাখা হয় ও কলসীটি তন্দুরের উপর বসান হয়। তাহার পর কলসীর মুখটীতে জলন্ত ঘুঁটে চাপাইয়া বন্ধ করা হয়। বলা বাহুল্য কলসীর তলায় একটী ছিদ্র থাকে, ঐ ছিদ্র দিয়া একটু একটু তৈল চুয়াইয়া তন্দুরের মধ্যস্থিত আর একটী পাত্রে পড়িতে থাকে।

তৈল বাহির করিবার আর একটী প্রথা এইরূপ। গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে একটী পাত্র রাখা হয়। তাহার পর একটি কলসীর ভিতর বীজ পুরিয়া তাহার মুখে একখানি খুরি কাদা লেপিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। ঐ খুরিখানির মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র থাকে। তাহার পর কলসীটী উপুড় করিয়া গর্ত্তের মধ্যস্থ পাত্রের উপর রাখা হয় এবং কলসীর উল্টান তলায় ঘুঁটের ভাবরা দেওয়া হয়। কলসীটী পূর্ণ থাকিলে অল্পক্ষণ পরেই তৈল চুয়াইয়া পড়ে। এই প্রথায় বীজ হইতে অধিক তৈল বাহির হয়; প্রায় দুই সের বীজে দশ ছটাক তৈল পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যবিধ প্রণালীতে সাত আট ছটাকের অধিক তৈল বাহির হয় না।

ডুমরাঁও অঞ্চলের লোক বলে যে কুসুম-বীজের তৈলে খোস পাঁচড়া সত্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। এই তৈল তিন চারিবার লাগাইলেই, যেমন কোন খোস হউক না কেন শুকাইয়া যায়, পোড়া তৈলে বাত ও অনেক প্রকার ক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহাতে গবাদি পশুদিগের ক্ষত আরোগ্য হইতে শুনা গিয়াছে। কোন কোন স্থানে রন্ধনেতেও কুসুমবীজের তৈল ব্যবহৃত হয়।

কুসুমফুলের গাছ যখন কচি থাকে, তখন উহার ডগা অনেকস্থলে রন্ধন করিয়া খায়। অনেক দরিদ্র লোক বীজমধ্যস্থ শ্বেত পদার্থটী চূর্ণ করিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে অনেক সময়ে অজীর্ণ রোগ আনয়ন করে। বর্দ্ধমান অঞ্চলে মুড়ি প্রভৃতির সহিত কুসুমবীজ মিলাইয়া খাইয়া থাকে। কুসুমবীজ ভাজা খাইতে বেশ সুস্বাদু। উহা দেখিতে ধানের গড়গড়ির মত।

পূর্ব্বে বৎসরে প্রায় ছয় সাত লক্ষ টাকার কুসুমফুল বিদেশে রপ্তানি হইত, এখন লক্ষ টাকা মূল্যেরও ফুল রপ্তানি হয় না। ১৮৭৮।৭৯ সালে ৪৯৭৭ হন্দর কুসুমবীজ সমগ্র ভারত হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল, ইহার মূল্য ১,৮৬,৭১১ টাকা, কিন্তু গত বর্ষে ৪৩৩ হন্দর রপ্তানি হইয়াছিল, ইহার অধিকাংশ বঙ্গদেশ হইতেই প্রেরিত হইয়াছিল। এই ফুলের মুল্য ৬৭,৫০৬ টাকা। এখন চীনদেশেই প্রায় সমস্ত ফুল রপ্তানি হয়, অতি অল্প পরিমাণ জাপান ও ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়।

১৮৯৫ সালে বোম্বাই প্রদেশে যত তৈল বীজ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কুসুম-বীজ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। ১৯০২।৩ সালে তথায় ইহার আবাদ অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে রঙের জন্য কুসুমফুলের চাহিদা (Demand) না থাকিলেও তৈলের জন্য ইহার আবাদ চলিবে। পঞ্জাবপ্রদেশে ঘৃতের সহিত কুসুম বীজের তৈল ভেজাল দেয় বলিয়া তথায় উহা যথেষ্ট বিক্রয় হইয়া থাকে। তথায় অনেক দরিদ্র লোক ঘৃতের পরিবর্ত্তে কুসুম বীজের তৈলে লুচি ভাজে।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

রেড়ীর চাষ

শ্রীশশীভূষণ সরকার লিখিত —

"কৃষকের" কয়েকজন পাঠক সম্প্রতি রেড়ীর চাষ, রেড়ীর খৈল তৈল ও তৎসংক্রান্ত ব্যবসায় সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন করিয়াছেন। আমরা প্রত্যেককে স্বতন্ত্র ভাবে উত্তর দেওয়া অপেক্ষা এতৎ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলাম। নিম্ন লিখিত প্রবন্ধ রেড়ীর বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের ও প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখো-পাধ্যায় লিখিত পুস্তকাদি হইতে সঙ্কলিত হইল।

রেড়ী, ইউফরবিয়েসি জাতির রিসিনস পরিবার ভুক্ত। উদ্ভিদ্ শাস্ত্রে ইহার নাম রিসিনস কমিউনিস (Ricinus communis)। রেড়ীগাছ, নানাস্থানে নানারূপ আকার ধারণ করে। কোনও স্থানে ইহা বিশ ত্রিশ হাত উচ্চ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া অনেক দিন জীবিত থাকে, আবার কোথাও বা ইহা সামান্য ওষধী রূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া এক বৎসরের মধ্যে মরিয়া যায়। সচরাচর ইহা সাত আট হস্তের অধিক উচ্চ হয় না। কাণ্ড ফাঁপা, চিক্কণ, গোলাকার, লোমশূন্য। উপরিভাগে ঈষৎ রক্তবর্ণ। পত্র বিপর্য্যস্ত, বক্র, গোলাকার, ঈষৎ রক্তবর্ণ। পত্র ঈষৎ নিম্নমুখ, উপতৃণ সংযুক্ত, ছয় হইতে আট ইঞ্চ দীর্ঘ। পুষ্পগুচ্ছক বহু ভিন্ন, পুংকেশর ও গর্ভকেশর ভিন্ন ফুলে থাকে। ফল

ত্রিকোষ, কাঁটাযুক্ত। পক্কাবস্থায় ষড়্ভাগে বিভক্ত হইয়া বীজ নির্গত হয়। বীজ গোলাকার, চেপ্টা, একের চার হইতে একের দুই ইঞ্চ দীর্ঘ। একের চার হইতে দুয়ের পাঁচ ইঞ্চ প্রস্থ; একের আট ইঞ্চ স্থূল, চিক্কণ, রেখাবিশিষ্ট, নানা বর্ণে রঞ্জিত।

উদ্ভিদ্ শাস্ত্রমতে রেড়ী বড় ও ছোট এই দুই বর্ণে বিভক্ত। বড় দানাকে ফ্রক্টস্ মেজর ও ছোট দানাকে ফ্রুটস্ মাইনর বলে (Fructus major and minor)। অনেকের মত এই যে ছোট দানা হইতে ভাল তেল প্রস্তুত হয়; কিন্তু এ বিষয়ের নিশ্চয়তা নাই।

কলিকাতার বাজারে এক শত প্রকারেরও অধিক রেড়ী আমদানি হইয়া থাকে। এই সকল রেড়ীকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়—(১) যে সকল রেড়ী ভাগলপুর, বেহার ও উত্তর পশ্চিম হইতে আমদানি হয় ও (২) যাহা সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থান হইতে আইসে। উত্তর ভারতের রেড়ীর মধ্যে কয়েকটীকে প্রধান বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়। পীরপৈঁতি, কহলগাঁ, সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর, মকায়া, বামুনগামা, মথুরাপুর, বিস্নুনি, রেভেলগঞ্জ, সিতারা, রসুলপুর, বখতীয়ারপুর, জুমাই, দারভাঙ্গা, রোশড়া, বীরপুর, ইটোয়া, হাত্রাস ইত্যাদি। সমুদ্রকূলবর্ত্তী রেড়ীর মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান,—কোথাপটনম্, মান্দ্রাজ, মসুলিপাটাম, কোকোনাডা, ব্রজবাহা, কটক, বালেশ্বর ও মেদিনীপুর। উত্তর ভারতের রেড়ীর মধ্যে সকলের চেয়ে, পীরপৈঁতিরই রেড়ী ভাল বলিয়া পরিগণিত, তাহার নীচে কহলগাঁ, সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর ও মকায়া। সমুদ্রতীরবর্ত্তী রেড়ীর মধ্যে কোথপটনম্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কোথাপটনমের তুল্য কোন রেড়ীই কলিকাতার বাজারে আমদানি হয় না। কোথাপাটনমের নীচে কোকোনাডা। মোটামুটি কথা এই, পাগাড়তলি স্থানে যে রেড়ী হয় তাহা চর জমির রেড়ীর অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট।

চাষ—বঙ্গদেশে সর্ব্বত্রই রেড়ীর চাষ হইতে পারে, কিন্তু পাটনা অঞ্চলেই ইহার অধিক চাষ হয়। কৃষকেরা এখানে তিন প্রকার রেড়ীর চাষ করিয়া থাকে, যথা ভাদোই, বাসন্তী বা সালুক এবং চনাকি। প্রথমটী অন্যান্য খরিফ বা বর্ষাকালের ফসলের সহিত উৎপত্তি হয় বলিয়া তাই ইহার ভাদোই নাম হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম জল পড়িলে কৃষকেরা ইহা ক্ষেত্রে অন্যান্য শস্যের সহিত বুনিয়া দেয়। মাঘমাসে ইহার ফল পরিপক্ক হয়। ভাদোই রেড়ীর দানা বড়, কিন্তু খোশা স্থূল। ভাদ্র আশ্বিন মাসে বাসন্তী রেড়ীর বুনন হইয়া থাকে ও চৈত্র মাসে ইহার ফল পরিপক হয়। চনাকি রেড়ীর বড় অধিক চাষ হয় না। ইহার ফল পাকিলে ফাটিয়া যায়, আর বীজ দূরে গিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়ে, তাই ইহার এরূপ নাম হইয়াছে। চনাকি রেড়ীর দানা ভাল, কিন্তু বীজ দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া অনেক নষ্ট হয়, লোকে তাই ইহার বড় অধিক চাষ করে না। ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে চনাকি রেড়ীর গাছ তিন বৎসর পর্য্যন্ত কৃষকেরা রাখিয়া দেয়। কিন্তু প্রথম বৎসর যেরূপ ফল হয়,

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে সেরূপ হয় না। তার পর গাছ মরিয়া যায়। নদীর ধারে দোঁয়াস জমিতেই রেড়ী ভালরূপ জন্মে। রেড়ীর চাষে কোনরূপ বিশেষ পরিশ্রম নাই। ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া দেড় হাত কি দুই হাত অন্তর এক একটী বীজ বপন করিতে হয়। কোনও স্থানে লোকে দুই হাত অন্তর কেবল একটী ছোট গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতেই বীজ বপন করিয়া দেয়। বুনিবার সময় বীজের মুখের দিক্ নীচে রাখিতে হয়। এক বিঘা বুনিতে পাচ সের বীজ যথেষ্ট। আট নয় দিনে বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হয়। গাছ যখন ছোট থাকে, তখন মাঝে মাঝে ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিলে রেড়ীর বিশেষ উপকার হয়। তাহা যদি না হয়, তবে নিড়াইয়া দিলেও চলিতে পারে। উদ্দেশ্য গোড়াগুলি একটু আল্গা থাকা। আর ঘাসে কি অপর কোনও গাছে ইহাকে চাপিয়া না ধরে, সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। মাঝে মাঝে লাঙ্গল দেওয়া ও গোড়া আল্গা করিয়া দেওয়ার আরও উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দারা আশে পাশের ছোট ছোট শিকড় কাটিয়া যায়, তাহাতে গাছ লম্বা হইয়া উর্দ্ধমুখে বাড়িতে পারে না, তখন ইহার প্রতিগাঁট হইতে শাখা প্রশাখা বাহির হইতে থাকে। উর্দ্ধমুখে দীর্ঘ হইয়া বাড়িয়া উঠিলে, মাথায় কেবল এক গুচ্ছ ফল হইবে অধিক হইবে না। আর চারিদিকে শাখা প্রশাখা হইলে, প্রতি শাখায় দুই তিন থোলো করিয়া ফল হইবে। এক এক গুচ্ছে ২৫ হইতে ৩০টী করিয়া ফল থাকে, প্রতি ফলে তিনটি করিয়া বীজ থাকে। যদি অপর কোন ফসলের সহিত ইহার চাষ করা হয়, তাহা হইলে সেই ফসলের পা'টের সঙ্গে সঙ্গে রেড়ীরও পা'ট হইয়া যায়।

রেড়ীর ফল 'পাকোপাকো' হইয়া আসিলে কৃষকদিগের ছেলেরা দেখিতে থাকে, কোন থোলোটীর বীজ এক-আধটী ফাটিয়া বাহির হয়। থোলোর এক আধটী ফল ফাটিলেই সমস্ত থোলোটী কাটিয়া লইতে হয়। তার পর থোলোগুলি ঘরের ভিতর ছায়াতে রাখিতে হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ফল সংগ্রহ হইলে, যখন গাছগুলি ফল-শূন্য হইয়া পড়ে, তখন সংগৃহীত ফল সকল একত্র করিয়া একটী গর্ত্তের ভিতর রাখিতে হয়। অল্প জলে কিঞ্চিৎ গোবর গুলিয়া সেই জল ইহার উপর ছড়াইয়া দিতে হয়। তার পর হয় একখণ্ড মাদুর না হয় গুন দিয়া তাহা চাপা দিতে হয়। তিন দিন পরে ফল-গুলিকে বাহির করিয়া রৌদ্রে দিয়া অল্প পিটিলেই সমুদয় খোশা বীজ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। কিন্তু বুনিবার নিমিত্ত যে বীজ রাখিতে হইবে, তাহা এরূপ করিলে চলিবে না। তাহাতে জল আছড়া দিয়া শুকাইলে রসে ও উত্তাপে বীজ-নিহিত অঙ্কুরের প্রাণ নষ্ট হইতে পারে। বীজের জন্য যে রেড়ী রাখিতে হইবে, তাহার ফল দুই তিন দিন রৌদ্রে শুকাইয়া একখণ্ড তক্তার উপর রাখিয়া পিটিয়া খোসা পৃথক্ করিয়া লইতে হইবে। এক বিঘায় একেলা রেড়ীর চাষ করিলে চারি হইতে বার মণ রেড়ী উৎপন্ন হইতে পারে।

ভাগলপুর, মুঙ্গের, মালদহ, পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে পাঁচ প্রকার রেড়ীর চাষ হইয়া থাকে, যথা—মুঠীয়া, ঝোকিয়া, চনাকি, গোহুমা ও ভাদোইয়া। প্রথম চা কাপ্রন্নির

রেড়ীর অগ্রহায়ণ মাসে বুনন হইয়া থাকে, চৈত্র বৈশাখ মাসে ইহাদের ফল সংগৃহীত হয়। ভাদোইয়া রেড়ীর জ্যৈষ্ঠ মাসে বুনন হয়; অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে ইহার ফল সংগৃহীত হয়। রেশমের জন্য যেখানে তুঁতের চাষ হয়, সেইখানে অনেক স্থানে ক্ষেত্রের আলের উপর, লোকে রেড়ী বুনিয়া দেয়। যশোহর জিলায় এই দুই প্রকার রেড়ী দেখিতে পাওয়া যায়, খুদে ও বাঘা। খুদে অবশ্য ছোট, আর বাঘা বড়। খুদে, বনে-বাদাড়ে আপন-আপনি হয়, কেহ ইহার চাষ করে না, ইহার ফলও কেহ কুড়ায় না। বাঘা, লোকের খেতের ধারে বুনিয়া দেয়। গাছ বড় হইলে ইহা এক প্রকার বেড়ার মত হইয়া ভিতরের ফসলকে গরু বাছুর হইতে রক্ষা করে। পূর্ব্বদেশে রেড়ীর বড় চাষ হয় না। কখনও কখনও হরিদ্রার সঙ্গে লোকে ইহা বুনিয়া থাকে। কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোণা প্রভৃতি স্থানে ক্ষেত্রের ধারে ধারে রেড়ীগাছের সা'র দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিয়াছি সুসঙ্গের বনে না-কি অনেক রেড়ীর গাছ আপনা-আপনি জন্মে। লোকে কিন্তু ইহার ফল আহরণ করে না। বীজ গাছ-তলায় পড়িয়া পচিয়া যায়। গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতার বাজারে কখনও কখনও এক প্রকার ক্ষুদ্র রেড়ীর আমদানি হয়। তাহার কিন্তু বড় আদর নাই।

মেদিনীপুর জিলায় সুবর্ণরেখা ও দোলঙ্গ নদীর ধারে প্রচুর পরিমাণে রেড়ী জন্মে। বালেশ্বর ও কটকেও রেড়ী হইয়া থাকে। উৎকল ভাষায় রেড়ীকে গাব বা জড় বলে। প্রধানতঃ রেড়ী এখানে দুই জাতিতে বিভক্ত, বড় ও ছোট; বড়কে উড়িয়া ভাষায় বড়-গাব আর ছোটকে চুনি-গাব বলে। বড় গাবের আবার দুইটী ভেদ আছে, যথা পতা-জড় আর কলা-জড়। ছোট জাতিরও দুইটী ভেদ, চুনি ও জহুরি। বড় গাবের গাছ প্রায় আট হাত উচ্চ হইয়া থাকে, ইহার পত্র ঈষৎ রক্তিমাবর্ণ। ছোট-গাব তিন চারি হস্তের অধিক উচ্চ হয় না, ইহার পত্র হরিদ্রা-বর্ণ। বপন করিবার পূর্ব্বে উৎকলবাসীরা, বীজ তিন চারি দিন জলে ভিজাইয়া রাখে। পূর্ব্বদেশেরও কোনও কোনও স্থানে এ প্রথা প্রচলিত আছে।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় সকল স্থানে রেড়ীর চাষ হয়। লোকে ইহাকে অন্যান্য ফসলের সঙ্গে বুনিয়া থাকে। ক্ষেত্রের পার্শ্বে ইহার পংক্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। খরিফ ফসলের ক্ষেত্রের মাঝে মাঝেও রেড়ীগাছ থাকে। কৃষকেরা তাহার কাছে বরবটি ও সিম গাছ পুতিয়া দেয়। এই দুই লতা রেড়ী-গাছের উপর গিয়া উঠে, সুতরাং কৃষকেরা এককালে দুইটী দ্রব্য লাভ করে।

পঞ্জাবে বড় অধিক রেড়ীর চাষ হয় না। এখানকার দুরন্ত শীতে রেড়ী-গাছ মরিয়া যায়। "পালা" রেড়ীর পরম শত্রু। শীতকালে রাত্রিতে শিশির জমিয়া যে সাদা সাদা নুনের মত হয়, তাহাকে "পালা" বলে।

বোম্বাই অঞ্চলে, সুরাট, আহ্মদনগর প্রভৃতি স্থানে রেড়ির চাষ হয়। এখানে রেড়ির গাছ দুই প্রকার, বড় ও ছোট। ইক্ষু, পান প্রভৃতি ক্ষেত্রের চারিদিকে লোকে

বড় জাতীয় গাছ পুতিয়া দেয়। প্রচুর পরিমাণে জল ও সার পাইয়া এই জাতীয় রেড়ি উচ্চ বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, আর অনেক দিন জীবিত থাকে। কিন্তু ইহার তেল ভাল নয়। অপরিষ্কার ও ঘন। জ্বালাইবার কাজ ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে লাগে না। ছোট জাতীয় রেড়ি, লোকে অন্যান্য খরিফ ফসলের সহিত বুনিয়া থাকে। ইহার গাছ বাৎসরিক, অর্থাৎ এক বৎসরেই ফল ফলিয়া মরিয়া যায়। ইহার তেল উৎকৃষ্ট, ঔষধেও ব্যবহার হইতে পারে।

বোম্বাইয়ের মত মান্দ্রাজেও রেড়ি বড় ও ছোট জাতিতে বিভক্ত। তাহা ছাড়া স্থানে স্থানে আরও কিছু সামান্য জাতিভেদ আছে। কৃষ্ণা নদীর কূলে পিয়ারা নামক এক জাতীয় রেড়ির গাছ দৃষ্ট হয়। এ গাছের শাখা-প্রশাখা বাহির হয় না। আবার কোইমবাটুর জিলায় মুলিকোট্টাই নামক এক প্রকার রেড়ি আছে, ইহার ফল ক্ষুদ্র ও তাহার উপর কাঁটা থাকে না। বড় জাতীয় রেড়ির,—গাছও বড়, বীজও বড়। স্বতন্ত্র ভাবে ইহাকে লোকে পুতিয়া থাকে। ইহার তেল কিন্তু ভাল নহে। প্রদীপে জ্বালাইবার জন্যই কেবল ব্যবহৃত হয়। ছোট জাতীয় রেড়ি অন্যান্য ফসলের সহিত জন্মে। ইহার তেল উৎকৃষ্ট। কলিকাতার বাজারে এই রেড়ি অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। গোদাবরী, কৃষ্ণা, সালেম, বেল্লারি প্রভৃতি জিলায় অনেক পরিমাণে রেড়ির চাষ হইয়া থাকে। কোকনাডা, মসুলিপাটাম, কোথাপটনম, মান্দ্রাজ এই সমুদয় বন্দর হইতে—রেড়ি, বিদেশে প্রেরিত হয়। কলিকাতা হইতে তেলের রপ্তানি অধিক, মান্দ্রাজ হইতে বীজের রপ্তানি অধিক। মান্দ্রাজ হইতে যে বীজ বিদেশে প্রেরিত হয়, তাহার অধিকাংশ ফরাশি দেশে—মারসেলি নগরে ও ইতালি দেশে ভেনিসে গিয়া থাকে। পর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবন ও রুষ দেশে সিবাষ্টপুল ও ওডেসাতেও কতক কতক বীজ প্রেরিত হয়।

চাষের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে আমার বক্তব্য এই যে, এক দিকে পিরপৈঁতি অপর দিকে কোথাপটনম, এই দুই স্থানের বীজ সর্ব্বোত্তম বলিয়া পরিগণিত। এই দুই বীজ কলিকাতার বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। অতএব যে সকল জমিদার-দিগের এলাকাতে রেড়ির চাষ হইয়া থাকে, তাঁহারা যদি পিরপৈঁতি বা কোথাপটনম বীজ আনাইয়া কৃষকদিগকে প্রদান করেন, তাহা হইলে বোধ হয় উপকার হইতে পারে। এই দুই বীজ হইতে রেড়ি উৎপন্ন করিলে, ভাল দানা হইবার সম্ভাবনা। ভাল রেড়ি হইলে মূল্যও তাহার অধিক হয়। অধিক মূল্য পাইলে কৃষকেরা আপনারাই আগ্রহের সহিত ভাল বীজ কিনিয়া লইবে। ইহার পর কৃষকদিগকে আর লাভালাভ বুঝাইয়া দিতে হইবে না। কলিকাতায় কিন্তু তেল করিবার নিমিত্ত যে পিরপৈঁতি ও কোথাপটনম দানা আনিত হয়, তাহা বুনিবার পক্ষে কতদূর উপযোগী বলিতে পারি না। গোবর জল-আছড়ায়, রসে ও উত্তাপে সে বীজের প্রাণ নাশ না হইলেও তাহার কিছু না কিছু বৈল-

ক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। সে জন্য ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, নেল্লোর, কৃষ্ণা, গোদাবরী প্রভৃতি জিলায় বুনিবার নিমিত্ত কৃষকেরা যে বীজ রাখিয়া দেয়, তাহাই লইয়া আসা কর্ত্তব্য। আবার আর একটী কথা। আপাততঃ ভাল বীজ হইতে ভাল রেড়ি উৎপন্ন হইলেও যদি এ দেশজাত বীজ বার বার রোপিত হয়, তাহা হইলে তাহার ক্রমে অবনতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তাই দেশ-জাত বীজ বপন না করিয়া বিদেশ-জাত বীজ বপন করাই ভাল। ভাল বীজ হইতে যে ভাল ফল হয়, তাহা বিলাতের লোকে বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। বীজ প্রস্তুত করা, বীজ বিক্রয় করা, সেখানে একটী স্বতন্ত্র ব্যবসা। বীজ ব্যবসায়ীরা কেবল বীজের জন্য যাহা কিছু সামান্য চাষ করেন, ফসলের জন্য চাষ করেন না। যেমন কৃষকের চেষ্টা কিসে অধিক ফসল হইবে; তেমনই বীজ-ব্যবসায়ীদিগের কেবল এই চেষ্টা, এই ভাবনা যে, কিসে আমার বীজটী সর্ব্বোত্তম হইবে, আর কৃষকেরা আসিয়া অধিক মূল্য দিয়া কিনিবে।

অনেক স্থানে প্রদীপে জ্বালাইবার নিমিত্ত লোকে ঘরে রেড়ির তেল বাহির করে। ঘরে, তেল বাহির করিতে হইলে, রেড়িকে প্রথমে খোলায় অল্প ভাজিতে হয়। তাহার পর ঐ ভাজা-রেড়িকে প্রথম ঢেঁকি কি উখলি কি হামানদিস্তায় কুটিয়া লইতে হয়। কুটা-রেড়িকে জলের সহিত মিশাইয়া সিদ্ধ করিলে তেল উপরে ভাসিয়া উঠে। সেই তেল উঠাইয়া লইয়া আর একবার সিদ্ধ করিলে জল শুকাইয়া যায়, কেবল তেল রহিয়া যায়। কুটা রেড়ি একবার সিদ্ধ করিলে যদি সমস্ত তেল বাহির না হয়, তাহা হইলে আর দু একবারও সিদ্ধ করিতে পারা যায়। কোনও কোনও স্থানে কুটিবার পূর্ব্বে আস্ত রেড়িকে লোকে প্রথম সিদ্ধ করে, তাহার পর রৌদ্রে শুকাইয়া কুটিয়া লয়। এরূপ করিলে তেল উত্তমরূপ বাহির হইয়া আইসে। ঘরে কৃষকেরা যে তেল বাহির করে, তাহা অপরিষ্কার। প্রদীপে ভিন্ন আর তাহা অন্য কাজে লাগে না। কলুদিগের ঘানি দ্বারাও রেড়ির তেল বাহির করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণরূপে তেল বাহির হয় না, অনেক রহিয়া যায় ও নষ্ট হয়।

অধিক পরিমাণে রেড়ির তেল বাহির করিতে হইলে কলের আবশ্যক হয়। ঐ কল লৌহ নির্ম্মিত, ইহাকে প্রেস বলে। কলিকাতায় আজ কাল এই কল প্রস্তুত হইতেছে। এই কলটী ইস্‌ক্রুপের দ্বারা প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করিতে পারা যায়। সেই সঙ্কুচনেই রেড়িতে চাপ পড়ে, তাহাতেই তেল বাহির হয়। কলে সম্মুখে অগ্নি জ্বালাইবার স্থান আছে। তেল বাহির করিবার সময় এই স্থানে আগুন জ্বালিতে হয়। আগুনের উত্তাপ গিয়া রেড়িতে লাগে, তাহাতে তৈল বিগলিত হইয়া নিঃসরণের সহায়তা করে। প্রধানত রেড়ি তৈল চারি প্রকার। যথা,—কোল্ডড্রন (Cold drawn) প্রথম নম্বর (No 1), দ্বিতীয় নম্বর (No 2), তৃতীয় নম্বর (No 3), দ্বিতীয় নম্বরে আবার নানারূপ ভেদ আছে, যথা গুডসেকণ্ড (Good Second)

অরডিনারি নম্বর টু (Ordinary No 2) লণ্ডন কোয়ালিটি (London Quality) লিভারপুল কোয়ালিটি (Liverpool Quality) গ্লাসগো কোয়ালিটি (Glasgaw Quality) ইত্যাদি। রেড়ির তেল কিছুদিন ঘরে থাকিলে পরিষ্কার হইয়া আইসে। সুতরাং আজ যে তেলটী এক প্রকার, কাল সেটী অন্য প্রকার হইয়া যায় এ জন্য উপরি উক্ত কয়প্রকার তেলের বিশেষ একটী নির্দ্ধারিত লক্ষণ নাই। পরিষ্কার, শুভ্রবর্ণ, তরল তৈল উৎকৃষ্ট ; তদ্বিপরীত নিকৃষ্ট।

কলের দ্বারা রেড়ি হইতে ঐ প্রণালীতে তেল বাহির হইয়া থাকে। ভাল তেল করিতে হইলে প্রথম রেড়িকে কুলা দ্বারা ঝাড়িয়া লইতে হয়। ইহাতে ছোট দানা, ধুলা প্রভৃতি দ্রব্য পৃথক্ হইয়া যায়। তাহার পর তক্তার উপর একবারে যতগুলি ধরে ততগুলি রেড়ি রাখিয়া কাঠের হাতল দিয়া এক ঘা মারিতে হয়। ইহাতে বীজের উপর যে যে খোসা থাকে, তাহা পৃথক্ হইয়া যায়। ইহাকে পুনরায় কুলা দ্বারা ঝাড়িলে খোসা সমুদয় উড়িয়া যায়। আর হাতলের আঘাতে যে সকল বীজ একেবারেই চূর্ণ হইয়া যায়, তাহাও পৃথক্ হইয়া পড়ে। গোটা গোটা শাঁসগুলি তখন কুলার উপর ছড়াইয়া হাতে একটী একটী করিয়া বাছিতে হয়। যে সকল শাঁস ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়। এইরূপ হরিদ্রা বর্ণের একটী শাঁস যদি পাঁচ সের শুভ্র বর্ণের শাঁসের সহিত মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে সমুদয় তেল টুকুকে বিবর্ণ করিয়া ফেলে। যখন বীজগুলি খোসা দ্বারা আবৃত থাকে, তখন কোন্‌টীর ভিতর শুভ্রবর্ণের আর কোন্‌টীতে হরিদ্রা বর্ণের শস্য আছে, তাহা বলিবার যো নাই। বীজ না ভাঙ্গিলে ইহা টের পাওয়া যায় না। কথিত আছে যে, বীজ অধিক পাকিয়া যাইলে ভিতরে এইরূপ হরিদ্রা বর্ণের শস্য হয়। এইরূপ মন্দ শাঁস বাছিয়া ফেলিয়া ভাল শাসগুলিকে রৌদ্রে দিতে হয়। রৌদ্রে শুষ্ক হইলে শাঁসকে এক প্রকার চক্রের ভিতর দিয়া অল্প ভাঙ্গিয়া লইতে হয়। কোল্ডড্রন তেল প্রস্তুত করিতে হইলে শাঁস ভাঙ্গিতে হয় না। প্রায় এক ফুট লম্বা চট কাপড়ে ভিতর যতগুলি শাঁস ধরে, তাহা রাখিয়া চট মুড়িয়া দিতে হয়। শাঁস-সম্বলিত এক এক খণ্ড চটকে পুডিং বলে। এই পুডিংগুলি লইয়া তখন কলের ভিতর সাজাইয়া দিতে হয়। একটী করিয়া পুডিং আর একখানি করিয়া লৌহপাত্র রাখিয়া পুডিংদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক্ করিয়া সাজাইয়া দিতে হয়।পুডিং দ্বারা কলটী আগা- গোড়া পূরিয়া যাইলে, তখন কলের স্ক্রুপে পাক দিতে হয়। তাহাতে পুডিংএর উপর চাপ পড়ে, নিষ্পীড়িত হইয়া তাহা হইতে তেল বাহির হইতে থাকে, আর সেই তেল ফোঁটা ফোঁটা নীচে পড়িতে থাকে। এই সময় পুডিংদিগের সম্মুখে অগ্নি জ্বালিবার স্থানে অগ্নি জ্বালিয়া দিতে হয়। পুডিং-মধ্যস্থিত রেড়ির শাঁসে সেই অগ্নির উত্তাপ লাগিয়া তেল বিগলিত হইয়া ভালরূপে বাহির হইতে থাকে। কোল্ডড্রন তেল করিতে হইলে, অগ্নি ব্যবহার করিতে নাই, কিন্তু

কেহ কেহ অল্প উত্তাপ দিয়াও থাকেন। কি কোল্ডডন কি ১ নম্বর তেলের জন্য ভাল কাঠের কয়লা বা কোক্ কয়লার আবশ্যক। কয়লা মন্দ হইলে আগুণ হইতে ধূম নির্গত হইয়া তেল বিবর্ণ হইয়া পড়ে। কোল্ডড্রন তেল প্রস্তুত করিতে হইলে শাঁস হইতে সমস্ত তেল বাহির করিয়া লইতে নাই। তাহাতে তেল পরিষ্কার ও তরল হয় না। বার আনা রূপ তৈল বাহির হইলেই ছাড়িয়া দিতে হয়। যে খোল রহিয়া যায়, তাহা তিন নম্বর তেলের রেড়ির সহিত মিশাইয়া পুনরায় অবশিষ্ট তেল বাহির করিয়া লইতে পারা যায়। ১ নম্বর তেল করিতেও লোকে সম্পূর্ণরূপ তেল বাহির করে না; শাঁসে কিছু তেল বাকি থাকিতে নিষ্পীড়ন কার্য্য স্থগিত করিয়া দেয়। ২ কি ৩ নম্বর তেল করিতে শাঁস হইতে সমুদয় তেলটুকু লোকে বাহির করিয়া লয়। তেল বাহির হইয়া পুড়িং সব যেমন অল্পা হইতে থাকে, তেমনি আরও স্ক্রুপ আঁটিয়া দিতে হয়। এই সময় স্ক্রুপ আঁটিতে অতিশয় বলপ্রয়োগের আবশ্যক। তাই তৈলনিষ্পীড়ক একবার নীচে নামে আবার পুনরায় কলের উপর চড়িয়া বসিয়া স্ক্রুপে তাহার সমুদয় দেহের ভার ও বল প্রয়োগ করিতে থাকে। এই সময় সে শীঘ্রই শ্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়া পড়ে। কলে চাপ দিবার নিমিত্ত কোনও কোনও স্থানে জলীয়কলের (Hydaulic power) সহায়তা গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু কলিকাতার প্রায় সকল কলই মানুষের বল দ্বারা পরিচালিত হয়, বাষ্পীয় বলে ইহার কার্য্য ভালরূপ হয় না, কারণ স্ক্রুপের চাপ অতি সাবধানে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিতে হয়। তিন মণ রেড়ি ভাঙ্গিলে দুই মণ শাঁস হয়, ঐ শাঁসে কলটী পরিপূর্ণ হয়, আর একবারের নিষ্পীড়ন কার্য্য ইহাতেই হইয়া থাকে। সকল রেড়িতে সমান তেল বাহির হয় না। কোথাপটনম ও পিরপৈঁতির ১০০ মণ বীজে ৪১ মণ তৈল বাহির হয়। কহলগাঁ, কোকোনাডা, ভাগলপুরের ১০০ মণে ৪০ মণ বাহির হইয়া থাকে। অপরাপর নিকৃষ্ট রেড়ি হইতে শতকরা ৩০ হইতে ৩৮ মণ তেল বাহির হয়। সকল রেড়িতে কোল্ডড্রন কি ১ নম্বর তেল প্রস্তুত হয় না। ইহার জন্য কোথাপটনম, কোকনাডা ও পিরপৈঁতিই সর্ব্বোত্তম।

কল হইতে তেল বাহির করা হইল। এই তেল এক্ষণে অতিশয় অপরিস্কার ও গাঢ়। ইহাকে পরিস্কার ও তরল করিতে হইবে। জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক্ষণে অনেকক্ষণ ধরিয়া কলাই-করা-তাঁবার-ডেকচিতে সিদ্ধ করিতে হইবে। সিদ্ধ করিবার সময় বড়ই সাবধানতার আবশ্যক। যেরূপ বৈদ্যদিগের পাক তেল নামাইতে বিশেষরূপে বিচক্ষণতার আবশ্য করে, ইহাও তদ্রূপ। যদি খরপাক হইয়া যায়, তাহা হইলে রেড়ির তেল বিবর্ণ হইয়া পড়ে, উত্তমবর্ণ থাকে না; অপরিস্কৃত হইয়া যায়, এবং তাহাতে রক্তিমা আভার উদয় হয়। রক্তিমা আভাযুক্ত তেলের আদর কম, মূল্যও কম আবার তেল কাঁচা থাকিলে তাহাতে জল রহিয়া যায়, সুতরাং অল্প দিন পরে সে তেল পচিয়া যায়। সিদ্ধ হইলে তেল উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইতে হয়। ইহার জন্য

কাঠের ফ্রেম আছে সেই ফ্রেমের উপরিভাগে এক খানির নীচে আর একখানি, এইরূপ অনেক খণ্ড কাপড় সংলগ্ন থাকে, তলভাগে দুই তিন খণ্ড ফেলানেল থাকে। প্রথম কাপড়ের উপর তেল ঢালিয়া দিলে, ফোঁটায় ফোঁটায় দ্বিতীয় কাপড় খণ্ডে তেল পড়িতে থাকে, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়। এইরূপে সমস্ত কাপড় ও ফেলানেল পার হইয়া তেল নীচে গিয়া একটী গামলায় পতিত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাপড়-খণ্ডে কাঠের কয়লার গুঁড়া রাখিতে হয়। তাহাতে তেল উত্তম পরিষ্কার হয়। কোল্ডড্রনের পক্ষে, শুনিয়াছি, পশু-হাড়ের কয়লা (animal charcoal) বিশেষ পরিষ্কারক। কেহ কেহ আবার কোল্ডড্রন তেল এ প্রণালীতে না ছাঁকিয়া ব্লটিং কাগজে ছাঁকিয়া লন। ইহার জন্য ছিদ্রময় টিনের অনেকগুলি ফনেলের আবশ্যক করে। ফনেলের ভিতর কয়লার গুঁড়া ও ব্লটিং পেপার রাখিয়া উপরেরটীতে তেল ঢালিয়া দিলে, টোসায় টোসায় সব ফনেল পার হইয়া তেল বিশুদ্ধ হইয়া যায়। ছাঁকিবার পর কোল্ডড্রন তেলের আর কিছু করিতে হয় না। কোল্ডড্রন ও ১ নম্বর তেলই ছাঁকিতে বিশেষরূপে যত্ন করিতে হয়। অপর সব নিকৃষ্ট নম্বরের তেল কেবল দুই তিনখানি কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলেই চলিতে পারে। ছাঁকা হইয়া যাইলে ১ নম্বর প্রভৃতি তৈল এক্ষণে হৌজ বা ট্যাঙ্কে লইয়া ফেলিতে হয়। এখানে চারি পাঁচ দিন রৌদ্র খাইলে তেল আরও পরিষ্কার হইয়া আসে। তাহার পর টিনের ক্যানেস্তারায় বন্ধ করিয়া বিক্রয় করিতে হয়। কোল্ডড্রন ও ১ নম্বর তেলের জন্য বীজ বাছিতে ও পরিষ্কার করিতে যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হয়, অপর সকল নম্বার তেলের জন্য লোকে সেরূপ যত্ন করে না। ৩ নম্বর তেলের জন্য লোকে যৎসামান্যই যত্ন করিয়া থাকে।

১ নম্বর তেলও আজকাল ঔষধে ব্যবহার হইতেছে। কিন্তু ইহা অন্যায়; কারণ এ তেলে অনেকটা রেড়ীর রুক্ষ স্বভাব (acridity) বর্তমান থাকে, তাহাতে পাকস্থলীর ও অন্ত্রের প্রদাহ উপস্থিত করিতে পারে। শস্তা ঔষধ ব্যবহার করা কখনই উচিত নহে। সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করিতেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কল-কব্জার নানা স্থানে পরস্পরে ঘর্ষণ নিবারণের জন্য ২ নম্বর তেল বিশেষ প্রয়োজন হয়। ৩ নম্বর তেল প্রদীপে জ্বালাইবার নিমিত্তই লোকে ক্রয় করে। ইহা অষ্ট্রেলিয়াতেও প্রেরিত হয়। শুনিয়াছি সেখানকার লোকে ইহা মেষের গায়ে মাখাইয়া দেয়। তাহা করিলে পশম বৰ্দ্ধিত হয়।

রেড়ীর খো'ল অতি উত্তম সার। ইক্ষু ও আলু প্রভৃতি ফসলে, (যাহার মূল লইয়া আমাদের প্রয়োজন, তাহার জন্য) ইহা বিশেষ উপকারী। অন্যান্য দ্রব্যের খো'ল ক্ষেতে কিছু বিলম্বে ফলদায়ক হয়। কিন্তু রেড়ীর খো'ল সত্বর ফসলকে বলশালী করিয়া তুলে। আসাম ও বঙ্গদেশের উত্তর বিভাগে এড়ি নামক এক প্রকার রেশমের কীট আছে। ইহারা রেড়ির পাতা খাইয়া জীবিত থাকে। এই রেশম হইতে যে কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহার তুল্য দীর্ঘকালস্থায়ী কাপড় আর পৃথিবীতে নাই। ছিঁড়িতে জানে

না। এক কাপড় পুরুষ-পুরুষানুক্রমে ব্যবহার করিতে পারা যায়, লোকের এইরূপ বিশ্বাস। আজকাল এই কাপড় ইংরেজ ও ভদ্র দেশীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে অধিক প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এড়ি রেশমের কথা স্বতন্ত্র। সে কাহিনী এখানে আরম্ভ করিলে পুঁথি বড়ই বাড়িয়া যাইবে।

ফরাসি, ইতালি প্রভৃতি দেশে এখান হইতে অনেক রেড়ীর বীজ প্রেরিত হইয়া থাকে। বীজ না লইয়া যাহাতে তাহারা তেল লয়, এ বিষয়ে আমাদের যত্নবান্ হওয়া উচিত। তেল বাহির করিতে যে পরিশ্রম হয়, তাহার মূল্য আমরা পাই না, তাহায় লাভও পাই না। আবার এ দেশে 'খোল' রহিয়া যাইলে ভূমির সার হইতে পারে। তাহাতে ভূমি তেজঃশালী হইয়া যে অধিক পরিমাণে ফসল হয়, তাহাও আমরা এক্ষণে পাই না। সুতরাং বিদেশে বীজ না গিয়া যাহাতে তেল যায়, সে বিষয়ে আমাদিগের যত্ন করা কর্ত্তব্য।

সদ্য বৃষ্টির অনাবৃষ্টির জ্ঞান

সূক্ষ্মগণনার অভাবে বৎসর গণনার নির্দ্দিষ্ট ফল ঠিক ঠিক মেলে না। এই সকল কারণে বৃষ্টি অনাবৃষ্টির প্রাকৃতিক লক্ষণগুলি জানিয়া রাখিলে অনেক সময় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। প্রকৃতির শিশু প্রকৃতির সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত হইলে, নিত্য সাহার্য্য করিলে তাহাদের একটা স্বাভাবিক জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। সে জ্ঞানটা উপেক্ষার জিনিষ নহে। একটা সামান্য নৌকার মাঝি দূরবীক্ষণ কম্পাসাদি যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত, দিনে রাতে সমানভাবে নৌকা চালনা করিতে পারে, বায়ুর গতি দেখিয়া ঝড় বৃষ্টির লক্ষণ বুঝিয়া লয়, মেঘের আকৃতি, প্রকৃতি, স্থান দেখিয়া আবহাওয়ার লক্ষণ নির্ণয় করে। এই সকল কারণে সাধারণতঃ প্রচলিত প্রবচনগুলি মহামূল্যবান।

চাষীর পক্ষে বৃষ্টি বিজ্ঞান যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আমরা ইতিপূর্ব্বে পরাসর সংহিতা হইতে বৃষ্টি বিজ্ঞান সম্বন্ধে কৃষকে বহু বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি এবং তাহাতে খনার বচন ও গ্রাম্য প্রবচনগুলি যথাসম্ভব সন্নিবেশিত হইয়াছে। এখন আমরা আশু বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির লক্ষণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চাই। বৃষ্টি হবে কি না হবে ইহা জানিবার উপায় থাকিলে অনেক অযথা পরিশ্রম, সময় ও অর্থনাশের সম্ভাবনা হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। আবহাওয়া লক্ষণ নির্ণয়ের গবর্ণমেণ্টের

যে ব্যবস্থা আছে, তাহার বিবরণী সাধারণ চাষীর গোচরে আসে না। আবহাওয়া নির্ণয় অতি সূক্ষ্ম গণনার উপর নির্ভর করে সুতরাং কোনখানে একটা ভুল হইলে সমস্ত গণনাটা ভুল হইয়া যায়।

জলহস্তো জলস্থো বা নিকটেঽথ জলস্থ বা।
দৃষ্ট্বা পৃচ্ছতি বৃষ্ট্যর্থং বৃষ্টিঃ সংজায়তেঽচিরাৎ॥
অকস্মাদন্নমাদায় উত্তিষ্ঠতি পিপীলিকা।
ভেকঃ শব্দায়তেঽকস্মাৎ তদা বৃষ্টির্ভবেদ্ ধ্রুবম্॥
বিড়ালা নকুলাঃ সর্পা যে চান্যে বা বিলেশয়াঃ।
ধাবন্তি শরভা মত্তাঃ সদ্যোবৃষ্টির্ভবেদ্ ধ্রুবম্॥
কুর্ব্বন্তি বালকা মার্গে ধূলীভিঃ সেতুবন্ধনম্।
ময়ূরাশ্চৈব নৃত্যন্তি সদ্যোবৃষ্টিঃ প্রজায়তে॥
আঘাতবাতদুষ্টানাং নৃণামঙ্গব্যথা যদি।
বৃক্ষাগ্রারোহণঞ্চাহেঃ সদ্যোবর্ষণলক্ষণম্॥

জলের নিকটে বা জলমধ্যে যদি জলস্তম্ভ দৃষ্ট হয়, তবে আশু বৃষ্টি হইয়া থাকে। পিপীলিকা সকল অন্নগ্রহণ করিয়া সহসা উর্দ্ধে উঠিতে থাকিলে, অথবা ভেক সকল হঠাৎ শব্দ করিতে থাকিলে, নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি হইয়া থাকে। বিড়াল, নকুল, সর্প বা অন্য বিলেশয় (যাহারা বিলে বাস করে) জন্তু সকল অথবা শরভ (হরিণ বিশেষ) সকল প্রমত্ত হইয়া দৌড়িতে থাকিলে তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি হয়। বালকগণ যদি পথিমধ্যে ধূলিদ্বারা সেতু বন্ধন করে কিংবা ময়ুর সকল নৃত্য করিতে থাকে, তবে সদ্যঃ বৃষ্টি হইয়া থাকে। আঘাতজনিত-বাতাক্রান্ত ব্যক্তির পীড়িত অঙ্গে যদি সহসা ব্যথা উপস্থিত হয় অথবা সর্প সকল বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করিতে থাকে, তবে, তখনই বৃষ্টি হইবে, জানিবে।

বৃষ্টি হওয়া বা না হওয়া সম্বন্ধে খণারও বচন আছে যেমন—

দিনে মেঘ, রাতে তারা,
তবে জান্‌বে শুকোর ধারা।

যদি দিবাভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং রাত্রে আকাশ পরিষ্কার হইয়া নক্ষত্র ফুটিয়া উঠে তবে কিছুদিন অনাবৃষ্টির লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

বেঙ ডাকে ঘন ঘন, জল হবে শীঘ্র জেনো।

বেঙ ঘন ঘন ডাকিতে আরম্ভ করিলে শীঘ্র বারি বর্ষণ হয়।

কোদালে কুড়ুলে মেঘের গাঁ, এলো, মেলো বহে বা,

কৃষকে বল বাঁধ্‌তে আল আজ না হয়, হবে কাল ।

কাল সাদা খণ্ড খণ্ড ভাবে আকাশে যে মেঘ দেখা দেয় তাহাকে কোদালে কুড়ুলে মেঘ বলে। এই মেঘ দেখা দিলে এবং তার উপর চারিদিক হইতে এলো মেলো বাতাস বহিলে অবিলম্বে বৃষ্টি হইবে।

আশু বৃষ্টির আর একটি লক্ষণ আমাদের দেশের প্রবচনে শিক্ষা করা যায়।

অমোঘা পশ্চিমে মেঘা, অমোঘা পূর্ব্ব বায়সা, অমোঘা নৈরিতে বিদ্যুৎ।

পশ্চিমে নিবিড় মেঘ দেখা দিলে, পূর্ব্বদিক হইতে জোর বাতাস বহিতে থাকিলে, নৈরিতে বিদ্যুত দৃষ্ট হইলে আশু বৃষ্টি বুঝিতে হইবে।

চাঁদের শোভার মধ্যে তারা, বৃষ্টি বরষে মুষলধারা।

চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে তারা দেখা গেলে, অতি শীঘ্র মুষলধারায় বৃষ্টি হয়।

দূর শোভা নিকট জল, নিকট শোভা দূর জল।

চন্দ্রমণ্ডল যদি চন্দ্রের অনেকদূরে থাকে তবে আশু বৃষ্টি হয়, শোভা নিকট হইলে বিলম্বে বৃষ্টি হয়, এবং উহা অনাবৃষ্টির লক্ষণ।

পূবেতে উঠিলে কড়, ডাঙ্গা ডোবা একাকার।

বর্ষাকালে পূর্ব্বদিকে রামধনু উঠিলে অচিরে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়।

পশ্চিমের ধনু নিত্য খরা, পূবের ধনু বর্ষে ঝারা।

পশ্চিমে রামধনু দেখা দিলে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না—কিন্তু পূবের ধনুতে বারি বর্ষণের লক্ষণ জানিতে হইবে।

ভাদুরে মেঘে বিপরীত বায়। সেদিন বড় বর্ষা হয়॥

শ্রাবণ ভাদ্রে বহে ঈশান। কাঁধে কোদাল নাচে কৃষাণ॥

ভাদ্র মাসে যেদিকে মেঘ থাকে তাহার বিপরীত দিক হইতে বায়ু বহিলে সেদিন বাদল হইবে। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ঈশান দিক হইতে বাতাস বহিলে সুবৃষ্টি হয় তজ্জন্য কৃষকগণ আনন্দে কোদাল লইয়া নাচিতে নাচিতে ক্ষেত্রে যায়।

ভাদুরে মেঘে পূবে বায়। সেদিন বড় বর্ষা হয়॥

ভাদ্রমাসে পূর্ব্বদিক্ হইতে বাতাস বহিলে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়।

শ্রাবণে বায় পূবে যায়। হাল ছেড়ে চাষা বাণিজ্যে যায়

শ্রাবণ মাসে পূর্ব্বদিক হইতে বাতাস বহিলে শস্য কিছুই হয় না সুতরাং চাষ ধরা হাল ছাড়িয়া ব্যবসা করিতে যায়।

সাময়িক কৃষি-সংবাদ

ফাঙ্গাস্ বা উদ্ভিদাণুরোগ সম্বন্ধে কৃষিবিভাগের অনুসন্ধান—পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষতঃ ত্রিপুরা, নোয়াখালী এবং ঢাকা জিলায় উফ্রা, ডাক্ অথবা থোড়মরা নামে এক প্রকার ব্যারাম ধানের অত্যন্ত অনিষ্ট করিতেছে। সহকারী উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ এই ব্যারামের কারণ নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা ও ইহার সমালোচনা বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ করিয়াছেন। আনুবীক্ষণিক যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম কৃমি এই ব্যারামের আংশিক কারণ, এই কৃমি এত ক্ষুদ্র যে খালি চক্ষুতে ইহা দৃষ্টির অগোচর।

পীড়িত ধান গাছের বীজ (কৃমি) দ্বারা সুস্থ ধান গাছে (inoculation) টীকা দিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে যে এই কৃমিই ব্যারামের কারণ। ইংরাজীতে এই কৃমিকে ইল্‌ওয়ার্ম বা নিমাটোড্ (El-worm or nematode) কহে। এই ব্যারাম আষাঢ় কিম্বা শ্রাবণ মাসে জলডুবা ধানে দেখা যায় এবং অগ্রহায়ণ কি পৌষ মাস পর্য্যন্ত প্রাদুর্ভাব থাকে। ইহা প্রথমে অল্প স্থান ব্যাপিয়া আক্রমণ করে এবং ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। পীড়িত গাছ আনুবীক্ষণিক যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কৃমি শিষের ভিতর এবং পাতলা ধানের (চিটার) ভিতর থাকে। প্রত্যেক চিটা ধানে বহু সংখ্যক কৃমি পাওয়া গিয়া থাকে।

সাধারণতঃ ধানের ফুল বাহির হইবার পূর্ব্বেই এই ব্যারাম আক্রমণ করে এবং ঐ সময় গাছগুলিকে ঈষৎ লাল ও কাল রঙ্গের দেখায়।

গাছের থোড় ভিতরে আট্‌কাইয়া যায়, পরে গাছ মরিয়া যায়। থোড়ের ভিতরের কোমল পদার্থ পচিয়া দুর্গন্ধ হয়। থোড় আট্‌কিয়া যায় বলিয়াই ইহাকে থোড়মরা বলে। যদি ফুল বাহির হইবার পর গাছ এই ব্যারামে আক্রান্ত হয় তবে অনেক ধান পরিপক্ক হয় না এবং চিটা হইয়া যায়।

এই ব্যারাম নিবারণের উপায় বাহির করিবার জন্য পরীক্ষা আরম্ভ করা হইয়াছে। এক্ষণে নিম্নলিখিত উপায় সম্প্রতি অবলম্বন করা যাইতে পারে।—

(১) ধান আবাদের পর ভাটা এবং নাড়া বেশ ভালরূপ ক্ষেতে পুড়াইয়া ফেলিবে।

(২) অন্য ফসল না বুনা পর্য্যন্ত ক্ষেত পুনঃপুনঃ চাষ করিবে।

(৩) যে স্থানে এই ব্যারাম না হয় ঐ স্থান হইতে বীজ ধান সংগ্রহ করিবে এবং এই বীজধান একটী জলপূর্ণ পাত্রে ঢালিবে। পরে যে ধান ভাসিয়া উঠিবে তাহা উঠাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিবে; যে ধান জলে ডুবিয়াছে তাহা একটু শুকাইয়া বুনিবে।

(৪) কোনও ক্ষেতে প্রথমে রোগ দেখা দিলে পীড়িত ধান তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া ফেলিবে।

উপরোক্ত উপায় সকল কৃষকেরই অবলম্বন করিতে হইবে, নতুবা এক ক্ষেত হইতে অন্য ক্ষেত আক্রমণ করিবে।

রাজসাহী বিভাগে বিশেষতঃ রংপুর জিলায় গত শীত ঋতুতে গোল আলু এবং বিলাতি বেগুন ফাইটফ্থোরা ইন্‌ফেস্‌টেন্স (Phytophthora infestans) নামক এক প্রকার উদ্ভিদাণু রোগ ফসলের অনেক ক্ষতি করিয়াছে।

এই কাল-রোগ নিবারণের জন্য বোর্ড মিক্সার (তুঁতে ও চূণের জল) পীড়িত গাছে দম-কল দ্বারা ছড়াইয়া অনেক ফসল রক্ষা করা হইয়াছে। এই ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী এবং দমকলে কি ভাবে ছড়াইতে হয় অনেক স্থানে কৃষকদিগকে দেখান ও 'কৃষকে' আলোচিত হইয়াছে।

আলুর এই কাল-রোগ সমতল জমিতে পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। ইহার পার্ব্বতীয় স্থানেই প্রাদুর্ভাব ছিল। তথা হইতে আনিত পীড়িত আলু হইতে এই ব্যারাম অধুনা সমতল জিলায় বিস্তৃত হইয়াছে। অতএব শীত ঋতুতে পার্ব্বতীয় দেশ হইতে আলু আনিয়া কি প্রকারে গুদামজাত করিয়া কিম্বা বীজ আলু আনিয়া কি প্রকারে গুদমজাত করিয়া বীজ আলু এই ব্যারাম হইতে রক্ষা করা যাইতে পারা যায় তদুপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য হইয়াছে। শীত ঋতুতে এই ব্যারাম প্রাদুর্ভাব হইবার পূর্ব্বেই ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা আলু কাল রোগ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।

মুন্সিগঞ্জ ও বর্দ্ধমান বিভাগের কলাগাছের হাইতা বা হাতিমারা এবং ধসা ধরা ব্যারাম কিরূপ উদ্ভিদাণু রোগের কারণ তাহা পরীক্ষা এবং কি ভাবে এই ব্যারাম নিবারণ করা যায় তদ্বিষয় চেষ্টা করা হইতেছে।

খুলনার গুপারির প্লেগ বা মড়ক নামে যে রোগের কারণ এক প্রকার উদ্ভিদাণুরোগ, ফোমাস লুসিডাস (Fomes lucidus) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার এখনও পরীক্ষা চলিতেছে এবং ব্যারাম নিবারণের জন্য গাছের গোড়ায় চূণা দিয়া পরীক্ষা করা হইবে।

এতদ্ব্যতীত বীরভূম, খুলনা এবং কুড়িগ্রাম প্রদর্শনীতে দর্শকদিগকে নানা প্রকার উদ্ভিদাণুরোগের জীবনবৃত্তান্ত এবং উহা প্রতীকারের উপায়, প্রকৃত পীড়িত গাছের নমুনা দেখাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বর্দ্ধমান বিভাগের ভেপুধব্য নামক ধানের ব্যারামের এবং খুলনা, যশোহর এবং বীরভূমের তাল গাছের ব্যরামের রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে, তাহা যথাসময়ে পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

বঙ্গে ভাদুই শস্য—বর্ত্তমান অবস্থা—সমস্ত আশুধান্যও এই পর্য্যায় ভুক্ত।

সমগ্র ব্রীটিশ ভারতে যে পরিমাণ জমিতে ধানের আবাদ হয় বাঙলায় আশুধান তাহার শত ভাগের ৬'৬ ভাগ।

বর্ত্তমান বর্ষে বীজ বপন কালে আবহাওয়া ভাদুই খন্দের অনুকুলই ছিল। পরে পশ্চিমে বৃষ্টির অভাবে ও পূর্ব্ব বঙ্গে অতি বর্ষণ হেতু ভাদুই ফসলের বিঘ্ন হইয়াছে। তথাপি কিন্তু দেখা যায় যে পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা অধিক ভাদুই আবাদ হইয়াছে

পূর্ব্ব বর্ষের জমির পরিমাণ	... ...	৫,৯৮৭,৭০০ একর;
ভাদুই শস্যে আবদ্ধ জমির বর্ত্তমান	... ...	৬,২২৪,৬০০ „

ইহার মধ্যে আশু ধান্যের জমির পরিমাণ—

পূর্ব্ব বর্ষে	... ...	৪,৯৮৬,৫০০
বর্ত্তমান বর্ষে	... ...	৫,২৮৬,৮০০

বর্ত্তমান বর্ষে পাট চাষ কম হওয়ায় নিশ্চিতই আশুধানের চাষ বাড়িয়াছে। ফলন নিতান্ত কম হইবে বলিয়া মনে হয় না—তের চৌদ্দ আনা ফসল হইবে।

ইক্ষুর আবাদ—বর্ত্তমান অবস্থা—বঙ্গদেশে কমিবেশী ২৩৩,৯০০ একর পরিমাণ জমিতে আখের আবাদ হইয়াছে। অন্য বৎসর অপেক্ষা আবাদী জমির পরিমাণ অধিক বলিয়া অনুমান হইতেছে। বর্দ্ধমান, রাজসাহি, বগুড়া, মালদা ব্যতীত অন্যত্র ইক্ষু বসাইবার সময় সুবৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রাবণ ভাদ্রে অতি বর্ষণ হেতু পূর্ব্ব বঙ্গের স্থানে স্থানে ইক্ষুর ক্ষতি হইয়াছে। অন্যত্র আবাদের অবস্থা ভাল। মোটের উপর প্রায় চৌদ্দ আনা ফসল হইবে।

বাঙলা তিলের আবাদ—১৯১৫-১৬—বর্ত্তমান বর্ষের জমির পরিমাণ ১৯৪,৩০০ একর, বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ১৮৯,৩০০ একর। একর প্রতি ৪।০ মণ শস্য জন্মিবে বলিয়া ধরিলে বর্ত্তমান বর্ষে ২০,৯০০ টন তিল উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।
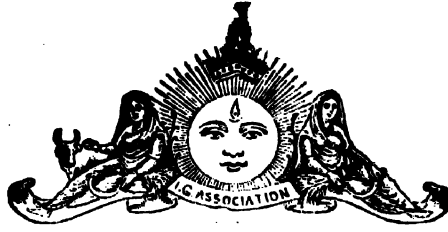
কার্ত্তিক, ১৩২২ সাল।

মৌমাছি-পালন

ভারতে মধু ও মোমের ব্যবহার অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন সাহিত্যে ও কবিরাজী গ্রন্থাদিতে মধুর বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলেও এতদ্দেশে যে কোন সময়ে মধু উৎপাদনের জন্য মধুমক্ষিকা পালন করা হইত তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ আরণ্য মধু এত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সে সময়ে পাওয়া যাইত যে কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের আবশ্যক হইত না। যাহা হউক বর্ত্তমান সময়ে ভারতে যথেষ্ট মধুর আবশ্যকতা থাকিলেও খাঁটি মধু ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে এবং মৌমাছি পালন ব্যতীত ইহার প্রতীকারের কোন উপায়ও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

সম্প্রতি পুষার কৃষিতত্ত্বানুসন্ধানাগার হইতে মিঃ সি, সি, ঘোষ প্রণীত Bee-keeping অর্থাৎ মৌমাছি পালন নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তিকাটি যে সময়োপযুক্ত হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যদিও ইহাতে বিশেষ কিছু নূতন তথ্য নাই তথাপি মৌমাছির জীবন বৃত্তান্ত, পালনের আধুনিক কল কৌশল ও সাজ সরঞ্জামাদি বিষয়ক বিবরণ সুচারুরূপে বিবৃত হইয়াছে। এই পুস্তিকাখানি পাঠে মৌমাছি পালনেচ্ছুক ব্যক্তি মাত্রেই অনেকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন এবং মৌমাছি চাষের পথও অনেক সুগম হইবে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে "কৃষকে"র পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পুস্তিকার মুখ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম।

মধুমক্ষিকা হইতে আমরা মধু পাইয়া থাকি বটে কিন্তু মধু জিনিষটা মৌমাছির নিজস্ব নহে। মৌমাছি ফুল হইতে ইহা সংগ্রহ করে এবং প্রয়োজনের অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করে বলিয়াই ইহা মৌচাকে ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। মৌচাকের
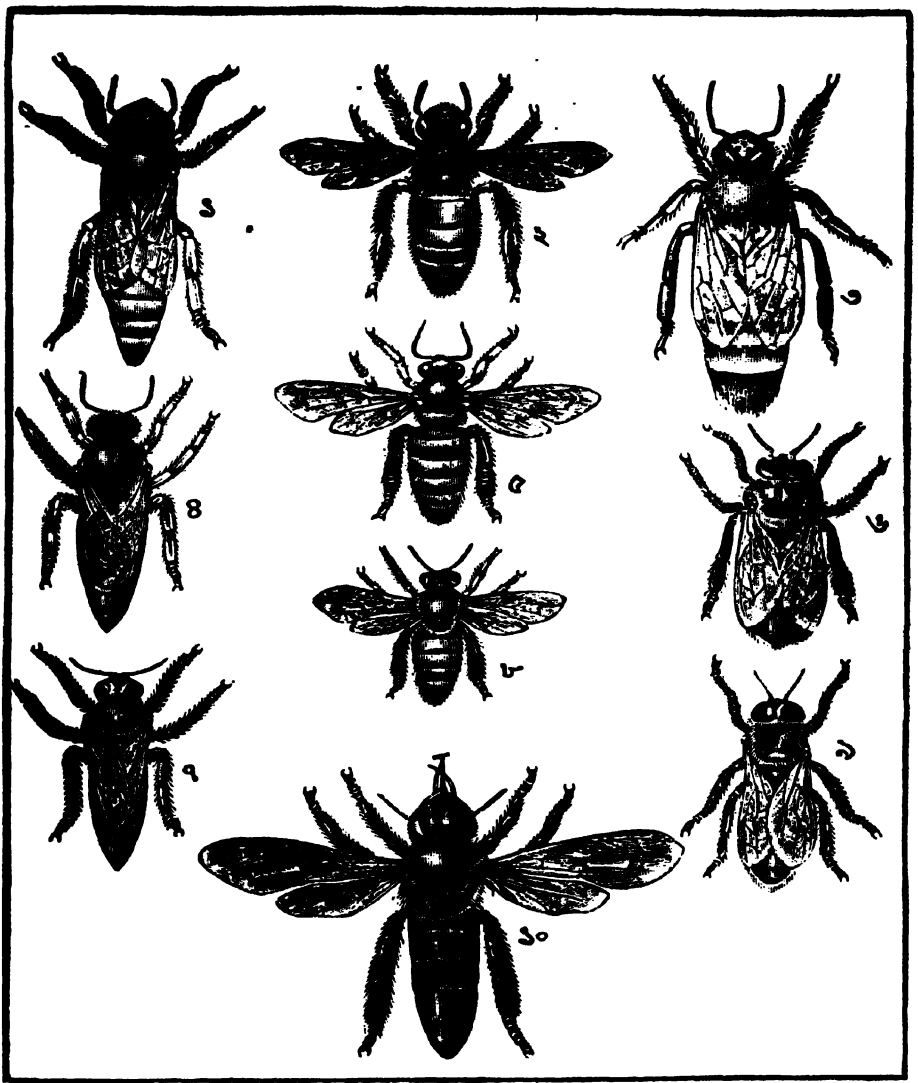
মধুমক্ষিকা

১। রাণী য়ুরোপীয় মক্ষিকা—ইটালিজাতীয় (Apis melifica)

২। কর্ম্মী " " " "

৩। পুং মক্ষি " " " "

৪। রাণী ভারতীয় মক্ষিকা (Apis Indica)

৫। কর্ম্মী " " "

৬। পুং মক্ষি " " "

৭। রাণী ক্ষুদ্র মক্ষিকা (Apis florea)

৮। কর্ম্মী " "

৯। পুং মক্ষি " "

১০। কর্ম্মী পাহাড়িয়া মক্ষিকা (Apis dorsata)

সকল চিত্রই কিছু বৰ্দ্ধিত আয়তন করিয়া দেখান হইয়াছে।

মধু ঠিক ফুলের মধু নহে, কারণ মধু প্রথমতঃ মৌমাছির উদরস্থিত মধুস্থলীতে সঞ্চিত হয়। তাহার যখন চাকে আসিয়া বসে তখন মৌমাছি উহা উদ্গীরণ করিয়া ফেলে। মৌমাছির উদরে থাকার সময় মধুতে কতিপয় রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। সুতরাং খাঁটি ফুলের মধুর সহিত ইহার কিছু পার্থক্য আছে।

মৌমাছির জীবন বৃত্তান্ত অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক। জন্ম হইতে আরম্ভ করিলে ইহার জীবনের চারিটি বিভিন্ন অবস্থা অথবা রূপ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—(১) ডিম্ব (২) কীড়া (৩) পূপ (গুটির অবস্থা) এবং (৪) পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত মক্ষিকা। একটি মৌচাক ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে চাকের কোন কোন কোষে অতি ক্ষুদ্র ঈষৎ বক্র শ্বেতবর্ণ নলাকার পদার্থ রহিয়াছে। উহাই ডিম্ব। প্রায় তিন দিনের পর ডিম ফুটে এবং তখন দ্বিতীয় অর্থাৎ কীড়া অবস্থা আরম্ভ হয়। শ্রেণী ভেদে ছয় বা সাত দিবস কীড়া পালন করিয়া তাহার পর কোষের মুখ আবৃত করিয়া দেয়। আবৃত হওয়ার পর ১১ কিম্বা ১৩ দিবস পর্য্যন্ত কীড়া ক্রমশঃ পূপে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। এই সময়ের অবসানে পূর্ণদেহ প্রাপ্ত পতঙ্গরূপে বাহির হইয়া আসে।

মধুমক্ষিকার উপনিবেশে আশ্চর্য্য প্রকার শ্রম বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত মৌমাছিগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। ১ম রাণী ; ২য় কর্ম্মী মক্ষী এবং ৩য় পুং মক্ষী। এক সময়ে একটি উপনিবেশে একটি মাত্র রাণী থাকে। উহার একমাত্র কার্য্য ডিম্ব প্রসব করা। ডিম্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইতে "রাণী"র ১৫।৷০ সাড়ে পনর দিবস আবশ্যক হয়। একটি রাণী ২০০০ পর্য্যন্ত প্রসব করিতে পারে এবং প্রায় তিন বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। যে কীড়া হইতে রাণী উৎপাদিত হয় তাহার উত্তমরূপ পোষণ হওয়া আবশ্যক বলিয়া ইহার জন্য স্বতন্ত্র কোষ প্রস্তুত হয়। ইহা অপরাপর কোষ অপেক্ষা দীর্ঘ এবং উন্নত। রাণী পতঙ্গ অবস্থায় বহির্গত হইয়া গেলে এই কোষ মৌমাছিগণ নষ্ট করিয়া দেয়।

পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হওয়ার পাঁচ দিবস পরে রাণী পুং সহবাসের জন্য চাক হইতে বহির্গত হইয়া যায়। প্রথম দিবস অকৃতকার্য্য হইলে তিন সপ্তাহ বয়স প্রাপ্তি পর্য্যন্ত রাণী প্রত্যহই বহির্গত হইয়া যায়। ইহার মধ্যে যখনই পুং সহবাস সংঘটিত হয় তখন হইতেই কিম্বা তাহা না হইলেও তিন সপ্তাহের পর আর রাণী মৌচাক ছাড়িয়া যায় না। শেষোক্ত স্থলে রাণী চিরকুমারী থাকিয়া যায়। শেষোক্ত স্থলে রাণী কেবল কর্ম্মী মক্ষী ডিম্বই প্রসব করে। পুং সহবাস ঘটিলে রাণী স্ত্রী (অর্থাৎ রাণী), কর্ম্মী এবং পুং মক্ষিকা তিন প্রকার মক্ষিকার ডিম্বই ইচ্ছানুসারে প্রসব করিতে সমর্থ হয়। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে কর্ম্মী মক্ষিকা অপুষ্ট স্ত্রী মক্ষিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মৌচাকের যাবতীয় কার্য্য কর্ম্মী মক্ষিকা দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহারা চাক প্রস্তুত, সন্তান প্রতিপালন, খাদ্য সংগ্রহ, সঞ্চয় ও রক্ষণাবেক্ষণ, গৃহ সংস্কার ও উত্তাপ

রক্ষা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকে। একটি মাঝারি আকারের মৌচাকে কর্ম্মী মক্ষিকার সংখ্যা বিশ হাজারের কম হইবে না। ইহাদিগকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া ইহারা অধিক দিন বাঁচে না। একটি কর্ম্মী মক্ষিকার আয়ুঃ দেড় মাস হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত। কিন্তু যাহাতে চাকের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় তজ্জন্য সকল সময়েই যথেষ্ট পরিমাণে কর্ম্মী মক্ষিকা ডিম্ব থাকে। বস্তুতঃ একটি চাকের অধিকাংশ ডিম্বই কর্ম্মী মক্ষিকা উৎপাদন করে। রাণী অথবা পুং মক্ষিকা উৎপাদনোপযুক্ত ডিম্ব কেবল সময় সময় প্রয়োজনানুসারে প্রসবিত হয় মাত্র।

পুং মক্ষিকা কর্ম্মী মক্ষিকা অপেক্ষা আকারে বড়। সেই জন্য যে সকল কোষে ইহাদের কীড়া প্রতিপালিত হয় যে সেগুলিও অপেক্ষাকৃত বড়। বৎসরের সকল সময় চাকে পুং মক্ষী দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন নূতন রাণী প্রতিষ্ঠার আবশ্যক হয় তখনই ইহাদের সৃষ্টি হয়। ইহাদের সাধারণ আয়ু প্রায় দুই মাস কিন্তু ইহাদের রাণীর গর্ভোৎপাদন ভিন্ন আর কোন কার্য্য না থাকায় এবং ইহারা নিজের আহার সংগ্রহ করিতে পারে না বলিয়া কর্ম্মী মক্ষিকাগণ একবার কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে ইহাদের পক্ষচ্ছেদ করিয়া ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। এইরূপ অসহায় অবস্থায় ইহারা শীঘ্রই অকালে মরিয়া যায়।

এতদ্দেশে সাধারণতঃ চারি জাতীয় মধুমক্ষিকা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—(১) Apis dorsata (২) Apis Indica (৩) Apis flora এবং (৪) Melipona Sp। প্রথমোক্ত তিন প্রকারের মৌমাছির এবং বিলাতী মৌমাছির (Apis Mellifica) চিত্র স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

Apis dorsata নামক মৌমাছিকে পাহাড়িয়া মৌমাছি বলিতে পারা যায়। ইহারা পর্ব্বত গাত্রে, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের শাখায় কিম্বা সময়ে সময়ে বড় বড় বাড়ীর প্রাচীরে একটিমাত্র বৃহদায়তন চাক প্রস্তুত করে। চাক প্রস্থে এমন কি তিন হাত সাড়ে তিন হাত পর্য্যন্ত হয়। ইহা কথনই আচ্ছাদিত স্থানে চাক প্রস্তুত করে না। এক একটি চাকে পঁচিশ ত্রিশ সের পর্য্যন্ত মধুও পাওয়া যায় কিন্তু মৌমাছিগুলি এত গোপন স্বভাব বিশিষ্ট যে ইহাদিগকে পালন করা অতীব দুরূহ ব্যাপার।

পক্ষান্তরে Apis indica জাতীয় মৌমাছি সকল সময়ে আচ্ছাদিত স্থানেই চাক প্রস্তুত করে। বৃক্ষের কোটরে, প্রাচীরের গহ্বরে, অব্যবহৃত গৃহে অথবা গৃহ সজ্জাদিতে ইহাদের চাক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সমান্তরালভাবে সজ্জিত একাধিক চাক প্রস্তুত করে। এই জাতীয় পার্ব্বত্য মক্ষিকা নিম্নদেশস্থ মক্ষিকা অপেক্ষা কিছু বড়। ইহাদের চাকে গড়ে বৎসরে তিন সের, সাড়ে তিন সেরের অধিক মধু পাওয়া যায় না। সুতরাং মধু সঞ্চয় হিসাবে ইহারা ১ম শ্রেণীর মক্ষিকা অপেক্ষা অপকৃষ্ট।

Apis flora পূর্ব্বোক্ত মক্ষিকা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। ইহারা একটিমাত্র চাক প্রস্তুত করে

কেরোসিন বাক্স নির্ম্মিত মধুচক্র
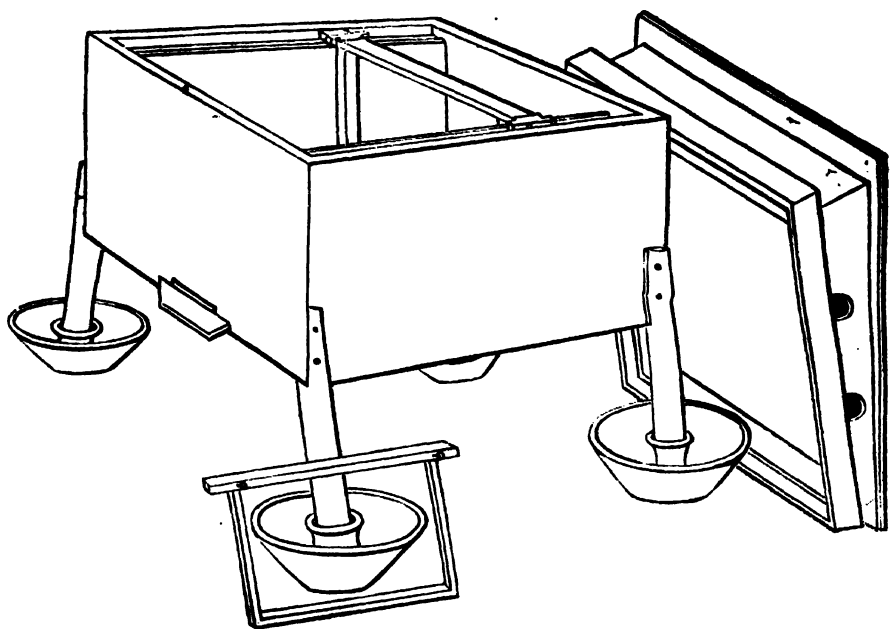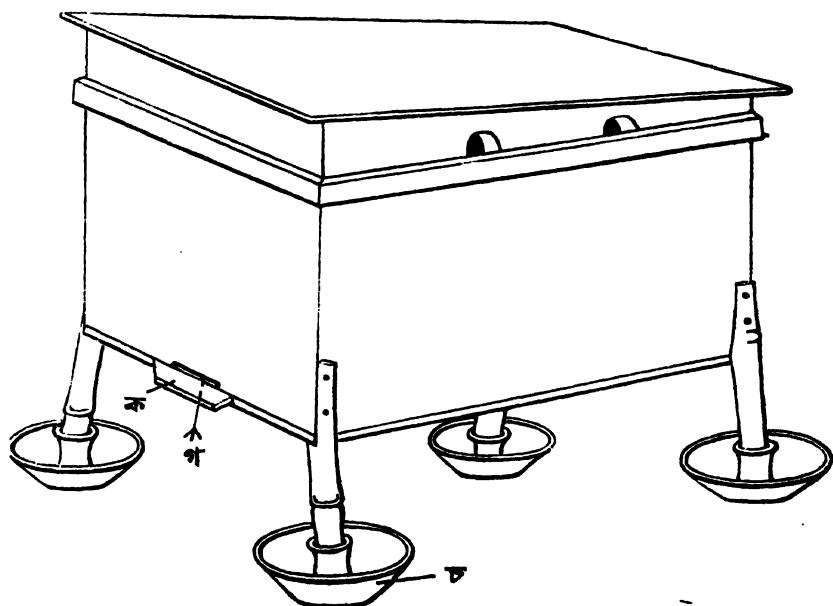
ডালা খোলা অবস্থায় দেখান হইয়াছে। ভিতরে যে ফ্রেমটি থাকে তাহা একবার খোলা এবং এক পরান দেখান হইয়াছে।

কেরোসিন বাক্স নির্ম্মিত মধুচক্র

ক। মধুমক্ষিকা উড়িয়া আসিয়া এই তক্তাখানির উপর বসে।

গ। মক্ষিকার প্রবেশের পথ।

চ। জলপূর্ণ বাটি ইহার উপর বাক্সের পায়া বসান থাকে। পিপীলিকা প্রভৃতি

বটে কিন্তু ইহাদের চাক প্রস্থে সাধারণতঃ ৬।৮ ইঞ্চির অধিক হয় না। ঝোপ ঝাপ ও ক্ষুদ্র বৃক্ষাদিতে ইহাঁদের চাক অনেক সময় দৃষ্ট হয়। চাক হইতে উৎপাদিত মধুর পরিমাণ অত্যন্ত কম—আধপোয়া একপোয়ার অধিক নহে।

Melipona Sp. নামক মধুমক্ষিকা ভারতীয় মধুমক্ষিকার মধ্যে ক্ষুদ্রতম। ইহা ব্রহ্ম দেশেই অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ইহার চাকে মোমের পরিবর্ত্তে যে এক প্রকার রজন পাওয়া যায় তাহা বার্ণিস ও অপরাপর কার্য্যের জন্য অল্প বিস্তর মাত্রায় রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহারা অতি অল্প পরিমাণে মধু সঞ্চয় করে। এই জাতীয় মক্ষিকা পালনে সুতরাং লাভের আসা বড় অধিক নহে।

পুস্তকখানি সচিত্র, ইহার ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর ও ভাষা সরল।

অবিমিশ্র ধানের বীজ—এখন ধানের অবিমিশ্র বীজ পাওয়া দুষ্কর। এক ধানের সহিত অন্য ধান কিছু না কিছু মিশাল আছেই। কোন প্রকার ধানের বীজ রাখিতে হইলে ধান কাটিবার পূর্ব্বে ধানের শীষ বাছিয়া কাটিয়া আলাহিদা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ক্ষেতের সর্ব্বোচ্চ শীষগুলি বীজের জন্য সংগ্রহ করাই আবশ্যক, কারণ তাহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সুপুষ্ট বীজ থাকে। সুপুষ্ট বীজ সর্ব্বাপেক্ষা ভারি হয়। এই প্রকারে ধানের শীষ সংগ্রহ করিয়া তাহা সতন্ত্রভাবে ঝাড়িয়া মাড়িয়া লইলে তবে অমিশ্র বীজ পাওয়া যায়।

সুপুষ্ট বীজের একটা পরীক্ষা আছে লবণাক্ত জলে ফেলিয়া দিলে যে বীজগুলি ডুবিয়া যায় তাহাই সুপুষ্ট বীজ। অপুষ্ট বীজ হাল্‌কা বলিয়া ডুবে না। এইরূপে বাছাই করিলেও একেবারে নির্দ্দোষ বীজ মেলে না। পাশাপাশি অন্য ধানের সহিত বপন করিলে পরাগ সঙ্গম দ্বারা সঙ্কর উৎপন্ন হইতে পারে। তাহাতে কখন ভাল কখন মন্দ ফল হয় এবং চাউলের গুণাগুণের ব্যতিক্রম হয়। জল হাওয়ার গুণে কখন সরু ধান মোটা হইয়া যায় এবং মোটা ধান মিহি হয়। সাঙ্কর্য্য ঘটিলে ধানের বহিরাবরণেই অনেক লক্ষণ প্রকাশ পায়। যাহাই হউক না কেন, মোটামুটি দৃশ্যতঃ একই রকমের ধান্য শীষ ক্ষেত হইতে বাছাই করিয়া সংগ্রহ করিলে তাহাকে সুবীজ বলা যাইতে পারে।

কলাই শস্যের বীজ বাছাই—এই সকল বীজ কুলা ঝাড়া করিয়া ও হাত বাছাই করিয়া লইতে হয়। বীজের গুরুত্ব নির্দ্ধারণের নিমিত্ত প্রতি হাত লবণ জলে ডুবাইবার আবশ্যক হয় না, কুলার আগায় হাল্‌কা বীজ ঝাড়াই হইয়া পড়িয়া যায়।

পত্রাদি

—:*:—

কলার চাষ—

সেক্রেটারি কৃষক মণ্ডল, ওয়ারডিয়া, মধ্য প্রদেশ।

প্রশ্ন—১। বাঙলা দেশে কত প্রকার কলার চাষ হয়?

২। কলা চাষের উপযুক্ত মৃত্তিকা ও আবহাওয়ার অবস্থা?

৩। কলা গাছের উপযুক্ত সার?

৪। একর প্রতি কতগুলি গাছ বসিবে?

৫। পাকা বা কাঁচা কলা ফল হিসাবে ব্যবহার ব্যতীত ইহার অন্য ব্যবহার?

৬। কলা গাছের কোন ব্যবহার হয় কিনা?

৭। কত দিনে ফলে?

৮। জলসেচনের আবশ্যকতা?

৯। একর প্রতি লাভালাভ?

উত্তর—এই কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে কলা সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে হয়। তাহা না লিখিয়া আমরা কৃষকের পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রবন্ধাবলি পাঠ করিতে অনুরোধ করি এবং সংক্ষেপে আবশ্যকমত জ্ঞাতব্য বিষয় গুলির উল্লেখ করা গেল।

১। বাঙলা দেশে প্রধানতঃ চাপা, চাটিম, কাঁটালি ও কাচাকলা এই কয় জাতীয় কলার আবাদ দেখা যায়। এই কয় জাতীয় আবার উপজাতি আছে।

চাপাজাতীয়—চাপা, চিনিচাঁপা, রামকলা, অগ্নিশ্বর, বীট জবা।

কাঁটালি জাতীয়—কাঁটালি, কালিবউ, ডোরে বা বিচেকলা, লতা কাঁটালি।

চাটিম জাতীয়—চাটিম, মর্ত্তমান, কানাই বাঁশী, পিনাঙ, অনুপম, অমৃতমান, মোহন-বাঁশী, রাজা (Singapur), কাবুলী (Cavendishi)

কাঁচকলা বা কাচা কলা ইহার ছোট বড় ও ফলনে অধিক ইত্যাদি প্রকারভেদে ২।৩ উপজাতি আছে। এক প্রকার কাচকলার উপযুক্ত মৃত্তিকায় চাষ করিলে এক এক কাঁদিতে ২২ ছড়া কলা হয়।

২। সরস আবহাওয়া ও কাদা দোঁয়াস মাটিই কলার আবাদের বিশেষ উপযুক্ত।

৩। এক একরে (তিন বিঘা আধ কাঠা) ৩৫০টা গাছ বসিতে পারে। সাধারণতঃ লোকে চৌকাভাবে ১২ × ১২ ফিট অন্তর গাছ বসায় তাহাতে বিঘাতে ১০০ শত গাছের অধিক ধরে না কিন্তু তাহা না করিয়া ত্রিকোণাকারে গাছ বসাইলে সারিগুলি ১২ ফিট

না হইয়া ১০।৯ দশ ফিট নয় ইঞ্চ অন্তর হইবে অথচ গাছ হইতে গাছের অন্তর ১২ ফিটই থাকিবে। ইহাতে এক একরে ৩৫০টা গাছ অনায়াসে বসাইতে পারা যায়।
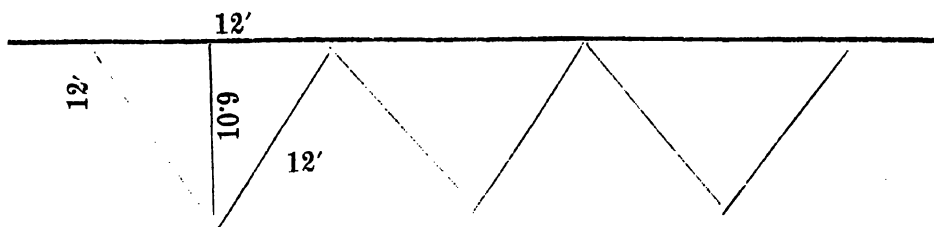
৪। কলার আবাদে এক একরে ৭০ পাউণ্ড পটাস, ৭০ পাউণ্ড ফস্ফরিক অম্ল ও এতদ্ব্যতীত যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ভিজ্জ সার দেওয়া আবশ্যক। উদ্ভিজ্জসারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থাৎ একরে অন্ততঃ ২০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন না মিলিলে সোরা প্রভৃতি নাইট্রোজেন প্রধান সার দেওয়া আবশ্যক। গোয়ালঘরের আবর্জ্জনা সার ও তাহার সহিত কিঞ্চিৎ চূণ ও কলার পাতা পুড়াইয়া তাহার ছাই ইত্যাদি মিশ্র সার ব্যবহারে কলার ফলন খুব বাড়ে, ইহার সহিত কিছু পরিমাণ হাড়ের গুড়া ও পুরাতন পাঁক মাটি মিশাইলে সম্পূর্ণ সার প্রয়োগ করা হইল। পাঁক মাটিতে পাটাস থাকে, হাড়ের গুঁড়া হইতে ফস্ফরিক অম্ল ও কিছু ভাগ চূণ পাওয়া যায়। গোয়াল ঘরের সারে যে গোময় গোমূত্র মিশ্রিত থাকে তাহা হইতে যথেষ্ট নাইট্রোজেন মেলে—এবং ছাই দেওয়ায় তাহাতেও পটাস প্রয়োগের কার্য্য হয়। অন্য সারের সহিত একর প্রতি ২॥ মণ রেড়ীর খৈল দিলে বড় উপকার হয় কারণ রেড়ীর খৈল হইতে নাইট্রোজেন মিলে, আবার ইহা কলা গাছের পোকা নিবারক।

কলাগাছের সম্পূর্ণ সার—এক একরে—৩৫০ ঝুড়ী পাঁক মাটি
১০০ „ ছাই „
১৭৫ „ গোয়ালের আবর্জ্জনা সার
৩ মণ হাড়ের গুঁড়া
২॥ „ রেড়ীর খৈল
১ „ চূণ

৫। বাঙলা দেশে ফল হিসাবে কলার ব্যবহারই অধিক। আজকাল পুষ্ট কলা হইতে কলার ময়দা, আটা প্রস্তুত হইতেছে।

৬। কলা গাছের খোলা বা ছাল হইতে এখানে সূত্র প্রস্তুত হয় না তবে কলা গাছের খোলা গবাদিকে সময় সময় খাওয়াইতে দেখা যায়।

৭। গাছ বসাইয়া কলা ফলিতে ও পরিপক্ক হইতে এক বৎসর সময় লাগে।

৮। বাঙলা দেশে কলার বাগানে জল সেচনের আবশ্যক প্রায়ই হয় না।

৯। ফসল সুচারুরূপে হইলে একরে মোট আয় ৩৫০৲ টাকা হয়, তাহা হইতে ১০০৲ টাকা খরচ বাদ দিলে নেট লাভ ২৫০৲ টাকা থাকিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আসাম কৃষি-বিভাগে ডেপুটী ডিরেক্টর—

ভারত গবর্ণমেণ্ট আসাম প্রদেশের কৃষিবিভাগের জন্য একজন ডেপুটী ডিরেক্টর নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশে ও পঞ্জাবে শস্যের অবস্থা—

যুক্তপ্রদেশের পশ্চিম অংশ, পঞ্জাবের কোনও কোনও স্থান, রাজপুতনা, মধ্যভারত ও উত্তর-পশ্চিম প্রান্তদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র কৃষির অবস্থা আশাপ্রদ।

সিকিমে শস্যহানি—

সিকিমের কোনও কোনও স্থলে ভুট্টা নষ্ট হইয়াছে, সেই জন্য তথায় চাউল ও অন্যান্য শস্যের দর বাড়িয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুরে মৎস্যবিভাগ—

ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্ট নব-প্রতিষ্ঠিত মৎস্যবিভাগ কৃষিবিভাগের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন। ডাক্তার কুঞ্জন পিলে রাজ্যের মৎস্য-সম্পদের উপচয় সাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি শাঁখের চাষ ও মৎস্যবহুল অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শুটকী মাছ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।—বাঙ্গালায় কবে কল্পনা কার্য্যে পরিণত দেখিব?

কলিকাতায় মাছের আমদানি—

১৯১২-১৩ সালে ৫২৯১ টন, ১৯১৩-১৪ সালে ৩৬২৪ টন এবং ১৯১৪-১৫ সালে ৩১১৭ টন মাছ রেলযোগে কলিকাতায় আনিত হইয়াছিল। মাছের আমদানি ক্রমে হ্রাস হইতেছে, কাযেই দাম বাড়িতেছে। যে রেলে যত মাছ গত বৎসর কলিকাতায় আসিয়াছিল, তাহার তালিকা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে:—ইষ্টারণ বেঙ্গল ২১৪৮ টন, বেঙ্গল নাগপুর ৩৯২, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ১৯১, বারাসত বসিরহাট ১৫১, বেঙ্গল ও নর্থ ওয়েষ্টারণ ১১৭, আসাম বেঙ্গল ৮৮, হাওড়া আমতা ২১, হাওড়া সেয়াখালা রেলওয়েযোগে ১ টন মাছ কলিকাতায় আসিয়াছিল।

উৎকৃষ্ট ষাঁড়দ্বারা গো-জনন—

উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের দ্বারা গো-বৎস উৎপাদনের জন্য জেলখানাগুলিতে ষাঁড় থাকে। তদ্‌বাদে বাঙ্গালাদেশে সরকারী ২৮ ষাঁড় রহিয়াছে। কিন্তু প্রজা সাধারণ এখনও এই বিষয়ে উদাসীন থাকায় গোজাতির অবনতি ঘটিতেছে। কোন কোন জেলা হইতে প্রজারা ভাল ভাল ষাঁড় পাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গবর্ণমেণ্ট ষাঁড় সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন নাই।

স্বদেশী কারখানা—

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে আম্বালার কাচের কারখানায় দিন দিন উন্নতি হইতেছে। করখানার মালিক লালা পান্নালাল তাঁহার কার্য্য সুচারুপপে সম্পূর্ণ আধুনিক প্রণালীতে চালাইবার জন্য ৬ জন জাপানী কারিগর নিযুক্ত করিয়াছেন। এখানে সম্প্রতি চিম্‌নি প্রস্তুত হইতেছে। আমরা এই কারবারের উন্নতি কামনা করি।

বেহারে মাছের চাষ—

বেহার-উৎকল প্রদেশের কৃষিবিভাগের মীন-শাখার তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত সাউথওয়েল্ পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ে মাছের চাষ করিবার জন্য খরিদমুল্যে পাঁচ লক্ষেরও অধিক পোনা-মাছ বিতরণ করিয়াছেন। ফলে মাছের বংশবৃদ্ধি ও মূল্যের হ্রাস হইবে, এমন আশা অসঙ্গত নহে।—জেলেদের সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া,

সংঘবদ্ধ জেলেদিগকে জলকরে মাছ ধরিবার অধিকার ইজারা দিবারও ব্যবস্থা হইতেছে। তাহা হইলে, মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীরা জেলেদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিতে পারিবে না; জালুকদের দুঃখ ঘুচিবে। দেশবাসীও অপেক্ষাকৃত সুলভমূল্যে মাছ খাইতে পাইবে।— কিন্তু বাঙ্গালায় কি হইতেছে তাহা আমরা অদ্যাপিও ঠিক পাইতেছি না।

সার-সংগ্রহ

(ভারতের খনিজ সম্পত্তি)

বিগত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের খনিজ অবস্থা সম্বন্ধে যে সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, ঐ সময়ের মধ্যে সারা ভারতে যে মূল্যের খনিজ সামগ্রী উঠিয়াছিল তাহার তের গুণ মূল্যের পাথুরিয়া কয়লা কেবল ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড হইতে পাওয়া গিয়াছিল। অথচ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রফল ঐ তিনটী স্থানের ক্ষেত্রফল অপেক্ষা প্রায় পনরগুণ অধিক; সুতরাং বুঝা যাইতেছে এদেশের খনিজ আয় তুলনায় অতি অল্প।

সুখের বিষয় খনিজাত দ্রব্যের উৎপাদন এদেশেও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় খনিসমূহ হইতে প্রায় এগার কোটী চল্লিশ লক্ষ টাকার মাল উঠিয়াছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ঐ মাল উঠিয়াছে প্রায় পনর কোটী টাকার, অর্থাৎ পাঁচ বৎসরে খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন এদেশে প্রায় চারি আনা রকম বাড়িয়াছে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরে এই বৃদ্ধির হার আরও একটু বেশী দেখা গিয়াছিল, কারণ ঐ সময় হইতেই এদেশে কয়লার খনিসমূহের কার্য্য বাড়িয়া উঠে। তথাপি ভারতীয় খনিজ শিল্প এখনও শৈশবের সীমা অতিক্রম করে নাই। ইহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া স্যার টমাস হলণ্ড বলিয়াছেন,—

"The principal reason for the neglect of metalliferous minerals is the fact that in modern metallurgical and chemical developments the bye-product has come to be serious and indispensable item in the sources of profit and the failure to utilise the bye-products necessarily involves neglect of the mineral that will not pay to work for the metal alone."

অর্থাৎ এদেশে ধাতু উৎপাদনকারী খনিজ পদার্থসমূহ অনাদৃত হইবার হেতু এই যে, বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে রাসায়নিক উপায়ে ধাতুপরিষ্করণকালে খনিজাত মিশ্র পদার্থের বিশ্লেষণে মূল ধাতুর সহিত যে সকল গৌণ উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি নষ্ট না করিয়া রাসায়নিকেরা কৌশলে তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহাতেই খনিজ শিল্পের ব্যবসায়ে তাঁহারা যথেষ্ট লাভবান্ হন। কিন্তু যদি কেহ সেই উপাদানগুলির প্রতি উপেক্ষা করেন তাহা হইলে মূল ধাতুর উৎপাদনে যে অতিরিক্ত ব্যয় পড়ে তাহাতে ব্যবসায়ের খরচা পোষায় না, কাজেই মূল ধাতুর উৎপাদন অসম্ভব হইয়া উঠে। মোটামুটি ভাবে একটা সহজ উপমা দিয়া কথাটা বুঝাইয়া বলিতেছি। ধরুন, কোন ব্যক্তি যদি তৈল ব্যবসায়ের নিমিত্ত পাঁচ হাজার নারিকেল খরিদ করেন তবে তাঁহার পক্ষে শুধু নারিকেলের শাঁস লইয়া ব্যস্ত থাকিলে চলিবে না, নারিকেলের ছোবড়া ও খোলাগুলি যাহাতে উচিত মূল্যে বিক্রীত হয় এবং তৈল প্রস্তুতের পর উহার খইল হইতেও যাহাতে কিছু খরচা উঠে—তাহার চেষ্টা তাঁহাকে করিতে হইবে। এরূপ করিলে তৈলের 'পড়তা' অনেক কম হইয়া দাঁড়াইবে, এবং তিনি ব্যবসায়ে লাভবান হইতে পারিবেন ; নচেৎ যদি তিনি নারিকেলের ছোবড়া, খোলা ও খইল প্রভৃতি গৌণ উপাদানগুলিকে উপেক্ষাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যবসাদারের সহিত সেই ব্যক্তি কখনই সমকক্ষতা করিতে পারিবেন না। এক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা উল্লিখিত তৈল ব্যবসায়ীর সহিত তুলনীয়।

খনিজ তাম্র ও গন্ধকের সমবায়ে উৎপন্ন মিশ্র পদার্থের বিষয় এখানে আলোচিত হইতে পারে। এই মিশ্র পদার্থ ভারতের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উল্লিখিত দুই পদার্থের মধ্যে কোনটীর টান বাজারে অযথা হ্রাস হইলে অপরটী উৎপাদন করিয়া লাভবান হওয়া যায় না। এদেশের বাজারে তাম্রের টান যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু গন্ধকের প্রয়োজন সেরূপ নাই। ইউরোপে গন্ধকদ্রাবক (Sulphuric Acid) প্রস্তুতকার্য্যে মূল গন্ধক প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ গন্ধকদ্রাবক আবার অন্যান্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অপরিহার্য্য। কাজেই ইউরোপে—যেখানে মানববুদ্ধি রসায়ন বিজ্ঞানকে বিবিধ কার্য্যকর অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করিয়াছে সেখানে—গন্ধক দ্রাবকের টান অত্যন্ত অধিক। এদিকে ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানে খনিজ শিল্পের এতটা উন্নতি এখনও হয় নাই যে, খনিজাত মিশ্রপদার্থ সংস্কার করিয়া তজ্জাত সর্ব্ববিধ গৌণ উপাদানগুলিকে কাজে লাগান যাইতে পারে।

এক শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে একটন গন্ধকদ্রাবক সাড়ে চারি শত টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত। এখন তাহার দাম দাঁড়াইয়াছে মাত্র ত্রিশ টাকা। এরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন কিরূপে হইল? রসায়ন বিজ্ঞানের উন্নতিই এই মূল্যহ্রাসের হেতু। শুধু

গন্ধকদ্রাবক বলিয়া নহে ইউরোপে বহুবিধ খনিজ দ্রব্যই এখন সস্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর অবাধ বাণিজ্যের ফলে সেই সকল সুলভ দ্রব্য এদেশে আসিয়া ভারতীয় পণ্যের উচ্ছেদ সাধন করিতেছে। তুঁতে, গন্ধক, হিরাকস প্রভৃতি ক্ষারজাতীয় জিনিসগুলি পূর্ব্বে এ দেশেই জন্মিত। এখন কিন্তু বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় ঐ সকল মূল্যবান্ ভারতীয় পণ্য বিলুপ্ত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাম্র রৌপ্য প্রভৃতি ধাতব পদার্থসমূহ পূর্ব্বে এদেশেই খনিজাত মিশ্র উপাদান হইতে বিশ্লেষণ করিয়া লওয়া হইত। এখন এদেশে সে ব্যবসায় বন্ধ হইয়াছে। পক্ষান্তরে ভারত হইতে প্রতিবৎসর নব্বই হাজার টন প্রস্ফুরকগর্ভ পদার্থ বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে; আর যে রাশি রাশি খনিজ পদার্থ এদেশে উপেক্ষিত ও অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, ঠিক সেইরূপ মিশ্র পদার্থ হইতে ইউরোপে উৎপন্ন অমিশ্র ধাতু দ্রব্য ক্রয় করিতে ভারতীয়গণ বার্ষিক সাড়ে তের কোটী টাকা বিদেশীয় বণিক্‌গণকে দিয়া থাকেন। এ অবস্থা পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে। সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী টাটার লৌহ কারবার প্রতিষ্ঠার পর হইতে এদেশে ইস্পাতের রেল প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। তা'ছাড়া লৌহের ন্যায় তাম্রও যাহাতে এদেশের খনিজ পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় তাহার চেষ্টা চলিতেছে। সরকারী বিবরণে প্রকাশ, সম্ভবতঃ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই ভারতে সুবৃহৎ তাম্রের কারবারসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সকল খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন এদেশে বহুলরূপে আরম্ভ হইলে উহা বিদেশে চালান না হইয়াও কতদূর পর্য্যন্ত এদেশের অভাব পূরণ করিতে লাগিবে, তাহা এদেশের উৎপন্ন দ্রব্য জাতেরও আমদানির হিসাব দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। আজকাল ভারতে বার্ষিক পৌনে তের কোটী টাকা মূল্যের খনিজদ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; আর বিদেশ হইতে বার্ষিক পঁয়তাল্লিশ কোটী টাকা মূল্যের খনিজ জিনিস আমদানি হয়। এই পঁয়তাল্লিশ কোটী টাকার জিনিস বিদেশ হইতে না আসিয়া যদি এদেশেই উৎপন্ন হয় তাহা হইলে ভারতবাসী অনেকটা লাভবান্ হইতে পারে; কারণ এদেশের খনিসমূহে মিশ্রধাতুপিণ্ডের অভাব নাই। কিন্তু সেই মিশ্র পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া কার্য্যোপযোগী করিবার ক্ষমতা ভারতবাসীর নাই তাই এ দুর্দ্দশা।

এই সম্পর্কে খনিজ তৈলের প্রসঙ্গ আলোচিত হইতে পারে। অধুনা ব্রহ্মদেশে কেরোসিন তৈলের কারবার বেশ জাঁকাইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য ঐ কারবার বিদেশী মহাজনগণেরই হস্তগত, কিন্তু অধুনা বৈদেশিক ধনী সম্প্রদায়ের সাহায্য ব্যতীত এদেশে কোন স্বদেশী কারবারকে প্রায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে দেখা যায় না। তাই ব্রহ্মদেশে ভারতীয় কুলিমজুরেরা যে খনিজ তৈলের উৎপাদনে কতকটা লাভবান হইতেছে, ইহাও সুখের সংবাদ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়।

পরিশেষে স্যার টমাস হলাণ্ডের কথায় বলিতে হয়, "A country like India must be content therefore to pay the tax of import until

industries arise demmanding a sufficient number of chemical products to complete an economic Cycle." অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত না এদেশে খনিজ শিল্পের একটা উন্নতি সাধিত হয় যে, তাহাতে সর্ব্ববিধ রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা এদেশেই অনুভূত হইতে থাকে ততদিন ভারতবাসীকে বৈদেশিক পণ্যের জন্য আমদানি-শুল্ক দিতেই হইবে। বলা বাহুল্য এই আমদানি-শুল্কের আধিক্য হেতু এদেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়িগণ নানাবিধ সুবিধা সত্ত্বেও সময়ে সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় অক্ষম প্রতিপন্ন হন; কারণ "Chamical and metallurgical industries are essentially gregarious in their habits." অর্থাৎ রাসায়নিক শিল্প ও ধাতু বিশ্লেষণ স্বতই ঘনিষ্ঠভাবে সংস্পৃষ্ট। রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্য ব্যতীত খনিজাত মিশ্র ধাতুর বিশ্লেষণ সম্ভবপর নহে। কাজেই এদেশের খনিজ বিত্ত করায়ত্ত করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে রসায়ন-শিল্পকেও উজ্জীবিত করিতে হইবে।

ঢাকার বস্ত্র শিল্প—

লর্ড ও লেডী কার্ম্মাইকেল ঢাকার শিল্পবিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছেন ও উৎসাহ দিতেছেন। ঢাকা কার্পাসশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকাই কাপড় দেশবিদেশের নৃপতিদিগের অঙ্গ আবৃত করিত। নানারূপ মসলিন ঢাকায় প্রস্তুত হইত—তেমন কাপড় আর কোথাও হইত না—হয়ও না। সে সব শিল্পী আর নাই। এবার ঢাকার নানা স্থান হইতে শিল্পী আনাইয়া লর্ড ও লেডী কার্ম্মাইকেলকে মসলিন বুনন, জরীর কাজ করা দেখান হইয়াছে। উয়ারীতে ও নবাবপুরে প্রদর্শনীও বসান হইয়াছিল। খাঁ বাহাদুর আওদল হোসেন ও অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র মহাশয় এই এই কার্য্যের উদ্যোগী।

বাগানের মাসিক কার্য্য

—:০:—

পৌষ মাস।

সব্জী বাগান।—বিলাতী শাক্-সব্জী বীজ বপন কার্য্য গত মাসেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন উদ্যানপালক এমাসেও পারস্লী (Parsley) বপন করিয়া

সফলকাম হইয়াছেন। কেবল বীজ বোনা কেন, কপি প্রভৃতি চারা নাড়ীয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের গোড়ায় মাটি দেওয়া ও আবশ্যক মত জল দিবার জন্য মালিকের সতর্ক থাকিতে হইবে। সালগম, গাজর, বীট, ওলকপি প্রভৃতি মূলজ ফসল যদি ঘন হইয়া থাকে, তবে কতকগুলি তুলিয়া ফেলিয়া ক্ষেত্র পাতলা করিয়া দিতে হইবে। আগে বসান জলদি জাতীয় কপির গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। গোড়া এই সময় কিছু খৈল দিয়া একবার জল সেচন করিতে পারিলে কপি বড় হয়।

কৃষি-ক্ষেত্র।—আলু গাছে মাটি দিয়া গোড়া আর একবার বাঁধিয়া দিতে হইবে। পাটনাই আলুর ফসল প্রায় তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। এই সময় কিন্তু ফসল কোদালি দ্বারা উঠাইয়া না ফেলিয়া যতদিন গাছ বাঁচিয়া থাকে ততদিন অপেক্ষা করা ভাল। ইতিমধ্যে নিড়ানি দ্বারা খুঁড়িয়া কতক পরিমাণ আলু খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে ঝাড় হইতে আলু তুলিবে তাহাতে মটরের মত আলুগুলি রাখিয়া বাকিগুলি তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই আলুগুলি তুলিয়া পরে গোড়া বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে গাছগুলি পুনরায় সতেজে বাড়িতে থাকে। আলুক্ষেত্রে এমাসে দুই একবার আবশ্যক মত জল দেওয়া আবশ্যক। মটর, মসুর, মুগ প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিশেষ কোন পাইট নাই। টেঁপারি ক্ষেতেও জল দেওয়া এই সময় আবশ্যক।

তরমুজ, খরমুজ, চৈতে বেগুন, চৈতে শসা, লাউ, কুমড়া ও উচ্ছে চাষের এই উপযুক্ত সময়।

ভ্যানিলা (Vanilla planifolia)

ইহা এক প্রকার অর্কিড। ইহার ফল মশালারূপে ব্যবহার হয়

কৃষক।

সূচীপত্র।

অগ্রহায়ণ ১৩২২ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৬শ খণ্ড। } অগ্রহায়ণ, ১৩২২ সাল। } ৮ম সংখ্যা।

মশালা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রসায়ন তত্ত্ববিদ্ শ্রীনলিন বিহারি মিত্র লিখিত

ভ্যানিলা (Vanila)—ইহা এক প্রকার অর্কিডের ফল। ইহা বিদেশজাত, এই জাতীয় অর্কিডের নাম V. Planifolia। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্ এবং গ্রীষ্ম প্রধান এমেরিকায় ইহার জন্মস্থান। ভারতে এই অর্কিড জন্মাইবার বহু চেষ্টা হইয়াছে কারণ, ইহার সীমের মত লম্বা ফলগুলি অতি উপাদেয় খাদ্য। যে গাছে জন্মায় ইহা পত্র বিন্যাস ও ফুলদ্বারা সে গাছের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। ফল, মিষ্টান্ন সুঘ্রাণ ও সুস্বাদু করিতে, তৈলাদি সুগন্ধ করিতে এবং ঔষধার্থে ইহার প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে কিন্তু ব্যবসায়ের মত উপযুক্ত মাত্রায় ইহা এখনও জন্মাইতে পারা যাইতেছে না।

মশালা শাক বা পট হার্ব্ব—শুলফা (Furnaria purviflora) ইহা ভারতের একটি প্রধান শাক। ইহার বপনের সময় আশ্বিন কার্ত্তিক। ইহার গন্ধ মনোহর বলিয়া হিন্দু, মুসলমান, মাড়য়ারি প্রভৃতি সকলেরই ইহা প্রিয়। অন্যান্য শাক ও তরকারি সুগন্ধ করিতে ইহার ব্যবহার বহুল দৃষ্ট হয়। ৪ হাত পরিমিত ছোট চৌকাতে বীজ বপন করিতে হয়। মাঝে মাঝে শাক কাটিয়া লইলে আবার গজাইয়া উঠে। বীজের ব্যবহার কম।

ধনিয়া শাক—ধনে বীজের ব্যবহারের কথা ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি। ধনে শাক গন্ধযুক্ত। মুসলমানগণ এই শাক বড় পচন্দ করেন। তরকারি ও মাংসের সহিত

ইহার পাতা ব্যবহার হয় এবং সতন্ত্র ও অন্য শাকের সহিত এই শাক ব্যবহার করা চলে। চাষ প্রণালী শুল্‌ফা প্রভৃতি অন্যান্য শাকের ন্যায়। বীজের জন্য বিস্তৃত ক্ষেত্রে চাষ হয়। এক একরে ১০ মণ ধনে জন্মে এবং এক একর চাষের জন্য ১২ সের বীজের আবশ্যক।৭

সেলেরি (Celery)—দুই তিন জাতীয় সেলেরি আছে। ইহার শাক ও বীজ উভয় ব্যবহারে লাগে। অন্য শাকের মত যথেচ্ছা ছড়াইয়া বীজ বপন করা যায় অথবা হাপরে * চারা প্রস্তুত করিয়া তাহা ১২ ইঞ্চি অন্তর সারিতে ৭।৮ ইঞ্চ অন্তর অন্তর রোপ করা যায়। সারযুক্ত হাল্‌কা মাটি ইহার চাষের উপযুক্ত। পাতায় সুগন্ধ যথেষ্ট আছে। বীজও মিষ্টান্ন পলান্ন পক্কান্ন সুঘ্রাণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। শাঁসযুক্ত সেলেরি কোমল ডাটাগুলি চর্ব্বণে মধুর। সেলেরি বীজই আমাদের দেশে রাধুনি বলিয়া খ্যাত।

পার্শলি (Parsley)—ইহাও সুগন্ধযুক্ত শাক। ইহার শাক ও বীজ দুইই লোকের প্রিয়। ঘোড়া কিম্বা গবাদি পশুর মুত্রস্থলির কোন ব্যারাম হইলে ইহার পাতা সিদ্ধ জল পরম হিতকারী। ইহার বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায়। এই তৈলের ভেষজ গুণ আছে। খাদ্য বস্তু ইহার পাতা দ্বারা গন্ধযুক্ত হয়। সেলেরি পাতা গুলি দেখিতে মনোহর। এই কারণে সাহেবী খানায় খাদ্য পূর্ণ ডিস্ গুলি এই পাতাদ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। চাষের কোন প্রকার বিশেষত্ব নাই—সেলেরি প্রভৃতি চাষেরই অনুরূপর ইহার চারা তৈয়ারি করিয়া লইয়া নাড়িয়া পুতিবার আবশ্যক নাই। বীজ হাতে ছড়াইয়া এককালে ক্ষেতে বপন করা চলে।—চাষের পদ্ধতি "সবজী চাষ" নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

মিণ্ট—অনূ্যন ২৫ রকমের মিণ্ট আছে। মিণ্টের শুষ্ক গাছ মশালারূপে ব্যবহার হয় ও ইহা গৃহস্থালিতে অন্য কাজেও দরকার হয়। জাপানি পিপারমিণ্ট তৈল জমিয়া দানা বাঁধে। ইহাই বাজারে মেন্‌থল (Menthol) বলিয়া বিক্রয় হয়। পিপারমিণ্ট (M. Pipereta) তৈলের জন্য বিখ্যাত। ইহার প্রচুর আবশ্যক। পর্ব্বত গাত্রে ও অরণ্য মধ্যে জলস্রোতের ধারে ধারে এই গাছ জন্মে। এমেরিকান রাজ্যে বৎসরে ১০০,০০০ পাউণ্ড তৈল উৎপন্ন হয়। একটন শাক হইতে ৭ পাউণ্ড মাত্র তৈল পাওয়া যায়। এক পাউণ্ড তৈলের মূল্য ৫০।৫৫ সিলিং অর্থাৎ প্রায় ৪০ টাকা। এক একরে ৩ টন শাক জন্মান যাইতে পারে। ইহার শিকড় কাটিয়া রোপণ করিলে গাছ জন্মান যায়. শিকড় রোপণের পর ক্ষেত্রে গোশালার সার, ঝুল, কাঠের ছাই, ধুলিবৎ হাড়ের গুড়া প্রভৃতি মিশ্রসার দুই তিন বার প্রয়োগ করা আবশ্যক।

মেথি—বপনের সময় আশ্বিন মাসের শেষ। বর্ষা থামিয়া গেলে ইহার চাষ

* নর্শারী—বীজ হইতে চারা উৎপাদন ও প্রতিপালন ক্ষেত্র ; চলিত কথায় যাহাকে "হাপর" বলে।

করিতে হয়। কাঠা প্রতি ৫ তোলা বীজ বপন করিতে হয়। শাক কাটিয়া খাওয়া হয়। দুই তিনবার শাক কাটিয়া লওয়া চলে। শাক সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত। ইহার ক্ষুদ্র বীজ ব্যঞ্জনে ও তৈলের মশলা রূপে ব্যবহৃত হয়। হাম বসন্ত রোগে মেথির জাড়ি (মেথিবীজ সিদ্ধ জল) মহৌষধ।

পিড়িং—ইহাও এক প্রকার ভারতীয় শাক। হাল্কা দোয়াস মাটি ধুলিবৎ চূর্ণ করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিতে হয়। গাছগুলি বেশ ঝাড়াল হয়। ঝাড় বাঁধিলে মাঝে মাঝে কাটিয়া লইয়া খাইতে হয়। শাক খাইতে সুমিষ্ট ও সুঘ্রাণ। ইহার বীজগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র। কাঠাতে বপনের জন্য ২ তোলার অধিক বীজ লাগে না।

মার্জ্জোরাম—এক প্রকার য়ুরোপীয় শাক। ইহার পাতা অতিশয় সুগন্ধযুক্ত। এই শাক বারমাস থাকে ; মেথি, সুল্‌ফা সেলেরির মত মরসুম অন্তে মরিয়া যায় না। ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি গন্ধযুক্ত করিতে ইহার পাতার আবশ্যক। পাতাগুলি দেখিতেও সুন্দর। খাদ্যাদি পরিবেষণের সময় সেলেরি মার্জ্জোরম প্রভৃতি পাতা দ্বারা সাজাইয়া দেওয়া হয়। ইহা হইতে এক প্রকার উবায়ু গন্ধ তৈল পরিশ্রুত করা যায়। এই তৈল ফরাসি দেশে সাবান প্রস্তুতের কাজে লাগে। পাহাড়ি দেশে চূণ ঘুটিঙের জায়গায় ইহা খুব সতেজে বর্দ্ধিত হয়।

থাইম—তাহাও এক প্রকার বিলাতি শাক। বহু পুরাকাল হইতে ইহার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। গাছগুলি ক্ষুদ্র। ইহার ভেষজগুণ আছে। মিষ্টান্নাদি সুঘ্রাণ করিতেও আবশ্যক। বহু প্রকারের থাইম আছে। ইহা হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয় তাহা জমিয়া থাইমল আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ইহা এক্ষণে চর্ম্মরোগ নিবারণের জন্য গাত্র সম্মার্জ্জনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রায় ৫০ রকমের থাইম ভূমধ্যসাগরের কূল হইতে আল্পস্ পর্ব্বতের শিখর দেশ পর্য্যন্ত, উত্তর পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে উত্তর ভারত অবধি এবং পশ্চিম তিব্বতে দেখিতে পাওয়া যায়।

সেজ—এমেরিকান শাক বিশেষ। অন্যূন ৪০০ রকমের সেজ আছে, তাহার মধ্যে দুই চারি রকম ব্যবহার হয়। য়ুরোপে ইহার চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার ভেষজ-গুণ আছে এবং ইহা তৈলাক্ত।

সুইট ফ্লাগ—ইহা আমাদের দেশে নাটবেনের মত মাঠে রসা জমিতে জন্মে ইহার শাক খায়। ইহার শিকড় তৈলাক্ত এবং তাহাতে বেশ একটু সুগন্ধ আছে। উহা পেটের পীড়াতে মহা উপকার দর্শে। বিয়ার, জিন প্রভৃতি মদ্য সুগন্ধ করিবার জন্য ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ইহা বারমেসে গুল্ম জাতীয় গাছ। য়ুরোপ, উত্তর এসিয়া এবং উত্তর এমেরিকা সর্ব্বত্রই জন্মে।

ল্যাভেণ্ডার—(Lavandula Augustifolia and L. vera) অপেক্ষা

কৃত নিরস জমি ইহাদের প্রিয়। য়ুরোপে সব্জীবাগানে ইহা থাকিবেই। ইহার ৪০০ একর বিস্তৃত বড় বড় আবাদও আছে। মিণ্ট, থাইম, বামের মত ইহার শাক হইতে তৈল পরিস্রুত করা যায়। তৈল চুয়াইয়া লইবার জন্য বৎসরে দুইবার শাক কাটিয়া লওয়া হয়—জুলাই মাসে একবার এবং সেপ্টেম্বর মাসে আর একবার।

বীজ হইতে কিম্বা গাছের শিকড় বা ডগা কাটিয়া বসাইয়া চারা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ভাল গাছ উঠিলে এক মরসুমে এক একরে ৭৫ হইতে ১০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত আয় হয়। বাঙ্গালা হিসাবে তিন বিঘায় আয় হাজার কিম্বা ১২ শত টাকা।

অষ্টেলিয়ায় এক প্রকার লেভেণ্ডার জন্মায় (L. Stoechas) তাহার ফুল অতি সুন্দর ও সুগন্ধ ; মধুমক্ষিকার বড় প্রিয়। লেভেণ্ডার ক্ষেতের নিকট মৌচাক হইলে সে চাকের মধু অতিশয় সুগন্ধযুক্ত হইবে এবং তত্রস্থ ক্ষেত্রস্বামীরা বলেন যে এক একর হইতে একমণ মধু উৎপন্ন হইতে পারে। আমাদের দেশে কত মধুই বৃথা নষ্ট হয়। গ্রাম্যপ্রধান দেশে লেভেণ্ডার গাছ একটু ছায়াযুক্ত স্থান ভিন্ন জন্মায় না।

বেসিল (Basil)—বাবুই তুলসী ইহার বারমেসে ও মরসুমী দুই রকম গাছ আছে এবং অনেক প্রকারের বাবুই তুলসী আছে। পৃথিবীর সকল স্থানেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও ইহা বনে জঙ্গলে স্বভাবতই জন্মে। ইহার পাতার রস গরম জলের সহিত সেবনে জ্বর নাশ হয়। সুগন্ধী তৈল আতরাদি প্রস্তুতে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয় এবং খাদ্যবস্তু সুঘ্রাণ করিতে ইহার পাতা কাজে লাগে।

পচাপাতা (Patchouli)—পচাপাতার গন্ধ অতি মনোহর। তৈলের ইহা একটি বিখ্যাত মশালা, ব্যঞ্জন মিষ্টান্নাদি সুঘ্রাণ করিতেও ইহার আবশ্যক। ইহার চাষ হয় এবং বনে জঙ্গলে আপনা হইতেও জন্মে। ইহার শাক হইতে তৈল চুয়ান যায়, এক হন্দর পরিমাণ শাক হইতে ২৮ আউন্স তৈল নির্গত করা যাইতে পারে। এক হন্দরের ওজন ১ মণ ২৭ সের এবং ২৮ আউন্স তৈলের ওজন বাঙলার ওজন পাঁচ পোয়া মাত্র।

পুদিনা—ইহাও মশালা শাক জাতীয়, ব্যঞ্জন, মিষ্টান্নাদি সুঘ্রাণ করিতে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা সুন্দর চাটনি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই চাটনি অত্যন্ত হজমী। ভারতের হিন্দু, মুসলমানের ইহা অতিশয় প্রিয়। য়ুরোপে পুদিনা দেখিতে পাওয়া যায় না। ডগা কাটিয়া চারা প্রস্তুত করা যায়, বীজ বপন করিলে কাঠা প্রতি (৭২০ বর্গ ফিট) ১ তোলার অধিক বীজের আবশ্যক হয় না। দোঁয়াস আল্গা মাটি ইহার উপযুক্ত, পুরাতন গোময় ইহার উৎকৃষ্ট সার। শাক কাটিয়া লইতে হয়।

বেথুয়া—সরস জমিতে অতি সহজেই জন্মান যায়। ইহা দ্বারাও ব্যঞ্জনাদি সুঘ্রাণ করা যায়। কুলের সহিত বেথুয়া শাকের অম্ল রাধিলে তাহাও অতি সুতার হয়। চাঁপানটে, ডেঙ্গো, পাট শাক প্রভৃতিকে এক হিসাবে পটহার্ব্ব বলা যাইতে পারে কিন্তু

ইহাদিগকে সজীর মধ্যে ধরাই ঠিক এবং ইহাদের সুগন্ধি মশালা তালিকাভুক্ত হওয়ার অধিকার দেখা যায় না। পাট, পুঁই, নটে প্রভৃতি শাকের আলোচনা সজী চাষ পুস্তক মাত্রেতেই আছে।

কফির আবাদ

প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত

ইতিহাস ও বিবরণ—কফি আজকাল অনেক স্থলে চায়ের স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ইউরোপীয়গণের মধ্যে বিশেষ আদরের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম হাবশি দেশে (আবিসিনিয়ায়) ইহার আবাদ হইত। পরে সপ্তদশ শতাব্দিতে 'বাবা বুদান' নামক জনৈক মুসলমান তীর্থ যাত্রী মক্কা হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিবার সময়ে কফি বৃক্ষ এদেশে প্রথম আনয়ন করেন। লিন্সকোটেন (Linschoten) ভারত ভ্রমণ কালে দক্ষিণ ভারতে কফির আবাদের কোনও উল্লেখ করেন নাই। (১৫৭৬-৯০)। কিন্তু ১৬৬৫-৬৯ খৃষ্টাব্দে টেভারনিয়ার (Tavornier) মহীশুর রাজ্যে ইহার আবাদের বিশদ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দিতে বঙ্গদেশে আবাদের চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু সে চেষ্টা তত ফলবতী হয় নাই। ১৮৬০ খৃঃ হইতে ইহার আবাদের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতে থাকে এবং কুর্গ মহীশুর ত্রিবাঙ্কুর ও মান্দ্রাজের সেভারি পর্ব্বতে আবাদের ভূমি অনেক পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করে। ১৮৯৬ খৃঃ ৪৫০ বর্গ মাইল ভূমির উপর ইহার আবাদ হয় এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ১২০ বর্গ মাইল ভূমি অনুর্ব্বর বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ইহার আবাদে প্রায় ১২০০০ সহস্র ব্যক্তি নিযুক্ত আছে। ১৯০৩-৪ সালে ৩২৫৯২,০০০ পাউণ্ড কফি বিদেশে চালান গিয়াছে। ঐ সালে সর্ব্বশুদ্ধ ১৩৭ লক্ষ টাকার কফি বিক্রয় হয়। ব্রেজিল হইতে অল্প মূল্যের কফি ইউরোপে অধিক পরিমাণে রপ্তানি হওয়াতে ভারতীয় ব্যবসায়ী-গণ কয়েক বৎসর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

কফিরগাছ—কফিগাছ উচ্চতায় ১০ দশ হস্ত হইতে ১৪ চতুর্দ্দশ হস্ত প্রমাণ হইয়া থাকে। কমলা লেবু বৃক্ষের ন্যায় এক প্রকার শ্বেত পুষ্পে বৃক্ষটীকে ছাইয়া ফেলে, ফলগুলি চেরীর ন্যায় সুপক্ক হইলে লাল বর্ণ ধারণ করে। ইহার ভিতরকার বীজ দুটী

একত্র যুক্ত থাকে। বিভিন্ন জাতীয় কফির মধ্যে (Coffea arabica) জাতীয় গাছেরই অধিক আদর। কফির হিন্দিনাম 'বান', বাঙ্গালায় ইহার কোন বিশেষ নাম নাই; কারণ ইহা এ দেশীয় ফল নহে।

আবাদ—২,০০০ হইতে ৫,০০০ ফীট উচ্চ পর্ব্বতের ঢালু জমিতে কফির আবাদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। নাতিশিতোষ্ণ দেশে যথেষ্ট বৃষ্টির জল পাইলে বৃক্ষগুলি খুব সতেজ হয়। ভূমিতে যাহাতে জল না জমিয়া থাকে তাহার যথাযথ বন্দোবস্ত করা উচিত। কফির আবাদের জন্য মাটী বেশ গভীর এবং আদ্র হওয়া চাই। নূতন জঙ্গল কাটা ভূমিতে উক্ত গুণগুলি বর্ত্তমান থাকাতে ইহার আবাদের জন্য উহা বড়ই সুবিধা জনক। বপনের জন্য, দশ বৎসরের পুরাতন সতেজ বৃক্ষ হইতে, বীজ সংগ্রহ করিতে হয়। ফেব্রুয়ারী মাসেই বপনের প্রশস্ত কাল। বীজ গুলিকে মাটীর মধ্যে প্রোথিত করিয়া দিবার আবশ্যক হয় না; ঘন ভাবে ছড়াইয়া চট চাপা দিলেই যথেষ্ট হয়। ভূমি আদ্র থাকিলে শীঘ্র চারা বাহির হয়; এবং ইঞ্চি প্রমাণ হইলে নার্শারিতে (যে ক্ষেত্রে বীজ লালিত হয়) রোপণ করা হয়। নার্শারি কোন জলাশয়ের নিকট মনোনীত করিতে হয়। প্রথম অবস্থায় চারাগুলিকে রৌদ্র কিরণ হইতে রক্ষা করা আবশ্যক। এই নিমিত্ত নার্শারি কোন না কোন ঘন পত্র সন্নিবিষ্ট ছায়াযুক্ত বৃক্ষ তলে স্থাপন করিতে হয়। এই স্থানের মৃত্তিকা ৫ ফিটের অধিক প্রস্থে না হইলেই ভাল। তাহার মাটী উত্তমরূপে কর্ষিত হওয়া চাই। চারাগুলিকে ৪ ইঞ্চি অন্তর রোপণ করিতে হয় এবং নিয়মিত ভাবে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। চারাগুলিতে দুই চারিটী পত্র দেখা দিলে বীজতলায় (Seed bed) এ রোপণের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। তখন উহাদিগকে ৯ ইঞ্চি হইতে ১২ ইঞ্চি পৃথক রোপণ করিতে হয়। এই রোপণ কার্য্য মেঘলা দিবসে করিলেই ভাল। এক বৎসর পরে চারাগুলিকে ক্ষেত্রে বপনের বন্দোবস্ত করিতে হয়।

ডিসেম্বর মাসে বন কাটিয়া এবং আগাছা ইত্যাদি পুড়াইয়া ভূমিকে আবাদোপোযোগী করা হয়। কতক ছাই ভূমির উর্ব্বতা বৃদ্ধির জন্য মাটীর সহিত মিশাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। বড় বড় বৃক্ষগুলি ছায়ার প্রত্যাশায় কাটা হয় না। ভূমি এইরূপে প্রস্তুত হইলে তাহাতে দুই ফুট গভীর গর্ত্ত করা হয়। তন্মধ্যস্থ মাটীকে গুঁড়া করিয়া চারা গুলিকে বসান হয়। সাধারণতঃ বৃক্ষগুলি ৬ ছয় ফীট হইতে ৮ আট ফীট অন্তর রোপণ করা হইয়া থাকে। এই পার্থক্য ভূমির উর্ব্বরতার উপর নির্ভর করে।

নিড়ান—বন কাটা হইলে ক্ষেতটি নিড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। চারাগুলি যতদিন না পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ততদিন মাটী মধ্যে মধ্যে কোদলাইয়া দেওয়া আবশ্যক। প্রথম বৎসর এক 'একর' মাটী কোদলাইতে ও নিড়ান দিতে ১ মুদ্রা খরচ হয়। মাটী নরম না হইলে প্রতি বৎসর এক হস্ত গভীর কোদলাইয়া দিলে অনেক সুবিধা হয়।

যে সব স্থলে মধ্যে মধ্যে ঝড় হইবার সম্ভাবনা সে স্থলে চারা গুলিকে রক্ষা করিবার জন্য আড়াল দিবার প্রয়োজন।

সার—প্রথমবার ফল হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সার দিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না; গাছের পাতা এবং নানা আগাছা পচিয়া সারের কাজ করে। স্থান বিশেষে কৃষকের (Forest top soil) বা মৃত্তিকার প্রথম স্তর সার রূপে ব্যবহার করে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাড়, গোবর, খইল ইত্যাদিই সার রূপে ব্যবহৃত হয়। বৎসরের মধ্যে দুইবার সার দেওয়া হইয়া থাকে (১) প্রথম, ফল সংগ্রহ করিবার পরই (২) দ্বিতীয়, বর্ষায় ঝড় বৃষ্টির কয়েক দিবস পরে।

শাখা এবং মস্তকচ্ছেদন—(Topping and Pruning) চারাগুলি ৪৷৷০ ফিট হইতে উচ্চতায় অধিক হইলে উহাদের মস্তকগুলি কাটিয়া ফেলা হইয়া থাকে। মস্তক ছেদনের প্রধান উদ্দেশ্য (১) প্রবল বায়ুভরে ভাঙ্গিয়া যাইতে না দেওয়া (২) এবং কফি সংগ্রহের সুবিধা। ইহার আরও একটী সুবিধা এই যে ইহাতে চারাগুলি (মস্তকের দিকে) উচ্চতায় না বাড়িয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। প্রশাখাগুলি শাখা হইতে জোড়া জোড়া হইয়া বাহির হইতে দেখা যায়। প্রধান কাণ্ডের অর্দ্ধ ফুটের মধ্যে এইরূপ প্রশাখা বাহির হইলে উগা কাটিয়া ফেলা হয়। ইহাতে বায়ু চলাচলের পথ রোধ হয় না। ইহার দ্বারা আরও এই সুবিধা হয় যে উক্ত শক্তিটী বৃক্ষের কলেবর বর্দ্ধনে নিয়োজিত না হইয়া ফলোৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া থাকে। কাণ্ডের ২৷৷০ ফুটের মধ্যে সব ডাল কাটিয়া ফেলা হয়। অপ্রধান শাখা বা প্রশাখাতে ফল ধরিলে উহাকেও কাটিয়া ফেলা হয়।

ফলাহরণ—বৃক্ষগুলিতে মার্চ্চ মাসে (বাঙ্গালা ফাল্গুন) ফল পাকিতে আরম্ভ করে। উত্তম চারা হইতে দ্বিতীয় বৎসরে ফল আশা করা যায়। কিন্তু তাহা সংগ্রহ করা হয় না। মুকুল অবস্থাতেই উহাদিগকে বৃন্তচ্যুত করা হয়। তিন বৎসরের বৃক্ষ হইতে ফল অত্যন্ত অধিক হইলে উহাকে কম করিয়া দেওয়া হয়। চতুর্থ বৎসরের পর হইতেই সম্পূর্ণ ফল আহরিত হইয়া থাকে। অক্টোবর মাস কি নবেম্বর মাস হইতে আরম্ভ করিয়া (বাঙলা আশ্বিন কার্ত্তিক মাস) জানুয়ারী (পৌষ মাস) পর্য্যন্ত ফল পাকে। সমস্ত ফল সংগৃহীত হইলে বৃক্ষগুলির শাখা প্রশাখা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে ভূপতিত ফলগুলিকে অতি সহজে কুড়াইয়া লওয়া যায় এবং সার দিবারও সুবিধা হয়।

প্রস্তুতকরণ (Manufacture)—সাধারণতঃ সুপক্ক কফিকে চেরী বলে। ফলের বহিঃস্থ রসাল অংশকে 'শাঁস' (pulp) এবং অভ্যন্তরস্থ ভাগকে 'parchment' 'পার্চ্চমেণ্ট' কহে। 'চেরী' হইতে কফি প্রস্তুত করিতে গেলে এই সকল বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্য লইতে হয়। (১) চয়ন (২) গাঁজন (৩) শুষ্কীকরণ (৪) 'ছাল' ছাড়ান (pealing) (৫) পেষণ (৬) উৎকার।

ফল তোলার সঙ্গে সঙ্গে 'খোসা' ছাড়ান হয়। পরে শুঁটিগুলিকে বেশ করিয়া গাঁজাইবার জন্য ভিজাইয়া দেওয়া হয়। এক দিবস পরে ধৌত করিয়া উহাকে রৌদ্রে শুষ্ক করা হয়। রৌদ্রে শুকাইবার সময় বার বার শুঁটিগুলিকে উল্টাইয়া দিতে হয়। খুব শুষ্ক হইলে খোসা ছাড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে এবং পাখা করিয়া খোসাগুলিকে উড়াইয়া দিতে হয়। তখন পরিষ্কার কফি পড়িয়া থাকে। তখন ইহা কৌটায় ভরিয়া বিক্রয়ার্থ বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। প্রতি একারে সাধারণতঃ ৩০০ হইতে ৪০০ চারি শত 'পাউণ্ড' কফি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুগন্ধি এবং আকার হিসাবে কফির মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ১৯০৪।৫ সালে সর্ব্বশুদ্ধ ৩,৩০,২৭৭ হন্দর (cwt) কফি বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। উহার মূল্য ১,৭৬, ৮,১৯৮ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

গুণাগুণ। কফি-পানে নিদ্রার অল্পতা হয় এবং দেহ ও মন বেশ স্ফূর্ত্তিতে থাকে। ইহা পানে অধিক কার্য্য করিবার শক্তি পাওয়া যায়। রেলে ভ্রমণকালে ইহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ চায়ের পরিবর্ত্তে কফি ব্যবহার করেন। তবে অধিক মাত্রায় সেবন করিলে নানা কুফল ফলে। অল্প মাত্রায় ইহা অত্যন্ত উপকারী। ইহার আস্বাদও অত্যন্ত রসনা তৃপ্তিকর।

অরহরের চাষ

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত

সভ্য সমাজে অর্থের সহিত সকল দ্রব্যেরই বিনিময় চলে, অর্থ হইলে সংসারের কোন কোন জিনিসের অভাব থাকে না। বিনিময়ে কার্য্যসৌকার্য্যার্থে অর্থ নিতান্ত সুবিধাজনক ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু আজ কাল জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ধান্যাদি মহাধন অপেক্ষাও প্রয়োজন সাধক অর্থের আদর অধিক হইয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ সভ্যতার একঘেয়ে উন্নতি এবং সেই উন্নতির জন্য বলবতী পিপাসা। তাই আজ কাল আমাদের দেশের লোক সভ্যতার অভিমানে ঘোর অভিমানী। তাই আমাদের পল্লীগ্রামের শস্যক্ষেত্র, গোচারণের মাঠ হইতে কৃষক সহরের কল কারখানায় দড়ি কাটিতেছে, চট বুনিতেছে, নলি পাকাইতেছে। আর পল্লীর লোক চাউল কিনিয়া খাইতেছে। আমরা তাই অনাবৃষ্টির বৎসরে আধপেটা খাই, অন্নের জন্য কাঁদিয়া ব্যাকুল হই

ও অনাহারে প্রাণ হারাই। বাবু হইব, সহরে থাকিব, নগদ টাকার মুখ দেখিব, ইহাই সকলের ইচ্ছা, কিন্তু অবোধ আমরা ভাবিয়া দেখি না কাহার জন্য টাকার আদর। টাকা খাইয়া পেট ভরে না, টাকা পরিয়া অঙ্গ ঢাকে না, সত্য বটে—"কড়িতে বাঘের দুধ মিলে" কিন্তু অজন্মা হইলে কোথায় শস্য মিলিবে। আমাদের দেশের প্রাচীন মুনি ঋষিরাও কৃষিকার্য্যের যথার্থ সমাদর করিতেন, তাঁহারা স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ ও আপন আপন আশ্রমে বৃক্ষ লতাদি উৎপাদন করিতেন, বিচিত্র তীর্থ স্থান কুরুক্ষেত্র নামক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে মহারাজ কুরু স্বহস্তে চাষ করিতেন, প্রাচীন ভারতে কৃষি বিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি ছিল। ভারতের মৃত্তিকা অতিশয় উর্ব্বরা, এখানকার মৃত্তিকায় বীজ নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ লতাদি উৎপন্ন করে, এজন্য বিদেশীয়েরা ভারত ভূমিকে সমস্ত পৃথিবীর উদ্যান বলিয়া বর্ণন করেন, ভারতীয় আর্য্যগণ ভারতের সেই ঈশ্বরদত্ত শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করিতে জানিতেন, কৃষিকার্য্যকে তাঁহারা ঘৃণা করিয়া চাষার কাজ বলিয়া উপেক্ষা করিতেন না, তাঁহাদের উদ্যমেই ভারত ভূমির স্বর্ণপ্রসবিনী নাম রক্ষা হইয়াছে।

শস্য সংগ্রহের জন্যই কৃষিকার্য্যের প্রয়োজন। সর্ব্বাগ্রে জঠরজ্বালা নিবারণের উপায়, তবে সভ্যতা রক্ষার জন্য আয়োজন। যাহা না হইলে একদিনও জীবন রক্ষা হয় না, এমন সামগ্রী যে অত্যাবশ্যকীয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা যে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রাণপণে পরিশ্রম করি, শরীরে সুখ নাই, অসুখ নাই, হাহা ধাধা করিয়া এই সংসারে ঘুরিয়া বেড়াই, পরের মন জোগাইয়া দশ টাকা উপার্জ্জন জন্য আপনার স্বাধীনতাটুকু বিক্রয় করি, সে কেবল একমুষ্টি অন্নের জন্য, প্রাণপ্রদ অতি আদরের অন্ন লাভ করিতে কাহার না প্রবৃত্তি জন্মে, কে না ইহার জন্য দেহ মন উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হয়! আমাদের শরীরের বর্দ্ধন, ক্ষতিপূরণ ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্যই খাদ্যের আবশ্যক। উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিলেই খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সুসাধিত হয়। উৎকৃষ্ট বা পুষ্টিকর খাদ্যে শতকরা ২২ ভাগ সোরাজান থাকা দরকার। অন্নে অত্যধিক শ্বেত সার (শতকরা ৬৯ ভাগ) এবং অত্যল্প পরিমাণ সোরাজান আছে বলিয়া, শুধু অন্ন খাইয়া জীবন ধারণ করা যায় না। পক্ষান্তরে ডাইল মাত্রেই অত্যধিক সোরাজান থাকিলেও শ্বেতসারের অভাব আছে বলিয়া; কেবল ইহাতেও জীবন রক্ষা হয় না। ডাইল ও ভাত একত্রে আহার করিতে পারিলেই তাহা পুষ্টিকর খাদ্য হয়। কারণ অন্নের সোরাজানের অভাব ডাইলের অত্যধিক সোরাজানের দ্বারাই পূরণ হইয়া থাকে। ডাইলের পরিবর্ত্তে অন্নের সহিত মাছ, মাংস, দুগ্ধ, তরকারী ও নানাবিধ শাক সব্জী প্রভৃতি আহার করিয়াও জীবন ধারণ করিতে পারা যায়, উক্ত পদার্থগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে সোরাজান আছে। এই সকলগুলি অপেক্ষা ডাইল সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। আমাদের খাদ্যের মধ্যে ডাইলই প্রধান সোরাজানময় মাংসজনক খাদ্য। সুতরাং ধান্য, গম প্রভৃতির পর ইহাই আমাদের প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। অরহর, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও বিহার দেশের একটী

প্রধান চাষ। উক্ত দুই স্থানেই ইহার প্রচুর চাষ হইয়া থাকে, বঙ্গদেশে অরহরের চাষ খুব কমই হয়।

বালুকা মিশ্রিত জমী কিম্বা যে জমী বন্যার জলে ডুবিয়া যাইতে পারে, এরূপ নিম্ন ভূমি অরহরের চাষের পক্ষে উপযুক্ত নহে। অরহর জন্য শুষ্ক অথচ এঁটেল জমীই প্রসস্ত। অরহর গাছের গোড়ায় জল লাগিলে গাছ মরিয়া যায়। অরহরের গাছ জলের ও দুঃসহ শীতের কষ্ট সহ্য করিতে পারে না। নূতন উদ্যান প্রস্তুত করিবার জমীর চতুঃপার্শ্বে যে পগার কাটা হয়, তাহার মাথার উপরে দুই সারি করিয়া অরহর বীজ বপন করিলে তাহাতে শস্য ও বেড়ার কার্য্য উভয়ই হয়। স্থানে স্থানে কৃষকেরা ইক্ষু, মূলা, তুলা, বেগুন লঙ্কা ও অন্যান্য ফশলের জমীতে অরহরের বেড়া দেয়। অরহর গাছ শীঘ্র বাড়ে ও সোজা হইয়া উঠে বলিয়া, ইহা বেড়ার পক্ষে বিশেষ উপোযোগী। বেড়ায় লাগান অরহরের গাছ ৩।৪ বৎসর বাঁচিয়া থাকে এবং প্রতিবৎসর শস্যোৎপাদন করে। অরহরের বেড়ার দ্বারা তিনটি বিষয়ে লাভবান হওয়া যায়, (১) বেড়া দেওয়া কাজ হয়, (২) ক্রমাগত ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত অরহরের ডালই পাওয়া যায়, (৩) অরহরের দ্বারা ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বে আমাদের দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই (উচ্চ ভূমীতে) অরহরের বেড়া দেওয়া হইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অরহর বৃক্ষের উপকারিতা সম্বন্ধে লোকে অনভিজ্ঞ বলিয়াই এই প্রথাটী ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।

শস্যোৎপাদিকা শক্তি কমিয়া গেলেই চাষীগণ ক্ষেত্রে অরহর বীজ বপন করিয়া থাকে। এজন্য বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানের কৃষকেরা আশু ধান্যের সহিত অরহর বীজ বপন করে। বিহার ও উর্ত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জুয়ার ও বাজরার সহিত বপন করে সুতরাং অরহরের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করিতে হয় না। অনাবৃষ্টি হইলে অরহরের কোন ক্ষতি হয় না। অরহর গাছের মূল দীর্ঘ হয় ও মৃত্তিকার অনেক নিম্নে থাকে, সেই নিম্ন প্রদেশ হইতেই রস টানিয়া লইয়া বাঁচিয়া থাকে। জীবন রক্ষার জন্য বৃষ্টির জলের বড় আবশ্যক হয় না।

অরহর দুই প্রকার—মাঘী ও চৈতালী; প্রথম প্রকার অরহর মাঘ মাসে পাকে, এ জন্য উহার নাম মাঘী; দ্বিতীয় প্রকার চৈত্র মাসে পাকে, এই জন্য উহার নাম চৈতালী। মাঘীর ফুল হলদে ও বেগুনি রং মিশ্রিত, চৈতালী অরহরের ফুলের রং খাঁটী হলদে। উভয় প্রকার ডাইলের বর্ণও ফুলের বর্ণানুরূপই হইয়া থাকে। অরহুরের বীজ হইতে দাইল হয়। বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা ডাইল ভাঙ্গিয়া ছাতুও প্রস্তুত করে। উক্ত স্থান সমূহে বুটের ছাতু অপেক্ষা ইহার আদর বেশী। বঙ্গদেশে অরহরের ছাতু ব্যবহৃত হয় না। অরহরের গাছ জ্বালাইবার পক্ষে উৎকৃষ্ট। ইহার কয়লাতে অত্যুৎকৃষ্ট বারুদ ও টিকে প্রস্তুত হয়, এবং ছাই দ্বারা সাজিমাটীর তুল্য কাপড় কাচা ক্ষার হয়।

বপন করিবার জন্য অত্যল্প পরিমাণ বীজেরই আবশ্যক হয়। বিঘা প্রতি দুই সের হইলেই যথেষ্ট। অন্য ফসলের সঙ্গে অথবা পাতলা করিয়া বপন করিলে অর্দ্ধসের বা একসের বীজেই চলে। অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে প্রথমতঃ পাতলা করিয়া বীজ বপন করাই উচিত। বিঘা প্রতি ৩।৪ মণ হইতে ৫।৬ মণ পর্য্যন্ত ফসল হইতে পারে। এত অল্প পরিমাণ বীজ বপন করিয়া এত অধিক পরিমাণ ফসল আর কোন শস্যেরই হয় না। বপন করিবার বীজ ভাল করিয়া বাছিয়া লইতে হয়। কারণ বীজ সুপুষ্ট ও তাজা না হইলে, ক্রমাগত তিনবৎসর পর্য্যন্ত সমভাবে ফসলের আশা করা যায় না। মসুর, বুটাদির ন্যায় অরহর গাছ একবার শস্য প্রসব করিয়াই মরিয়া যায় না। ফল পরিপক্ক হইলে তাহা কাটিয়া পালা দিতে হয়, তৎপর শুষ্ক শুটি ফাটিতে আরম্ভ করিলে গরু দিয়া মাড়িয়া অথবা লাঠি দ্বারা ঠেঙ্গাইয়া বীজ বাহির করিতে হয়। বীজ বাহির করিয়া যে গুলি পুষ্ট ও তাজা তাহা বপন করিবার জন্য পৃথক রাখা আবশ্যক, বপনের বীজ রৌদ্রে দিয়া ভাল রূপে শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয়।

ঘৃত সংযোগে অরহরের ডাইল সুস্বাদ, পুষ্টিকর ও বায়ু নাশক। ইহাতে শরীরের বর্ণ ও লাবণ্য বৃদ্ধি হয়। লাক্ষা পোকা পালনের পক্ষে অরহর গাছ বিশেষ উপযোগী। লাক্ষা পোকা অরহর গাছে বেশ জন্মে। লাক্ষা পোকা ত্বক ও রস খাইয়া ফেলিলেও তাহাতে অরহর গাছের বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় না। লাক্ষা পোকার শরীর নির্গত আঠার ন্যায় রক্ত বর্ণ পদার্থ হইতে লা, পাতগালা, বাতীগালা, অলক্তক ও বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিবার রং তৈয়ার হয়। সুতরাং অরহরের সহিত লাক্ষা পোকা পালন করিলেও তদ্দ্বারা বিশেষ লাভবান হওয়া যায়।

পরেশনাথ পাহাড়—তোপ্‌চাঁচি—"মিক্‌মিক্ ঘাস"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (পরেশনাথ পাহাড়) তোপচাঁচি।

বাঙ্গালার পশ্চিম ছোটনাগপুর বিভাগ, এখন বিহার গবর্ণমেণ্টের অধীন। এই প্রদেশ ক্ষুদ্র বৃহৎ পর্ব্বত মালায় পরিশোভিত। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, পাথুরিয়া কয়লা প্রভৃতি ধন রত্ন রাজিতে প্রকৃতির ধন ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। মানুষের জীবন রক্ষক স্বাস্থ্য এখানে চিরবিরাজিত। দুর্ব্বার "ম্যালেরিয়া রাক্ষসী," এস্থানে প্রবেশ করিতে কদাচ সাহসী হয় নাই। পরেশনাথে জৈন ধর্ম্মাবলম্বী মাড়োয়ারি জাতির আরাধ্য দেবতা "পরেশনাথ" বিরাজ করিতেছেন। অত্যুচ্চ পর্ব্বতোপরি তাঁহার মন্দির, তথায় তাঁহার নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। স্থান অতি নির্জ্জন এবং মনোরম। এই পর্ব্বত উত্তর দক্ষিণে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পর্ব্বতগাত্রে নানাবিধ

ওষধি লতা এবং সুদৃঢ় শাল, তমাল, পিয়াল প্রভৃতি বিশাল তরুরাজিতে পরিশোভিত। পর্ব্বতোপরি উঠিবার একটী চক্রাকৃতি ঘুরান সিঁড়ি আছে। পাহাড়ের উপর একধারে গবর্ণমেণ্টের ডাক বাংলা আছে। পরিদর্শকগণ প্রয়োজন মত সময় সময় তথায় যাইয়া বায়ু সেবনের জন্য বাস করেন। তোপচাঁচি পরেশনাথ পাহাড়ের একটি মৌজা এখানে একটী পুলিশ ষ্টেশন আছে। স্থানটি একান্তে অবস্থিত ও অতীব সুন্দর, পর্ব্বত গাত্রোদ্ভূত একটি ঝর্ণা হইতে সুবিমল বারি অনবরত ঝর ঝর ঝরিতেছে পথশ্রান্ত পথিক এবং এমনকি বন্য পশুরা আসিয়াও ইহার নির্ম্মল জল পান করে। ভাবুক পরিব্রাজকগণ পরেশনাথের এই অনির্ব্বচনীয় নৈসর্গিক শোভা দর্শনে ভগবৎ ভক্তিতে বিমোহিত হইয়া পড়েন। তোপচাঁচিতে অনেক সময় ব্যাঘ্র ভল্লুকের ভয় হয়। বর্ত্তমান গ্রাণ্ডকর্ড রেল লাইনের উন্নতিশীল ধান্‌বাদ্ ষ্টেশন হইতে ভীমকায় কৃষ্ণবর্ণ অত্যুচ্চ পরেশনাথ পাহাড় দৃষ্টিগোচর হয়। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে এক সময়, এই তোপচাঁচিতে সমগ্র সাঁওতাল জাতি সমবেত হইয়া কাঁড়্ বা তীর এবং এক প্রকার দেশী কামান লইয়া ইংরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; তদনুসারে এই স্থানের নাম তোপচাঁচি হইয়াছে। তোপচাঁচি হইতে বহুদুর ব্যাপিয়া আমেরিকান্ 'চা' গাছ দেখা যায়। এই চায়ের পাতা শুকাইয়া 'চা' প্রস্তুত করিয়া পান করা গিয়াছে, তাহাতে আসামী চায়ের ন্যায়ই বোধ হয়। বর্ষাকালে এই স্থানের যেরূপ বৃহৎ আকার ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা এবং কুঁদ্‌রী দেখা গিয়াছে তেমন বৃহদাকার তরকারি আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। এই জায়গা সাঁওতাল প্রধান স্থান। ইহারা অতীশয় সত্যবাদী, সরলচিত্ত এবং ন্যায়বান্ জাতি। আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই পাহাড়ের গায়ে অধিক উচ্চ স্থানে, শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দুই তিন জাতীয় কলার শত শত ঝাড় যেন কেহ বাগান করিয়া রাখিয়াছে। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ইহা কোন মনুষ্য কৃত নহে স্বভাব জাত্। কলাও বিশেষ বড় ও মোটা নহে; তোপচাঁচিতে এখন যে কলা হয় ইহা কোন মনুষ্যের ভোগ্য হইতে কেহ দেখে না। কেবল পাহাড়ের বানরেই ভক্ষণ করিয়া থাকে। সাঁওতালেরাও কখন পাড়িবার চেষ্টা করে না। তবে কাঁদি ফলিবার বিরাম নাই। প্রাকৃতিক অবস্থায় সব উদ্ভিদেরই ফল ছোট হয়। প্রকৃতির উদ্দেশ্য বংশ বৃদ্ধি করা। ঝড়, ঝঞ্ঝাবাত, বৃষ্টি, প্রখর সূর্য্যকর হইতে নিজ অঙ্গের কোমল অংশগুলি উদ্ভিদ আবরণ দ্বারা ঢাকিয়া রাখে। এই জন্য প্রকৃতি সঞ্জাত ফলে বীজের আধিক্য দেখা যায়। জন্তু জানয়ারে এই বীজপূর্ণ ফলগুলি আহারে বিরত নহে কিন্তু মানুষ সৌখিন হইয়াছে। মানুষ প্রকৃতির পাঠশালায় পড়া শেষ করিয়া এখন যেন নূতন জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে ফলের বীজাধিক্য দেখিতে পারে না; ফলে আঁস আধিক্য তাহার অসহনীয়, ছোট ফল সে আদৌ পছন্দ করে না, বন্য গন্ধ ঘুচাইয়া সুস্বাদু সুগন্ধ ফলের সৃষ্টি করিতে চায়। বিশ্বামিত্রের সৃষ্টির মত সে প্রকৃতির জল, মাটি, বীজ, লইয়া নূতন একটা কিছু গড়িয়া তুলিতে চায় এবং ক্রমান্বয়ে তাহাই হইতেছে। সকল উদ্ভিদের রীতিমত যত্ন ও পাইট হইলে ক্রমশঃ তাহাদের ফল ভাল হয়। বন্য ঢেঁড়স ও বেগুণ হইতে দেব ভোগ্য বেগুণ ঢেঁড়স জন্মিতেছে, বুনো গাছ টমাটোর বীজ হইতে বৎসর কলা ও বারমেসে রহু সুন্দর সুন্দর টম্যাটোর জন্ম হইয়াছে তাহার গণনা হয় না। বন্য শরিষা হইতে শরিষা বংশের উন্নতি ও সেই বংশে কপির উদ্ভব হইয়াছে। ওলকচু যাহা ছুঁলে হাত কুটকুট ও জ্বালা করিত তাহা এখন উপাদেয় খাদ্য। কয়টার নাম করিব মানুষ বহুতর

উদ্ভিদের সংসর্গে আসিয়া তাহাদিগকে নিজ মনমত করিয়া লইয়াছে। মানুষে এখানকার কদলী ভক্ষণ করিতে পারেনা পরেশনাথ পাহাড়ের উচ্চতা এবং পর্ব্বত গাত্রের দুরারোহত্বও তাহার একটি কারণ। সেই কণ্টকাকীর্ণ দুরারোহ পর্ব্বত গাত্রে উঠিবারও কোন উপায় নাই। পক্ষান্তরে ইহাও অনুমান হয় যে "অহিংসা পরমধর্ম্ম" জৈনেরা বানর জাতির ভোগ্য বস্তু কদলী রাশি সাধারণ মানবকে লইবার পক্ষে বিশেষ বাধা জন্মাইয়া রাখিয়াছে, কারণ পরেশনাথ উহাদিগের দখলে এবং তীর্থস্থান। ঐ কলার ঝাড় সকল মাঘ মাস হইতে শুকাইয়া যায়। আবার বর্ষাগমে কচু গাছের ন্যায় গজাইয়া পর্ব্বতগাত্র সবুজবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তোলে। এই পাহাড়ের উপরে একপ্রকার লম্বা ঘাস দেখা যায় এই ঘাস খুব ভারসহ; উহাকে সাঁওতালেরা "মিক্ মিক্" ঘাস বলে। ইহা সাবুই ঘাস ব্যতীত অন্য কিছুই নহে অথবা সাবুই ঘাসের জাতি বিশেষ। উহা বর্ষাকালে পাহাড়কে ঢাকিয়া ফেলে এবং গরমকালে এককালীন উলু খড়ের ন্যায় শুকাইয়া যায়। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে সাঁওতালী স্ত্রীলোকেরা কাটিয়া আনিয়া নিকটস্থ পল্লীবাসীদের গো মহিষাদির খোরাকী জন্য অল্পমূল্যে বিক্রয় করে। আমি কয়েক গুছি আনিয়া, সিংভূমের জঙ্গল জাত, সাবাই ঘাষের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি তাহাতে তৎসদৃশ গুণবিশিষ্ট বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। ইহা দ্বারা ঐ দেশীয় লোকে দড়ি পাকাইয়া, শয়নের জন্য খাটিয়া বুনে, ঘর বাঁধে, কাছি প্রস্তুত করে। ইহার টান সহত্ব গুণ অতি প্রবল। এই "মিক্ মিক্" ঘাষ নিশ্চয়ই সাবাই জাতীয় ঘাস, অতএব ইহার এরূপ সামান্যভাবে ব্যবহার না করিয়া, কাগজ প্রস্তুতের জন্য, ব্যবহারে আনিলে, অধিক অর্থ ঘরে আসিতে পারে। মধ্য প্রদেশের পাহাড় ও জঙ্গলে, সাবাই ঘাস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, এবং তথায় ইহার বেশ একটি কারবার চলিতেছে। সিংভূমের ন্যায় পরেশনাথের পাহাড়ের "মিক্‌মিক্" বা সাবাই ঘাসের জমা লইয়া, যদি কেহ উহা কলিকাতা এবং বিদেশস্থ, গ্রেট ব্রিটেন, ডেনমার্ক, সুইডেন প্রভৃতি দেশীয় কাগজের কলে, এই ঘাস চালান দেন, তাহা হইলে, অনেক অর্থ পাওয়া যাইতে পারে। এইঘাস কাগজ প্রস্তুতের একটি ভাল উপাদান ইহা বহুপরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। ইহা মন হিসাবে বিক্রয় হয়। ভারত হইতে, বিদেশে rough materials অর্থাৎ কাঁচা মাল, সরবরাহ করা ভিন্ন, সূক্ষ্ম শিল্প তৈয়ারী করিবার সমবেত চেষ্টা আমাদের নাই। এ দেশের শিল্প উন্নতির জন্য রাজসরকার এবার বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং রাজ সাহায্যই আমাদের প্রার্থনা। কথার অবতারণা অনেক হইয়াছে, আশ্বাসবাণীও অনেক শুনা যাইতেছে, এখন সেগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে তবে বুঝিব যে ভারতে নব যুগ আসিল। এতাবতকাল আমরা আশায় প্রাণধারণ করিয়াছি। আশার মূলোচ্ছেদ হইলে আমাদের প্রাণবায়ু উঠিয়া যাইবে।

সাময়িক কৃষি-সংবাদ

বীজের জন্য পাট—এক্ষণে পাট বীজের অধিক দাম হইয়াছে—মণ ১০৲ টাকা, ১৫৲ টাকা মূল্যে পাট বীজ বিক্রয় হয়। সরকারী ক্ষেত্রে পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে এক একর জমিতে, বীজের জন্য পাটের চাষ করিয়া মোট ৩০/ মণ বীজ পাওয়া যায়। এই জমিতে একর প্রতি ১০/ মণ করিয়া খৈলের সার দেওয়াই পর্য্যাপ্ত সার প্রয়োগ বলিয়া মনে হয়। পাটের আঁশের জন্য পাট চাষে লাভ অনেক বটে কিন্তু তাহাতে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় অধিক, বীজের জন্য পাট চাষেও লোকসান নাই। ভাল আঁশ পাইবার জন্য পাটের বিস্তৃত আবাদ হইলে তবেই ভাল পাট বীজ উৎপন্ন করায় লাভ আছে। বীজের জন্য পাট চাষ করিলেও সেই সকল গাছ হইতে আঁশ একেবারে পাওয়া যাইবে না এমন নহে। এই সকল গাছের আঁশ কড়া হইয়া যায় এবং এই পাট গৃহস্থালীর মোটামুটি কাজ ভিন্ন অন্য ভাল কাজে লাগে না। কৃঃ সঃ।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে রেশম কীট-পালন শিক্ষা—রাজসাহী এবং বহরমপুর কীট-পালন-ক্ষেত্রে কীট-পালন শিক্ষা দিবার জন্য দুইটী বিদ্যালয় আছে। এই দুইটী বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কীট-পালন শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ছাত্রগণ সরকার হইতে মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি পায়। শেষ পরীক্ষার উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে বহরমপুরের কীট-পালন ক্ষেত্রের পলু ঘরের আদর্শে ঘর প্রস্তুত করিবার জন্য আড়াই শত টাকা মূলধন দেওয়া হয় এবং সেই ঘর তৈয়ার হইলে, যাহাতে তাহারা অন্ততঃ দুই বৎসর বৈজ্ঞানিক উপায়ে কীট পালন করিয়া বিশুদ্ধ বীজ বিক্রয় করে, এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে একটি অনুবীক্ষণ যন্ত্র ও সুতার জাল বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

রেশম-কীট-পালনে উৎসাহ—যে সকল জেলায় রেশমের চাষ হইয়া থাকে, সেই সকল স্থানের কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনীতে এই বিভাগীয় উৎকৃষ্ট গুটিসকল প্রদর্শিত হয় এবং উপযুক্ত কর্ম্মচারীদ্বারা অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে বীজ পরীক্ষা ও কাশার করিবার জন্য সুতার জালের ব্যবহার কীট-পালকগণকে দেখান হইয়া থাকে। সেই সঙ্গে সময়ে সময়ে সহজ ভাষায় সাধারণের বোধগম্যভাবে বক্তৃতাদ্বারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে কীট-পালন করিবার পন্থাও বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

রেশম কীটের উন্নতিকল্পে নানা অনুষ্ঠান—(ক) বিলাতী ও জাপানী কীটের সহিত বঙ্গের বিভিন্ন কীটের জোড় লাগাইয়া পরীক্ষার্থ নানাবিধ দোয়াঁসলা বা শঙ্কর গুটি উৎপাদন করা হইতেছে। কয়েক প্রকার শঙ্কর গুটি হইতে সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। আশা করা যায়, এইরূপ শঙ্কর গুটি উৎপাদন দ্বারা ভবিষ্যতে দেশের দুর্ব্বল গুটির অবস্থা উন্নত হইবে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে এই বিষয়ের পরীক্ষা ও গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং এখনও এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে

নিশ্চয়রূপে উপনীত হওয়া যায় নাই। এই সকল শঙ্কর গুটির বীজ এখনও কীট-পালকগণকে বিক্রয় করা হয় না, তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য কেহ কেহ লইয়া যায়।

তুঁতের জমির সার—(খ) হাড়ের গুঁড়া তুঁতের জমিতে সাররূপে ব্যবহার করিয়া অতি উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ পুষ্করিণীর পলি মাটীই সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কারণ ইহাই সহজ-প্রাপ্য, সুলভ ও উৎকৃষ্ট সার।

বিদেশীয় তুঁত গাছ—(গ) ইটালী দেশীয় তুঁত বৃক্ষের পাতা, শেষ খোলস্ ছাড়ার পর কীটকে খাওয়াইয়া বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে। কীটের এই শেষ অবস্থায় যদি সরস নরম পাতা খাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা "রসা" রোগে আক্রান্ত হয়। সুতরাং এই অবস্থায় দেশী তুঁতের ঝাড় হইতে নরম পাতা না দিয়া, ইটালীর তুঁত বৃক্ষের পাতা খাওয়াইলে কীটগণ রসাগ্রস্ত হইতে পারে না। আর যদি অন্য কোন কারণে তাহাদের রসা হয় তাহা হইলেও এই তুঁত বৃক্ষের পাতা খাওয়াইলে সেই রোগ নিবারণের বিশেষ উপায় হয়। এই কারণে প্রতি কীট-পালন-ক্ষেত্রে কতকগুলি ইটালী দেশীয় তুঁত বৃক্ষ লাগাইয়া রাখা উচিত।

রেশম চাষে বীজ পরিবর্ত্তন আবশ্যক—গুটিগুলি অতিশয় সবল ও নিরোগ হইলেও যদি এক বীজ হইতে এক স্থানে উপর্য্যোপরি প্রতি বৎসর ক্রমাগত ফসল উৎপাদন করা যায়, তাহা হইলে ২।৩ বৎসর পরে, সেই বীজ রোগমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, স্থানীয় একরূপ জলবায়ু ও আবহাওয়ার জন্য নির্জীব ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এইরূপ দেখা গিয়াছে, যে এই সকল নির্জীব ও দুর্ব্বল কীটের "কটা" রোগ হওয়া অনিবার্য্য। তখন কটা রোগের হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উপায় নাই। এই বিঘ্ন ও অন্তরায় দূরীকরণার্থ রেশম কৃষি বিভাগ-বীজ বদল করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। সেই জন্য সরকারী কীট পালন ক্ষেত্রের বীজ সকল সময়ে ব্যবহার না করিয়া, অন্যত্র হইতে ভাল বীজ আনীত হয়। পরে অনুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে রোগেমুক্ত করা হয় এবং তাহা হইতে কীট উৎপাদিত হইয়া থাকে।

বগুড়া জেলা ভিন্ন অন্যত্র খাঁটি দেশী বা ছোট পলুর বীজ প্রায়ই পাওয়া যায় না। কারণ বগুড়ার লোকেরা এখন পর্য্যন্তও নিস্তারি গুটির চাষ করে নাই। কেবলমাত্র ছোট পলুর জোয়ার বদল করিবার উদ্দেশ্যে বগুড়ায় সরকারী কীট-পালন-ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান বর্ষ হইতে তথা কার ছোট পলু আনয়ন করিয়া প্রত্যেক বন্দে সরকারী কীট-পালন-ক্ষেত্রে এক বন্দ মাত্র পালন করিয়া পরে সাধারণকে বিক্রয় করা হইবে।

অগ্রহায়ণ, ১৩২২ সাল।

কৃষির বিবর্ত্তণ

আমাদের দেশের চারিদিকের শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র ও বাগান বাগিচাদি দেখিয়া অনেকেরই হয়ত মনে হয় যে কৃষি একটি চিরন্তন ব্যাপার, আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিতে গেলে এবং পৃথিবীর ইতিহাসের সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষির উদ্ভাবনা অতি অল্পদিনই হইয়াছে; এমন কি ইহা মানবজাতির অভ্যুদয়ের সমসাময়িকও নহে। পুরাকালের কথা ছাড়িয়া দিলেও এখনও পৃথিবী পৃষ্ঠে মরু, অরণ্য, পর্ব্বত ও জলাশয়বাসী এমন অনেক জাতি রহিয়াছে যাহারা জীবনধারণের জন্য কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করে না। মৃগয়া লব্ধ অথবা গৃহপালিত পশুপক্ষীর মাংস ও স্বভাবজাত তরু গুল্মাদির ফল মূল প্রভৃতিই ইহাদের প্রধান অবলম্বন। এতদ্দেশে স্বতঃ বিচরণশীল 'বেদিয়া' নামক যে জাতি দৃষ্ট হইয়া থাকে উহারাও মানব সভ্যতার অকৃষক-অবস্থার সাক্ষ্য প্রদান করে।

বর্ত্তমান যুগে মানবজাতির অস্তিত্ব অনেক পরিমাণে কৃষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু মানব ইতিহাসে এমন সময় ছিল যে সমাজের পক্ষে কৃষি অত্যাবশ্য-কীয় বলিয়া বিবেচিত হইত না। যে তাতার, মোঙ্গল প্রভৃতি জাতিরা মধ্য এসিয়া হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রবল প্রতাপে তাৎকালিক প্রায় অর্দ্ধভারত অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাদেরও প্রথম অবস্থায় কৃষি অজ্ঞাত বিষয় ছিল। তাহাদিগের ধন সম্পত্তির মধ্যে ছিল দিগন্ত-বিস্তৃত তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর সমূহ; অসংখ্য অর্দ্ধবন্য ঘোটক ঘোটকীর পাল এবং চিল (pine) বৃক্ষের নিবিড় অরণ্যানী। পঞ্জাবের উত্তর প্রান্তে উপনীত হইয়া যখন তাহারা সুদূরব্যাপী শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র সমূহ সন্দর্শণ করে, তখন তাহারা যে কিরূপ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল তাহা অনেক ইতিহাস পাঠকই অবগত আছেন।

কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তণের কারণ প্রধানতঃ দুইটি বলিয়া বোধ হয়—১মতঃ সর্ব্ববিষয়ে জগতের আদিম প্রাচুর্য্যের ক্ষয় এবং ২য়তঃ বিচরণ বিলাসের পরিবর্ত্তে আমাদের নির্দ্দিষ্ট দেশ অথবা স্থানে স্থিতি-প্রবণতা। পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই বৃহৎ বৃহৎ অরণ্য মনুষ্যের হস্তে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহারা যে অমিতপরিমাণে ফলমূল ও বন্য জন্তু প্রভৃতি উৎপাদন করিত তাহাও আর আজকাল নাই। কাজেই কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদির বৃদ্ধি সাধন করিতে হইয়াছে। এই কৃত্রিম উপায়ই কৃষি। কৃষির প্রচলন বিচরণশীল জাতিগণের মধ্যেও আছে, কিন্তু তাহা অতি নিকৃষ্টপ্রকারের। যাহাদের একস্থানে স্থিতির কোন স্থিরতা নাই তাহারা যতশীঘ্র পারে জমি হইতে ফসল তুলিয়া লইতে চায়। সেই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে 'গুজর' প্রভৃতি বন্যজাতিরা পর্ব্বত গাত্রে খানিকটা জমি পোড়াইয়া তাহাতে শীঘ্র-পরিপক্কশীল কোন প্রকার শস্য ছিটাইয়া দেয় এবং জলবায়ুর প্রকোপ অধিক হওয়ার পূর্ব্বেই উহা সংগ্রহ করিয়া লইয়া উক্ত স্থান হইতে প্রস্থান করে। সভ্যতার উন্নতির সহিত মানব ক্রমশঃ এক স্থানে পুত্র পরিবারাদি ও আত্মীয় স্বজন লইয়া সমাজ বন্ধন করিয়া থাকিতে শিখিয়াছে। সেরূপ অবস্থায় আর ইতঃস্তত পরিভ্রমণ সম্ভবপর নয়; সুতরাং উদ্ভিদ ও ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া যাহাতে স্বীয় আবাসভূমির নিকট আহার্য্য পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

মানবজাতির দেশদেশান্তরে বিচরণের সহিত কৃষির যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও ফল মূলাদির ইতিহাস আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পরোক্ষতঃ জগতে কৃষির সহিত ভূগোলের সম্পর্কও সামান্য নহে। গুহাবাসী আদিম মনুষ্য যদি বর্ত্তমান যুগে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া দেখিত, তাহা হইলে পৃথিবী পৃষ্ঠে যে অসীম পরিবর্ত্তন সমূহ সাধিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া সে চমৎকৃত হইয়া যাইত। এই সমুদয় পরিবর্ত্তণে মানবের হস্ত সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ জাতি ধন ও যশের লোভে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া শুধুই যে রাজনৈতিক জগতের সীমা পরিবর্ত্তণ করিয়াছে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে উহারা বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ অথবা প্রাণীর ভৌগলিক অবস্থানেরও (Geographical distribution) বহুল্য বিপর্য্যয় সাধন করিয়াছে।

কতিপয় স্থলে নৈসর্গিক কার্য্যে মানবের হস্তক্ষেপ কেবল ধ্বংসেরই কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—যথা অরণ্যবিনাশ। অরণ্য বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায়, নদীর উদ্দাম তরঙ্গে, প্রবল বন্যায়, প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপে, ও অবাধ ঝড় বৃষ্টিতে এক এক দেশ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। শুধু যে বন গিয়াছে তাহা নহে, যে মৃত্তিকার উপর বন অবস্থিত ছিল তাহাও চলিয়া গিয়াছে। ভারতের পঞ্চনদ প্রদেশ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চিরকালই যে উত্তর পঞ্জাবে বিশাল শুষ্ক প্রান্তর ও প্রায় নগ্ন পর্ব্বতমালা বিরাজমান ছিল না তাহার যথেষ্ট ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রহিয়াছে। অতিরিক্ত বৃক্ষচ্ছেদন, পর্ব্বতগাত্র

দাহন ও মনুষ্যের সহচর পশ্বাদি অবাধ চারণে বহু পুরাকালে উক্ত দেশের এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়া ছিল এবং এতদিন সেইরূপ চলিয়া আসিতেছিল। সৌভাগ্যের বিষয় যে আজ কাল গঙ্গা ও যমুনার ক্যানাল সমূহের প্রভাবে পঞ্জাবের পুরাতন ঐশ্বর্য্য আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মানবের হস্তক্ষেপে কৃষির ধ্বংস ও পুনরুদ্ধার উভয় কার্য্যই হইতেছে। মোটের মাথায় বোধ হয় পুনঃ প্রতিষ্ঠা অথবা নব প্রবর্ত্তণই অধিক পরিমাণে হইতেছে। কারণ কৃষিকার্য্য মানবের সুসভ্য অবস্থার নিত্য সহচর। মানুষ যতই এক হইতে অন্য স্থানে গমন করিয়াছে ততই তাহার আহার্য্য উদ্ভিদাদি ও গৃহপালিত পশুপক্ষী প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছে। কিন্তু সভ্যতার আদিম অবস্থায় মানুষের পরিভ্রমণের এবং তৎসঙ্গে কৃষিকার্য্য বিস্তারের কয়েকটি গুরুতর প্রতি বন্ধক ছিল। যখন মানব উপযুক্ত পরিমাণ জ্ঞান লাভ করে নাই, শিল্প ও বিজ্ঞানের যখন আবির্ভাব হয় নাই—যে সময়ে পর্ব্বত, মরু, অরণ্য ও বেগবতী নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক সমূহ তাহাকে বিশেষ বিশেষ দেশে অথবা অঞ্চলে আবদ্ধ করিয়া রাখিত। ভারতে বহুজাতি, ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার দৃষ্ট হইবার অন্যতম কারণ এই যে বহু দিবস হইতে নৈসর্গিক বাধা বিঘ্ন প্রভৃতির অন্য বিভিন্ন দেশ সমূহের মধ্যে সামান্য মাত্রই পরিচয় ছিল। বর্ত্তমান সময় কাশ্মীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ এবং কলিকাতা হইতে কারাচি অনায়াসে যাতায়াত করা যায়। কিন্তু এক শতাব্দী পূর্ব্বে এইরূপে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গমন করা যে কত কষ্ট সাধ্য ছিল তাহা বলা বাহুল্য মাত্র—এমন কি অবস্থা বিশেষে উহা আদৌ সম্ভবপর ছিল কিনা তাহা বলা যায় না। বিংশ শতাব্দীতে পর্ব্বতগর্ভ ভেদ করিয়া, কিম্বা উহা অতিক্রম করিয়া রেলগাড়ি চলিয়াছে, বায়বীয় রেল অথবা রজ্জুপথের সাহায্যে পর্ব্বত শৃঙ্গস্থ দেশ সমূহের দ্রব্যাদি সমতলস্থ দেশের সহিত আদান প্রদান হইতেছে। সুতরাং পর্ব্বত আর মানব সমাজ প্রসারে বাধা দিতে পারিতেছে না। মরুও মানবের বুদ্ধি কৌশলের নিকট পরাস্ত হইয়াছে। আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে, আফ্রিকার, মেসোপোটোমিয়ায় এবং ভারতের স্থানে স্থানে উপযুক্ত উদ্ভিদ রোপণ, শুষ্ক চাষ, বসতি স্থাপন, জলাশয়, কূপ ও খাল খোদন প্রভৃতির দ্বারা অনেক জমি মরুর করাল কবল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। আফ্রিকার সাহারা মরুর প্রায় ৩০ বর্গ মাইল ক্ষেত্র আজকাল মানব ও পশ্বাদির আহার্য্য উৎপাদন করিতেছে। পর্ব্বত ও মরুর ন্যায় অরণ্য ও নদী সমূহও বর্ত্তমান সময় মনুষ্যের যথেচ্ছা বৃদ্ধি রুদ্ধ করিতে পারে না। এ সমস্ত অতিক্রম করিয়া মনুষ্য ও কৃষি দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

বস্তুতঃ পূর্ব্বে যে সমুদয় ভৌগলিক সীমা ছিল, এখনও অধিকাংশ স্থলে সে সকল বিরাজমান থাকিলেও তাহাদের আর সে পুরাতন অর্থ নাই। পাথুরিয়া কয়লা, তৈল, ইন্ধন ও তাড়িত শক্তি পূর্ব্বতন সীমা সমূহ ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। তাহার উপর আবার

মানবের কৌশলে পৃথিবীর মহাদেশ ও সমুদ্র সমুহের পারস্পরিক অতীত সম্বন্ধ অন্তর্হিত হইয়াছে। দুইটি উদাহরণে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়—যথা সুয়েজ ও পানামা ক্যানাল। এই দুইটি ক্যানালের প্রাদুর্ভাবে যে জগতের বাণিজ্য প্রভূতভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা বলা অনাবশ্যক। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত কৃষিকার্য্য প্রচারের যে কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মানবের ইতিহাসে পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি আবিষ্কৃত হইবার আগে কৃষি নিতান্তই স্থানীয় ব্যাপার ছিল। এক দেশের ফসল তদ্দেশেই ব্যবহৃত হইত এবং এমন কি অতিরিক্ত হইলে নষ্টও হইয়া যাইত। যে সকল দেশে অধিক পরিমাণ উর্ব্বর জমি রহিয়াছে সে সকল জমিও অনাবশ্যক বোধে অনাবাদী পড়িয়া থাকিত। এখন আর তাহা হয় না। এখন পৃথিবীর যাবতীয় বড় বড় ব্যবসায়ের স্থান জল অথবা স্থল পথে পরস্পর সংযুক্ত। পৃথিবীর জন্য পাট বঙ্গদেশে উৎপাদিত হয়। ভারতের তুলা, গোধূম, তৈলবীজ প্রভৃতি সর্ব্বত্রই রপ্তানী হয়। ইংলণ্ডের আহার্য্য গোধুমের উৎপত্তি স্থান রুষিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা। ফ্রান্সের নিত্য ব্যবহার্য্য শাকশব্জী আফ্রিকার উত্তরভাগ হইতে আইসে। এই সমস্ত বিষয় ভাবিলে বুঝিতে পারা যায়—কৃষির বহুল প্রচারে বিজ্ঞান যতদুর সাহায্য প্রদান করিয়াছে এমন আর কোন কারণেই করে নাই।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি মানবের দেশ দেশান্তর গমনাগমনের সহিত উদ্ভিদ ও পশ্বাদিও গমন করিয়াছে। বায়ু, জল ও বন্য জীব জন্তুগণের দ্বারাও উদ্ভিদের প্রসার হয় বটে, কিন্তু মানবের আহার্য্যোপযোগী যে সকল তরুগুল্মাদি আমরা সচরাচর দেখিতে পাই তাহা প্রধানতঃ মনুষ্যের দ্বারাই স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত। এইরূপ না হইলে কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে এত বৈচিত্র দেখিতে পাওয়া যাইত না। আমাদের দেশে সচরাচর যে সমস্ত ফসল উৎপাদিত হয় তাহার মধ্যে কতিপয় এইরূপে বিদেশ হইতে আনীত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তামাক, আলু, বিলাতী বেগুন, বিলাতী কুমড়া, কপি, বিলাতী আমড়া, আনারস, পেপে প্রভৃতির নাম করিতে পারা যায়। নিত্য ব্যবহারে ইহাদের নূতনত্ব চলিয়া যায় এবং কিছু কাল পরে লোকে মনে করে যে এই সমস্ত ফসল চিরকালই এতদ্দেশে জন্মিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও কৃষি প্রসারে ইহাদের কার্য্যকারিতা লোপ পায় না। নূতন সভ্যতার সংঘর্ষণে, দেশ পরিবর্ত্তণে এবং মানব কর্ত্তৃক প্রাকৃতিক অবস্থার রূপান্তরে কৃষি সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও বৈচিত্রময় হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে অধিকদুর যাইতে হইবে না। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার রেল অথবা ষ্টিমার হইতে দুরে অবস্থিত গ্রামাদির কৃষির উপর লক্ষ্য রাখিলেই তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। পূর্ব্বে যে সমস্ত জমিতে একমাত্র ধান ফসল ছিল এখন সে স্থানে অবস্থাভেদে, পাট, আলু, তামাক, চিনার বাদাম প্রভৃতির চাষ প্রবর্ত্তন হইতেছে। নূতন নূতন শাক শব্জীর পরিসর সহর তলা হইতে ক্রমশঃ পল্লীর দিকে অগ্রসর হইতেছে।

এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ ও অঞ্চলের মধ্যে যাহা দেখা যায় দেশ ও মহাদেশের মধ্যেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। আদিম মানবের গৃহ প্রাঙ্গনস্থিত দুই চারিটা গাছ হইতে এখন কর্ষিত উদ্ভিদাদি যে পৃথিবী পৃষ্ঠে কোটি কোটি বিঘা জমি অধিকার করিতেছে তাহার মূলে আর কিছুই নহে—কেবল মানবের প্রকৃতি জয়ের চেষ্টা।

পত্রাদি

—:*:—

হাড়ের গুঁড়া মিহি ও মোটা—

শ্রীযুত যতীন্দ্রনারায়ণ মিশ্র—হরিশ্চন্দ্রপুর পোঃ।

প্রশ্ন—"হাড়ের গুঁড়া"—কৃষি বিষয়ক কোন পুস্তকে দেখিয়াছিলাম হাড়ের গুড়া দুই প্রকার অবস্থায় বিক্রয় হয়। (১) ধুলির ন্যায় অতি সূক্ষ্ম গুড়া ও (২) ছোট ছোট দানা বিশিষ্ট (Crystal) গুঁড়া। জমিতে কোনটার প্রয়োগে অধিক লাভবান হওয়া যায়, উহাদের দোষগুণ সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করি। যেমন আজকাল অন্যান্য জিনিষে ভেজাল আরম্ভ হইয়াছে সেইরূপ ইহাতেও ভেজাল দেওয়া হয় কি না অর্থাৎ কেহ ইহাতে ধুলি অথবা অন্য প্রকার জিনিষ মিশাইয়া বিক্রয় করিতে পারে কি না? উহার উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ আছে কি না, থাকিলে কোন শ্রেণীর গুঁড়া উৎকৃষ্ট।

উত্তর—মিহি হাড়ের গুঁড়া মাটির রসে গলিয়া শীঘ্র কার্য্যকরী হয় এই জন্য মোটা অপেক্ষা মিহি হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগে আশুফল পাওয়া যায়।

অন্য জিনিষের মত ইহাতেও ভেজাল চলে। কিন্তু মোটা দানা অপেক্ষা মিহি গুঁড়াতে অধিক ভেজালের আশঙ্কা।

প্রশ্ন—হাড়ের গুঁড়ার দর—বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ হইতে প্রদত্ত "হাড়ের গুঁড়া সার" নামক পুস্তিকায় (১৩২০।১৩২১ সাল) "উহার মূল্য সাধারণতঃ তিন টাকা মণ হিসাবে" লেখা আছে এবং ঢাকা মৈমনসিং প্রভৃতি জেলার বহু কৃষক ঐ দরে ক্রয় করিয়াছে কিন্তু আপনাদের উহার মূল্য প্রতি মণ ৫৲ পাঁচ টাকা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, আপনাদের গুঁড়ার এত অধিক মূল্য হওয়ার কারণ কি?

উত্তর—এখন হাড়ের গুঁড়ার দর চড়িয়াছে। ৩৲ টাকা মণ পাওয়া অসম্ভব। তবে যদি গভর্ণমেণ্ট কৃষি-বিভাগ সস্তায় খরিদ করিয়া তাহার উপর কোন খরচ না

চাপাইয়া চাষীদিগকে সস্তায় বিক্রয় করেন তবে সে স্বতন্ত্র কথা। সম্ভবতঃ পরীক্ষার্থ এরূপ বিতরণ সময় চাষীরা ৩৲ টাকা মণ দরে হাড়ের গুঁড়া পাইয়াছে। কিন্তু ব্যবসাদার এ দরে সরবরাহ করিতে পারিবে না। ব্যবসাদার সস্তায় দিলে জানিবেন যে তাহাতে ভেজাল আছে।

প্রশ্ন—"প্লানেট জুনিয়ার হো" উহার ব্যবহার প্রণালী কি উপায়ে শিক্ষা করা যাইবে?

উত্তর—প্লানেট জুনিয়ার হো চালান আদৌ কঠিন নহে, সামান্য চেষ্টাতে যে সে চালাইতে পারে। একখানি প্লানেট জুনিয়ার হো আনাইয়া তাহার বিভিন্ন অংশ স্ক্রু, পেরেক দ্বারা আঁটিয়া লইয়া হাতে ঠেলিয়া বা বলদ দ্বারা টানাইয়া চালান যায়।

প্রশ্ন—পাথুরে কয়লার ছাই আলুর জমিতে দেওয়া যাইতে পারে কি না? কাঠের ছাই ও পাথুরে কয়লার ছাই এই দুইটীর মধ্যে কোনটীতে পটাসের ভাগ অধিক মাত্রায় আছে, এবং মোটের উপর কোনটী অধিকতর উৎকৃষ্ট সার? আলুর জমিতে কয়লা চালিয়া ছাই দিতে হইবে, কি কয়লা সমেত দিলেও চলিবে, কয়লা সমেত ছাই দিলে কি অনিষ্ট হইতে পারে?

উত্তর—পাথুরে কয়লার ছাইয়ে পটাসের ভাগ কম। কাঠের ছাই, গোময়ের ছাই, কলার পাতার ও খোলার ছাই তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ছাই হইতে কয়লা বাছিয়া লইয়া সেই ছাই ক্ষেতে দেওয়া কর্ত্তব্য। ছায়ের সহিত অল্প বিস্তর কয়লা থাকিলেও ক্ষতি নাই বরং লাভ আছে।

লন বা ঘাস মাঠ প্রস্তুত—

শ্রীযুত শ্রীনাথ সিংহ—মধ্য শ্রীরামপুর।

প্রশ্ন—একটি ঘাস মাটি প্রস্তুত করিতে বার বার চেষ্টা করিতেছি—কিন্তু মাঠটি ঠিক মনোমত হইতেছে না, ঘাস মাঠ প্রস্তুতের মোটামুটি একটা প্রণালী জানিতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়।

উত্তর—যে জমিতে ঘাস মাঠ করিবেন সেটিকে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে কয়েকবার উত্তমরূপে চষিতে হইবে। আগাছা বা অন্য ঘাসের শিকড়, গোড়া, ঢিল, ঢেলা, খোলা, কাঁকর প্রভৃতি উত্তমরূপে বাছিয়া ফেলিয়া মাটি ধুলিবৎ করিয়া ফেলিতে হইবে। এই চষা মাটির উপর একর প্রতি তিন শত ঝুড়ি অর্থাৎ ১৫০ মণ গোয়ালের সার ছড়াইয়া পুনরায় একবার লাঙ্গল মই দিয়া মাটি চৌরাস করিয়া ফেলিতে হইবে। এইবার এই সমতল মাটিতে ভারি রোলার চালাইয়া মাটি চাপিয়া বসাইয়া দেওয়া আবশ্যক। অতঃপর মাটির উপর ভাগে পাঁকমাটি চূর্ণ ও গোময় চূর্ণ চাল্‌না দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া উহার উপর সামান্য মাত্রায় পাতলা করিয়া ছড়াইতে হয় এবং একবার হাত আঁচড়া দ্বারা

মাটির উপরিভাগ কিঞ্চিৎ মাত্রায় খুলিয়া লইয়া তাহার উপর বীজ বপন করিতে হইবে। বীজ বপনের পর মাটি আবার রোলার চালাইয়া চাপিয়া লওয়া কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে নতুবা বীজের সহিত মাটির নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। বীজ হউক বা অন্য কিছুই হউক ভাসা ভাসা কোন কাজই হয় না অন্তরে অন্তরে মিলন ও মিশ খাওয়া আবশ্যক। এই ত গেল বীজ ছড়াইয়া লন প্রস্তুতের কথা। দূর্ব্বা ঘাস বসাইতে হইলে হয় শিকড় সমেত দূর্ব্বা ঘাষ বিচালী কাটা বঁটি দ্বারা অথবা কল দ্বারা কুচাইয়া লইয়া বীজ ছড়াইবার মত ছড়াইয়া কাজ সুসম্পন্ন করিতে হয় অথবা ধান রোয়ার মত নিড়ানি দ্বারা শিকড়যুক্ত ছোট ছোট ঘাষের গুচ্ছ বসাইতে হয়। মাটি চাপিয়া দেওয়া অপরাপর কার্য্য একই প্রকার। বীজ ছড়াইয়া বা ঘাষ বসাইয়া সরু সরু ছিদ্রযুক্ত বোমা সাহার্য্যে ক্ষেতে জল ছিটাইতে হয়। বড় মাট হইলে কাম্বিস্ পাইপ দ্বারা জল ছিটানই সুবিধা। কিন্তু তাহার নলের মুখে বোমার মুখ পরাইয়া লইবার ব্যবস্থা করা চাই নতুবা মোটা ধারে জল পড়িলে মাটি কাটিয়া স্থানে স্থানে গর্ত্ত হইয়া যাইবে।

লন তৈয়ারি করিবার জন্য নানা প্রকার নরম ঘাষের বীজ পাওয়া যায় ২০ × ২০ ফিট অর্থাৎ ৪০০ বর্গফিটের জন্য এক পাউণ্ড বীজের আবশ্যক। যদি ঘাস বসান হয় তবে তাহার মাত্রা নিজেই ঠিক করিতে পারিবেন।

নাইট্রেট অব লাইম—

শ্রীযুত হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, ইঞ্জিনিয়ার,—বর্দ্ধমান।

প্রশ্ন—আলু, ইক্ষু, আনারস এবং পিয়ারা প্রভৃতি ফলের বাগানে কি পরিমাণে উক্ত সার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য ?

উত্তর—আলু ও ইক্ষু কিম্বা ফলের গাছের জন্য নাইট্রোজেন সার অপেক্ষা পটাস ও ফস্ফরিক অম্লপ্রধান সারের প্রয়োগ অধিক মাত্রায় আবশ্যক। স্থূলতঃ এইরূপ সারের উপাদান ২ ভাগ পটাস, ২ ভাগ ফস্ফরিক অম্ল এবং ১ ভাগ নাইট্রোজেন।

নাইট্রেট্ অব লাইম, নাইট্রোজেন প্রধান সার। ইহাতে চূণও আছে। ইহাতে ক্যালসিয়াম সালফেট ও পোটাসিয়াম নাইট্রেট্ সম পরিমাণে মিশ্রিত আছে। ফস্ফরাস ও পটাসের ন্যায় চূণ'ও বৃক্ষ লতার ও শস্যের ফুল ধারণের শক্তি প্রদান করে এবং ইহা প্রয়োগে শস্য শীঘ্র পরিপক্ক হয়। সুতরাং নাইট্রেট্ অব লাইম প্রয়োগে সমকালে নাইট্রোজেন ও চূণ প্রদানের কার্য্য হয়। ইহা খুব তেজস্কর, সাধারণতঃ এই সার প্রতি বিঘায় ১ মণ যথেষ্ট। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফস্ফরাস সারের জন্য ২ মণ হাড় চূর্ণ এবং ২ মণ কলাপাতার কিম্বা ঘুঁটের ছাই (গোময় ভস্ম) প্রদান করা আবশ্যক। ফলের বাগানে সমুদয় ক্ষেতে সার না ছড়াইয়া প্রত্যেক গাছের গোড়ায় দিলেই চলে। নারিকেল গাছে সোরা সারের (Nitrate of lime) মাত্রা কিছু অধিক হইলে ভাল হয়।

প্রশ্ন—নূতন গাছে এই সার দেওয়া যায় কি না?

উত্তর—নূতন গাছে দিবার কোন বাধা নাই, তবে ছোট, বড় হিসাবে সারের পরিমাণের কম বেশী করিতে হয়।

প্রাইমারী স্কুলে কৃষি-শিক্ষা—

প্রশ্ন—আজকাল অপার প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রগণকে কৃষি-শিক্ষা দিবার যৎকিঞ্চিৎ ব্যবস্থা হইয়াছে এই কারণে কতিপয় স্কুলের শিক্ষক আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে কৃষি-শিক্ষা দিবার জন্য কি কি পুস্তক উপযোগী এবং কোন্ কোন্ কৃষি-যন্ত্র অত্যাবশ্যক।

উত্তর—শ্রীগিরীশচন্দ্র বসু এম,এ এফ, আর, এ, এস, প্রণীত কৃষি গ্রন্থাবলী ও শ্রীনৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, এম, আর, এ, এস, প্রণীত সরল কৃষি বিজ্ঞান ও শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী এফ, আর, এইচ, এস, শিবপুর কৃষি কলেজ ডিপ্লোমেড প্রণীত কৃষি-রসায়ন পুস্তক বিশেষ উপযোগী। যন্ত্রের মধ্যে নিড়ানি, কাস্তে, কোদাল, খোন্তা, হাত আঁচড়া বা হাত বিদা, উইড ফর্ক, ট্রাউয়েল, বোমা, পিচকারী, কাটারি, ছুরী, ডাল ছাঁটা কাঁচি ফুল তোলা কাঁচি ও একগাছি একটি মাপের কাটি বা দড়ি। এই গুলি থাকা নিতান্ত আবশ্যক ঘাস প্রভৃতি নিড়াইবার জন্য—নিড়ানি জমির উপর মাটি আলগা করিবার জন্য ও জমির উপরের ঘাস, কুটা টানিয়া আনিবার জন্য—হাত আঁচড়া। মাটি কোপাইবার জন্য—কোদাল। গাছের গোড়া আল্‌গা করিয়া দিবার জন্য—উইড ফর্ক। গর্ত্ত খুঁড়িবার জন্য—খোন্তা। চারা গাছ শিকড় সমেত তুলিবার জন্যও খোন্তার আবশ্যক। বেগুন, লঙ্কা, কপি প্রভৃতি সব্জী চারা উঠাইবার জন্য—ট্রাউয়েল। ঘাস ও শস্য প্রভৃতি কাটিবার জন্য—কাস্তে। ডাল ছাটিবার জন্য ও ফুল তুলিবার জন্য—কাঁস্তে ছোট বড়।

ডাল কাটা ও অন্য সাধারণ কাজের জন্য—ছুরী, কাটারি।

ক্ষেতের আইল ঠীক করা ও চারা সমভাবে পৃথক বসান ইত্যাদির জন্য—মাপকাটি ও দড়ি।

সার-সংগ্রহ

কাটোয়া (বর্দ্ধমান) শস্য সংবাদ—

কাটোয়া মহকুমায় এবার হৈমন্তিক ধান্যের অবস্থা মন্দ নহে। ধান্য এবার অতি প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যাইত কিন্তু উপযুক্ত

পরিমাণ বৃষ্টি না হওয়ার অনেকগুলি গ্রামের শস্য প্রায় ছয় আনা ভাগ নষ্ট হইয়াছে, কোনও কোনও গ্রামে আবার সমস্ত ক্ষেতে আবাদ হয় নাই। ইক্ষুর চাষ তেমন আশাপ্রদ নহে। আশ্বিনে বৃষ্টি হয় নাই, কাজেই রবিথন্দের বীজও অনেকদিন বপন করা হয় নাই। তারপর নদীর তীরবর্ত্তী ক্ষেতসমূহেও কলাই, গম প্রভৃতি কিছুই বপন হয় নাই। সেই জন্য ফসলের অবস্থা মন্দ না হইলেও সম্পূর্ণ আশা প্রদ বলিয়া মনে হয় না।

নীল—

শুনিলাম, শ্রীযুত ভুপেন্দ্রনাথ বসু এবার তাঁহার মজঃফরপুরের জমীদারীতে নীলের চাষ করিয়াছেন, এবং কতকটা সফল হইয়াছেন।—আনন্দের বিষয় বটে।

রাজসাহীর "হিন্দু রঞ্জিকা" লিখিয়াছেন—"রাজসাহী জেলাতে বহুকাল পরে আবার নূতন করিয়া নীলের চাষ আবাদ কোন কোন স্থানে আরম্ভ হইয়াছে। একজন সাহেব সরকার পক্ষ হইতে পুঠিয়ার সন্নিকটে নয়নগাছীতে নীলের আবাদ আরম্ভ করিয়াছেন।"

নীল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হইয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়াছিল।—ব্যবহারে প্রতিপন্ন হইয়াছে, কৃত্রিম নীল অপেক্ষা কৃষির নীল উৎকৃষ্ট। কৃষি-বিভাগের কোনও কোনও অভিজ্ঞের বিশ্বাস, অল্পব্যয়ে স্বাভাবিক নীলের উৎপাদন সম্ভব। কৃষি বিভাগে পরীক্ষা চলিতেছে।

আমরা বলি নীল আসুক, ক্ষতি নাই। নীলের আনুসঙ্গিক বিপদগুলি না আসে।

অষ্ট্রেলিয়ার ফসল—

নিউসাউথ ওয়েল্‌স, ভিক্টোরিয়া, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া, কুইন্সল্যাণ্ড প্রদেশে এবারে কোটী বুশেল গম উৎপন্ন হইয়াছে। মেলবোর্ণ, ১৪ই ডিসেম্বর।

পঞ্জাবে ইক্ষু ১৯১৪।১৫—

বর্ত্তমান বর্ষে ৩৬৬,০৫৬ একরে ইক্ষুর আবাদ হইয়াছে। বিগত বর্ষ অপেক্ষা প্রায় শতকরা ১১ ভাগ কম জমিতে ইক্ষুর আবাদ হইয়াছে—বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ৪১০,৮৫৭ একর। আক বসাইবার সময় বৃষ্টির জলের ও সেচন জলের অভাবহেতু ইক্ষুর আবাদ এত কমিয়াছে তথাপিও দেখা যাইতেছে যে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় নিতান্ত কম নহে।—মোটের উপর সারা বৎসরের আবহাওয়া ইক্ষু চাষের অনুকূলই ছিল। এ বৎসর উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ২৬৭,৮৭০ টন।

পঞ্জাবে জোয়ার ও বজরা ১৯১৪।১৫—

পঞ্জাবে জোয়ার ও বজরা চাষ প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। পঞ্জাবে জোয়ারের আবাদ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ১৯১৩ সালে ১,২৪৭,৫২৩ একর জমিতে জোয়ার চাষ হইয়াছিল কিন্তু ১৯১৫ সালে ১,১৭৫,৬৪৯ একরে জোয়ার চাষ হইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে বজরা চাষ ২,৭৩৭,৯৩১ একর অন্যান্য বৎসর ইহা অপেক্ষা অধিক জমিতে বজরার আবাদ হয়। উৎসন্ন শস্যের পরিমাণ জোয়ার ও বজরা দুই মিলিয়া ৪৫০,৮০০ টনের কম নহে।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে সরকারী বাগান—

এই সকল বাগানে মালির অভাব হইয়াছে। যে হিসাবে মালিরা মাহিনা পায় তাহাতে তাহাদের খাওয়া পরা কুলায় না। মধ্যপ্রদেশে নাগপুর মহারাজবাগ প্রভৃতি সরকারী বাগানে মালিদিগকে রীতিমত শিক্ষা দিয়া বিশেষ কর্ম্মোপযোগী করিয়া লইবার চেষ্টা হইতেছে। এবং যাহাতে তাহারা অধিক বেতন পায় তাহার ব্যবস্থা হইবে।

কেবল মধ্যপ্রদেশ কেন—ভারতের সর্ব্বত্র উপযুক্ত ও কর্ম্মঠ মালির অভাব। উদ্যানকার্য্য জীবিকার্জ্জণ হইবে না বলিয়া কেহ সহজে এই কার্য্য শিখিতে অগ্রসর হয় না। যে শ্রেণীর লোকে সাধারণতঃ এই কার্য্য করে তাহারা লেখাপড়া শিখিয়া কেরানীগিরি ও অন্যান্য কর্ম্মে লিপ্ত হইবার জন্য ব্যগ্র। এরূপ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য এই যে, ঐ শ্রেণীর যুবকগণকে কর্ম্মোপযোগী লিখিতে পড়িতে শিখাইয়া এবং হাতে হাতিয়ারে কাজ করাইয়া কর্ম্মঠ করিয়া তুলিতে হইবে এবং ক্রমশঃ যাহাতে তাঁহারা এক একটা উদ্যানের রক্ষক হইতে পারে এবং আশানুরূপ রোজগার করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। এরূপ হইলে তখন দেশে মালির অভাব ঘুচিবে, এখন আশা করা যায়। কৃঃ সঃ

জাপানের বস্ত্রশিল্প—

ভারত হইতে জাপানে তুলা রপ্তানি এবং জাপানে প্রস্তুত বস্ত্রাদির ভারতে আমদানী ব্যাপারে জাপানী গবর্ণমেণ্ট অর্থসাহায্য করিতেছেন। এ সম্বন্ধে বিলাতের কমন্স সভায়ও প্রশ্ন উঠিয়াছিল। সম্প্রতি "এসাসিয়েটেড প্রেসে"র জনৈক প্রতিনিধি মান্দ্রাজের কয়েকজন বড় বড় বণিকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহাদের

মতামত গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা সে সকল মতামতের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিলাম :—

মেসার্স ডব্লিউ, এ, বিয়ার্ডসেল এণ্ড কোম্পানী মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী। ইহারা ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ই আমদানী ও বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহাদের কারবারের অধ্যক্ষ মিষ্টার বিয়ার্ডসেল বলিয়াছেন,—এ পর্য্যন্ত জাপানী ধুতি সাড়ী প্রভৃতি দ্বারা আমাদের মাঞ্চেষ্টারের আমদানী ধুতি সাড়ী প্রভৃতির ব্যবসায়ের কোনও ক্ষতি হয় নাই।

মেসার্স হাজি মহম্মদ বাদসা সাহেব এণ্ড কোম্পানী মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। মিষ্টার এ, এচ স্রোহর এই কোম্পানীর বস্ত্রবিভাগের অধ্যক্ষ। ইনি কিছুদিন জাপানে ছিলেন। ইনি বলেন,—জাপান যে ভারতের বস্ত্র ব্যবসায়ের কিয়দংশ হস্তগত করিতে ইচ্ছুক, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এ ব্যাপারে তাহারা কতদূর সাফল্য লাভ করিতে পারিবে, তাহা এখন ঠিক বলা যায় না। জাপানী বস্ত্রাদির উপর ভারতের ব্যবসায়িগণের যদি শুভদৃষ্টি পড়ে এবং জাপান ম্যাঞ্চেষ্টরের মত সস্তায় ভাল মাল যদি সরবরাহ করিতে পারে, তাহা হইলে সে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। জাপানে অন্যান্য ব্যবসায়ের মত এই বস্ত্র-ব্যবসায়েও জাপান গবর্মেণ্ট অর্থ সাহায্য করিতেছেন।

জনৈক প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় বণিক এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, জাপানী বস্ত্র-শিল্প এ পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতের কলকারখানায় প্রস্তুত মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতির কোনও ক্ষতি করিতে পারে নাই! ভারতের তুলা যথেষ্ট পরিমাণে জাপানে রপ্তানি হইতেছে বটে; কিন্তু জাপানে যত তুলা আমদানি হয় তাই ভাল। ইহাতে এদেশের কৃষিজীবীরা লাভবান হইবে।

অপর একজন বিখ্যাত ইউরোপীয় বলেন,—জাপানী বস্ত্রাদি দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি দেখিয়াছি। ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্রাদির সহিত তুলনায় তাহা দাঁড়াইতে পারে না। এক্ষণে ইংলণ্ডের কাপড়ের কল-কারখানার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে জাপানী বস্ত্র ব্যবসায় ভারতের বাজারে স্থান লাভ করিতে পারে। ইংলণ্ডে পূর্ব্বে কাপড় তৈয়ারী করিতে যে দর পড়িত, এখন সে দর শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ, ইংলণ্ডে এখন শ্রমজীবির অভাব হইয়াছে ও অন্যান্য খরচ পত্রও বাড়িয়াছে; ইহার উপর আবার চড়া দরে তুলা কিনিতে হইতেছে। জাপানে এ সকল গোলযোগ নাই। তাই সুবিধা দরে কাপড় যোগাইতে পারিবে। কিন্তু এত সুবিধা সত্ত্বেও জাপান গবর্মেণ্টের সাহায্য ব্যাতিরেকে জাপানী কাপড় ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের সহিত প্রতি-যোগীতায় দাঁড়াইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। আবার, ইংলণ্ড হইতে ভারতে চালান দিবার জাহাজের মাশুল বাড়িয়াছে। এই সকল নানা কারণে জাপানের বস্ত্র শিল্পের সুবিধা হইতে পারে।

অপর এক ইউরোপীয় বণিকের মত এই যে, জাপান গবর্মেণ্ট পৃথিবীর বাণিজ্য

হস্তগত করিবার জন্য জাপানের প্রায় সকল ব্যবসায়েই অর্থ সাহায্য করিতেছেন। ভারতে দিয়াশলাই ও রেশম রপ্তানি ব্যাপার এক্ষণে জাপানের একচেটিয়া হইয়াছে। বাঙ্গালার রেশম শিল্পকে একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ইহার পরে জাপান যদি ম্যাঞ্চেষ্টারের ব্যবসায়ের কিয়দংশ হস্তগত করে তাহা হইলে আমি বড় বিস্মিত হইব না বর্ত্তমান অবস্থায় জাপানের সাফল্য ও সুবিধা কেহ রোধ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

রেশম শিল্প—

ভারতে রেশম শিল্পের উন্নতি সাধনে ভারতগবর্মেণ্ট মনোযোগী হইয়াছেন।

প্রথমতঃ একজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করা হইবে। তিনি ভারতবর্ষ ও অন্যান্য যে দেশে রেশম উৎপন্ন হয় তথাকার অবস্থা বিবেচনা করিয়া নিজ মন্তব্য গবর্মেণ্টের নিকট পেশ করিবেন। সাউথ কোসিংটন বিজ্ঞান ও শিল্প কলেজের অধ্যাপক মিষ্টার এইচ ম্যাক্সওয়েল লেফরয় এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। লেফ্রয় এই সপ্তাহে ভারতবর্ষে উপনীত হইবেন। তিনি বর্ত্তমান শীতকালে ভারতবর্ষের রেশম আবাদের অবস্থা আলোচনা করিয়া পরে সম্ভবতঃ জাপান ও চীনদেশ পরিদর্শন করিবেন।

কেবল কৃষিতে কাজ হইবে না—এ দেশের লোককে কৃষিজীবি না রাখিয়া ব্যবসায়ী করিতে হইবে, নহিলে এ দেশের দারিদ্র্য-সমস্যায় সমাধানের সম্ভাবনা নাই। এ কথা যুক্তপ্রদেশের শাসনকর্ত্তার মত দুই চারিজন রাজকর্ম্মচারী না বুঝিলেও সরকার বুঝিয়াছেন। ভারতের শাসনপ্রণালীতে সরকার উন্নতি প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। উন্নত শাসনপ্রণালীতে ব্যয়বৃদ্ধি অনিবার্য্য। কিন্তু দেশে যদি কেবল দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়েরই বাস হয়, তবে সে ব্যয়নির্ব্বাহের উপায় কি হইবে? সুতরাং যে দিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, এ দেশে ব্যবসার পত্তন করিতে হইবে। কিন্তু বিদেশাগত নূতন ব্যবসা বসাইবার চেষ্টা না করিয়া প্রথমে এ দেশের পুরাতন কিন্তু নিষ্প্রভ ব্যবসাগুলির উন্নতিসাধনচেষ্টাই সঙ্গত। সে কথাও সরকার বুঝিয়াছেন এবং বুঝিয়া সে পক্ষে চেষ্টাও করিতেছেন। কিন্তু সে চেষ্টার ফললাভের সৌভাগ্য আমাদের এখনও হইতেছে না। অনুসন্ধানে ও পরীক্ষায় অনেক সময় গত হইতেছে। আমাদের মনে হয়, অনুসন্ধানে, পরীক্ষায় ও পরামর্শে এ দেশের লোকের সাহায্যগ্রহণ না করাতেই এই বিলম্ব ঘটিতেছে। ভারতে রেশমের ব্যবসা অনেক দিনের। কিন্তু সে ব্যবসা মরিতে বসিয়াছে। বিদেশের রক্ষাশুল্ক, এ দেশে উন্নতির অভাব প্রভৃতি যে সকল কারণে এমন হইয়াছে সে সকল আমরা পূর্ব্বে পাঠকদিগকে দেখাইয়াছি। কিন্তু মহীশূর সরকারের চেষ্টায় যখন মহীশূরে

এ ব্যবসার উন্নতি সম্ভব হইয়াছে, তখন অন্যত্রই বা না হইবে কেন? সংপ্রতি সরকার এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য মিষ্টার ম্যাক্সওয়েল লেফরয় নামক একজন বৈজ্ঞানিককে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি ভারতে ও অন্যান্য দেশে রেশমের চাষের অবস্থা দেখিয়া ভারতে রেশমের চাষের উন্নতির উপায় উদ্ভাবিত করিবেন। তিনি জাপানে ও ইণ্ডো-চীনে যাইবেন। ভাল। কিন্তু জাপানের বা অন্য দেশের প্রাকৃতিক ও আর্থিক অবস্থা ভারতের প্রাকৃতিক ও আর্থিক অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র। বাঙ্গালায় অনুসন্ধান জন্য একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল। কাশীমবাজারের মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র তাহার একজন সদস্য ছিলেন। সে সমিতির বিবরণও মামুলী নিয়মে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কি কাজ হইয়াছে, তাহা জানিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। মিষ্টার লেফরয় আসিতেছেন। তিনি কি দেশের লোকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাজ করিবেন? যদি তাহার ব্যবস্থা না হয়—কেবল ম্যাজিষ্ট্রেটের কথায় তিনি অবস্থা বুঝেন তবে কি হইবে?

নূতন ভূমির উৎপত্তি—

আমার সম্মুখে হিমালয় পর্ব্বতমালায় অনেক সামুদ্রিক শামুক ঝিনুকের খোলা বাহির হয়। সমুদ্রবাসী জীবদিগের খোলা এ স্থানে কি করিয়া আসিল? অনেকে অনুমান করেন যে, যে স্থানে এখন অত্যুচ্চ হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্বে সেই স্থান সমুদ্রের ভিতর ছিল। ভূমিকম্পে অথবা ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাতে সেই স্থান উচ্চ হইয়া সমুদ্রের ভিতর হইতে বাহির হইয়াছে। এখন কোন কোন স্থানে ভূমিকম্পে সমুদ্রের ভিতর হইতে নূতন দ্বীপ উত্থিত হয়, অথবা পুরাতন দ্বীপ জলমগ্ন হইয়া যায়। তবে পৃথিবীর আদি অবস্থায় যেরূপ সর্ব্বদা ভয়ঙ্কর বিপ্লব ঘটিত, এখন আর সেরূপ হয় না। কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী অতি দ্রুত বেগে আপনা আপনি ঘূর্ণিত হইত। এখন চব্বিশ ঘণ্টায় দিবা রাত্রি হয়, অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবী একবার আপনা আপনি ঘূর্ণিত হয়। তখন তিন ঘণ্টায় পৃথিবী আপনা আপনি ঘুর্ণিত হইত. অর্থাৎ তিন ঘণ্টায় দিবা রাত্রি হইত। এই ঘোর মন্থনে বোধ হয় পৃথিবী হইতে চন্দ্র ছিঁড়িয়া পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল। সেই স্থানে গর্ত্ত হইয়া প্রশান্ত সাগর হইয়াছে। চন্দ্রকে আনিয়া প্রশান্তসাগরে ঠিক বসাইতে পারা যায়।

কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ ছিল, আর সে সময় কিরূপ ঘটনা ঘটিতে ছিল, তাহা ভূগর্ভ হইতে উত্থিত নানারূপ চিহ্ন দর্শনে ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কতকটা অনুমান করিতে পারেন। কিন্তু বড় তরমুজের উপর পিপীলিকা যেরূপ বিচরণ

করে, গোলাকার পৃথিবীর উপর আমরা সেইরূপ বিচরণ করি। ইহার ভিতর কি আছে তাহা আমরা জানি না। আমাদের পায়ের নিম্নে দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত কি আছে তাহা আমরা জানি। কিন্তু ভাঁটার ন্যায় পৃথিবীকে এফোড় ওফোড় করিলে যে সুড়ঙ্গ হয়, তাহা দীর্ঘে চারি হাজার ক্রোশ। বাকী ৩৯৯৮ ক্রোশ বিস্তৃত ভূগর্ভে কি আছে তাহা আমরা জানি না। অনেকে অনুমান করেন যে, ইহার ভিতর ঘোর উত্তাপ আছে। সেই উত্তাপে নানারূপ প্রস্তর ও ধাতু তরল অবস্থায় টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। সেই তরল প্রস্তর আগ্নেয় পর্ব্বতের মুখ দিয়া মাঝে মাঝে বাহির হয়। দুধের সরের ন্যায় পৃথিবীর উপরিভাগ কেবল কঠিন। তাহার উপর আমরা বাস করি। সেই কঠিন উপরিভাগের কোন কোন স্থান কখন কখন ধসিয়া পড়ে ও ভিতরের তরল পদার্থের স্থান অধিকার করে। ধসিয়া পড়িবার সময় তাহার পার্শ্বের স্থান কখন কখন উচ্চ হইয়া পর্ব্বতের আকার ধারণ করে। নিম্ন স্থান সমুদ্রে পরিণত হয়। ধসিয়া পড়িবার সময় ভূমিকম্প হয়।

পৃথিবীর আদি অবস্থা সঠিক জানিবার নিমিত্ত আর একটী উপায় আছে। আলোক এক সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ ক্রোশ গমন করে। এক মিনিটে ষাট লক্ষ ক্রোশ। এক ঘণ্টায় ৩৬,০০,০০,০০০ ক্রোশ, একদিনে ৮৬৪,০০০০০০০ ক্রোশ, এক বৎসরে ৩,৫৩৬০,০০,০০,০০০ ক্রোশ, অন্ধকার রাত্রিতে আমাদের আকাশ যে অগণিত নক্ষত্রে ছাইয়া যায়, তাহাদের কোনওটীর আলোক একদিনে, কোনটীর আলোক এক বৎসরে, কোনটীর আলোক এক সহস্র বৎসরে, কোনটীর আলোক এক লক্ষ বৎসরে, কোনটীর আলোক এক কোটী বৎসরে পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। বোধ হয় তাহা হইতে দূরে আরও অনেক নক্ষত্র আছে, যাহাদের আলেক বর্ত্তমান কল্পের প্রথম দিন হইতে শূন্য পথে ভ্রমণ করিতেছে, তথাপি এখনও পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। এই সমুদয় নক্ষত্রে যদি কোন জীবের বাস থাকে তাহারা পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিতে পায় না। এক শত বৎসরে যে নক্ষত্র হইতে আলোক আসিয়া পৃথিবীতে উপস্থিত হয়, সে নক্ষত্রের জীবগণ এক শত বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী যেরূপ ছিল, তাহাই দেখিতে পায়। তুমি যদি সে স্থানে গমন করিতে পার তাহা হইলে তুমিও তাহা দেখিতে পাও। পাঁচ হাজার বৎসরে যে নক্ষত্রের আলোক পৃথিবীতে উপনীত হয়, যদি তুমি সেই নক্ষত্রে গমন কর, তাহা হইলে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি কিরূপে বিরাটরাজার গরু চুরি করিতেছেন, তাহা দেখিতে পাও। ফল কথা, কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্ব পৃথিবীর কিরূপ অবস্থা ছিল, এই উপায়ে তাহা জানিতে পারা যায়। কিন্তু ঐ সকল স্থানে যাওয়া কিছু কঠিন। রেল গাড়ী নাই, কিছুই নাই। তড়িৎবেগে গমন করিলেও কোটি বৎরের কম সে স্থানে উপস্থিত হইতে পারা যায় না।

যখন ভূমিকম্পে পর্ব্বত উত্থিত হয়, তখন তাহা প্রকাণ্ড কঠিন প্রস্তররাশি ব্যতীত

আর কিছুই নহে। সূর্য্যের উত্তাপে, বৃষ্টির জলে, বায়ুর প্রভাবে ক্রমে প্রস্তর গাত্র পচিতে থাকে। পচিয়া চূর্ণ হইয়া যায়। বর্ষার জলে প্রস্তরচূর্ণ নিম্নে গিয়া পতিত হয়। হিমালয় পর্ব্বত পূর্ব্বে বোধ হয় এখন অপেক্ষা অনেক উচ্চ ছিল। ইহার অনেক পচিয়া ও ধূইয়া গিয়াছে। ইহার নিম্নে সমুদ্র ছিল। প্রস্তরচূর্ণ পড়িয়া সেই সমুদ্র ভরাট হইয়া গিয়াছে। ভরাট হরিদ্বার হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত মনুষ্যের আবাসভূমি বিশাল দেশে পারণত হইয়াছে। গঙ্গার মুখে এখনও নূতন দেশের সৃষ্টি হইতেছে। বর্ষাকালে গঙ্গার জল ঘোলা হয়, অর্থাৎ ইহার সহিত অনেক মৃত্তিকা মিশ্রিত থাকে। সেই সমুদয় মৃত্তিকা গঙ্গার মুখে সাগরে পতিত হইয়া নূতন দেশের উৎপত্তি হইতেছে।

পর্ব্বত গাত্র হইতে সমুদয় প্রস্তরচূর্ণ ধুইয়া যায় না। কোন কোন স্থানে অল্লাধিক রহিয়া যায়। আমাদের বায়ুতে নানাপ্রকার জীবাণু আছে। রীতিমত শরীর ধারণের নিমিত্ত তাহারা সর্ব্বদাই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে। পর্ব্বতগাত্রে প্রস্তরচূর্ণ দেখিয়া বায়ুস্থিত উদ্ভিদাণু তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করে। হরিৎবর্ণের ছেৎলারূপে তাহাদের আবির্ভাব হয়। সূক্ষ্ম উদ্ভিদগণ মরিয়া তাহাদের পচিত দেহ প্রস্তরচূর্ণের সহিত মিশ্রিত হয়। সেই মৃত্তিকা ক্রমে ছোট ছোট তরুলতার উপযোগী হয়। তাহাদের গলিত পত্রাদি ভূমির সহিত মিশিয়া মৃত্তিকা আরও স্থূল হয় ও বড় বড় বৃক্ষের উপযোগী হয়। এইরূপে পর্ব্বতগাত্র ক্রমে বনে আবৃত হইয়া পড়ে, বৃক্ষগণ শিকড়ের দ্বারা পর্ব্বতগাত্রের মৃত্তিকা অবদ্ধ করিয়া রাখে। বর্ষার জলে অধিক ধুইয়া যায় না। মৃত্তিকায় বৃষ্টির জলও অনেক আবদ্ধ হইয়া থাকে, একেবারে নিম্নে গিয়া পড়ে না। জল অল্পে অল্পে নিঃসৃত হইয়া ঝরণার রূপ ধারণ করে। পর্ব্বতের বন কাটিয়া ফেলিলে মৃত্তিকা ধুইয়া যায়, ঝরণাও শুষ্ক হইয়া যায়; নদীর জল কমিয়া যায়। দক্ষিণে নীলগিরির নিম্নে অনেকগুলি ছোট ছোট নদীর এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। বনের আর একটা গুণ এই যে তাহারা মেঘ আকর্ষণ করিতে পারে। বন কাটিয়া ফেলিলে বৃষ্টিপতনের পরিমাণ কমিয়া যায়। পর্ব্বতগাত্রে বন হইলে সে স্থানে উদ্ভিদভোজী পশুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই পশুগণের সংখ্যা হ্রাস করিবার নিমিত্ত মাংসভোজী পশুগণেরও আগমন হয়। পশু পক্ষীর মল মূত্র ও মৃত দেহ মাটীর সহিত মিশিয়া ভূমি আরও উর্ব্বরা হয়। ক্রমে এই সমুদয় স্থানে মানুষের বাস হয়।

নিম্নে ধোয়াটি পড়িয়া যে সমুদয় নূতন দেশ হয়, তাহাতেও এইরূপ হয়। যে স্থানের যেরূপ উপযোগী সেই স্থানে সেইরূপ উদ্ভিদ্ জন্মে ও সেইরূপ পশু বাস করে। হিমালয়ের উচ্চে বায়ু শীতল। সেই স্থানে চিড় প্রভৃতি গাছের বন আছে। লোণা জল কোন কোন গাছের প্রিয় বস্তু। এরূপ গাছ সুন্দর বনে জন্মে। আপনাদিগের বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত নানা উদ্ভিদ্ নানা উপায় অবলম্বন করে। ইহার বিবরণ অন্য কোন প্রবন্ধে প্রদান করিব।

বাণিজ্যে সরকারী সাহায্য চাই—

জাপান যে এত সস্তায় কাপড় বেচিতে পারিতেছে, তাহার কারণ লইয়া অনেক আলোচনা হইতেছে। আসল জিজ্ঞাস্য, জাপানী সরকার জাপানী ব্যবসায়ীদিগকে সাহায্য দিয়া অসম প্রতিযোগিতায় বিদেশের ব্যবসায় সর্ব্বনাশ করিতেছেন কি না? এ বিষয়ে একটা কথা সর্ব্বজন বিদিত। জাপানী ষ্টীমার কোম্পানীগুলি সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে—সুতরাং জাপানী মাল অতি অল্প ভাড়ায় বিদেশের বাজারে চালিয়া দেওয়া সম্ভব হয়। সুতরাং সেও একরূপ "বাউন্টি"। জাপানা গেঞ্জিতে এ দেশের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। অথচ এ দেশে গেঞ্জীর কল চলা দুর্ঘট কেন? যে দামে লাভ রাখিয়া খুজরা বিক্রয়কারী দোকানদার জাপানী গেঞ্জী বেচিতে পারে, সে দামে এ দেশের কলে গেঞ্জী প্রস্তুতই হয় না। জাপানী মাল কতকটা খেলো। কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র—তাহারা সস্তা মালেরই সন্ধান করে। সুতরাং জাপানী গেঞ্জীর কাটতী খুব। এখন কথা, যে দামে কিছুতেই এ দেশে মাল উৎপন্ন করা যায় না, সেই দামে জাপানী মাল এদেশে বিক্রয় হয় কেমন করিয়া? সব দেশের সরকারী সব কথা জানা যায় না। তাহার প্রমাণ, জার্ম্মাণীর লোকসংখ্যা কত, তাহাও জার্ম্মাণী অতি যত্নে গোপন রাখিয়াছিল। সুতরাং জাপানী সরকারের বাণিজ্য-নীতি যে অনায়াসে জানা যাইবে, এমন বোধ হয় না। তবে এ ক্ষেত্রে কারণ অনুমান করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। আমরাও বলি, সরকারী শাহায্যের কথা স্পষ্ট জানিতে না পারিলে যদি প্রতীকার-শুল্ক প্রতিষ্ঠার অসুবিধা ঘটে, তবে সরকার ত এ দেশের শিল্পের প্রতিষ্ঠার বা উন্নতির জন্য অর্থসাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতে পারেন। সরকার এখন সেই ব্যবস্থাই কেন করুন না?

গোরক্ষিণী সভায় মুসলমানগণের যোগদান—

পঞ্জাব-হুসিয়ারপুরে গত ১৩ই ১৪ই এবং ১৫ই নবেম্বর তারিখে গোরক্ষিণী সভায় একাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় বহুসংখ্যক মুসলমানের আগমন হইয়াছিল; কেবল আগমন নহে,—ইঁহারা অনেকেই গোহত্যা নিষেধ সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং কেহ কেহ কবিতা পাঠও করিয়াছিলেন। পঞ্জাব-লাহোরের "ট্রিবিউনে" প্রকাশ,—"একজন মুসলমান ধর্ম্মবক্তা গোরক্ষা সম্বন্ধে যখন স্বরচিত কবিতা পাঠ করিতেছিলেন, তখন অনেক মুসলমান আর স্থির থাকিতে না পারিয়া সভাস্থলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—জীবনে আর তাঁহারা কখনও গোমাংস গ্রহণ করিবেন না। অপর অনেক মুসলমান এরূপ শপথ ত করিয়াছেনই,—অধিকন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,—অপর মুসলমানগণকে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

হইবার জন্যও অনুরোধ করিবেন। বক্তা মুন্সী আল্লা ইয়ার খাঁ বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—স্বভাববশে মুসলমানগণও হিন্দুর ন্যায় গোহত্যায় বিরোধী। দৃষ্টান্ত,—মিশর এবং এসিয়িক তুরস্ক ;—এই দুই রাজ্যে গোহত্যা নাই।" প্রসঙ্গতঃ মুন্সী আল্লা ইয়ার আরও বলিতে পারিতেন,—এবার বকরিদ পর্ব্বকালে হায়দরাবাদের নিজাম গোহত্যা হইতে দেন নাই। সেবার আফগান-আমীরও ভারতে আসিয়া বকরিদ পর্ব্বকালে দিল্লী সহরে গোহত্যা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন,—বকরিদে গোহত্যা কোরাণের আদেশ নহে। যাই হউক,—মুসলমান সম্প্রদায়ে এরূপ আন্দোলন এখন যত অধিক হইবে, ততই মঙ্গল।

বাগানের মাসিক কার্য্য

—:*:—

পৌষ মাস।

সব্জী বাগান।—বিলাতী শাক্-সব্জী বীজ বপন কার্য্য গত মাসেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন উদ্যানপালক এমাসেও পারস্‌ (Parsley) বপন করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। কেবল বীজ বোনা কেন, কপি প্রভৃতি চারা নাড়ীয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের গোড়ায় মাটি দেওয়া ও আবশ্যক মত জল দিবার জন্য মালিকের সতর্ক থাকিতে হইবে। সালগম, গাজর, বীট, ওলকপি প্রভৃতি মূলজ ফসল যদি ঘন হইয়া থাকে, তবে কতকগুলি তুলিয়া ফেলিয়া ক্ষেত্র পাতলা করিয়া দিতে হইবে। আগে বসান জলদি জাতীয় কপির গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। গোড়ায় এই সময় কিছু খৈল দিয়া একবার জল সেচন করিতে পারিলে কপি বড় হয়।

কৃষি-ক্ষেত্র।—আলুগাছে মাটী দিয়া গোড়া আর একবার বাঁধিয়া দিতে হইবে। পাটনাই আলুর ফসল প্রায় তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। এই সময় ফসল কোদালী দ্বারা উঠাইয়া না ফেলিয়া যতদিন গাছ বাঁচিয়া থাকে ততদিন অপেক্ষা করা ভাল। ইতিমধ্যে নিড়ানি দ্বারা খুঁড়িয়া কতক পরিমাণ আলু খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে ঝাড় হইতে আলু তুলিবে তাহাতে মটরের মত আলুগুলি রাখিয়া বাকিগুলি তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই আলুগুলি তুলিয়া পরে গোড়া বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে গাছগুলি পুনরায় সতেজে বাড়িতে থাকে। আলুক্ষেত্রে এ মাসে দুই একবার আবশ্যক মত জল দেওয়া আবশ্যক। মটর, মসুর, মুগ প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিশেষ কোন পাইট নাই। টেঁপারি ক্ষেতেও জল দেওয়া এই সময় আবশ্যক।

তরমুজ, খরমুজ, চৈতে বেগুন, চৈতে শসা, লাউ, কুমড়া ও উচ্ছে চাষের এই উপযুক্ত সময়।

কৃষক।

সূচীপত্র।

পৌষ ১৩২২ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

বিজ্ঞাপন।

বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক

প্রাতে ৮॥০ সাড়ে আট ঘটিকা অবধি ও সন্ধ্যা বেলা ৭টা হইতে ৮॥০ সাড়ে আট ঘটিকা অবধি উপস্থিত থাকিয়া, সমস্ত রোগীদিগকে ব্যবস্থা ও ঔষধ প্রদান করিয়া থাকেন।

* * * * *

এখানে সমাগত রোগীদিগকে স্বচক্ষে দেখিয়া ঔষধ ও ব্যবস্থা দেওয়া হয় এবং মফঃস্বল-বাসী রোগীদিগের রোগের সুবিস্তারিত লিখিত বর্ণনা পাঠ করিয়া ঔষধ ও ব্যবস্থা পত্র ডাকযোগে পাঠান হয়।

* * * * *

এখানে স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ, গর্ভিনীরোগ, ম্যালেরিয়া, প্লীহা, যকৃত, শোথ, উদরী, কলেরা, উদরাময়, কৃমি, আমাশয়, রক্ত আমাশয়, সর্ব্ব প্রকার জ্বর, বাতশ্লেষ্মা ও সন্নিপাত বিকার, অম্লরোগ, অর্শ, ভগন্দর, মূত্রযন্ত্রের রোগ, বাত, উপদংশ সর্ব্বপ্রকার শূল, চর্ম্মরোগ, চক্ষুর ছানি ও সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, নাসিকারোগ, হাঁপানী, যক্ষ্মাকাশ, ধবল, শোথ ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার নূতন ও পুরাতন রোগ নির্দোষ রূপে আরোগ্য করা হয়।

* * * * * *

সমাগত রোগীদিগের প্রত্যেকের নিকট হইতে চিকিৎসার চার্য্য স্বরূপ প্রথমবার অগ্রিম ১৲ টাকা ও মফঃস্বলবাসী রোগীদিগের প্রত্যেকের নিকট সুবিস্তারিত লিখিত বিবরণের সহিত মনি অর্ডার যোগে চিকিৎসার চার্য্য স্বরূপ প্রথম বার ২৲ টাকা লওয়া হয়। ঔষধের মূল্য রোগ ও ব্যবস্থানুযায়ী স্বতন্ত্র চার্য্য করা হয়।

* * * * * *

রোগীদিগের বিবরণ বাঙ্গালা কিম্বা ইংরাজিতে সুবিস্তারিত রূপে লিখিতে হয়। উহা অতি গোপনীয় রাখা হয়।

* * * * * *

আমাদের এখানে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রতি ড্রাম ৵১০ পয়সা হইতে ৪৲ টাকা অবধি বিক্রয় হয়। কর্ক, শিশি, ঔষধের বাক্স ইত্যাদি এবং ইংরাজি ও বাঙ্গালা হোমিওপ্যাথিক পুস্তক সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

* * * * *

মান্যবাড়ী হানেমান ফার্ম্মাসী,

৩০নং কাঁকুড়গাছি রোড, কলিকাতা।

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৬শ খণ্ড। { পৌষ, ১৩২২ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

মূলধন

আজকাল কৃষি শিল্প বাণিজ্য বিষয়ে নানারূপ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে তন্মধ্যে অধিকাংশই যে সারগর্ভ ও সময়োপযোগী তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দাসত্বের উমেদারী না করিয়া একনিষ্ঠ হইয়া কৃষি শিল্প বা বাণিজ্যিক কোন ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিলে আমাদের মত অকর্ম্মণ্য বাঙ্গালীরও যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ না হয় এমন নহে। ধনী লোকের কথা বাদ দিয়া যে সকল লোককে নিজ উপার্জ্জনের দ্বারা সংসার চালাইতে হইবে তাহাদের মধ্যে অনেকেরই যে স্বাধীন জীবিকা নির্ব্বাহের বাসনা নাই এ কথাও ঠিক নহে।

আমাদের দেশের ধনীগণ শতকরা তিন চারি টাকা সুদে কোম্পানীর কাগজ কিনিবেন তথাপি লাভজনক ব্যবসায়ে মূলধন নিয়োগ করিতে চাহেন না, ইহা যে একমাত্র বাঙ্গালী ধনীদিগেরই দোষ তাহা অবশ্য বলিতে চাহি না। বাঙ্গালীরা অযোগ্যতার ফলে অধিকাংশ ব্যবসাতেই লোকসান করিয়া ফেলে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর যেরূপ কার্য্যে শিথিলতা তাহাতে যৌথ কারবারের (joint stock Co.,) উপযুক্ত বাঙ্গালী এখনও হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লিমিটেড কোং গঠন করিয়া দেশের বড় বড় লোকের নাম দিলে কোম্পানীর অংশ বিক্রয়ের দ্বারা অর্থাগম হয় সত্য কিন্তু যে কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয় সে কার্য্যে হয় ত হস্তক্ষেপ করাই হয় না। নীচ স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া কোম্পানীর পাণ্ডারা (Directors) বিবাদ বাধাইয়া দেন এবং হয় ত কেহ কেহ নানা বিশৃঙ্খল ঘটাইয়া অবশেষে

অবসর লন। ইহার দ্বারা কেবল যে সেই কোম্পানীর অংশীদারগণই ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহা নহে বাঙ্গালীর জাতীয় উন্নতির পথও কণ্টকাবৃত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে এরিয়ন কটন মিলস্ কোং লিঃ (Aryan Cotton Mills Co., Ltd.,) নামে এক দেশীয় কোম্পানী গঠিত হয়, তাহাতে নাড়াজোলের রাজা প্রভৃতি অনেক বড় লোকের নাম দেখিয়া আমার মত নির্ব্বোধ কিছু অংশ খরিদ করে, যত দিন দাবীর (Call) সমস্ত টাকা মিটান না হইয়াছিল ততদিন পত্রাদির ব্যবহার রীতিমতই চলিতেছিল। কিন্তু টাকা সমস্ত মিটানর পর অনেক নাড়া চাড়া দিয়া অর্থাৎ পত্রাদি লিখিয়া দেখিলাম কোম্পানী পঞ্চভূতে লয় হইয়াছে আর কোন সাড়াই (ঠিকানা পর্য্যন্ত) পাওয়া যায় না। এরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় কিন্তু এ প্রবন্ধের তাহা উদ্দেশ্য নহে। জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী এখন বাঙ্গালীর পক্ষে উপযুক্ত নহে। জয়েণ্ট অর্থাৎ একতাই যদি থাকিবে তবে বাঙ্গালীর এত দুর্দ্দশা কেন। যাক্ কথায় কথায় মনের আবেগে আমাদের বক্তব্য বিষয় হইতে অন্যদিকে আসিয়া পড়িয়াছি।

পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে আমাদের অনেকেরই এখন "এণ্ড কোং" না হইয়া ব্যবসা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু বড় কাজে হস্তক্ষেপ না করিয়া ছোট খাট কাজ করিয়া যোগ্যতা অর্জ্জন এক্ষণে আমাদের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় যে যাঁহাদের কার্য্য করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা আছে তাঁহাদের মূলধনের অভাব, এবং যাঁহাদের মূলধন আছে তাঁহাদের কার্য্য করিবার ইচ্ছার অভাব বা কোন লাভজনক কার্য্য করিবার তাঁহাদের আবশ্যক হয় না, কারণ তাঁহারা জানেন যে সামান্য চেষ্টা করিয়া গহনা বন্ধক রাখিয়া টাকা সুদে খাটাইলেও বার্ষিক শতকরা ১২৲ টাকা সুদ বা লাভ তাঁহাদের হইবেই সুতরাং অনিশ্চিত লাভ লোকসানের দায়িত্ব ঘাড়ে লইয়া ব্যবসা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া তাঁহাদের পক্ষে অস্বাভাবিক। ধন বিজ্ঞানবিদেরা বলেন যে দেশের সুদের হার সস্তা না হইলে শিল্প বাণিজ্যাদির উন্নতি হইতে পারে না। শুনিতে পাওয়া যায় ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ সমূহে সাধারণতঃ সুদের হার বার্ষিক শতকরা তিন চারি টাকার বেশী নহে সুতরাং যদি সে দেশে কোন ব্যবসায় শতকরা পাঁচ ছয় টাকা লাভের আশা থাকে তাহা হইলে লোকে আগ্রহের সহিত সেই সমস্ত ব্যবসায় মূলধন নিয়োগ করেন। আমাদের দেশের অবস্থা কিন্তু অন্যরূপ। বাবু যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার তাঁহার অর্থনীতি নামক পুস্তকে ভারতবর্ষে প্রচলিত সুদের হার সম্বন্ধে আলোচনার সময় যে একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের দেশের লোক ব্যবসা বাণিজ্যে মূলধন নিয়োগ না করিয়া কেন সুদি কারবারে আকৃষ্ট হন। ঘটনাটী এই—

"ময়মনসিংহ জেলায় জামালপুর মহকুমায় একটী দরিদ্র কৃষক টাকা প্রতি সাত পয়সা চক্রবৃদ্ধি সুদে ১৫৲ টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল তিন বৎসর এবং কয়েক মাস পরে পাওনাদার

দুই শত কুড়ি টাকা এক আনা সাতপাই রেহাই দিয়া ও এক টাকা ওয়াশীল বাদ দিয়া পাঁচ শত টাকার দাবিতে নালিশ রুজু করেন। হিসাব করিয়া দেখা গেল সুদের হার শতকরা ১৩৪০৲ টাকা হিসাবে পড়িয়াছে। আদালত শতকরা ১৩১।০ টাকা হিসাবে সুদ মঞ্জুর করিয়া বাদীকে ডিক্রী দিয়াছিলেন।" ইহা যে অসম্ভব বা অতিরঞ্জিত ব্যাপার তাহা নহে এমন অনেক দেখা যায় যে, কোন কোন মহাজনের (কুসিদ জীবির) নিকট কর্জ্জ করিলে সে ঋণ পিতৃ মাতৃ ঋণের ন্যায় কখনও পরিশোধ করিতে পারা যায় না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মূলধনের মহার্ঘতা আমাদের কৃষি বাণিজ্যাদির উন্নতির পথে বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি উপায়ে সস্তায় অর্থাৎ অল্প সুদে আমাদের দেশে মূলধন সংগ্রহ হইতে পারে তাহারই আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমার নিকট হইতে পাঠক যেন কোন নূতন তথ্য আবিষ্কারের আশা করিবেন না। কারণ তাহাহইলে আপনাকেই ঠকিতে হইবে, যেহেতু আমার সে যোগ্যতা নাই। সাধারণে সস্তায় মূলধন পাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যে আইন (১৯১২ সালের ২ আইন) বিধি বদ্ধ করিয়াছেন সেই সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। গভর্ণমেণ্ট যে আইন করিয়াছেন তদনুসারে অনেক স্থানে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে বটে কিন্তু বাঙ্গালার লোক সংখ্যার তুলনায় ইহার কার্য্যকারিতা যে অনেকেই উপলব্ধি করেন নাই তাহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বর্দ্ধমানের ন্যায় এত বড় জেলায় এই আইন অনুসারে মোট ২১৩ টী ব্যাঙ্ক অদ্যাবধি স্থাপিত হইয়াছে।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে অল্প টাকা কর্জ্জ করিলে যে হারে সুদ দিতে হয় অধিক টাকা একত্রে কর্জ্জ লইলে সুদের হার অনেক কম হয়। অবশ্য অধিক টাকা সকল লোককে মহাজনরা কর্জ্জ দেন না একথাও সত্য। যে ব্যক্তি অধিক টাকা কর্জ্জ পাইবার যোগ্য তাঁহার সম্পত্তির জন্যই হউক বা যে কোন কারণেই হউক (তাঁহার) "ক্রেডিট" বা বাজার সম্ভ্রম অধিক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উপযুক্ত ক্রেডিট থাকিলেই অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত ক্রেডিট হয়ত যথেষ্ট না হইতে পারে কিন্তু কয়েকজন মিলিয়া তাঁহাদের ক্রেডিট একত্রিত করিলে (co-operative credit) তাহার দ্বারা অনেক কার্য্য (যাহা একের পক্ষে অসাধ্য) অনায়াসে সাধন হইতে পারে। এই মূল সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া সস্তায় মূলধন সংগ্রহের জন্য গবর্ণমেণ্ট গ্রামে গ্রামে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন গভর্ণমেণ্ট ১৯০৪ সালে কো-অপারেটীভ্ ক্রেডিট সোসাইটীর একট (Act 10 of 1904) প্রবর্ত্তন করেন ; পরে উহা সংশোধিত হইয়া ১৯১২ সালের ২ আইন নামে অভিহিত হয়। এই আইনে তিন প্রকার সমিতি গঠনের নির্দ্দেশ আছে।

১। Rural বা গ্রাম্য সমিতি। ২। Urban বা নাগরিক সমিতি। ৩। Central বা কেন্দ্রিক সমিতি। সকল সমিতির উদ্দেশ্য এক হইলেও গঠনের

তারতম্য আছে। নাগরিক ও কেন্দ্রিক সমিতির বিষয় বাদ দিয়া গ্রাম্য সমিতির সম্বন্ধে এক্ষণে আমরা আলোচনা করিব এই সমস্ত সমিতির কার্য্য পরিদর্শনের জন্য গভর্ণমেণ্ট নিজ ব্যয়ে প্রত্যেক প্রদেশে একজন উচ্চ বেতনের কর্ম্মচারী Registrar of Co-operative Societies নিযুক্ত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের জন্য যে রেজিষ্টার আছেন তাঁহার আফিস কলিকাতায় রাইটারস্ বিল্ডিংসে।

১। সমিতির উদ্দেশ্য :—পরস্পরের সাহায্যে মিতব্যয়ী ও আত্ম নির্ভরশীল হইতে উৎসাহ দিয়া সভ্যদিগের অবস্থার উন্নতি করা।

২। কি প্রকারে সমিতির মূলধন সংগ্রহ করা হয় :—(ক) সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটী (Executive Committee) সমিতির কার্য্য চালাইবার জন্য সমিতির তরফ হইতে কর্জ্জ করিবেন। (খ) সমিতির কার্য্যের প্রতি লোকের বিশ্বাস স্থাপিত হইলে স্থানীয় লোকের মূলধন আকৃষ্ট হইবে ; অর্থাৎ লোকে আগ্রহের সহিত তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ সমিতিতে আমানত (Deposit) করিবেন। (গ) পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেক সমিতিকে ১৩ বৎসরের জন্য ২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত কর্জ্জ দিতেন উক্ত ১৩ বৎসরের মধ্যে প্রথম ৩ বৎসর বিনা সুদে এবং পরের দশ বৎসর বার্ষিক শতকরা মাত্র চারি টাকা সুদে লইতেন এবং চতুর্থ বৎসর হইতে প্রতি বৎসর আসল ঐ টাকার দশমাংশ হিসাবে আদায় করিতেন; কিন্তু এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা এই কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ায় নিজে কোন সমিতির মূলধন সরবরাহ না করিয়া যে সকল সমিতি পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে ও যাহাদের মূলধন এত অধিক যে, তাঁহারা নিজে স্থানীয় লোকের মধ্যে খাটাইতে পারিতেছেন না। সেই সকল সমিতি (Central Banks) হইতে বন্দোবস্ত করিয়া মূলধন অভাববিশিষ্ট সমিতি সমূহকে সুবিধামত সুদে টাকা সরবরাহ করিয়া থাকেন।

৩। সমিতির বিশেষ সুবিধা :—(ক) সমিতি রেজেষ্টী করিবার জন্য কোনরূপ ফীস্ (fees) দিতে হয় না। (খ) বৎসরে অন্ততঃ একবার করিয়া সমিতির খাতা পত্র গভর্ণমেণ্ট তরফ হইতে বিনা ব্যয়ে পরিদর্শন করা (Free audit) হয়। (গ) সমিতির দলিল পত্রে ষ্ট্যাম্প লাগে না ও রেজেষ্টী করিতে হইলে ফীস্ লাগে না (free from stamp duty and Registration fees) (ঘ) সমিতির আয়ের উপর ইনকম টেক্স (Income tax) লাগে না। (ঙ) সমিতি ও তাহার মেম্বরগণের মধ্যে টাকা আদান প্রদান কালে রসিদ ষ্ট্যাম্প (Receipt stamp) ব্যবহার করিতে হয় না। (চ) সমিতির হিসাব রক্ষার জন্য যাহা কিছু খাতাপত্র আবশ্যক সমস্তই রেজিষ্টারস্ আফিস হইতে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

৪। কি প্রকার সমিতি স্থাপন করিতে হয়।—(ক) কলিকাতায় রাইটারস বিল্ডিংয়ে কো-অপারেটীভ সোসাইটির রেজিষ্টার সাহেবের নিকট সমিতি স্থাপনের জন্য আবেদন

করিতে হয়। (খ) সমিতিতে অন্ততঃ ১৫ জন সভ্য থাকা আবশ্যক তন্মধ্যে অন্ততঃ ৮ জন লেখাপড়া জানা চাই। (গ) সমিতির সভ্যগণের প্রত্যেকের বয়স অন্যূন ১৮ বৎসর হওয়া আবশ্যক। (ঘ) সমিতির সভ্যগণ এক গ্রামবাসী হইলেই ভাল হয় অভাবে নিকটবর্ত্তী একাধিক গ্রামের লোক হইলেও চলিবে। (ঙ) সভ্যগণ কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সচ্চরিত্র হওয়া আবশ্যক। ইহা ব্যতীত আবশ্যকীয় যে কোন সংবাদ উল্লিখিত ঠিকানায় কো-অপারেটিভ সোসাইটীর রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকট জানিতে পারা যায়। গ্রামে গ্রামে এইরূপ সমিতি স্থাপন করিয়া যাহাতে কৃষক ও শিল্পীগণের মধ্যে সস্তায় মূলধন সরবরাহ হয় তাহার আয়োজন করা আবশ্যক নচেৎ বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। বারান্তরে এবিষয়ে আর কিছু (Practical points) আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

দার্জ্জিলিঙ্গে আলুর চাষ

—:*:—

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী এম্, আর, এ, এস্
ডিপ্-ইন-এগ্রি, শিবপুর, লিখিত

আলু চাষের সময়—দার্জ্জিলিঙ্গ পাহাড়ে বৎসরে দুইবার আলুর চাষ হয়। ইহা বলা আবশ্যক যে দার্জ্জিলিঙ্গ জেলায় সর্ব্বত্র এইরূপ হয় না। সমুদ্র হইতে যে পর্ব্বতের উচ্চতা ৪০০০ ফিট বা ততোধিক তথায়ই কেবল বৎসরে দুইবার আলুর চাষ হইতে পারে। সমতল ভূমিতে অথবা যে পাহাড়ের উচ্চতা ৪০০০ ফিটের কম তথায় শীতকালেই কেবল আলুর চাষ হইতে পারে। পাটনা সহরে উচ্চ জমীতে যে স্থলে বর্ষার জল দাঁড়ায় না, তথায় কলগাঙ্গের আলু সেপ্টেম্বর মাসেই চাষ হইয়া থাকে কিন্তু ইহার ফসল অতি অল্প। তবে অতি প্রথমে নূতন আলু উঠিলে তাহার মূল্য খুব অধিক এবং আলু তুলিয়া লইয়া ঐ জমীতে পুনরায় আলুর চাষ কিম্বা কপির চাষ হইতে পারে, এইজন্য পাটনার কৃষকগণ অসময়েও আলুর চাষ করিয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার আলু ঐ সময়ে উৎপন্ন হয় না। কেবল কলগাঙ্গের আলু (ইহার চক্ষু রক্তবর্ণ বিশিষ্ট) চাষ হইয়া থাকে।

রোপণের সময়—দার্জ্জিলিঙ্গে দুইবার রোপণ হয় তাহার সময়ঃ—১ম জানুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া মার্চ্চের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অর্থাৎ মাঘের মধ্যভাগ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

২য়। আগষ্টের মধ্যভাগ হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রধানতঃ সেপ্টেম্বর অথবা শ্রাবণ মাস। ৪০০০ ফিটের নিম্নদেশে ভাদ্র হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত আলু রোপণ করা হয়। কোন কোন স্থলে মে ও জুন মাসেও আলু বসান হয় এই আলু অক্টোবর মাসে পাকে। প্রকৃতপক্ষে দার্জ্জিলিঙ্গ জেলায় বারমাসই প্রায় আলু লাগান হয় প্রথমোক্ত রোপণের আলুর ফসল অধিক। কিন্তু স্থলবিশেষে ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে রোপিত আলু অধিক ফল ধারণ করে। কারণ এই সময়ে অধিক বৃষ্টি কিম্বা একেবারে বৃষ্টির অভাব হয় না। তবে এই সময়ে টিপি রোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব হয়। এইজন্য অধিকাংশস্থলে এই সময়ে আলুর চাষ করা হয় না।

সার—দার্জ্জিলিঙ্গে গোবর ব্যতীত অন্য সার ব্যবহারের নিয়ম নাই। ইহার পরিমাণেরও ঠিক নাই। যার যেমন সার সংগ্রহ আছে, সে সেই পরিমাণে গোবর প্রয়োগ করে। কোন কোন কৃষক বিঘায় ৩০ মণ, কেহ কেহ বা বিঘা প্রতি ৫০ মণ গোবর ব্যবহার করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ না করিলে কখনও আলু উৎপন্ন করা যায় না। সার বিহীন জমীতে বিঘায় ১০ মন আলুও জন্মান যায় না।

রোপণ প্রণালী—দার্জ্জিলিঙ্গে সাধারণতঃ কোদালীদ্বারা জমী প্রস্তুত করা হয়; কারণ জমী উঁচু ও নীচু থাকায় তথায় হল চালান যায় না। আলু বসাইতে হইলে বিঘায় ৪ বা ৫ মন বীজের প্রয়োজন হয়। তাহারা এক হাত অন্তর অন্তর লাইন প্রস্তুত করে। প্রত্যেক লাইনে ৬ ইঞ্চি অন্তর আলু বসান হয়। ছোট আলু আস্তই বসান হয় এবং বড় আলু কাটিয়া লাগান হয়। দার্জ্জিলিঙ্গের কৃষকগণ আলু কিছু অধিক পরিমাণে রোপণ করিয়া থাকে। ইহাতে টিপি রোগের আক্রমণ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায় দার্জ্জিলিঙ্গে লাইন ২৫ হইতে ৩২ ইঞ্চি অন্তরে করা উচিত এবং প্রত্যেক লাইনে ৯ ইঞ্চি অন্তর আলু বসান কর্ত্তব্য। হুগলি জেলায় যে বৎসর টিপি রোগের বড় প্রাদুর্ভাব হয় তখন দেখিয়াছিলাম যে যে জমীর আলু ঘণ বসান হইয়াছিল তথায় টিপি রোগের আক্রমনও অধিক হইয়াছিল।

দার্জ্জিলিঙ্গে আলুর ফসল অধিক হয় না। ইহার কারণ ইতিপূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে যে তাহারা কেবল একমাত্র গোবর সার অল্প পরিমাণে ব্যবহার করে। অধিক পরিমাণে গোবর সার পাওয়াও যায় না। তথায় অধিক বৃষ্টি হয় এবং জমীও অত্যন্ত ঢালু। সুতরাং জমীর সার অত্যধিক পরিমাণে বিধৌত হইয়া চলিয়া যায়। এই সব কারণে বিঘা প্রতি ২০ মন ফসল হইলেই তথাকার কৃষকগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সমতলক্ষেত্রে যত্নের সহিত চাষ করিলে বিঘা প্রতি ১০০ মন আলুও উৎপন্ন হয়।

উদ্ভিদে তরল সার প্রয়োগ

—:*:—

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত

আমাদের সুজলা সুফলা বঙ্গজননী প্রকৃতই স্বর্ণ প্রসবিনী, ইহার জল বায়ু কৃষিকার্য্যের সম্পূর্ণ অনুকূল, বিশেষতঃ প্রকৃতি প্রদত্ত সারে ইহা স্বতঃই উর্ব্বরা, এমন সোণার দেশের লোকও যে অন্নের কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছে, ইহা বস্তুতঃই দুখের বিষয়। কৃষিকার্য্যের প্রতি ঘৃণাই ইহার মূল কারণ। ইউরোপ, আমেরিকা জাপান প্রভৃতি দেশের মৃত্তিকা এদেশের তুলনায় কৃষিকার্য্যের পক্ষে তত অনুকূল নহে। তথাপি তাহারা তাহাদের সার প্রয়োগ, অধ্যবসায় পরিশ্রম ও উৎসাহের সাহায্যে একই জমী হইতে বারংবার প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করিয়া কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে সমর্থ হইতেছে। বঙ্গদেশের কৃষককে পাশ্চাত্য দেশের কৃষকগণের ন্যায় অত্যধিক অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিতে হয় না। কৃষিকার্য্যে সারের প্রয়োজনীয়তা কি এবং শস্যের খাদ্যাভাব দূর করিতে হইলে কিরূপ খাদ্যের জন্য কিরূপ সার ব্যবহার করিতে হইবে, মোটামুটিভাবে এই সকল তথ্য অবগত হওয়া কৃষক মাত্রেরই পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশের কৃষক লোকও এদেশে নাই, এজন্য সাধারণতঃ এদেশের কৃষকদিগকে প্রকৃতির উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। ফলে কোন বৎসর প্রকৃতি প্রতিকূল হইলেই দেশে অন্নাভাব জনিত হাহাকারধ্বনি উপস্থিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের কৃষকেরা কোন কোন সময় ভূমিকে বিশ্রাম দিয়া থাকে, অর্থাৎ তাহাতে কোনরূপ শস্যের চাষ না করিয়া পতিত রাখে। ক্রমাগত ২।৪ বৎসর জমী পতিত রাখিয়া তৎপরে উহাতে ফসলের চাষ করে। ভূমিকে বিশ্রাম দিতে পারিলে যে তাহাতে অধিক ফসল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা বিশ্রামকালে ভূমিতে প্রকৃতিদত্ত সার ক্রমে ৩।৪ বৎসর সঞ্চিত হইয়াই উহার উর্ব্বরা শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। কিন্তু রীতিমত সার প্রয়োগাদি করিতে পারিলে জমীকে বিশ্রাম দিয়া কৃষককে ক্ষতিস্বীকার করিতে হয় না। বরং বিশ্রাম না দিয়াও তাহারা একই ক্ষেত্র হইতে পুনঃপুনঃ প্রচুর ফসল পাইতে পারে। ইহাদের আর্থিক লাভও যথেষ্ট হয়, এবং দেশে ধনাগমের পথও প্রশস্ত হয়।

উদ্ভিদেরা আমাদের জীবন রক্ষা করিয়া থাকে, সুতরাং উহাদিগকে রক্ষা আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, খাদ্যের অভাব হইলে উদ্ভিদেরাও আমাদের ন্যায় জীবিত থাকেনা বলিয়া যে একেবারেই হউক, বা বারে বারে হউক, উহাদের খাদ্য আমাদিগকেই যোগাইতে হইবে। দুগ্ধের জন্য গোপালন করিয়া থাকি, গাভী হইতে রীতিমত দুগ্ধ পাইতে হইলে উহাকে যথোপযুক্ত খাদ্য দিতে হয়, মাংসের জন্য ছাগ পরাবতাদি পশু পক্ষী পালন

করিতে হইলে উহাদিগকেও রীতিমত আহার দিতে হয়, পালিত পশুপক্ষীরা স্বকীয় খাদ্যবস্তু নিজেরাই অনুসন্ধান করিয়া লইতে সর্ব্বদা সমর্থ নহে, ফলতঃ উহাদেরও খাদ্যাভাব ঘটিলে আমাদিগকে যোগাইতে হয়, তদ্রূপ ভূমি হইতে যখন আমাদের সকল প্রকার খাদ্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে, তখন ভূমিরও খাদ্যাভাব মোচন করা আমাদেরই কর্ত্তব্য।

আম্র, লিচু, কাঁঠালাদি ফল বৃক্ষ, লাউ, কুমড়া, বেগুণ, কপি, আলু ইত্যাদি শাক সব্জী কিম্বা পুষ্পোদ্যানের নানাবিধ ফুল গাছ সকল প্রকার উদ্ভিদেহ তরল সার দিলে দুইটী বিশেষ মহদুপকার সংসাধিত হয়, প্রথমতঃ এতদ্বারা উদ্ভিদের বর্দ্ধনশীলতার পরিবৃদ্ধি হয়। দ্বিতীয়তঃ উদ্ভিদেরফলন ফুলনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি হয়। তরল সার কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, কোন কোন পদার্থ হইতে সচরাচর উৎকৃষ্ট তরল সার প্রস্তুত হইয়া থাকে, উদ্ভিদের কোন অবস্থায় ও কি কি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উহার প্রয়োগের আবশ্যক তাহা বিশেষরূপে জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। আমি নিজে তরলসার প্রয়োগের পক্ষপাতী এবং প্রায় বারমাসই আমি উহা নানাবিধ তরি তরকারী ও বৃক্ষাদিতে ব্যবহার করিয়া থাকি। উদ্ভিদের অবস্থা ও অভাব বিবেচনা করিয়া অল্লাধিক পরিমাণে ইহার ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়া থাকে।

উদ্ভিদে যে সকল সার প্রয়োগ হইয়া থাকে, প্রায় তাহার অধিকাংশই তরল সার রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। স্থূল সারকে জলে গুলিয়া তরল করিয়া লইলেই তরল সার হয়, তবে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে বিগলিত পদার্থকে জলে মিশ্রিত করিয়া লইলে উহার কার্য্য শীঘ্র ফলপ্রদ হইয়া থাকে, সদ্য বা টাটকা জিনিসের তরল সারে তেমন শুভ বা আশু ফল প্রদান করে না। এ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে সার বিগলিত হইলে উহা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে সার পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়, আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে টাটকা জিনিস জলে গুলিয়া গাছে ব্যবহার করিলেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। আমি কিন্তু বিগলিত সারই ব্যবহার করিয়া থাকি, কারণ বারংবার পরীক্ষা ও ব্যবহারের ফলে ইহাই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে স্থূল পদার্থ বিগলিত হইলে উহার স্থূলাংশের বহুভাগ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাগে বিভক্ত হইয়া যায় এবং শীঘ্রই তাহা উদ্ভিদগণ শিকড়ের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া আহরণ করিতে পারে। ফলতঃ উদ্ভিদ শরীরে শীঘ্রই উহার কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বিগলনকালে সার মধ্যে একটী উত্তাপ জন্মে, সেই উত্তাপ হেতু সারের কতকগুলি পদার্থ বাষ্পাকারে যেমন চলিয়া যায়, তেমনি আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই উত্তাপ হেতু সারের মধ্যে একটা ভৌতিক পরিবর্ত্তন ঘটে, তন্নিবন্ধন সার মধ্যস্থিত সারাংশেরও অনেক প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন হয়, এতদ্ব্যতীত সারের মধ্যে যে স্থূল পদার্থ অগলনীয় অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল, তাহাও উত্তাপবশে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুতে পরিণত হয়, কাজেই উহা শীঘ্রই উদ্ভিদগণ আহরণ করিতে সমর্থ হয়।

সারকে সদ্যই জলে গুলিয়া ব্যবহার করিলে সম্যক ফল পাওয়া যায় না বরং অধিক

মাত্রায় প্রয়োগে কুফলই ফলিয়া থাকে আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, আমার বাগানস্থ দুইটী চারা লিচু গাছে সদ্যসার জলে গুলিয়া ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহাতে চারা গাছ দুইটী তৎপর দিবস হইতে ঝিমাইতে আরম্ভ করে। অনন্তর উহা তফাৎ করিয়া ফেলিয়া তাহাতে জল সেচন ও অন্যান্য পাইটাদি করিয়াও গাছ দুইটীকে আর বাঁচাইতে পারিলাম না, অবশেষে শুষ্ক হইয়া মরিয়া গেল। ইহার কারণ ইহাই অনুমিত হইল যে সদ্য বা টাটকা সার বিমিশ্রিত জল গাছের গোড়ায় দিতেই মৃত্তিকা কর্ত্তৃক জল শীঘ্রই শোষিত হইয়া স্থূলাংশ সাররূপে উপরে থাকিয়া গেল, ও উহা হইতে একটী স্বাভাবিক উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া গাছটীকে ঝিমাইয়া শেষে মারিয়া ফেলিল। সেই অবধি আমি বিগলিত সারই ব্যবহার করিয়া থাকি, এবং তাহাতে আশানুযায়ী ফলও প্রাপ্ত হইয়াছি, কোন জিনিস বিগলিত করিতে হইলে উহাতে রস ও উত্তাপ উভয়ই থাকা উচিত, একের অভাবে অন্যের কার্য্য সংঘটিত হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একখণ্ড তৈল পিষ্টক বা খৈল শুষ্কাবস্থায় গাছের গোড়ায় ফেলিয়া রাখিলে কোন কার্য্যই হয় না, কিন্তু কালবশে উহাতে প্রতিদিনের শিশিরপাত হেতু ক্রমে উহা বিচুর্ণিত হইতে থাকে, অপরদিকে সূর্য্যোত্তাপের প্রকোপে উহার রূপান্তর হয়। এইরূপে বিগলিত হইয়া তৈল পিষ্টকের পৃথক অস্তিত্ব যখন আর থাকে না, তখন উহার শক্তি উদ্ভিদে প্রকাশ পায়। কিন্তু সেই শক্তি কিম্বা তাহার গুণ উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। ক্রমে ক্রমে বিগলিত হইয়া উদ্ভিদ শরীরে ক্রমে কার্য্য করিতে থাকে বলিয়াই উহার আশু উপকারীতা বুঝিতে পারা যায় না। স্থূলাবস্থায় মৃত্তিকায় সার প্রযুক্ত হইলে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মাংশে বিভক্ত হইতে বিলম্ব হয়, কিন্তু যত বিগলিত হইতে থাকে, ততই উহার ক্রিয়া উদ্ভিদ শরীরে দেখিতে পাওয়া যায়। স্থূলসার মাটীতে প্রদান করিবার পরে যদি তাহাতে জল সেচন না করা যায়. কিম্বা যদি বারিপাত না হয়, তাহা হইলে সেই সার নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে, অথবা অতি ধীরে বিগলিত হইয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত রসের সহিত সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে। ইহা হইতেই বুঝিতে হইবে, যে ক্ষেত্রে স্থূলসার দিলেও উহা তরলাবস্থায় পরিণত হয়, তবে তাহার কার্য্য হয়।

রুগ্ন ও মড়াঞ্চে গাছে তরল সার দিলে উহাতে নবশক্তির সঞ্চার হয়, বৃদ্ধিশীল গাছে প্রদান করিলে উহাতে শীঘ্রই ফলন ফুলনের শক্তি আনয়ন করে। ফুলের কুঁড়ি অবস্থায় দিলে ফুল বড় হয় ফুলের গঠন পরিপাটি হয় ফুলের বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায় ফলের মধ্যমাবস্থায় দিলে, ফল পরিপুষ্ট হয়, সুপক্ক হয় ও সুস্বাদ হয়, ইহাও বলা আবশ্যক যে অবিবেচনার সহিত বা অসময়ে কোন উদ্ভিদে তরল সার প্রদান করিলে হিতে বিপরীত হইয়া থাকে। যে গাছটী বেশ বাড়িতেছে এবং ফল বা ফুল হইবার বিলম্ব আছে, তাহাতে অধিক পরিমাণে বা প্রতিনিয়ত এই সার প্রদান করিলে গাছ অনেক সময় ষাঁড়াইয়া যায় অর্থাৎ অতিশয় বৃদ্ধিশীল হইয়া পড়ে। তখন আবার ইহার বৃদ্ধিশীলতার

গতিরুদ্ধ করিবার জন্য গাছের গোড়ায় মাটী দূরব্যাপিয়া কোদলাইয়া ও মৃত্তিকাচূর্ণ করিয়া দিতে হয়, ইত্যাদি নানা উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কোদলাইয়া দিলে গাছের অনেক শিকড় কাটিয়া যায়, মৃত্তিকার আর্দ্রতার হ্রাস হয়, সুতরাং গাছের আর তেমন বাড়িবার শক্তি থাকে না। গাছের শিকড় এইরূপে কাটিয়া গেলে এবং মাটীর রস শুষ্ক হইতে থাকিলে, উদ্ভিদ শরীর মধ্যে একটী ঘোরতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, গাছ থমকিয়া যায়, এই অবসরে গাছের শাখা পল্লবাদি অপেক্ষাকৃত কঠিন করিয়া উহার গতি ফলন ফুলনের দিকে ধাবিত হয়। অনেকে মনে করেন যে, বৃদ্ধিশীল গাছের শাখা প্রশাখাদি ছাঁটিয়া দিলে উহার বৃদ্ধিশক্তির হ্রাস হইবে, কিন্তু সেটা ভ্রম, গাছের শাখা প্রশাখা কাটিয়া দিলে, আপাততঃ সেই কর্ত্তিতাংশের গতিরুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু ফলে সে গতিটী অপরাপর শাখা প্রশাখার দিকে ধাবিত হয়, কিম্বা মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত শিকড়সমূহের বৃদ্ধি সাধন করে এইরূপে উদ্ভিদের একাংশের গতি রুদ্ধ হইলে অথবা শিকড়ের বৃদ্ধিহেতু শাখা প্রশাখা অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তি সঞ্চালিত হইলে আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল কোথায়? এতদ্বারা বৃক্ষকে অধিকতর বর্দ্ধিত হইবার পক্ষে সহায়তা করা হইল।

কপি, আলু, বেগুণ, শাকাদি সব্জী বাগানেও আমি তরল সার ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট সুফল পাইয়াছি। বারমাসের যোগান সার রাখিতে হইলে বাগানের মধ্যে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে বড় বড় পিপা, গামলা বা মটকী মধ্যে সার ভিজাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। সার পচিতে আরম্ভ হইলে তাহাতে রাশি রাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমিবৎ পোকা জন্মে, আবার তাহাই আপনা হইতে মরিয়া গিয়া সারের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। এতন্নিবন্ধন সারের গুণও অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সার পচাইলে উল্লিখিত প্রকারে আর একটী বিশেষ লাভ হইয়া থাকে। সার সঞ্চিত পাত্রটীকে দিবারাত্র ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক, এবং জল কমিয়া গেলে পুনরায় সেই পাত্রে জল দিয়া রাখিতে হয়। সার অতিশয় পুরাতন হইয়া গেলে উহার শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে, এজন্য একেবারে অধিক সার না ভিজাইয়া ব্যবহার করিবার ১০।১৫ দিন হইতে একমাস কাল পূর্ব্বে ভিজাইতে দেওয়া আবশ্যক। প্রতিনিয়ত যোগান রাখিবার জন্য ২।৪টী পিপাদি রাখার আবশ্যক, কারণ তাহা হইলে একটী পিপার সার ব্যবহার করিবার কিছু পূর্ব্বে দ্বিতীয় পিপার সার প্রস্তুতের উদ্যোগ করা যাইতে পারে। ৩।৫ বৎসরের পুরাতন পচা গোবর ও খৈল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে কিম্বা বিমিশ্রিত ভাবে পচাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। যেস্থানে অস্থিচূর্ণ পাওয়া যায়, তথায় উহাদের প্রত্যেকের সহিত কিছু কিছু মিশ্রিত করিয়া পচাইলে আরও সুন্দর ও উপাদেয় হইয়া থাকে। চারা অবস্থা হইতে তরল সার ব্যবহার করিতে পারিলে গাছ বেশ সুপুষ্ট হয়, এজন্য কপি প্রভৃতি বীজ হইতে চারা জন্মিবার পরেই একদফা তরল সার দেওয়া উচিত। হাপোরে বসাইয়া ২।৩ বার দিলে সুন্দর বৃহৎ বৃহৎ কপি জন্মে। তরল সার দিবার সময় পাত্র হইতে স্বতন্ত্র পাত্রে কিছু তরল সার উঠাইয়া তাহার সহিত সামান্যরূপ জল মিশাইয়া প্রত্যেক গাছের গোড়ায়

ঢালিয়া দিতে হয়, রস টানিয়া গেলে দু একদিন অন্তর গোড়ার মাটীতে "যো" বান্ধিলে গাছের গোড়াগুলি আস্তে আস্তে একবার নিড়নী দিয়া নিড়াইয়া উত্তমরূপে মৃত্তিকার সহিত সারের সরকে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিবে, অতঃপর গাছে প্রয়োজনানুরূপ জল সেচন করা বিধেয়।

বর্ষাকালে তরল সার ব্যবহার করিবার বিশেষ কোনই আবশ্যকতা উপলব্ধি করি না। কারণ আকাশের জল স্বভাবতঃই সারময়। তবে দেশবিশেষে কোনস্থানের বৃষ্টির জলে বেশী কোনস্থানে অল্প সারভাগ বিদ্যমান থাকে। বৃষ্টির জলে সারময়তা প্রতিপাদন করিবার জন্য বিশেষ অনুসন্ধান বা গবেষণার আবশ্যক করে না। একই প্রকারের দুইটী গাছকে স্বতন্ত্রভাবে এক একটি গামলায় রোপণ করিয়া বৃষ্টির সময়ে একটীকে বাহিরে অপরটীকে গৃহমধ্যে রাখিয়া দিলে, দুই চারি দিবসের মধ্যেই বৃষ্টির জলের উপকারিতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বর্ষাকালে গাছে তরল সার দিয়া কোনই লাভ নাই, কারণ তৎকালে বারিপাতের প্রভাবে তাবৎ উদ্ভিদই বিনা সারে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সুতরাং তখন আবার তরল সার দিলে অনেক সময়ে গাছের বৃদ্ধির আতিশয্য হয়, আবার অনেক সময় উদ্ভিদগণ তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ না হওয়ায় কতক সার বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া চলিয়া যায়, কতক সার ভূগর্ভের ভিতর দিয়া মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থিত ছিদ্র দিয়া বহুদূর নিম্নে চলিয়া যায়। উদ্ভিদগণ যখন আহারীয় পদার্থকে আহরণ করিতে সমর্থ হয় এবং শরীরস্থ করিতে সক্ষম হয়, তখনই উহা প্রযোজ্য।

সাময়িক কৃষি-সংবাদ

—:*:—

মার্কিণদেশীয় সিগারেটের তামাক—সিগারেটের তামাক উজ্জ্বল পীত বর্ণ করিবার জন্য এই পরীক্ষাক্ষেত্রে কৃত্রিম অগ্নিতাপ সংযোগে তামাক শুষ্ক করা হয়। ইহার জন্য স্বতন্ত্র একটী ঘরের প্রয়োজন। ইহার মধ্যে ২ দুই পার্শ্বে ২ দুইটী লোহার চোঙ্গা এমনিভাবে বসাইতে হয় যে বাহির হইতে অগ্নি জ্বালাইলে উহার তাপ ঐ চোঙ্গা মধ্যে দিয়া চলিয়া যাইলে কিন্তু ঘরের ভিতর ধূয়াঁ লাগবে না। এইরূপ তাপ ক্রমান্বয়ে ৩।৪ দিন মধ্যে ১৮০ ডিগ্রি ফারণহিট পর্য্যন্ত এমনিভাবে পরিচালিত করিতে হয় যেন তামাক সহজে শুষ্ক হইয়া যায়। ইহাতে তামাকের বর্ণ ও স্বাদ উৎকৃষ্ট হয়।

১৯১১ সালে নিম্নলিখিত পরিমাণে তামাকের আবাদ করা হইয়াছিল ও মূল্য পাওয়া গিয়াছিল :—

তামাকের নাম।	ওজন।	প্রতিমণের মূল্য।
হেয়াইট বার্লি	৫/০ মণ	৩৭॥০ দর।
লিটিল ফ্রেমেনজিন	৭/০ ,,	৩৫৲ ,,
কনেকটীকাট সিড্	১৩/০ ,,	২৫৲ ,,

এই বৎসর মৃত্তিকার নিতান্ত অনুর্ব্বরতাবশতঃ এই তামাক ভাল জন্মে নাই। একারণ যেরূপ মূল্য পাওয়া গিয়াছিল উহা যে বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। মৃত্তিকা ভাল হইলে অধিকতর উৎকৃষ্ট তামাক পাওয়া যাইত—এবং মূল্যও অধিক পাওয়া যাইত সন্দেহ নাই।

তুরষ্কদেশীয় সিগারেটের তামাক—এই তামাক অল্প পরিমাণে অবাদ করা হইয়াছিল। ইহার ১ নং তামাকের মাত্রা ১৯ সের পাওয়া গিয়াছিল। ইহা ৮১·০ মণ দরে বিক্রীত হইয়াছিল। এই ফারমের তামাক দেখিয়া রঙ্গপুর টুবাকো কেম্পানী স্থানীয় প্রজাদিগের সাহার্য্যে উৎকৃষ্ট সিগারেটের তামাক আবাদ করিবার জন্য এই বৎসর চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেও এই ফারম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিত। ১০।১২ জন কৃষক এই মার্কিন দেশীয় ও তুরষ্কদেশীয় তামাকের বীজ আবাদ করিয়া ২০।২০ মণ তামাক পাইয়াছিল। উহা প্রতিমণ ২০৲ টাকা হিসাবে এই কোম্পানী খরিদ করিয়াছিল এই ফারম হইতে কিছু তামাকের চারা নারায়ণগঞ্জের মিঃ গ্রেনকে দেওয়া হইয়াছিল। তিনিও সন্তোষজনক ফল পাইয়াছেন বলিয়া শুনা গিয়াছে।

পৌষ, ১৩২২ সাল।

ইক্ষু-শর্করা

—— ঃ*ঃ ——

আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার ইক্ষু চাষ ও শর্করা উৎপাদন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। উন্নত জাতীয় ইক্ষুর প্রবর্ত্তন এবং চাষ ও শর্করা প্রস্তুতের কলের একত্র সমাবেশ ব্যতীত ভারতীয় শর্করা ব্যবসায়ের যে কোন স্থায়ী উন্নতি হওয়ার আশা নাই তাহাও বহুবার প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সমস্ত জগতে ইক্ষু শর্করার আধুনিক অবস্থা সম্বন্ধে কতিপয় বিষয় বিবৃত হইবে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে ক্রমশঃ জানিতে পারা যাইতেছে যে শর্করা সখের দ্রব্য নহে, ইহা খাদ্য হিসাবে একটি আবশ্যকীয় পদার্থ। ইহা সহজেই পরিপাক হয়, শরীরের মাংসপেশী সমূহের বলসাধন করে ও উত্তাপ উৎপাদন করে। শিশুগণের পক্ষে ও অত্যধিক শারিরীক পরিশ্রমলিপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যকীয়। যে ব্যক্তি সহজে দৈনিক ৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে পারে, তাহাকে রোজ একপোয়া আন্দাজ (৮ আউন্স) চিনি খাইতে দিলে সে আরও ১ একের ৪ চার হইতে ১ একের ৩ তিন গুণ অধিক কাজ করিতে পারিবে। ইহার কারণ এই যে কায়িক শ্রমলিপ্ত পেশীসমূহ শর্করা ভিন্ন আর কোন দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারে না। মাংস প্রভৃতি খাইতে দিলে, প্রথমে মাংস হইতে শর্করা নিষ্কাষণ করিয়া লইয়া তাহার পর ব্যবহার করিতে পারে। তাহাতে অবশ্য কতক পরিমাণ শক্তির অপব্যয় হয়। এই সমস্ত কারণেই বোধ হয় প্রতীচ্য দেশ সমূহে শর্করার ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এক গ্রেটব্রিটনের অঙ্কাদি দেখিলেই তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। ১৭০০ খৃঃ অব্দে উক্ত দেশে কেবলমাত্র ১০,০০০ টন শর্করা ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৮০০ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০,০০০ টন হয় এবং ১৯০০ সালে দেখিতে পাওয়া যায় যে শর্করা ব্যবহারের মাত্রা বহুল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া

১৫,৬০,০০০ টনে পরিণত হইয়াছে। লোক সংখ্যার অনুমানে ইহার মাত্রা লোক প্রতি ৮৬ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। প্রতীচ্য দেশ সমূহের পক্ষে ইহাই সর্ব্বোচ্চ অঙ্ক। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ, ফ্রান্সে ও জর্ম্মণিতে লোক প্রতি শর্করা ব্যবহারের মাত্রা যথাক্রমে ৬৩ পাঃ, ৩১ পাঃ, ২৭ পাঃ। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইংরাজের কায়িক পরিশ্রমের পটুতাও নানা প্রকার ক্রীড়া, শিকার ও ব্যায়াম প্রবণতার সহিত এই উচ্চমাত্রায় শর্করা ব্যবহারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

কোন্ দেশ যে ইক্ষুর আদি উৎপত্তিস্থান তাহা সঠিক বলা যায় না এবং ইক্ষুও কুত্রাপি বন্য অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। ভারতবর্ষে যে অতি প্রাচীন কালেও ইক্ষু উৎপাদন প্রচলন ছিল অনেক পুরাণে ও কিম্বদন্তীতে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। ভারত হইতে চীন দেশে ইক্ষু প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণও রহিয়াছে। উদ্ভিদ্ শাস্ত্রের মতেও ইক্ষুর উৎপত্তিস্থান ভারতবর্ষ কিম্বা উহার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত কতিপয় দ্বীপ সমূহ। এতদ্দেশ হইতেই খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে সেকন্দর গ্রীস প্রত্যাগমন কালে ইক্ষু লইয়া যান এবং এই সময় হইতেই ইহা পারস্য দেশে এবং তৎপরে মিসর ও সিরিয়া দেশে প্রবর্ত্তিত হয়। অষ্টম শতাব্দীতে মিসরের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট জমিতে ইক্ষু চাষ হইত। আফ্রিকার পশ্চিমাংশে এবং স্পেন দেশে মুরগণ কর্ত্তৃক ইক্ষু প্রবর্ত্তিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে ইক্ষু উৎপাদনের একমাত্র কেন্দ্র স্পেন; তথায় বৎসরে প্রায় তিন লক্ষমণ আন্দাজ শর্করা উৎপাদিত হয়। পূর্ব্বকালে ভিনিস নগরে শর্করার একটি প্রসিদ্ধ বাজার ছিল, উহা পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুর্কীর সহিত যুদ্ধের জন্য বিনষ্ট হইয়া যায়। পর্ত্তুগীজগণ বাণিজ্য উপলক্ষে মদিরা, ক্যানেরী দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতিতে গিয়া ইক্ষু চাষ আরম্ভ করেন এবং কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর হইতে ব্রেজিল, ওয়েষ্ট-ইণ্ডিয়া প্রভৃতি দেশে ইক্ষু উৎপাদনের সূত্রপাত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে যে সমুদায় স্থান হইতে জগতের বাজারে ইক্ষু শর্করা সরবরাহ হইয়া থাকে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি দেশ প্রধানঃ—ভারবর্ষ, কিউবা, যবদ্বীপ, হাওয়ায়ী, লুসিয়ানা, কুইন্সল্যাণ্ড, ফিজি, পেরু, আর্জেণ্টাইন, ব্রেজিল, ওয়েষ্টইণ্ডিজ্ ও ডেমেরেরা এবং সামান্য অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে এই সমুদয় স্থান হয় বিষুব রেখার উপরে কিম্বা উহার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত।

ইক্ষু ব্যতীত অপরাপর উদ্ভিদ্ হইতেও অল্প বিস্তর মাত্রায় শর্করা উৎপাদিত হইয়া থাকে। আমেরিকায় মেপাল ও ইউরোপে বীট ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত। কিন্তু উৎপাদনের বাহুল্যতায় ও ব্যবসায়ের হিসাবে এক বীট শর্করাকেই ইক্ষু শর্করার প্রতি-দ্বন্দী বলিতে পারা যায়। বীট শর্করা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র জর্ম্মাণি, অষ্ট্রীয়া, ফ্রান্স, রুসিয়া, হলণ্ড, বেলজিয়ম, ইতালী ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য। ইহাদের মধ্যে এক শেষোক্ত দেশ ভিন্ন প্রায় অপর সকল গুলিই বর্ত্তমান মহাসমরে লিপ্ত। সুতরাং শর্করার বাজার যে অত্যাধিক চড়িয়া যাইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? এই জন্যই সমর ঘোষণার

অল্পদিন পরেই বিলাতের গবর্ণমেণ্ট ১০ লক্ষ টন ইক্ষু শর্করা ক্রয় করিয়া ফেলেন। কিন্তু বাজারে ইক্ষু অপেক্ষা বীট শর্করার প্রাধান্যই অধিক। ১৯১৩ সালে গ্রেটব্রিটেন যে পরিমাণ চিনি ক্রয় করেন তাহার মধ্যে ১৫,৩১,৪৩০ টন বীট শর্করা এবং কেবল ৫,৬৪,৭৬০ টন মাত্র ইক্ষু শর্করা। বর্ত্তমান সময় কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বীট শর্করা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র জর্ম্মাণি ও অষ্ট্রীয়া হইতে আর রপ্তানির উপায় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে জর্ম্মাণিতে যে চিনি জমিতেছে তাহার পরিমাণ ২০ লক্ষ টনের কম হইবে না। এই চিনি যে ভবিষ্যতে শর্করার বাজারে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটন করিবে তাহার কোনও সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে বীটশর্করা ইক্ষুশর্করার প্রবলতম প্রতিদ্বন্দী হইলেও ইহার প্রচলন অধিক দিন হয় নাই। মহাবীর নেপোলিয়নই প্রথমতঃ বীট হইতে শর্করা উৎপাদনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন এবং ১৮৪০ সাল হইতে ইহার ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে চাষ আরম্ভ হয়। অপরাপর বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের ন্যায় বীট শর্করা উৎপাদনেও জর্ম্মাণি যথেষ্ট অধ্যবসায়, দূরদর্শিতা এবং কার্যদক্ষতা দেখাইয়াছেন। ১৮৬৫ সালে জর্ম্মাণি হইতে বিলাতে মোট ৩০,০০০ হন্দর চিনি আইসে। ৩০ বৎসর পরে ১৮৯৫ সালে উক্ত দেশ ১,৭০,০০০০০ হন্দর চিনি বিলাতে পাঠান। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কিরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত বীট শর্করা উৎপাদন অগ্রসর হইতেছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে শর্করা বাজারে এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে ইক্ষু শর্করা উৎপাদন আর লাভজনক হইবে না বলিয়া অনেক হতাশ হইয়া ইক্ষু চাষ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং অনেক আক আবাদকারী সাহেব ও কোম্পানি ফেল্ হইয়া গিয়াছিলেন। এই সময়ে জগতে বীট ও ইক্ষু শর্করা উৎপাদন যথাক্রমে ৪৩,২৩,৮৯৯ ও ২৬,৫২,০০০ টন দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু তাহার পর হইতে আবার বৈজ্ঞানিক প্রথায় ইক্ষু চাষ হইয়া এবং উন্নত জাতীয় ইক্ষুর প্রবর্ত্তন হইয়া জগতে ইক্ষু চাষের অবস্থা অনেকটা ফিরিয়াছে। কিন্তু যে সমুদয় নব নব বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বনে আধুনিক ইক্ষু চাষের উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশীয় গণের ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা যবদ্বীপের উল্লেখ করিতে পারি। কয়েক প্রকার রোগে যবদ্বীপের ইক্ষুক্ষেত্রগুলি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রায় একপ্রকার বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। রোগ সহিষ্ণু জাতির প্রবর্ত্তন করিয়া ও বীজ হইতে ইক্ষু উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া জাভার কর্ত্তৃপক্ষগণ ইক্ষুচাষের পুনরুদ্ধার করেন। গবেষণার ফলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে বীজ হইতে উৎপন্ন ইক্ষুই অধিক পরিমাণে রোগের আক্রমন সহিতে পারে এবং গড়পড়তায় অধিক পরিমাণ শর্করা উৎপাদন করে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অনেক স্থানে আকের, ধানের ন্যায় শিষ হইয়া ফুল ও বীজ হইতে

দেখা যায়। উত্তর ভারতে আকের কমই ফুল হয়। বীজোৎপন্ন আকের ঘাসের সহিত অনেক সাদৃশ্য থাকায় তাহার উপর লোকের নজর বড় একটা আকৃষ্ট হয় না। ১৮৫৮ সালে একজন সাহেব বার্বাডেস্ দ্বীপে প্রথমে আকের চারা আবিষ্কার করেন। উহা হইতে গাছ ভাল হয় না বলিয়া অনেকেই হতশ্রদ্ধ হইয়া উক্ত বিষয়ে আর কিছু দিনের জন্য হস্তক্ষেপ করেন নাই কিন্তু তৎপরে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ বিশেষ যন্ত্রাগার প্রতিবেষ্টিত ও বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হইয়া বীজোৎপন্ন ইক্ষু সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। তাহার ফলে এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে যবদ্বীপের উৎকৃষ্ট জাতি সমূহ স্থানীয় "চেরিবোঁ" ও উত্তর ভারতের "চিনে" জাতির বর্ণ-শঙ্কর। এই জাতীয় ইক্ষুই যবদ্বীপে সমধিক মাত্রায় প্রচলিত এবং ইহাদের দ্বারা ইক্ষু চাষের যে কত উন্নতি সাধন হইয়াছে তাহা যবদ্বীপ হইতে ভারতে আমদানি চিনির মাত্রার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

এক্ষণে ভারতে ইক্ষু চাষ ও শর্করা উৎপাদনের বর্ত্তমান অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। বিগত কুড়ি বৎসরে জগতে অন্যান্য দেশে শর্করা উৎপাদনের মাত্রা প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ভারতে বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক বরং সামান্য পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে কতক পরিমাণ চিনি এতদ্দেশ হইতে রপ্তানি হইত; এক্ষণে চিনির আমদানি ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইক্ষু উৎপাদন ও শর্করা প্রস্তুত করিবার মধ্যে সহযোগীতার অভাব এবং দেশভেদে তদুপযুক্ত জাতীয় ইক্ষু উৎপাদন বিষয়ে নিশ্চেষ্টতা।

প্রথম কারণটি বিশেষভাবে বুঝিতে হইলে যবদ্বীপের শর্করা প্রস্তুতের ব্যবস্থার উল্লেখ করিতে হয়। উক্তদেশে শর্করা প্রস্তুতকারীর সহিত চাষের কোন সাক্ষাত সম্বন্ধ নাই। তবে প্রত্যেক কারখানার চতুঃপার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমি আছে এবং উক্ত জমিতে উৎপাদিত ইক্ষুর উপর কারখানার সত্ব আছে। কারখানা হইতে উপযুক্ত পরিমাণ সার দেওয়া হয় এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে চাষের জন্য জমি ও ইক্ষু বিক্রয়ের মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে বিশেষজ্ঞগণ সকল সময়েই কোন্ সারে, বীজে ও জমিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শর্করা উৎপাদনোপযোগী ইক্ষু হইতে পারে তাহা অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন। এইরূপে কলওয়ালগণ ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েই চেষ্টা করেন যাহাতে অধিকতর পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হয় এবং চাষীগণও ইক্ষুর উৎকর্ষতা হিসাবে মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়ায় তাহাদের প্রাপ্য অর্থ হইতে বঞ্চিত হয় না। ভারতেও এইরূপ সমবেত চেষ্টা না হইলে সমধিক উন্নতির আশা নাই।

উপযুক্ত জাতীয় ইক্ষুর বিষয় বলিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হয় ভারতের দুইটি অঞ্চলই ইক্ষু উৎপাদনের কেন্দ্র (১) উত্তর ভারত পাঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয় তীরস্থ জমি এবং (২) দক্ষিণ ভারত সমুদ্রের উপকুলস্থ দেশ সমূহ। প্রথমোক্ত

অঞ্চলে উষ্ণতার লাঘবতা বশতঃ অপেক্ষাকৃত পাতলা ও কম রসযুক্ত ইক্ষু জন্মে। কিন্তু চাষের সুবিধা থাকায় এই অঞ্চলেই মোট ইক্ষু ফসলের মধ্যে ৯।১০ ভাগ জন্মায়। দ্বিতীয় অঞ্চলে মোটা রসযুক্ত ও বৃহদাকারের ইক্ষু জন্মায় বটে কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ জলের অভাবে চাষের পরিসর অত্যন্ত কম। কেবল মাত্র একের দশ ভাগ ফসল এই অঞ্চলে জন্মাইয়া থাকে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে এই দুই অঞ্চলের ইক্ষুর শঙ্কর উৎপাদন করিলে এমন কয়েকটি জাতি পাওয়া যাইবে যে উহাদের মধ্যে এক একটি বিভিন্ন দেশের জল হাওয়া ও জমির সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইবে। সমলকোটা ইক্ষুক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে প্রায় ৬০ হাজার ইক্ষু চারা প্রস্তুত হইয়াছে এবং বিভিন্ন স্থানে এ সমুদয় লইয়া পরীক্ষাও চলিতেছে। কিরূপ ফলাফল দাঁড়ায় তাহা ২।৪ বৎসরের মধ্যেই জানিতে পারা যাইবে।

পত্রাদি।

—:*:—

বেগুণে পোকা—

শ্রীগুণাভিরাম পাঠক, সাধনপাড়া, বহিরগাছী জেলা নদিয়া।

প্রশ্ন—১। আমি এবৎসর আমার বেগুণক্ষেতে একজাতীয়, গাছে ও ফলে কাঁটাশূন্য সাদা বর্ণের (whitesh green) ও অপেকাকৃত বৃহদাকারের বেগুন লাগাইয়াছি। গাছগুলি বেশ সতেজে বাড়িয়াছে। কিন্তু প্রায় প্রতি প্রাতঃকালেই দেখিতে পাইতেছি যে ৫।৭ টী বেশ সতেজ গাছের মূল ডগাটী নুইয়া পড়িয়াছে। ডগাটী কাটিয়া চিরিয়া দেখি ছোট ও বড় একপ্রকার পোকা উহার মজ্জা খাইয়া ফেলায় ঐরূপ ঘটিতেছে। ক্ষেতের প্রায় সকল গাছই এইরূপে আক্রান্ত হইয়াছে ও হইতেছে। কতকগুলি গাছের পাতায় চুণের গুঁড়ারন্যায় একপ্রকার সাদা দ্রব্যের লেপ উৎপন্ন হইয়া গাছগুলি একেবারে মরিয়া যাইতেছে। ঘুঁটের ছাই দিয়া কোন উপকার হয় নাই, ইহারই বা প্রতীকার কি?

উত্তর—১। আপনার বেগুনক্ষেতে মাজ পোকা ও ছাতরা পোকা এতদুভয়ের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। ক্ষেতের বেগুন গাছের দুই একটি ডগা শুকাইতে দেখিলেই সাবধান হওয়া উচিৎ এবং প্রথম হইতে আক্রান্ত ডগাগুলি বা পোকাধরা বেগুন কাটিয়া লইয়া পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে। সপ্তাহে একবার ক্ষেতের মাঝে শুষ্ক পাতা ডাল একত্রিত করিয়া আগুন লাগাইলে কতকটা প্রতিকার হয়।

তুঁতের জল বা চুণের জলে ধুইয়া দিলে ছাতরা অনেক নিবারণ হয়।

"ফসলের পোকা" নামক পুস্তকখানিতে এই সকল বিষয়ের বিশেষ আলোচনা দেখিতে পাইবেন। পুস্তকখানি কৃষক অফিসে পাওয়া যায়।

জমী তেফসলী করা—

প্রশ্ন—২। আমার একখণ্ড নাতিবিস্তীর্ণ রোয়া আমনের জমি আছে। তাহার ধান কাটা হইতেছে। প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে জমিটী আগামী আষাঢ় অর্থাৎ পুনরায় রোয়ার সময় পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু আমি জমিটীকে এরূপভাবে ফেলিয়া না রাখিয়া উহাকে "তেফসলী" জমিতে পরিণত করিতে চাহি। অবশ্য এজন্য আমাকে উপযুক্ত সার ব্যবহার করিয়া জমির উর্ব্বরতাশক্তি অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে। "তেফসলী করিবার জন্য আমি সম্বৎসরকে এইরূপ বিভক্ত করিতে চাই—

(১) অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখের প্রথম পর্য্যন্ত আপনাদিগের উপদেশানুযায়ী কোন প্রকার সার প্রয়োগ ও শস্য বপন।

(২) বৈশাখ হইতে আষাঢ়ের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত "ষেটে" (যাহা ৬০ দিনে পাকে) নামক আশুধান্য বপন।

(৩) আষাঢ়ের শেষার্দ্ধ হইতে অগ্রহায়ণের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত রোয়া আমন প্রস্তুতকরণ। এস্থলে আপনাকে একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। জমিটী "তেফসলী" করিবার ইচ্ছা আমার অতি লোভজনিত নহে। গ্রামে আমার প্রায় ১৭৫ বিঘা চাষের জমি গ্রামে কৃষকদিগের মধ্যে খাজনায় বিলি আছে। এখানকার কৃষকগণ এরূপ অলস ও নিঃস্ব যে, না তাহাদের উপযুক্ত পরিশ্রম করিবার ইচ্ছা আছে, না উপযুক্ত সার কিনিয়া জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার সামর্থ্য আছে। এদিকে প্রচলিত প্রথানুসারে ৩ বৎসর আবাদের পর উপর্য্যুপরি দুই বৎসর এক একটী মাঠ "ফেলিয়া রাখিলে আমাকে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে। একটী মাঠে আমার প্রায় ৮০ বিঘা জমি আছে। মাঠটী সমস্তই গত ও বর্ত্তমান বৎসর ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু তত্রাপি কৃষকদিগের হাহাকার যায় না। সেইজন্য আমি এখানকার কৃষকদিগকে দেখাইতে চাই যে উপযুক্ত সার ব্যবহার করিলে, তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া লাভবানই হইবে। প্রতি বৎসর আবাদ করিলেও জমির উর্ব্বরা শক্তি নষ্ট হইবে না।

এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে আমার আমনের জমিসম্বন্ধীয় প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত হইবার উপযুক্ত কি না, হইলে কোন সার ব্যবহার করিয়া কোন্ শস্য বপন করিলে আগামী চৈত্রের মধ্যে উগা পাকিবে। এস্থলে বলা উচিত যে জমিটিতে এখন তাদৃশ রস নাই। কেবলমাত্র শিশির ও দৈবাৎ বৃষ্টি ভরসা।

যদি জমিটী "তেফসলী" করা সম্ভব না হয়, এবং তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তাহা

হইলে উহাকে "দোফসলী" করা যাইতে পারে কি না অর্থাৎ বৈশাখে "যেটে" ধান বুনিয়া আষাঢ়মাসে আমন ধান রোয়া যাইতে পারে কিনা যদি তাহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বিঘা প্রতি কোন্ সার কি পরিমাণে প্রয়োগ করিলে দুই প্রকার ধানই আশানুরূপ হওয়া সম্ভব জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

উত্তর—২। জমিকে তেফসলী করা একবারে অসম্ভব নহে তবে জমির অবস্থা বুঝিয়া সে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। জমির মাটি আঠাল হইলে তাহা সহজে তেফসলী করা যায় না কারণ তাহাতে রস রক্ষা করা কঠিন, এমতাবস্থায় জমিটি দোঁয়াস হওয়া আবশ্যক।

অগ্রহায়ণ মাসে মটর ও অন্য কলাই বপন করা চলে, চৈত্রের মধ্যে সে ফসল তৈয়ারি হইয়া যাইবে। কলাই চাষে পটাস প্রধানের সার প্রয়োগ করিতে হয়। পরিমাণ—বিঘা প্রতি ৩০ হইতে ৫০ মণ। ঘুঁটের ছাই, কাঠের ছাই, কলার বাসনা, তামাক গাছ প্রভৃতির ছাইয়ে যথেষ্ট পরিমাণে পটাস থাকে। আশু ধানের সময় হাড়ের গুঁড়া ও সোরা সার ব্যবহার করিতে হয় এবং বর্ষাকালে রোয়া ধানের সময় বিঘা প্রতি ৫০/ মণ গোময় সার দিলে জমি নিস্তেজ হইয়া পড়িবার ভয় থাকে না। জমি নীরস হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকিলে সেচন জলের ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হয়। তেফসলী জমির জন্য সারা বৎসর ধরিয়া বিশেষ সতর্কতা ও পরিশ্রমের আবশ্যক, তাহার অভাব হইলে তিনটি ফসলেই লোকসান হইবার সম্ভাবনা। দুই ফসলের চাষ এই কারণে যুক্তিযুক্ত। পাট কাটিয়া ধান কিম্বা আশু ধান কাটিয়া কলাই এইরূপ পাল্টা পাল্টি দুইটী ফসল করিলে জমির শক্তি স্বভাবতঃই অক্ষুণ্ণ থাকে এবং ফসল ভাল হয়। কৃষি রসায়ণ দেখুন।

প্রশ্ন—৩। ধানের জমির জন্য সাধারণতঃ বিঘা প্রতি ১/ মণ হাড় চূর্ণ ও ।০ সের সোরা দিবার ব্যবস্থা কৃষকে আছে। জিজ্ঞাস্য দুইটী সার একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া কিম্বা পৃথক্ পৃথক্ ছড়াইতে হইবে।

উত্তর—৩। বৃষ্টি পড়িলেই জমি চষিয়া হাড়ের গুঁড়া ছড়াইয়া জমি তৈয়ারি করিয়া রাখিতে হয়। ধান রোয়ার সময় সোরা ছড়াইয়া রোপণ কার্য্য শেষ করিতে হয়। আশু ধানের ক্ষেত্রে চারা বড় হইলে বিদে চালাইবার সময় সোরা দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন—৪। ঘুঁটের ও কোক্ কয়লার (যাহা রন্ধন জন্য ব্যবহৃত হয়) ছাই হইতেও কি পটাস সার পাওয়া যায় ?

উত্তর—৪। কয়লার ছাইয়ে পটাস ভাগ অতি কম, ঘুঁটের ছাইয়ে শতকরা ১১।১২ ভাগ।

জমিতে সারের পরিমাণ নির্ণয়—

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

প্রশ্ন—১। আপনার কৃষক পত্রিকায় "অনুর্ব্বরা ভূমি উর্ব্বরা করিবার উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধে অনেক কথা লেখা আছে ; কোন কোন জমিতে পটাস, কোন জমিতে ফস্ফরাস,

কোন জমিতে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ প্রয়োজন তাহা নির্ণয় করায় উপায় লিখিত হয় নাই, যদি জানার কোন উপায় থাকে প্রবন্ধে বলিবেন কারণ তদনুযায়ী সারের ব্যবস্থা করা বোধ হয় অধিক ফল প্রদ হইবে।

উত্তর—১। জমির মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া তবে তাহাতে প্রযোজ্য সারের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যায়। রাসায়নিক বিশ্লেষণ ছাড়া উপায় নাই। সাধারণতঃ জমির অবস্থা দেখিয়া তদুপরি আগাছা কুগাছার আকার ও বাড় বৃদ্ধি দেখিয়া মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লওয়া কঠিন নহে। সকল জমিই গোময় প্রয়োগে উর্ব্বর হয়।

রেড়ির খৈল প্রয়োগ বিধি—

শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর সেন, সারোটাপি, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন—১। রেড়ীর খৈল গোলাপ গাছে কতদিন পচাইয়া দিলে ভাল হয়?

উত্তর—রেড়ীর খৈল দশ বার দিন না পচিলে গাছে দিবার উপযুক্ত হয় না।

প্রশ্ন—২। প্লানেট জুনিয়া ইহার ব্যবহার জানিতে চান।

উত্তর—কৃষকে বিগত পূর্ব্বমাসে প্রকাশিত হইয়াছে।

ফুলকপি বীজ দেশী আছে কি না—

শ্রীযুত আলকরাম প্রধান পণ্ডিত, ধর্ম্মশালা স্কুল, হাজারিবাগ।

প্রশ্ন—ফ্লাট ডাচ কপি কি দেশী?

উত্তর—পাটনা লেট ইহা ফুলকপি। আমাদের এদেশজাত বীজ হইতে এই কপি উৎপন্ন হইতেছে। ফুল বিলাতীর মত বড় হয়, ফ্লাটডাচ কপি বাঁধা কপি, ইহা মার্কিন কপি, মাথা চেপ্টা হয় ও খুব নিরেট হয়। ৭০ দিনে কপি তৈয়ারি হইয়া যায়।

সার-সংগ্রহ

—:*:—

পল্লীর উন্নতি—

পল্লী গ্রামের জঙ্গল সমস্যা বড় কম গুরুতর নহে। অনেক স্থলে এই সব জঙ্গল এত বেশী যে গৃহস্বামীদের নিজ ব্যয়ে তাহা মুক্ত করা বড় কষ্টকর।

পল্লী গ্রামে আজ কাল জন মুজরের দর এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে ভদ্রলোকদিগের প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার জন্য লোক পাওয়া মুস্কিল হইয়াছে। সুতরাং বৃহৎ জঙ্গল

পরিষ্কার করাইবার জন্য অর্থ ব্যয় করা তাঁহদের পক্ষে সহজ নহে। সরকার হইতে মধ্যে মধ্যে জঙ্গল পরিষ্কার করিবার জন্য গ্রামের উপর যে সব হুকুম থাকে তাহা নাম মাত্র প্রতিপালিত হয়। মধ্যবিত্ত ও গরীব ভদ্রলোকগণ স্বহস্তেই এই জঙ্গল পরিষ্কার কার্য্য করিয়া নিজের অর্থ ব্যয় নিবারণ করেন, ইহা স্বচক্ষে দৃষ্ট ঘটনা। তারপর একবার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া রাখিলেই হয় না; হয় সেখানে বসতি করিতে হয়, না হয় আবাদ করিতে হয়। গ্রামের মধ্যের জমি আবাদ করা অনেকে পছন্দ করে না, বসতি করিবার মত লোকও বড় পাওয়া যায় না সুতরাং কিছুদিন পরেই জঙ্গল আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অনেকে বলেন এই জঙ্গল সমস্যার সমাধান হইলে পল্লীর দুর্দ্দশা অনেকটা ঘুচিবে।

গ্রামের মধ্যে যে সব রাস্তা আছে, তাহাদের অবস্থা যতই শোচনীয় হউক, তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী পগারগুলির অবস্থা ততোধিক শোচনীয়। এই সব 'পগার' গ্রামের পয়ঃপ্রণালী বলিলেই চলে। কিন্তু ইহাদের দ্বারা জল নিঃসরণের কোনই সুবিধা হয় না। গাভের মধ্যে বৃষ্টি আদির জল সব উহাদের মধ্যে জমিয়া থাকে। তাহাতে চারিদিকের জঙ্গলের ডালপালা আদি পড়িয়া পচিতে থাকে, ঐ সব বাগানের মধ্যে যে সব তৃণগুল্ম আগাছা জন্মে তাহাও পচিতে থাকে। ঐ জল চৌদ্দ আনা জমিতে বসিয়া যায়, আর দুই আনা অংশ সূর্য্য কিরণে শুষ্ক হয়। ইহার ফলে গ্রামের ভূমি প্রায়ই স্যাঁৎসেতে হইয়া পড়ে। ইহাও রোগবিস্তারের আরও একটী কারণ।

যে সব কনট্রক্টরগণের রাস্তা মেরামতের ভার থাকে, তাহারা ঐ সব পগার হইতে যথেচ্ছা মাটি কাটিয়া লয় মাত্র। জলদেশের জলের প্রতি তাহাদের লক্ষ্য থাকে না সে জ্ঞানও তাহাদের কিছুই নাই। সুতরাং রাস্তার মেরামতের কার্য্যে পগারগুলির দশা ক্রমশঃই অধিকতর শোচনীয় হইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অবস্থাও খারাপ হইয়া থাকে। (বাঙ্গালী)

শিল্পের উন্নতি—

আমরা অনন্দিত হইলাম যে যুক্ত প্রদেশের তৈলের কারখানা গুলির ক্রমশঃ উন্নতি হইয়াছে। শিল্পবিভাগের সরকারী ডাইরেক্টর প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই প্রদেশের অবস্থা এমন অনুকূল যে, একটু যত্ন করিলেই তৈলের কারখানায় এই প্রদেশ পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে। তিনি বলেন যে এই প্রদেশে রঙ, বার্ণিশ ও ছাপার কালিরও কারখানা চলিতে পারে।

যুক্ত প্রদেশর নানা স্থানে এখনও বহুসংখ্যক নূতন নূতন তৈলের কল বসান যাইতে পারে। পরিচালনার সুব্যবস্থা হইলে কারবারে অবশ্যই লাভ ইহবে।

উদ্ভিদ্‌তত্ত্বালোচনায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র—

আমরা আনন্দিত হইলাম যে, ভারতসচিবের অনুমোদনে ভারতগবর্ণমেণ্ট আরো পাঁচ বৎসর আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রকে মৌলিক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করিবেন। এই জন্য তিনি পূর্ব্ববৎ বাৎসরিক ৫০ হাজার টাকা সাহার্য্য পাইবেন; ইহার মধ্য হইতেই তিনি তাঁহার সহকারীদের বেতন দিবেন। পরীক্ষাগার প্রস্তুতের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এককালীন ২৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। উদ্ভিদ-তত্ত্বের পরীক্ষার জন্য তিনি কলিকাতায় ও দারজিলিঙে উদ্যান পাইবেন।

গবর্ণমেণ্ট বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান জগদীশচন্দ্রের গুণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করায় সমস্ত বাঙ্গালীজাতি আনন্দিত হইয়াছে।

ভারতীয় বাণিজ্য মহাসভা—

আগামী ২৬এ ডিসেম্বর বোম্বাইনগরে ভারতীয় বাণিজ্য কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইবে। মাননীয় ফজলভয় করিমভয় সভাপতির কার্য্য করিবেন।

বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে এক্ষণে নবীন উদ্যম প্রকাশ করিতে হইবে; আমরা আশা করি বাণিজ্য কংগ্রেস সেই আশার সঙ্গীতেরই সূত্রপাত করিবেন। ভারতবর্ষ বাণিজ্যগৌরবে বঞ্চিত হইয়া প্রত্যেক বৎসর কোটি কোটি টাকা বিদেশীকে প্রদান করিয়া নিরন্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। এই ক্ষয় রোগের প্রতীকার না হইলে দেশ কিছুতেই জাগিতে পারে না। আমরা এই নূতন কংগ্রেসের সাফল্য সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেছি।

ভারতীয় শিল্প সমিতি—

আগামী ২৪এ ও ২৫এ ডিসেম্বর বোম্বাই নগরে জাতীয় মহাসমিতির মণ্ডপে ভারতীয় শিল্প সমিতির নবম অধিবেশন হইবে। সার দোরাবজী, জে, তাতা সভাপতির কার্য্য করিবেন। ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক যাবতীয় তত্ত্ব এই সভায় আলোচিত হইবে। এই সভাক্ষেত্রে শিল্প ও বাণিজ্যানুরাগী জননায়কগণ মিলিত হইবেন।

বাঙ্গালী শিল্পে ও বাণিজ্যে সকল প্রদেশের পশ্চাতে রহিয়াছেন, বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবকগণ একমাত্র চাকুরীই সম্বল করিয়াছেন; আশাকরি তাঁহারা এই সভায় যোগদান করিয়া আপনাদের বুদ্ধি শিল্প ও বাণিজ্যের দিকে প্রদান করিবার সুযোগ পাইবেন।

রেশম শিল্প—

এদেশের রেশম শিল্প দিন দিন নিতান্ত হীন হইয়া পড়িতেছে। ইহার প্রতিবিধান কল্পে ভারতসচিব মিঃ এইচ্ মাক্সওয়েল লেফরয় সাহেবকে অস্থায়িভাবে রেশম সম্বন্ধীয় গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে বিহার-পুষা ইম্পিরিয়েল কৃষি কলেজে কীটতত্ত্বের অধ্যাপনা করিতেন; সুতরাং ভারতীয় রেশমকীট সম্বন্ধে ইহাঁর কতকটা অভিজ্ঞতা আছে। আশাকরি লেফরয় সাহেবের গবেষণা ফলে সকল সত্য উদ্ঘাটিত হইবে।

বিলাস দ্রব্যের আমদানি কম—

১৯১৪-১৫ সালে তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের মোটর গাড়ীর আমদানি কম হইয়াছে। ১৯১৩-১৪ সালে ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকার রেসমী দ্রব্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, গত বৎসর ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি হইয়াছিল। স্যাম্পেইন মদ ৯ লক্ষের স্থলে ৫ লক্ষ টাকার আসিয়াছে। কেবল স্যাম্পেইন নয়, সর্ব্বপ্রকার বিলাতী মদের আমদানিই হ্রাস হইয়াছে। চুরুট, সিগারেট, বার্ডস্‌আই প্রভৃতির আমদানিও কমিয়াছে।

ইংলণ্ডের অবাধ বাণিজ্য—

বিদেশাগত দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করিবার জন্য শুল্ক স্থাপন করা ইংলণ্ডের নীতি নয়। ইংলণ্ড ক্ষুদ্র দেশ, নানাপ্রকার আহার্য্য দ্রব্যের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। সেই সকল দ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপন করিলে, গবর্ণমেণ্ট লাভবান হইতে পারেন বটে কিন্তু দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়া অপরিহার্য্য হইয়া উঠে সুতরাং জনসাধারণ বেশী মূল্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিতে বাধ্য হয় এবং বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। জন-সাধারণের এই ক্ষতি নিবারণের জন্যই ইংলণ্ড অবাধ বাণিজ্য-নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রক্ষণশীল রাজনীতিবিদগণ সেই নীতি রহিত করিয়া বিদেশাগত দ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপন পূর্ব্বক স্বদেশের শিল্প দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য মহা উদ্যম করিতেছেন। নূতন ভারতসচিব মিঃ চেম্বারলেন, সেই দলের একজন প্রধান নায়ক।

সম্প্রতি ইংলণ্ডের কতিপয় প্রসিদ্ধ লোক প্রধান মন্ত্রী মিঃ আসকিথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমদানী দ্রব্যের উপর মাসুল বসাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ লোকদের মধ্যে মিঃ হেরল্ড কক্স, সার কেলিন্স স্নুষ্টার প্রভৃতি অবাধ বাণিজ্যনীতির পরিপোষকদের নাম দৃষ্ট হইল। ইহারা মনে করিতেছেন, বিদেশাগত দ্রব্যের উপর

মাসুল বসাইলে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইবে সুতরাং লোকে মহার্ঘ দ্রব্য ক্রয় করিবে না, লোকের ঘরে টাকা জমিবে। এতদ্দ্বারা লোকে মিতব্যয়ী হইবে। বিলাস দ্রব্যের উপর মাসুল বসাইয়া লোককে মিতব্যয়ী করা খুব ভাল। কিন্তু ইংলণ্ড বিলাস দ্রব্য অপেক্ষা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যই অত্যধিক পরিমাণ আমদানি করিয়া থাকেন। জর্ম্মণী বা অষ্ট্রীয়া হইতে যত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ইংলণ্ডে আমদানি হয়, ভারতবর্ষ হইতে তদপেক্ষা অনেক অধিক দ্রব্য আমদানি হইয়া থাকে। ভারতের পাট, গম, চাউল, চর্ম্ম, চা, তুলা, তিসি প্রভৃতির উপর যদি আমদানি মাসুল বসান হয়, তবে তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইবে। ইংলণ্ডের লোকে কি বেশী মূল্যে উহা ক্রয় করিতে সম্মত হইবে। জনসাধারণ কি অসন্তুষ্ট হইবে না? জনসাধারণের অসন্তোষভাজন হইয়া ইংলণ্ডের কোন গবর্ণমেণ্ট কি দুই দিন তিষ্ঠিতে পারিবেন? যদি ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় আমদানি দ্রব্যের উপর মাসুল স্থাপন করেন, তবে ভারত গবর্ণমেণ্টেরও ইংলণ্ড হইতে আমদানি দ্রব্যের উপর মাসুল স্থাপন করা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হইবে। ইংলণ্ড কি তাহাতে সম্মত হইবেন?

ইংলণ্ডের বহু লোক বিদেশী দ্রব্যের উপর মাসুল বসাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। ইহাতে জর্ম্মণী বা অষ্ট্রীয়ার কোন ক্ষতি হইবে না। কেননা এখন জর্ম্মণী বা অষ্ট্রীয়া হইতে কোন দ্রব্য ইংলণ্ডে রপ্তানি হইতেছে না। ভারতবর্ষ হইতেই অধিকাংশ কাঁচা মাল ইংলণ্ডে যাইতেছে। ভারতবর্ষের দ্রব্যের উপর কি মাসুল বসান উচিত? "সঞ্জিবনী"

ভারতীয় শিল্পরাজির পুনর্জ্জাগরণ—

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু কিছুদিন পূর্ব্বে রামমোহন লাইব্রেরিতে তাঁহার সম্বর্দ্ধণা সমিতির অধিবেশনে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রনিধান করা কর্ত্তব্য। তাঁহার কথাগুলি জীবন্ত এবং সেগুলি ক্রমশঃই জাগ্রত সত্য বলিয়া প্রতিয়মান হইতেছে। তাঁহার উক্তি এই—

আমাদের দেশের শিল্পরাজির সমুল ধ্বংস যে আসন্ন, তাহা বোধগম্য করিতে আমাদের দেশে কি কেবলই বিলম্ব করিবেন? আমাদের দেশ কি বুঝিবেন না যে নিঃসহায় নির্ব্বিকার ভাব দেখিলেই বাহির হইতে আরো আক্রমণ আসে? চীনে সংপ্রতি যে সব ঘটনা হইয়া গিয়াছে তাহা হইতে কি আমরা কিছু শিখিব না? অতএব সময় যেন আর নষ্ট না হয়, গবর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণ আমাদের নিজ শিল্পরাজির পুনর্জ্জাগরণের জন্য বিপুল প্রয়াস করুন। এ পর্য্যন্ত যে সমুদয় চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই।

ভারতীয় সদস্যদের লইয়া গবর্ণমেণ্টের একটি পরামর্শ-সমিতি গঠন করা উচিত। শিল্পবৃত্তি ভুক্‌নির্ব্বাচনের নিয়মাবলীর কিছু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। এদেশে শিল্পাদির

অবস্থা ও তাহাদের ব্যাঘাতাদি, বিদেশে যাইবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে ভাল করিয়া জানিতে হইবে। কোনও একটা কারবারের জন্য তিন জন বৃত্তিভুক হইতেন, দুই জন শিল্পের আর এক জন বাণিজ্যের তত্ত্ব শিখিবেন। বৈদেশিক জ্ঞানকে ভারতবর্ষের উপযোগী করিয়া লওয়া কঠিন কার্য্য। আমাদের ভবিষ্যৎ তত্ত্বানুসন্ধানাগারে যে সব একনিষ্ঠ সাধকেরা শ্রম করিবেন, তাঁহারা এই মুস্কিল উত্তীর্ণ হইবার পথ আবিষ্কার করিবেন। (১) কাঁচা মালের সরবরাহ, (২) বিশেষজ্ঞের উপদেশ ও (৩) নব শিল্প প্রতিষ্ঠা দ্বারাও গবর্ণমেণ্ট বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন। আমি জানি গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগী। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের লক্ষ্য এক।

একই বিপদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে সংগ্রাম করিবার ফলে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও প্রেমের সঞ্চার হইবে এবং সম্ভবত, জগতের উপর এই যে মহাভীষণ এক করাল বিপদের ছায়া পড়িয়াছে ইহার মধ্য দিয়াও ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের মধ্যে স্বার্থের একটা সাম্য এবং একটা ঘনসন্নিবিষ্টতার বোধ উদ্রিক্ত হইতে পারে।

মহত্তর স্বদেশহিতৈষণার প্রয়োজন।

ভারতের এক মহা বিপদ্ উপস্থিত, এবং ইহার নিরাকরণের জন্য জনসাধারণের বিপুল চেষ্টার প্রয়োজন। কেবল যে একধা আর্থিক সঙ্কটেরই সম্মুখীন হইতে হইবে তাহা নহে, পরন্তু আর্য্য সভ্যতার প্রাচীন আদর্শমালার মধ্যে যে ধ্বংসলীলা চলিয়াছে, ঐ সমুদয়কে রক্ষা করিতে হইবে। যান্ত্রিক যোগ্যতাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া ধরিয়া লইবার বিপদ আছে; তেমনি আবার গলগ্রাহী নিশ্চেষ্ট স্বপ্নময় জীবনেরও বিপদ আছে। কেবলমাত্র দেশহিতৈষণার মহত্তর আহ্বানে আমাদের জাতি, চিন্তায় এবং কর্ম্মে তাহার উচ্চতম কাম্যবস্তুগুলি লাভ করিতে পারে, সেই আহ্বানে আমাদের জাতি চিরদিনই উত্তর দান করিবে।

ইষ্টবোর্ণে কিছুদিন গোখলের সঙ্গে ছিলাম। জানিতাম সেই শেষ দেখা। যাইবার সময় গোখলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভবিষ্য অবতার সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কিছু বলিবার আছে কি না। তিনি বলিলেন তাঁহার নিজের সম্বন্ধে তাঁহার স্থির বিশ্বাস যে যেই-মাত্র তিনি তাঁহার জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিবেন, সেইমাত্র আর একবার তিনি তাঁহার প্রেমের দেশে জন্মলাভ কমিবেন এবং তাঁহার সেবার যে মহৎ ভার তাঁহার উপর পড়িবে তাহা স্কন্ধে লইবেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলের মত ভক্ত সন্তান যে দেশে আছে সে দেশের মুক্তি হইবেই এবিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকিতে পারে না।

সঞ্জীবনী বলিতেছেন,—জগদীশচন্দ্রের জীবনময় বাণী অনিলের সহিত মিশিয়া যাইবে না ভারতবাসীর প্রাণে নবশক্তির সঞ্চার করিবে? তাঁহার এই বাণী সাধনের প্রয়োজন হইয়াছে। কে তাঁহার বাণী জীবনে আয়ত্ত করিবেন, তিনি সাড়া দিন। ভারতে নব যুগের আরম্ভ হউক।

খৈল সার—

যুক্ত-প্রদেশের গবর্মেণ্ট কৃষকদিগকে খইলের সারের উপকারিতা ও উপযোগিতা হাতেকলমে বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইজন্য কিছু টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। এই টাকায় খইল কিনিয়া সুলভে চাষাদিগকে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইবে। —আখের চাষে খইলের সার অত্যন্ত উপকারী। কৃষকেরা খইলের সার ব্যবহার করিলে যুক্ত-প্রদেশে উৎকৃষ্ট জাতির আখের চাষ প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে।—যুক্ত-প্রদেশের গবর্মেণ্টের এই চেষ্টা সমীচীন ও প্রশংসনীয়।—সকল প্রদেশের কৃষিবিভাগে এই নীতি অনুসৃত হউক।

থাইমল প্রস্তুত—

যুক্ত-প্রদেশের কৃষি-বিভাগ পচন-নিবারক "থাইমল" নামক ঔষধ প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকায় প্রচার করিয়াছেন।—যোয়ান হইতে 'থাইমল' প্রস্তুত হয়। যোয়ান ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জর্ম্মণী ভারতের যোয়ান লইয়া গিয়া 'থাইমল' প্রস্তুত করিত। যুক্ত-প্রদেশের কৃষি-বিভাগ বলেন, ভারতে সুলভে 'থাইমল' প্রস্তুত হইতে পারে—কলিকাতার বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্কস" তাহা হাতে-কলমে বহুপূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহাদের 'থাইমল' এদেশে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে, এবং ব্যবহৃত হইতেছে।—দেরাদূনে থাইমল প্রস্তুত করিবার জন্য অল্প মূলধনে একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যুক্ত-প্রদেশের কৃষি-বিভাগের রসায়ন-শালায় উৎকৃষ্ট 'থাইমল' উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা যে পদ্ধতিতে যোয়ান হইতে 'থাইমল' প্রস্তুত করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্বোক্ত পুস্তিকায় বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে।—আশা করি এই লাভজনক ব্যবসায় আমাদের হস্তচ্যুত হইবে না। ভারত-বাসী যুবকেরা এই শুভ অবসর ত্যাগ করিবেন না।

বাণিজ্য ব্যাপারে জাপান—

সকলেই অবগত আছেন যে পাশ্চাত্য জাতিনিচয়ের প্রতিযোগিতা-সত্ত্বেও কয়েক বৎসর হইতে জাপান এ দেশে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াস পাইতে ছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে জার্ম্মান ও অষ্ট্রিয়ার দুর্দ্দশা দর্শনে জাপান তাঁহাদিগের স্থান অধিকার করিবার জন্য এই অল্প দিনে কিরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা দেখুন। আমরা কেবল বঙ্গদেশের কথাই বলিতেছি। ১৯১৪ সালে আগষ্ট মাসের প্রথম হইতে সমর ঘোষিত হইয়াছে। ঐ আগষ্ট

মাস হইতে গত মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত জাপান হইতে কলিকাতার বন্দরে ১৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮৩১ টাকা মূল্যের দিয়াশলাই আমদানি হইয়াছে ; পূর্ব্ব বৎসরে ঐ কয় মাসে ৯ লক্ষ ৫৪ হাজার ১৯৮ টাকার দিয়াশলাই আসিয়াছিল। গত আগষ্ট হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ৫১ হাজার ৯৯৭ টাকা মূল্যের বিয়ার নামক মদ্য জাপান, কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্ব বৎসরে ঐ কয় মাসে ১ হাজার ২৭ টাকা মূল্যের বিয়ার, জাপান হইতে আসিয়াছিল। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে মার্চ্চমাস পর্য্যন্ত জাপান হইতে চারিলক্ষ টাকার অধিক মূল্যের কাঁচের পুঁথি ও নকল মুক্তা প্রভৃতি কলিকাতায় আসিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে ঐ সময়ে ২ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকার দ্রব্য আসিয়াছিল। কাঁচের চুড়ি আলোচ্য আট মাসে ১ লক্ষ ১৬ হাজার ২৬২ টাকার আসিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব বৎসরে ১ হাজার ১০৬ টাকার চুড়ি আসিয়াছিল। মোটার গাড়ীর সরঞ্জাম অর্থাৎ চাকার রবার প্রভৃতি যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপান হইতে আদৌ আসিত না, যুদ্ধের পরে আট মাসে জাপান ১ লক্ষ ১১ হাজার ৭০২ টাকা মূল্যের ঐ শ্রেণীর দ্রব্য পাঠাইয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসরে আগষ্ট হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত জাপান হইতে ১৮ হাজার ২৮৮ টাকার সাবান আমদানি হইয়াছিল, এ বৎসর ঐ কয় মাসে ২৪ হাজার ৫৫ টাকার সাবান আসিয়াছে, সুতার দ্রব্য পূর্ব্ব বৎসরের ঐ কয় মাসে ৩ লক্ষ ৫৫২ টাকার আসিয়াছিল, এবার ১১ লক্ষ ১৭ হাজার ৪৬৪ টাকার দ্রব্য আসিয়াছে। এইরূপে কাষ্ঠের বাক্স ও অন্যান্য দ্রব্য, বিস্কুট, লোজাঞ্জেস প্রভৃতি দ্রব্য কাঁচের দ্রব্য অর্থাৎ শিশি, বোতল, চিমনি প্রভৃতি ছড়ি, চাবুক ও অন্যান্য বহুবিধ দ্রব্য এবারে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ দেশে অধিক পরিমাণে আমদানি হইয়াছে।

আচার্য্য শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বাবুর জাপান প্রবাস— তিনি জাপানে অবস্থান কালে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা তিনি বঙ্গবাসীকে জানাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে "জগদ্‌ভ্রমণকালে যতগুলি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে একটি হইতেছে আমার জাপানে অবস্থান। জাপানের জনগনের প্রচেষ্টা সমুদয় এবং একটি বিরাট ভবিষ্যতের প্রতি তাহাদের যে এক বৃহতী উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহা জানিবার আমার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাহারা যাহা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে তাহা দেখিয়া অশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারে এমন কেহ নাই। বর্ত্তমানের এই যান্ত্রিক যুগে পর্থিব সম্পদের যোগ্যতাই সভ্যতার এক চিহ্ন—এই যোগ্যতাতে ইহারা ইহাদের জর্ম্মণ গুরুদিগকে পর্যন্ত পশ্চাতে ফেলিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহাদের কোনো বিদেশযাত্রী জাহাজ বা কোন কারখানা ছিল না। কিন্তু অতি স্বল্প কালের মধ্যে ইহাদের জাহাজের বহর এমন ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে যে প্রশান্তসাগরে আমেরিকার ষ্টিমার চলাচল প্রায় বন্ধই হইয়া আসিল। গবর্ণমেণ্ট

প্রভৃতির সাহায্যে পাইয়া তাহাদের শিল্প বাণিজ্যগুলি এবম্প্রকার উন্নতি করিয়াছে যে বৈদেশিক বন্দর দখল করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু আরো অনেক বেশী প্রসংশার বিষয় এই যে যাহাদের সঙ্গে শান্তিতে থাকা দরকার তাহাদের সঙ্গে যাহাতে কোনরূপ গোলমাল না হয় তাহা করিবার দূরদৃষ্টি ইহাদের আছে। বিদেশের লোকে যদি তাহাদের দেশের শিল্প বাণিজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহা হইলে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, তাহা ইহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়া শুল্ক বসাইয়া বৈদেশিক দ্রব্যের আমদানী প্রায় বন্ধ করিয়াছে।”

বিজ্ঞানালোচনায় নবযুগ—

আচার্য্য শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বসুর অভিমত যে, জড়বিজ্ঞান ও শারীরসংস্থানবিদ্যার মধ্যবর্ত্তী সংযোগভূমিতে নবতত্ত্বানুসন্ধানে ভারতবর্ষ ইউরোপকে পশ্চাতে ফেলিয়াছেন, নব উদ্দীপনার জন্য ইউরোপকে ভারতবর্ষের কাছে আসিতে হইবে। ইহাও সম্যক্ স্বীকৃত হইয়াছে যে যেদিন পূর্ব্বদেশের সমন্বয়মূলক জ্ঞানান্বেষণ প্রণালী পাশ্চাত্য দেশের বিষম বিশ্লেষণমূলক প্রণালীর সঙ্গে যুক্ত হইবে, সেদিন বিজ্ঞানের বহুল উপকার সাধিত হইবে। তাঁহার বিজ্ঞানাগারে ভারতবর্ষের এই নব প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য নানা দিগ্‌দেশ হইতে ছাত্রেরা আমার নিকট আবেদন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের বিশেষ এই যে দান, ইহার অভাবে মানবীয় জ্ঞানের উন্নতি যে অসম্পূর্ণ থাকিবে ইহার স্বীকৃতি ভারতের ভবিষ্য কর্ম্মীদের পক্ষে এক মহা উদ্দীপনার মূল হইয়াছে। অসংলগ্ন এক স্তূপ তথ্য হইতে সত্যকে নিংড়াইয়া বাহির করিবার যে প্রখরা কল্পনাবৃত্তি এবং মনোবৃত্তি সমুদায়কে অপচয় করিতে না দিয়া বিরলে ধ্যান করিবার যে অভ্যাস, আমারই দেশের লোকেদের নিকট সেই অপূর্ব্ব সম্পৎ রহিয়াছে। তক্ষশীলা, নালন্দা ও কঞ্জিভেরামের সুপ্রাচীন বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহ সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রাণে এক প্রেরণা আসিয়াছে—তিনি বিশ্বাস করিয়াছেন ভারতবর্ষে সেই সমুদয় গৌরবের ত্বরায়ই পুনরুদ্দীপন হইবে। শীঘ্রই বিদ্যার এক মন্দির উত্তোলিত হইবে সেখানে সংসারের সমুদয় অশান্তি হইতে ছিন্ন হইয়া তাঁহারা গুরু সত্য-লাভের চিরন্তন তপস্যায় নিয়ত রহিবেন, এবং মৃত্যুকালে তাঁহার সাধন তাঁহার শিষ্যদের হস্তে অর্পণ করিয়া যাইবেন। কিছুই তাঁহার কাছে বিষম পরিশ্রম বলিয়া মনে হইবে না; কখনই তিনি তাঁহার লক্ষ্য হারাইবেন না, কোন পার্থিব প্রলোভনের দ্বারা কোনো দিন তিনি তাহাকে ছায়াসমাচ্ছন্ন হইতে দিবেন না। কেননা তাঁহার হইতেছে সন্ন্যাসীর ভাব, এবং ভারতবর্ষই সেই একমাত্র দেশ যেখানে বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকা দূরে থাক, বরঞ্চ জ্ঞানই ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দুর্দ্দৈবক্রমে অদ্য ইউরোপে বিজ্ঞানের যে প্রকার অপব্যবহার লক্ষিত

হইতেছে, এমনটি ভারতবর্ষে কোনো কালেই সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে যদি অন্তরীক্ষবিজয় সংঘটিত হইত, তবে মানবের মধ্যে দৈব শক্তির এবম্প্রকার একটি বিকাশের হেতু প্রতি মন্দিরে পূজা দেওয়াই ভারতবর্ষের প্রথম ইচ্ছা হইত।

মধ্যপ্রদেশের "কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী"—

মধ্যপ্রদেশের এই সোসাইটি সমূহের ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দের বিবরণে প্রকাশ,—সমবায়-ঋণদান সমিতিসমূহ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। গত বৎসর সমিতির সংখ্যা,—৪০,৪১৫ ও মূলধন পয়ষট্টি লক্ষ ছিল; আলোচ্য বৎসরে যথাক্রমে ২,২৯১; ৪৪,০৮৪০ ও সাড়ে বায়াত্তর লক্ষে উঠিয়াছে। ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বটে।

বাঙলায় যৌথ কারবার—

গত নভেম্বর মাসে বাঙ্গালায় ছয়টি জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মোট মূলধনের পরিমাণ—১,৫৭০০০ টাকা।—একটি ব্যাঙ্কিং, একটি ব্যবসায়, একটি পাটের কল, দুটি চা-বাগাম, একটি জমী ও বাড়ীর কারবার। আশা করি, এই সকল কেম্পানী চালাইবার জন্য উদ্যোগীরা অব্যবসায়ী ডিরেক্টার নিযুক্ত করিবেন না। তাহা হইলে যত 'নাড়াবুনে কাস্তে ভাঙ্গিয়া করতাল গড়াইবার' অবকাশ পাইবে না।

দেশী বড় বেগুন—

হুগলী জেলায় হাসনান নামে একটি গ্রাম আছে। ঐ স্থানে খুব বড় বড় বেগুন জন্মে। বেগুণগুলি ওজনে তিন পোয়া হইতে এক সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। উহার আস্বাদন বড়ই মধুর, উহার বীচিও বড়ই অল্প, এমন কি নাই বলিলেও চলে। এতদ্ব্যতীত উহার খোসা বড় পাতলা। বড় বেগুণ উৎপন্ন করিবার জন্য হাসনান হইতে উল্লিখিত বেগুণের বীজ আনাইয়া বপন করা হইয়াছিল, এবং পরীক্ষার জন্য কয়েক জনকে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কাহারও চেষ্টা সফল হয় নাই, যে বেগুণ জন্মিয়াছিল সে গুলি অধিক বড় এবং সেরূপ সুস্বাদু হয় নাই। স্থানীয় লোকের ধারণা এই, হাসনানের যে ক্ষেত্রে সেই বেগুণ জন্মে, সেই ক্ষেত্র ব্যতীত অপর জমিতে তত বড় বা তত সুমিষ্ট বেগুণ হয় না। কথাটি সত্য বলিয়া মনে হইতেছে।—ভারতীয় কৃষি সমিতি।

মাঠ কড়াই—

মাঠকড়াই বা চিনের বাদামের চাষ বাঙ্গালা দেশে অল্প পরিমাণে হয় বটে, কিন্তু মান্দ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলে ইহার চাষ প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। ঐ দুই অঞ্চলে দরিদ্র লোকেরা ইহা অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহার করে, এতদ্ব্যতীত প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র মণ চিনের বাদাম ইউরোপ এবং আমেরিকায় রপ্তানী হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর বোম্বাই হইতে লক্ষাধিক হন্দর এবং মাদ্রাজ হইতে কিঞ্চিদধিক কুড়ি সহস্র হন্দর পরিমাণ চিনা বাদাম বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য বন্দর দিয়া বহু পরিমাণে বিদেশে চালান হয়। তা ছাড়া দেশের লোকেও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে।

চিনের বাদাম আমাদিগের অনেক ব্যবহারে লাগে। ইহার পরিষ্কার তৈল জলপাই তৈল বা অলিভ অয়েল (olive oil) এর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। ইহার খইলে অধিক পরিমাণে যবক্ষারজান থাকায় জমির উর্ব্বরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি করে, এমন কি রেড়ীর খইল অপেক্ষা ইহার খইল অধিক কার্য্যকর। তবে রেড়ীর খইল অপেক্ষা ইহার দাম কিছু বেশী। কিন্তু হইলে কি হয়, রেড়ীর খইল অপেক্ষা ইহাতে কার্য্য এত অধিক হয় যে; কিছু মহার্ঘ হইলেও ইহার ব্যবহারে কৃষিকার্য্যে লাভ বই লোকসান নাই। হান্‌বার্গ, মার্শেলস প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে মাঠ কড়াই রপ্তানী হয়, আবার সেই সকল স্থান হইতেই তৈল বাহির করা হইলে, ইহার খইল এখানে বহুল পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। ইহার খইল যে কেবল জমির সারের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, গবাদি পশুরাও তাহা তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করে। যদি এদেশে ইহার অবাদ যথেষ্ট পরিমাণে হয়, তবে একটা লাভজনক কৃষির প্রচলন হইতে পারে। ভারতীয় কৃষি-সমিতি।

তাঁতের উন্নতি—

জেলা বোর্ডের রিপোর্টের উপর গবর্ণমেণ্ট যে মন্তব্য জারি করিয়াছেন, তাহা পাঠে জানা যায় যে,বঙ্গদেশে শিল্পশিক্ষার অবস্থা বড় আশাপ্রদ নহে। অনেক জেলায় ফ্লাই শটল (Fly shuttle) দ্বারা কাপড় বুনিবার চেষ্টা হইয়াছিল,কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই প্রায় নিষ্ফল হইয়াছে। কোন কোন স্থানের তাঁতিরা ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারে নাই। আবার কোন কোন স্থানে তাঁতিরা চির প্রচলিত প্রথানুসারে হাতের সাহায্যে তাঁতে বস্ত্র বয়নে অধিক সুবিধা বুঝিয়াছিল। এক স্থানে তাঁতিরা বলে তাহারা বড় গরীব, পয়সা না দিলে তাহারা কাজ শিখিতে অক্ষম। আর একস্থানে লোকে বৃত্তির লোভে শিক্ষা করিতে আসিয়াছিল। কেবল চট্টগ্রাম এবং মানভূম জেলায় কতকটা কৃতকার্য্যতা দেখা গিয়াছে। যে দেশের শিল্পীরা অনভিজ্ঞতাবশতঃ উন্নতোপায়ে শিল্পবিদ্যা শিক্ষার উপকারিতা বুঝে না, সে দেশের মধ্যে ক্রমে যাহাতে শিল্পীদিগের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার হয় এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত।

রমণীদিগের কৃষি-শিক্ষা—

বিলাতে রমণীদিগকে কৃষিশিক্ষা দিবার নিমিত্ত একটী বিদ্যালয় আছে। লেডি ওয়ারউইক নাম্নী একটী রমণী এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ বিদ্যালয়ে রমণীদিগকে সহজ উপায়ে চাষ এবং বাগান প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রীর নামানুসারে উহাকে লেডিওয়ারউইক কলেজ নামে অভিহিত করা হয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বিলাত বা অন্যান্য উপনিবেশ উচ্চ বেতনে উদ্যান রক্ষিকা এবং dairy বা দুগ্ধাগার প্রভৃতি স্থানের অধ্যক্ষতা করিতেছেন। কৃষিবিদ্যালয়ে এক একটী ছাত্রীর বৎসরে ৮০ হইতে ১২০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৮০০৲ টাকা পর্য্যন্ত খরচ হয়।

বাগানের মাসিক কার্য্য

——:*:——

মাঘ মাস

সব্জীক্ষেত্র।—বিলাতী সব্জী প্রায় শেষ হইতে চলিল। যে গুলি এখন ক্ষেত্রে আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন বিশেষ পাট নাই।

কপি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া সেই ক্ষেত্রে চৈতে বেগুন ও দেশী লঙ্কা লাগান উচিত।

ভুঁইয়ে শসা, করলা, ঝিঙ্গা, প্রভৃতি দেশী সব্জীর জন্য জমি তৈয়ারি করিয়া ক্রমশঃ তাহার আবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে বপন করা উচিত। ফাল্গুন মাসেও বপন করা চলে।

ফলের বাগান। —আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্যান্য ফল গাছের ফুল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। ফল গাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফল বেশী পরিমানে ধরিবে ও ফুল ঝরিয়া যাইবে না। আনারসের গাছের এই সময় গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। গোবর, ছাই ও পাঁক মাটি আনারসের পক্ষে প্রকৃষ্ট সার। আঙ্গুর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে, তবে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

ফলের বাগানের অনতিদূরে তৃন, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে আগুন দিয়া মুকুলিত বৃক্ষে ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে, ফলে পোকা লাগার সম্ভাবনা কম হয় এবং ফল ঝরা নিবারণ হয়। পশ্চিম অঞ্চলে আম বাগানে এই প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। গাছে অগ্নির উত্তাপ যেন না লাগে, কিন্তু ধোঁয়া অব্যাহতভাবে লাগিতে পায়, এরূপ বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ড রচনা করিবে।

বর্ষাকালে যে সকল স্থানে বড় বড় গাছ পুতিবে, সেই সকল স্থান প্রায় দুই হাত গভীর

করিয়া গর্ত্ত করিবে এবং সেই খোড়া মাটি গুলি কিছু দিন সেই গর্ত্তের ধারে ফেলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটি দ্বারা ও তাহার সঙ্গে কতক সার মাটি মিশাইয়া সেই গর্ত্ত ভরাট করিবে। উপরের মাটি নীচে এবং নীচের মাটি উপরে করিয়া, খোড়া মটি দ্বারা গর্ত্তভরাট করিবে।

পুরাতন ডালের কুল ও পিয়ারা ছোট হয় ও তাহাতে পোকা ধরে, সেই জন্য পুরাতন ডাল প্রতি বৎসর ছাঁটা উচিত।

কৃষিক্ষেত্র।—সম্বৎসরের চাষ এই মাসেই আরম্ভ হইয়া থাকে। এই মাসে জল হইলেই জমিতে চাষ দিবে। যে সকল জমিতে বর্ষাকালের ফসল করিবে, তাহাতে এই মাসে সার দিবে। আলু ও কপির জন্য পলিমাটি দিয়া জমি তৈয়ারি করিয়া রাখিবে। এই মাস হইতেই ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করে। মুলার অগ্রভাগ কাটিয়া মটিতে পুতিয়া দিলে তাহা হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরিবার আগে মুলার আগার দিকে চারি আঙ্গুলি রাখিয়া তাহার মধ্যে খোল করিবে এবং ঐ খোলে জল দিয়া নীচের দিকে মুখ রাখিয়া টাঙ্গাইবে। প্রতিদিন ঐ খোল পুরিয়া জল দিবে। ক্রমে উহার শীশ বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিবে। এই উপায়েও উত্তম বীজ উৎপন্ন হইবে এই মাসের প্রথম ১৫ দিনের পর, হলুদ ও আদা তুলিতে আরম্ভ করিবে। হলুদের ও আদার মুখী বীজের জন্য শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। হলুদ, গোবর মিশ্রিত জলে অল্প সিদ্ধ করিয়া শুকাইতে দিবে। হলুদ সিদ্ধ করিবার কলে একবার উৎলাইয়া উঠিলেই নামাইয়া ফেলিবে। আধ শুক্না হইলেই হলুদগুলি রোজ একবার দলিয়া দিবে। দলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়। চীনা বাদাম এই মাসে উঠাইবে।

ফুলের বাগান।—ফুলের বাগানের শোভা এখন অতুলনীয়। মরসুমী ফুল সব ফুটিয়াছে। গোলাপ এখন প্রচুর ফুটিয়াছে। গোলাপ ক্ষেতে এখন যেন জলের অভাব না হয়। গোলাপের কলম বাঁধা শেষ হইয়াছে। বেল, মল্লিকা, যুথিকা ইত্যাদি ডালের অগ্রভাগ ও পুরাতন ডালগুলি ছাঁটিয়া দিবে।

শীতপ্রধান পার্ব্বত্যপ্রদেশে এখন এষ্টার, হাটিজ, লর্কস্পর, পিঙ্কস্, ফ্লক্স, ডেজী, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমীর ফুলবীজ বপন করিতে হইবে এবং শীতকালের সজ্জী যথা,—গাজর, সালগম, লেটুস্, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মূলাবীজ প্রভৃতি এই সময় বপন করিতে হইবে।

এই মাসের শেষে বেল, যুঁই মল্লিকা প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছগুলির তদ্বির না করিয়া জলদি ফুল ফুটাইতে না পারিলে ফুলে পয়সা হইবে না। ব্যবহার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

কৃষক।

সূচীপত্র।

মাঘ ১৩২২ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৬শ খণ্ড। { মাঘ, ১৩২২ সাল। { ১০ম সংখ্যা।

খেজুরের চাষ

—:*:—

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার,

কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি সদস্য, উকীল (হাইকোর্ট, কলিকাতা) লিখিত।

ইহা একটী খুব লাভজনক চাষ। আমাদের দেশে খেঁজুরের চাষ পূর্ব্বে খুব হইত কিন্তু এখন তাহার তেমনি অধঃপতন হইয়াছে। খেঁজুরের চাষ সম্বন্ধে আমি বিশেষ আলোচনা পূর্ব্ব পূর্ব্বভাগ কৃষকে করিয়াছি। খর্জ্জুরাবাদের প্রবর্ত্তন জন্য আমাদের দেশের জমীদারদের বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পারস্য সাগরের উপকণ্ঠ প্রদেশসমূহে, মিশরে এবং উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত কালিফর্ণিয়া ও আরিজোনা প্রদেশে খুব ভাল জাতীয় খেঁজুরের চাষ হইয়া থাকে। আমাদের দেশের খেঁজুর তত ভাল নহে, এখানে খেঁজুরে আবাদ কেবল গুড় প্রস্তুতের জন্যই হইয়া থাকে। নদীয়া, খুলনা, যশোহর, ২৪ পরগণা সাতক্ষীরা, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় খেঁজুর গাছ বহুল পরিমাণে জন্মে; এতদঞ্চলে খেঁজুর গুড়ের কারখানা অল্প বিস্তর এখনও আছে। আজকাল জাভা, মারিসস্ হইতে ইক্ষু চিনির ও বিট চিনির আমদানি প্রভাবে এতদ্দেশীয় এই ব্যবসায়টি—যাহার দ্বারায় বহু সংখ্যক নিঃস্ব দরিদ্রের জীবনোপায়ের পথ উন্মুক্ত থাকিত তাহা—এককালীন বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। টিউনীস, মরক্কো হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভুভাগটী খেঁজুরের জন্মস্থান বলিয়া পরিচিত। মশকাট্, মদিনা, বিস্ক্রা, টিউনীসিয়া, আবিসীনিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া, প্রভৃতি দেশে খুব ভাল জাতীয় খেঁজুর উৎপন্ন হয়। দেগ্‌লেৎনুর, খুদ্‌রোবি, হালওয়াবি

প্রভৃতি উত্তম জাতীয় খেঁজুরের কথা আমি আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া কৃষক পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছি। আমাদের দেশে ফলের জন্য খেঁজুর চাষ দৃষ্ট হয় না। পাঞ্জাব, মুলতান, সিন্ধু প্রভৃতি দেশে পারস্য উপকূল হইতে আনীত চারার গাছ করিয়া ফল উৎপাদনের চেষ্টা ও পরীক্ষা গভর্ণমেণ্টের কৃষিক্ষেত্রসমূহে করা হইতেছে বটে কিন্তু এখনও তাহার সফলতার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মধ্যভারত এবং বিহার প্রদেশে বহু খেঁজুর গাছ আছে কিন্তু এইগুলি হইতে রস ও গুড় উৎপাদনের লোক অভাবে কোনরূপ আয় বা লাভ হয় না। ঐ সকল দেশের অজ্ঞ স্থানীয় শিউলীগণ তাহা হইতে মাদকবর্দ্ধক তাড়ী কাটিয়া গাছগুলিকে অচিরে হীনবল ও তেজহীন করিয়া অকালে মারিয়া ফেলে। অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ববুনো সাহেব আমাকে ও ডালটন গঞ্জ নিবাসী বাবু হরিদাস মুখোপাধ্যায়কে কতকগুলি মিশরী খেজুরের বীজ দিয়াছিলেন। আমার দুইটী গাছ হইয়াছে; কিন্তু গাছগুলি পুংজাতীয় এবং হরিদাস বাবুর গাছগুলি স্ত্রীজাতীয় এবং আমার গাছ গয়া জেলায় ও তাঁর গাছ পালামৌ জেলায় উৎপন্ন বলিয়া কাহারও গাছে ফল ধরে নাই। কালিফর্ণিয়ার আণ্টাদিনা নিবাসী অধ্যাপক পল্ পোপেনো খেঁজুর চাষ সম্বন্ধে একটি সুন্দর পুস্তক লিখিয়াছেন। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের বাঙ্গলার মত দেশে খেঁজুর গুড় প্রস্তুতের বৈজ্ঞানিক ও সহজ (practical) প্রণালী সম্বন্ধে কেহ কোন সংবাদপত্রে বা মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সাধারণের অবগতির জন্য লিখেন নাই। পাশ্চাত্যদেশে কোন ব্যবসা সম্বন্ধে কেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিক্ষাপ্রদ পুস্তক প্রচারিত হয়; আমাদের দেশে সে প্রথা আদৌ নাই। আমার মনে হয় যে এ বিষয়ে ছবি দিয়া ও তাপমান যন্ত্রের অনুপাত দিয়া কোন অভিজ্ঞ লোকের এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ কৃষক প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ করিলে দেশের লোকের অনেক উপকার হয়।

ফলের জন্য খেঁজুর চাষ আমাদের দেশে নূতন হইলেও তাহা প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। সরস বেলে অথবা দোঁয়াশ উভয়বিধ মাটিতেই খেঁজুর গাছ উৎপন্ন হইয়া থাকে। গাছ, ক্ষেত্রে বীজ বপন বা চারা রোপণ এই উভয়বিধ উপায়ে উৎপন্ন হয় তাহা আমি ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি। বর্ষার পূর্ব্বেই সার দিয়া বীচিগুলি রোপণ করিতে হয় এবং চারাগুলি একটু বড় হইলে সেইগুলিকে তীক্ষ্ণ রৌদ্রে বা গ্রীষ্মের কঠিন রৌদ্রে এবং শীতকালে তীব্র তুষার (frost) হইতে রক্ষা করিবার আবশ্যক হয়। জমী বেশ সরস হওয়া চাই। লোণা জমীতে (alkaline) ইহার আবাদ করিবার চেষ্টা অবিধেয়। আগে মাটী বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়া তবে কোন্ জাতীয় গাছ রোপণ করিতে হইবে তাহা ঠিক করিয়া লইবে, নচেৎ নৈরাশ্য অবশ্যম্ভাবী। আমাদের দেশে সরকার বাহাদুর পাঞ্জাবে পারস্য দেশীয় খেঁজুর চাষের অনুকরণে চাষ পরীক্ষা করিয়া কতকাংশ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ডাঃ ডি মিলন্ এ বিষয়ে প্রধান প্রবর্ত্তক ছিলেন। তাঁহার গবেষণাপূর্ণ ১৯১২ সালের

প্রবন্ধ পাঠ করিলে এ বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। চারা দ্বারা গাছ করিলে অর্থাৎ খেঁজুর গাঁছের তেউড় হইতে গাছ উৎপাদন করিলে তাহাতে খুব ভাল ফল হইয়া থাকে। বীজের গাছের ফলে ভাল শাঁস হয় না; আঁটি বা বীজ বড় হয়। বোগদাদ সহরের নিকটবর্ত্তী খাতীম পাশার বিস্তৃত খেঁজুর বাগানের চিত্র আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। টিউনীসিয়া, ওমান, মিসরের মরুভূমির স্থানে এবং গিজের নিকটবর্ত্তী স্থানেও বড় খেঁজুর বাগান আছে।

কোন কোন খেঁজুর শীঘ্র পাকে, কোন জাতীয় বা খুব বিলম্বে পাকে; আবার কোন জাতীয় খেঁজুর ফলনে খুব বেশী হয়; বড় বড় কাঁদি নামে এবং কোন কোন জাতীয় কম ফলে। কোন জাতি এক বা দুই বৎসর অন্তর ফলে।

গুড়ের জন্য বা খেঁজুরের জন্য এখানে খেঁজুর চাষ হয় ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা। খেঁজুর গুড়ের ব্যবসাটি নষ্ট হইতে চলিয়াছে দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হয়; যখন খুলনা, যশোরাদি অঞ্চলে গুড় খুব বেশী পরিমাণে হইত ঐ সকল স্থান তখন কেমন হাস্যমুখী ছিল এবং কত সহস্র সহস্র দীন বঙ্গবাসীর জীবনোপায়ের পথ উন্মুক্ত ছিল তাহা মনে করিলেই স্বতই মন উৎফুল্লিত হয়। আম কাঁঠালাদি ফলের গাছের মত খেঁজুর গাছের গোড়ায় সার দিবার ব্যবস্থা বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। গাছের ফল বা রসের সহিত গাছের খাদ্যস্থিত যে উপাদানটি আমরা টানিয়া লই এবং তাহা উদ্ভিদ-জীবন রক্ষণ ও পোষণ জন্য যে পূরণ করিতে হয় তাহা অনেকেই স্মরণ রাখেন না। আমেরিকায় খেঁজুর উৎপাদকগণ গাছের গোড়ায় বৈজ্ঞানিক সার প্রয়োগ করেন কিন্তু নিঃস্ব ভারতীয় কৃষক মূল্যাধিক রাসায়নিক সার কোথায় পাইবে? তাহার পরিবর্ত্তে সহজ প্রাপ্য পচা গোবর মাটী বা গোশালা বা অশ্ব শালার আবর্জ্জনা পচা সার দিলেই যথেষ্ঠ বলিয়া আমার মনে হয়। বৎসর বৎসর গাছগুলির শুষ্ক পাতা বা ছাল বা বালদো পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। ইহাতে গাছে পোকা লাগার আশঙ্কা কম হয়। গাছগুলি পূর্ণ যৌবনাবস্থায় উপনীত হইলে চাঁপ বা মোচ্ ফেলিতে থাকে। এই মোচগুলির মধ্যে কোনটি পুং এবং কোনটি স্ত্রী। পুং মোচগুলি ঈষৎ গোল, ঠাস এবং ক্ষুদ্র আকারের হয়; মোচ পুষ্ট হইলে লালাভ (brown) বর্ণের হইয়া থাকে এবং তাহার আবরণ ফাটিয়া গিয়া পুষ্প বাহির হয়। এই পুষ্পগুলি খুব ঠাস্ বাঁধুনিতে রক্ষিত থাকে এবং ফুলগুলি ফুটিলে তাহা হইতে পরাগ ঝরিতে থাকে। এই পরাগ শ্বেতবর্ণের হয় এবং আমাদের দেশে শীতের সময় খেঁজুর গাছের পাতার গোড়ায় মোচ্ হইতে পরাগ ঝরিতে দেখা যায়। পুং মোচের পরাগ কীট পতঙ্গাদি এবং বায়ুর সাহায্যে স্ত্রী পুষ্পে নীত হইয়া ফল সঞ্চারের কার্য্য করে। ইহাই খেঁজুর গাছের "গর্ভাধান" (pollination)। কৃত্রিম উপায়েও স্ত্রীগাছের গর্ভাধান করাও হইয়া থাকে। এখন বুঝা দরকার স্ত্রী মোচগুলি কিরূপ? স্ত্রী মোচগুলি কিছু বড় ও দীর্ঘাকৃতি এবং আবরণের অভ্যন্তরস্থ

পুষ্পগুলি ফাঁক ফাঁক এবং ডালগুলিও ফাঁক ফাঁক সন্নিবিষ্ট। ফাটা স্ত্রী মোচের অভ্যন্তরস্থ ফুলগুলির মধ্যে প্রস্ফুটিত পুং পুষ্পের পরাগ কৃত্রিম উপায়ে শুষ্ক দিনে রৌদ্রের সময় নিষেক করিলেই কৃত্রিম "গর্ভাধান" হইল। পারস্য সাগরের উপকূল দেশসমূহে খেঁজুর চাষীগণ এই কৃত্রিম প্রণালীতে গাছে ফল উৎপাদন করে।

সুপক্ক খেজুর খাইতে অতি সুমিষ্ট ও সুস্বাদু। শুষ্ক পক্ক খেজুরও খাওয়া যায়। শুষ্ক খেজুরকে আমাদের দেশে ছোয়াড়া বলে। খেজুর আরব প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদের একটি প্রধান খাদ্য সামগ্রা। তথায় খেজুরের পুডিং, চাট্‌নি বা অম্বল, আচার ইত্যাদি বেশ উপাদেয় মুখরোচক খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের খেঁজুর ফলে কোন কাজই হয় না, স্থানে স্থানে গবাদি পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় এবং পল্লিগ্রামে শৃগাল কুক্কুরের উদর পূরণে লাগিয়া থাকে।

খেঁজুর চাষে সাফল্য লাভ করিতে হইলে গাছে নিয়মিত সেঁচ দিতে হয়, সার দিতে হয়। শীতের প্রথমে গাছের গোড়ায় সার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। গাছগুলিকে সারবন্দী করিয়া বসাইলে ভাল হয়। এমন ফাঁক ফাঁক বসাইবে যেন বাতাস রৌদ্র গতায়াত করিতে পারে; সেইজন্য গাছগুলিকে অন্ততঃ ১৫ ফিট ব্যবধানে বসাইবে অর্থাৎ একার প্রতি ২৫০টা গাছ বসাইবে। এক একার আমাদের দেশী মাপে প্রায় ৩৷০ বিঘার কিছু বেশী পরিমাণ হয়।

অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে যে একটি সাধারণ লোকের জীবন ধারণের জন্য ৩০০০ ক্যালোরী পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়। এক পাউণ্ড খেঁজুরে ১২৭৫ ক্যালোরী পরিমাণ তাপ সঞ্জাত হইয়া থাকে। অতএব খেঁজুর যে আমাদের জীবন ধারণের একটি প্রধান সামগ্রী তাহা বেশ বুঝা গেল। দুই বা তিন পাউণ্ড খেঁজুর খাইলেই একটি কর্ম্মিষ্ঠ সাধারণ মনুষ্যের জীবন ধারোণোপযোগী উপাদান তাহা হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। খেঁজুরে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি আছে,—পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ দ্বারা ইহা নির্ণিত হইয়াছে।

শ্বেতসার ও শর্করা	৭০·৬
প্রোটীড	১·৯
তৈল	২·৫
জল	১৩·৮
ভস্ম বা লবণ	১·২
সূত্র	১০·০
	১০০·০

এই জন্য আরব, পারস্য এবং পূর্ব্ব ও উত্তর আফ্রিকাবাসীগণ খেজুর খাইয়াই অনেক

সময় জীবন ধারণ করে। খেজুর অনেক জাতীয় হয়; তাহাদের কতকগুলির নাম আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি কিন্তু নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—আমিরী (সাহারা দেশীয়), আমহাট (মিশরী), আমীর হাজ (বাগদাদের নিকট মণ্ডলী নামক স্থানে পাওয়া যায়; ইহা বগদাদের তিন দিনের পূর্ব্ববর্ত্তী স্থান), আমিরী, মিশরী, এই জাতীয় বিলাতে বড় বেশী রপ্তানী হয়, আঞ্জাসী (বগদাদী), আস্‌রাসী (মেসোপোটামিয়া) আওয়াহদি (বাস্‌রা), বদিঙ্গানী (বগদাদী), বস্রাহি (বগদাদী), বস্রাশীন্ (মিশরী), বসজানি (আবরী), বরবনী (বগদাদী), বহি (বস্‌রা), বার্ত্তামুদা (সুদানী), এই জাতীয় খেজুর খুব কোমল হয় এবং খুব বেশী পরিমাণে জন্মায়। ডুবেনী (বগদাদী) আরবী চাওমানী প্রভৃতি খেজুর পূর্ব্ব আরব উপকূল হইতে ৬০ মাইলের মধ্যে প্রচুর জন্মায় এবং সামাইল উপত্যকায় প্রসিদ্ধ খেজুর বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। ফর্শি (বস্‌রা), ঘড় (উত্তর আফ্রিকা, ইহাই আমাদের দেশে ঘড়ার খেজুর বলিয়া বাজারে বিক্রীত হয়; এই দুই জাতীয় খেজুর বেলে মাটীতে ভাল জন্মে), হেলালী খেজুর পারস্যোপসাগরোপকুলে জন্মে। ভবিষ্যতে আরও দুই এক জাতীয় উৎকৃষ্ট খেজুরের পরিচয় দিব।

ক্রমশঃ

গৃহ-শিল্পের শুভ সুযোগ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী লিখিত।

আমরা চারিদিকেই নিত্য প্রয়োজনীয় গৃহ শিল্প হারাইয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া কেবল চাকরীরমোহে ও অন্নের জ্বালায় জুতা লাথি খাইয়া হাহাকার করিয়া কালের করাল কবলে পতিত হইতেছি। তবুও নিজের পথে চলিতে চাহিতেছি না। পূর্ব্ব পন্থা সবই ভুলিয়াছি। একটু চিন্তা ও অনুসন্ধান এবং ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক চেষ্টা করিলে, পূর্ব্ব শিল্প অধিকাংশই প্রত্যেক গৃহস্থই প্রস্তুত করিতে পারেন। কিন্তু অন্তরায়ের মধ্যে কেবল সুশিক্ষা, বাবুগিরি, এবং আলস্যই আমাদিগের গৃহলক্ষ্মীদিগকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এখন যত লোককে সভা করিয়া বক্তৃতা ও খবরের কাগজে লিখিয়া চক্ষু ফুটাইয়া দিতে হয়; সেকালে, এ সকল ঝঞ্ঝাট কিছুই করিতে হইত না। কিন্তু আশ্চর্য্যের ও দুঃখের বিষয়

এই যে, এখন ভারতের বাহিরের যাবতীয় সভ্য জাতি নিজ নিজ সমাজের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে সুচতুর লোক এদেশে পাঠাইয়া অলক্ষিত ভাবে এদেশের হাট বাজারের আমদানি রপ্তানি, লোকের রুচি, বিজ্ঞান বুদ্ধি, চাল চলন, বিলাসীতার মাত্রা, জল বায়ুর গতিক, রাস্তা ঘাটের অবস্থা, উদ্ভিদ, কৃষি ও খণিজ পদার্থের অনুসন্ধান এবং পরিমাণ, বেশ বুঝিয়া যাইয়া নিজ নিজ দেশের নৌ ও বাণিজ্য বিভাগের কর্ত্তাদের নিকট রিপোর্ট করায় স্বাধীন দেশের কর্ত্তারা তদনুসারে ইংরেজের অবাধ বাণিজ্য নীতি বলে এদেশস্থ অতি তুচ্ছ জিনিষের সামান্য কিছু মূল্য দিয়া যাবতীয় কাঁচা মাল খরিদ করিয়া জাহাজ বোঝাই করিয়া, সামুদ্রিক শুল্ক প্রদানপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়। আবার তাহা হইতেই সূক্ষ্ম শিল্প প্রস্তুত পূর্ব্বক ভারতের বাজরে পাঠাইয়া বিমোহিত ভারতবাসীকে নেশায় ভুলাইয়া তাদ্রের পয়সাটি পর্য্যন্ত হস্তগত করিয়া সকল জাতিই কোটী পতি হইতেছে ও হইয়াছে; আর আমরাই অধম জাতি ক্ষুধায় ও দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে মরিতেছি। সেইজন্য প্রত্যেক গৃহলক্ষী ও গৃহস্বামীকে করযোড়ে মিনতি করিতেছি যে আমাদের রাজা এক্ষণে সর্ব্বগ্রাসী জর্ম্মণিকে বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়াছেন; এই মহেন্দ্র ক্ষণে আবার যদি আমরা নিজ নিজ নিত্য প্রয়োজনীয় গৃহসজ্জা, গৃহশিল্প, ঔষধ এবং লজ্জানিবারণের জন্য বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে নিজেরাই মনোযোগ দেই, তাহা হইলে এই সুযোগে অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইতে পারি। প্রথমে দেখা যাউক যে কোন্ কোন্ জিনিষের প্রতি আমাদের সর্ব্ব প্রথমেই মনোযোগ দেওয়া উচিত। (১) চিত্র পট, (২) সূতা কাটা, বস্ত্র বয়ন (৩) শেলাই; (৪) কার্য্যকরী হিন্দু রসায়ন শিক্ষা, (৫) নিজহস্তে পাক প্রণালী, (৬) বাবুগিরির মাত্রা কমান; (৭) পরিশ্রমী হওয়া, (৮) ধর্ম্মতত্ত্বসংগ্রহ ও বিশ্বাস; (৯) ছাঁচের কাজ; (১০) কাষ্ঠের ও মাটীর নানাবিধ পুতুল প্রস্তুত; (১১) নানাবিধ গাছপালা হইতে পাকা রঙ প্রস্তুত প্রণালী; (১২) চিনি ও গুড় পরিষ্কার প্রণালী জানা; (১৩) মিঠাই প্রস্তুত শিক্ষা; (১৪) কলিত বিজ্ঞান শিক্ষা; (১৫) হস্ত পরিচালিত ছোট ছোট কল কব্জা প্রস্তুত; (১৬) মোরব্বা ও আচার প্রস্তুত; (১৭) ফুল ফলের বাগান প্রস্তুত; (১৮) চাউল, আটা ও ময়দার পালো প্রস্তুত; (১৯) সহজসাধ্য ঔষধ করণ ও গৃহ চিকিৎসা; (২০) সুদক্ষ গৃহস্থালী শিক্ষা (২০) বাঁশ ও বেতের কাজ; (২১) মোম্ ও কাগজের খেলানা; (২২) লোহার অস্ত্রাদির উৎকর্ষ; (২৩) পিতল কাঁশার ও এ্যালুমিনমের বাসন রক্ষা; (২৪) খাদ্য শস্যের গোলাজাত ও সংরক্ষণ; ইত্যাদি কতকগুলিন্ জিনিষের আপাততঃ, প্রত্যেক গৃহস্থ পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলে, নিশ্চয়ই আবার হাহাকার ঘুচিয়া শান্তির সুর ফিরিয়া আসিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস হয়। তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে দেশে বৈদেশিক আগমনের পর হইতে, দিন দিন লোকসংখ্যা বিস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায়, এই নীতি অবলম্বনে আর অভাব মিটিবার উপায় নাই। পূর্ব্বকার মানুষের

চাল চলন ও রুচির সঙ্গে আধুনিক লোকের চালচলন সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সুতরাং এখন প্রত্যেক শিল্পাদির জন্য, বড় বড় কল কারখানা না চালাইলে আর সে অভাব মিটে না। এ সম্বন্ধে রাজার আংশিক সাহায্য ও সম্পূর্ণ সহানুভূতি না থাকিলে কদাচ তাহা হইতে পারে না বটে, কিন্তু রাজ সাহায্য এক্ষণে আশা করা বাতুলতা, কারণ ভারত সম্রাটের বর্ত্তমান যে সঙ্কট সময় উপস্থিত, তাহাতে আমাদের সাধ্য থাকিলে, এসময়ে ভারতের মাটী দিয়া পর্য্যন্তও সাহায্য করা উচিত। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সহযোগীরা যাহাই বলুন, স্বয়ং ভারতেশ্বর আমাদের প্রতিপদে রাজ ভক্তির নিদর্শন মানিয়া লইতেছেন।

বর্ত্তমানে আমরা একেবারে যে ধ্বংশমুখে চলিয়া যাইতেছি, এখনও যদি একটু বুঝিয়া চলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যেক গৃহস্থ নিজ নিজ গৃহে এইভাবে প্রাণপণে শিল্প রক্ষা ও শস্য রক্ষা করিয়া বিলাসীতার মাত্রা কমাইয়া আনেন, তবে রাশি রাশি বিদেশী জিনিষের চড়া দামের হাত হইতে নিজ নিজ জীবন রক্ষা করিতে পারেন। জর্ম্মাণির অন্তর্দ্ধানে স্বদেশী জাপান আসিয়া বন্ধুর ন্যায় ভারতের বাজার বেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছে; তাহাতে ভারতবাসী বোধ হয় আরো ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে; কারণ জার্ম্মাণি অপেক্ষা জাপানের জিনিষ আরো খারাপ ও ঠুনকো; বিদেশী জিনিষ ভারতের বাজারে আমদানি না হইলে, এদেশের লোকের যে বিশেষ কোন ক্ষতি হইতে পারে; তাহা তো বোধ হয় না; বরং বিলাসীতার মাত্রা কমিয়া গেলে পূর্ব্বের ন্যায় দেশের লোকগণ চাষবাস করিয়া খাইয়া সুখেই থাকিতে পারে। আর সহরে থাকায় নেশা কমিয়া গিয়া বাবুরা নিজ নিজ পল্লীর উন্নতির কল্পে পল্লীগ্রামে বাস করিতে অভ্যাস করেন। মহানুভব লর্ড কর্জ্জন এই নীতি অবলম্বন করিয়া পল্লীবাসীর উন্নতির চেষ্টায় ছিলেন।

যাহাইহোক্ আমি কলিকাতার বাজারের বিদেশী মালের মোটামোটী একটা হিসাব বুঝিয়াছি; তাহাতে যাবতীয় কাঁচের ও কলাইকরা বাসন বিস্কুটাদি এবং পরিষ্কার চিনি ও বিলাতী ঔষধাদির দর গড়ে শতকরা দুই তিন গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। দেশের এমন দুর্দ্দিন অবস্থা দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, সেই জিনিষটী না হইলেও নয়, অথচ তাহার পরিবর্ত্তে কোন জিনিষ পাইবারও উপায় নাই। এমন অবস্থায় ভাণ্ডারে পূর্ব্ব হইতে যে কিছু আছে, তাহারই দাম ঐরূপ বাড়াইয়া দিতেছে। আর সহসা যদি দেশে কোন প্রকার তদনুরূপ জিনিষ তৈয়ারি না হয়; তবে একেবারেই তাহা ছাড়িয়া দিতে হইবে। অতএব ছোট ছোট দুই চারিটী জিনিষ পূর্ব্ব প্রথানুসারে তৈয়ারি করিতে শিখা উচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি সুতা কাটার কথা বলি—

সুতা কাটা;—কার্পাসের তুলাকে উত্তমরূপে পিঁজিয়া তাহার আঁশকে পাতলা করিয়া আলগাভাবে দুই অঙ্গুলি লম্বা ও এক অঙ্গুলি চওড়া করিয়া পলিতার ন্যায় করিতে হয়। সাঁওতাল রমণীরা এখনও এইভাবে নিজেরা সুতা কাটে ও দেশী তাঁতে সরু

মোটা কাপড় বুনে। এই কাপড় চেষ্টা করিলে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় অনেক পল্লীগ্রামে পাওয়া যায়। হস্ত চালিত তাঁতের (Hand loom) চলন্ উৎকৃষ্ট। স্বদেশীর সময় অনেকে ইহা শিক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেন ছাড়িলেন, তাহা কেবল দেশের দুর্ভাগ্যের কারণ। এখনও অনেক পল্লীগ্রামে অনেক বিধবা ব্রাহ্মণের মেয়েরা নিজের বাটীর (Tree Cotton) গাছ কাপাসের তুলা হইতে অতি সূক্ষ্ম পৈতা তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করেন। বিশুদ্ধ পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা হাতে কাটা সূতার পৈতাই ব্যবহার করেন। বিলাতী সূতার পৈতা স্পর্শও করেন না। বস্ত্র বয়নপোযোগী সূতা তাঁহারা প্রস্তুত করিতে পারিতেন, এখনও পারেন। দেশী তাঁতে দেশী সূতায় বোনা কাপড়ের গুণ অনেক। এইরূপ অনেক গৃহশিল্পের উল্লেখ করা যায়, সকলে চেষ্টা করিলে দেশের অভাব দেশ হইতে পুরণ হওয়া অসম্ভব নহে।

মৌমাছি পালন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইতিপূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় বিভিন্ন জাতীয় মৌমাছির উল্লেখ করিয়াছি। সকল জাতীয় মৌমাছি অবশ্য পালনের উপযুক্ত নয়। আদর্শ গৃহপালিত মৌমাছির কয়েকটি বিশেষ গুণ ও লক্ষণ থাকা আবশ্যক, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্যতম ; (১) শান্ত স্বভাব ; যে জাতীয় মৌমাছি সহজেই রাগিয়া উঠে ও কামড়ায় তাহাদিগকে লইয়া নাড়াচাড়া করা সোজা নয় ; (২) রাণীর পূর্ণ মাত্রায় সন্তানোৎপাদন শক্তি থাকা দরকার, তাহা না হইলে চাকের যাবতীয় কাজ ও মধু সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক মজুর পাওয়া যায় না ; (৩) মৌমাছিগুলি উত্তম মধু সংগ্রাহী হওয়া আবশ্যক ; (৪) তাহাদের শত্রুর আক্রমণ হইতে (বিশেষতঃ মৌমাছির) চাক রক্ষা করার ক্ষমতা ; (৫) ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িয়া যাওয়ার প্রবণতা যত কম হয় ততই ভাল। যে সকল জাতীয় মৌমাছি ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িয়া গিয়া অন্যত্র চাক নির্ম্মাণ করে তাহাদের দ্বারা কখনই অধিক পরিমাণে মধু সংগৃহীত হয় না। কারণ ঠিক যে সময়ে মধু সংগ্রহের কাল সেই সময়েই মৌমাছির ঝাঁক বাঁধে এবং এইরূপে আদি চাক ছাড়িয়া গেলে চাকে কর্ম্মী মক্ষির অভাবে যথেষ্ট মধু জমিতে পায় না।

এতদ্দেশে Apis indian জাতীয় মৌমাছিতেই এই সমুদয় গুণ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহারা আবৃত স্থানেই চাক প্রস্তুত করে, সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে, স্বাভাবিক চাকের অনুকরণে, চাক প্রস্তুত করিয়া দিলে ইহারা তাহাতে বাস করে। অন্যান্য জাতীয় দেশীয় মধুমক্ষিকা অনাবৃত স্থানে থাকিতে ভালবাসে; তজ্জন্য তাহাদিগকে কৃত্রিম চাকে বদ্ধ করিয়া রাখা অসম্ভব। Apis mellifica নামক ইতালীয় মধুমক্ষিকার পূর্ব্বোক্ত গুণাবলীর জন্য সর্ব্বত্র আদৃত হয়। য়ুরোপের সর্ব্বত্র, আমেরিকায় আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলণ্ড প্রভৃতি দেশে সেইজন্য ইতালীয় মধুমক্ষিকা পালন ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মৌমাছি পালন এতদ্দেশে এ পর্য্যন্ত অত্যন্ত অনুন্নত অবস্থায় রহিয়াছে। পাহাড়ী অথবা বন্য ২।৪টি জাতি ভিন্ন অন্য কেহই ইহাদের পালন অথবা প্রসারে অগ্রসর হয় না। খাসিয়া পর্ব্বতে এবং পূর্ব্ব হিমালয়ের অন্যত্র প্রায় ২ হাত লম্বা ও এক হাত প্রস্থ কাষ্ঠ খণ্ডের ভিতর ফাঁপা করিয়া এবং দুই পার্শ্বে দুইখানি সছিদ্র তক্তা লাগাইয়া দিয়া কৃত্রিম চাক প্রস্তুত হয়। এই সমুদয় চাক মাটির উপর গৃহের চালে ঝুলাইয়া রাখা হয়। গৃহের ভিতরে দেওয়ালের গায় গর্ত্ত করিয়া মৌমাছির বাসা করিয়া দেওয়ার প্রথাও পার্ব্বত্য অঞ্চলে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ভারতের অন্যান্য স্থানে মাটির হাঁড়ির কলসী উল্টাইয়া বৃক্ষ শাখায় কিম্বা মৃত্তিকার উপর রাখিয়া তাহাতেই মৌমাছি পালনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। যখন চাকে যথেষ্ট পরিমাণ মধু সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তখন ধোঁয়া দিয়া মৌমাছিগুলিকে তাড়াইয়া দিয়া চাকে কোন রূপে চাপ প্রদান করিয়া মধু বাহির করিয়া লওয়া হয়। অবশেষে চাকগুলিকে গালাইয়া ফেলিলে মোম পাওয়া যায়। পুনার সন্নিকট কেওয়া জাতি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাসে বন্য চাক সমূহ হইতে মধু সংগ্রহের জন্য চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারা যে মধু সংগ্রহ করে তাহা টাকায় ⁄২॥ হইতে ⁄৩॥ সের হিসাবে বিক্রয় হয়। কিন্তু ইহাতে মোম, পরাগরেণু, ও পিষ্ট মৌমাছির দেহাংশ ও রস প্রভৃতি থাকায় মধু অল্পদিনের মধ্যেই খারাপ হইয়া যায়। পার্ব্বত্য মধু অপেক্ষাকৃত ভাল এবং ইহার মূল্য সের প্রতি ১৲ হইতে ১।০; দার্জ্জিলিং জেলে মধু ২৲ টাকা সেরে বিক্রয় হয়। গ্রন্থকার অনুমান করেন যে কলিকাতার বাজারে বৎসরে ৭৩১ হইতে ৮৫৩ মণ পর্য্যন্ত মধু বিক্রয় হইয়া থাকে। আপাততঃ দেশ হইতে মধু আদৌ রপ্তানি হয় না বরং কিয়ৎ পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে।

এইরূপে পুরাতন প্রথার মধু উৎপাদনে যে বিশেষ কিছু লাভ আছে, তাহা বোধ হয় না। পক্ষান্তরে অভিনব বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৌমাছি পালনে স্থান বিশেষে লাভ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এইরূপ নূতন উপায়ে চাক করিতে হইলে নূতন ধরণের যন্ত্রপাতি ও কিয়ৎ পরিমাণ শিক্ষাও আবশ্যক। মিঃ ঘোষের পুস্তকে সরল ভাষায় ও

বহু চিত্র সহযোগে এই সমুদয় যন্ত্রাদি ও পালনের প্রথা ও কৌশলাদি বিষদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎসমুদয়ের সন্নিবেশ করা অসম্ভব, তবে মৌমাছি পালনের জন্য সাধারণ কেরোসিন বাক্সে যে চাক প্রতিপালন করিবার উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা অনেকের পক্ষে সহজ সাধ্য বলিয়া আমরা এস্থলে বর্ণনা করিলাম ও চিত্র দিলাম।
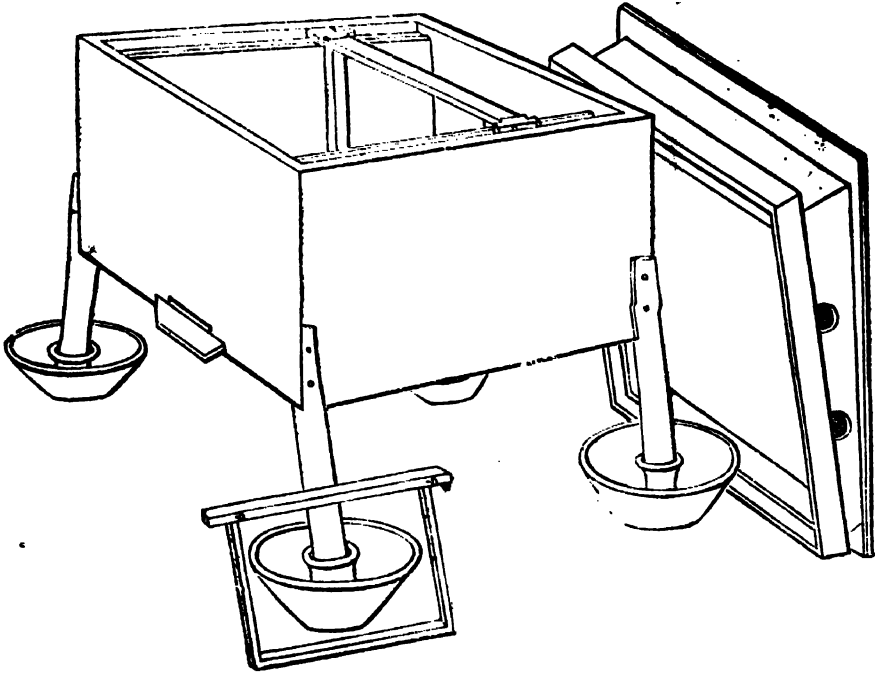
কেরোসিন বাক্স নির্ম্মিত মধুচক্র

ডালা খোলা অবস্থায় দেখান হইয়াছে। ভিতরে যে ফ্রেমটি থাকে তাহা একবার খোলা এবং এক পরান দেখান হইয়াছে।

কাঠের বা বাঁশের চারিটি পায়া। পায়া জলপূর্ণ বাটির উপর বসাইবার ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে।
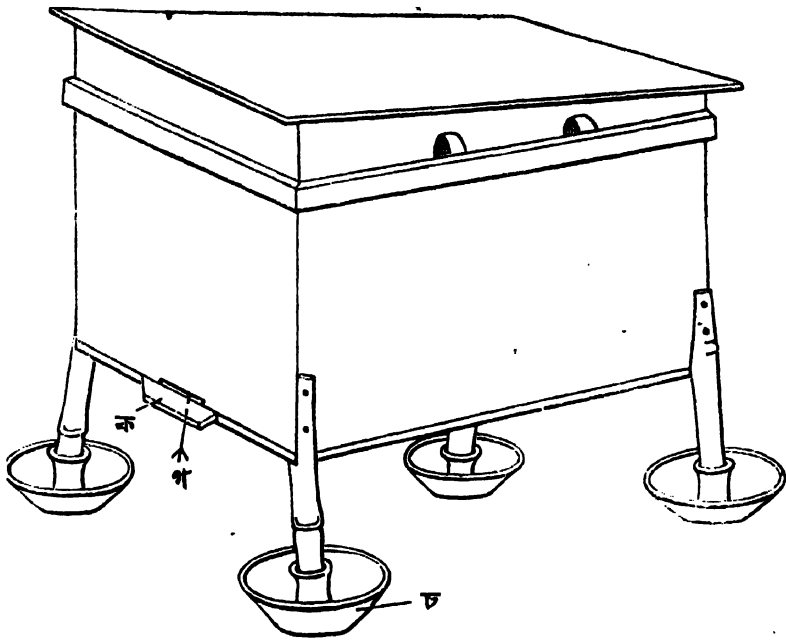
কেরোসিন বাক্স নির্ম্মিত মধুচক্র

ক। মধুমক্ষিকা উড়িয়া আসিয়া এই তক্তাখানির উপর বসে।

গ। মক্ষিকার প্রবেশের পথ।

চ। জলপূর্ণ বাটি ইহার উপর বাক্সের পায়া বসান থাকে। পিপীলিকা প্রভৃতি জল থাকাহেতু বাক্সে উঠিতে পারে না।

কেরোসিন বাক্সের যে দিকটি অধিক লম্বা সেই দিকে ভিতরে আর একখানি কাঠ বসাইতে হয়। মৌমাছির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চাকযুক্ত তক্তা এই কাঠের গায় সংলগ্ন থাকে (উপরের চিত্র দ্রষ্টব্য)। বাক্সের একদিকে একটি ছিদ্র করিয়া তাহার নিম্নেই একখানি ছোট কাঠ জুড়িয়া দিতে হয়। মৌমাছিগুলি আসিয়া প্রথমতঃ এই কাঠের উপর বসে ও তাহার পর ছিদ্র পথে বাক্সের মধ্যে প্রবেশ করে। বাক্সের নিম্নে চারি কোণে চারিটি বাঁসের খুঁটি লাগাইয়া দিতে হয়। চারিটি জলপূর্ণ পাত্রের উপর এই চারিটি খুঁটি বসাইয়া দিলে, বাক্সের মধ্যে পিপীলিকা ও অন্যান্য কীটাদি প্রবেশ করিতে পারে না। বাক্সের ঢাকনি একদিকে ঢালু করিয়া তৈয়ার করিলে ও উপরে টিন মুড়িয়া দিলে ভাল হয়। তাহাতে জল বাক্সে প্রবেশ করিতে পারে না। এইরূপ বাক্সে এতদ্দেশে সচরাচর মৌমাছি পালন করিতে পারা যায়। পাহাড়ে জল ও শীতের আধিক্যের জন্য বাক্সের কিছু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। যাঁহারা বিশিষ্টরূপে মৌমাছি পালন করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের পক্ষে "Standard Hive" অথবা আদর্শ চাক ব্যবহার করা ভাল।

উন্নত প্রণালীর সেই চাক ব্যতীত মৌমাছি পালকের আরও কতকগুলি সাজ সরঞ্জাম আবশ্যক। উহাদের নাম ও আনুমাণিক মূল্যাদি নিম্নে বিবৃত হইল ;—

১। কেরোসিন বাক্সের মৌচাক ৩৲ ; Standard চাক ৮৲। (২) ফর্ম্মা ; প্রত্যেক বাক্সে এক ডজন আবশ্যক ; স্থানীয় মিস্ত্রি দ্বারা তৈয়ারী করিলে ১৲ টাকায় ১ ডজন হইতে পারে। (৩) প্রত্যেক বাক্সের জন্য ১ ডজন ধাতব হাতল ; মূল্য ৴৹ হইতে ।৴৹ আনা। (৪) চাক ভাগ করিয়া দিবার জন্য এক একটি বাক্সের জন্য একখানি তক্তা—৶৹ (৫) রাণীর প্রবেশ বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক বাক্সে একখানি আবরণ—১৲ (৬) ধূম প্রয়োগ যন্ত্র—২৷৹ (৭) পিপীলিকা নিবারক মৃত্তিকার পাত্র ৪ খানি ৶৹ (৮) চাক গরম রাখিবার জন্য আচ্ছাদন—একটুকরা চট ও দুই টুকরা কম্বল—।৹ (৯) মধু সংগ্রহের জন্য ১ খানি ছুরী—৶৹ (১০) তারের জাল ; চক্র স্থাপনের জন্য এক কিম্বা দুই ডজন—ডজন প্রতি ।৶৹ (১১) ১ জোড়া দস্তানা—১৲ (১২) মক্ষিকা দংশন নিবারণের জন্য মুখের আচ্ছাদন—।৹ (১৩) মস্তকাবরণ বা মাতলা—৴৹ (১৪) মধু নিষ্কাষণ যন্ত্র ; একটি যন্ত্রের দ্বারা একাধিক পালকের কার্য্য চলিতে পারে ; দেশীয় মিস্ত্রি দ্বারা প্রস্তুত করাইলে ১০৲ টাকায় হইতে পারে। বিলাতী আমদানি যন্ত্রের মূল্য ৩২৲। (১৫) চাক পত্তনের ফর্ম্মা ; প্রত্যেক বাক্সের জন্য ১ ডজন—১৷৹ (১৬) কলাই করা তার, ছোট বাণ্ডিল ৶৹ (১৭) তার গাঁথিবার যন্ত্র ৴৹ (১৮) তার গাঁথিবার তক্তা—৶৹ (১৯) মৌমাছি খাওয়াইবার বোতল—৶৹।

পূর্ব্বোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে মৌমাছি পালনের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে ২২৲ হইতে ২৭৲ টাকা আবশ্যক হয়। সুতরাং অল্প ব্যয়েই এই কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। এতদ্দেশে এ পর্য্যন্ত কোথাও নূতন প্রথায় ব্যবসায়ের জন্য মৌমাছি পালন আরম্ভ হয় নাই। কোন স্থানে জল বায়ু ও বন্য অথবা কর্ষিত উদ্ভিদের ফুলের প্রাচুর্য্যের উপর মধু উৎপাদন নির্ভর করে। তৎসমুদয় অবস্থা সঠিক অবগত না হইয়া একবারে বড় কাজে হাত দেওয়া ঠিক নহে। অপাততঃ দুই একটি বাক্স লইয়া কার্য্য আরম্ভ করাই উচিত, পরে স্থান উপযুক্ত বোধ হইলে এবং মৌমাছিগুলি উৎকৃষ্ট জাতীয় হইলে চাষ সহজেই বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। এতদ্ভিন্ন ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে মৌমাছি পালন একটি স্বতন্ত্র ব্যবসায় হইতে পারে না। যে সময় ফুল ফুটিয়া থাকে সেই সময় ও তাহার অগ্র পশ্চাৎ কিয়দ্দিবস পালকের বিশেষ মনঃসংযোগ আবশ্যক হয়। বৎসরের অপরাপর সময় বস্তুতঃ কার্য্য নাই বলিলেই হয়। সুতরাং যাঁহারা মফঃস্বলে থাকেন এবং অপরাপর কার্য্যাদির অবসরে মৌমাছি পালন করিবার যাঁহাদের সময় আছে তাঁহাদেরই প্রথমতঃ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা বিধেয়। তাঁহারা মিঃ ঘোষের পুস্তক হইতে আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত খবরই জানিতে পারিবেন। ইংরাজী পুস্তক কিন্তু সকলের বোধগম্য নয়। আমরা আশা করি যে গবর্ণমেণ্ট এই পুস্তকের একটি সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিয়া ইহার কার্য্যকারিতার ক্ষেত্রের প্রসার করিবেন।

সাময়িক কৃষি সংবাদ

——:*:——

আসাম যোড়হাট ও করিমগঞ্জ ক্ষেত্র—এই সকল স্থানে ৪ জন ক্ষেত্র শিক্ষা-নবিস লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাদিগকে কৃষি ক্ষেত্রের সমুদয় কার্য্য হাতে হাতিয়ারে শিখান হইবে এবং ইহারা ভবিষ্যতে স্থানে স্থানে কৃষি পরীক্ষাদি কার্য্য নিজেরাই করিতে পারিবে। এই দলের মধ্যে একজন গারো যুবক আছে। এই যুবক যদি কৃষি কর্ম্মে দক্ষতা লাভ করিতে পারে তবে তাহাকেই গারো পর্ব্বত ক্ষেত্রে উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত করা হইবে।

এই সকল শিক্ষা-নবিসদিগকে উপযুক্ত বোধ করিলে বৃত্তি দিয়া উচ্চ কৃষি শিক্ষা লাভার্থ সাবর কৃষি কলেজে পাঠান হয়। আসাম কৃষি বিভাগের এইরূপ ব্যবস্থা সমিচীন বলিয়া মনে হয়।

আসামে ইক্ষু চাষের পরীক্ষা—প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ৫ ফিট অন্তর সারি না করিয়া স্থানীয় প্রথামত ৪ ফিট অন্তর সারি এবং সারিতে ১৷৷০ ফিট অন্তর আখের টাঁক (কটিং) বসাইলে ফসলের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। এমতাবস্থায় একর প্রতি ৮০০০ ইক্ষু কটিং আবশ্যক হয়। এক একর বাঙ্গালার মাপে প্রায় সোয়া তিন বিঘা।

কামরূপ ইক্ষু ক্ষেত্রে ৬০ একর পরিমাণ দুইটি ক্ষেত্র রচিত হইয়াছে এবং ষ্টীম চালিত কলের দ্বারা আবাদের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে; সুবিধা বা অসুবিধার কথা আমরা এখনও স্পষ্টরূপে জানিতে পারি নাই। ঐ দুইটি ক্ষেত্রের একটিতে জল নিকাশের অসুবিধা হেতু ইক্ষু ভালরূপ জন্মিতেছে না।

ধানের সার—কামরূপ ও শিবসাগর, খাসিয়া পর্ব্বত ক্ষেত্রগুলিতে হাড়ের গুঁড়া ও খণিজ ফস্ফেট চূর্ণ ধানের সাররূপে ব্যবহার করা হইয়াছিল। একর প্রতি ৩ মণ হাড় বা ফস্ফেট চূর্ণ প্রয়োগ করা হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই হাড় চূর্ণেরই উৎকর্ষতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। হাড়চূর্ণ প্রয়োগে খরচ বাদে ১৮৲ টাকা মুনফা থাকে, কিন্তু খণিজ ফস্ফেট প্রদানে ৭৲ টাকার অধিক লাভ হয় না। ইহাও দেখা গিয়াছে যে হাড়ের গুঁড়া বা খণিজ ফস্ফেট প্রয়োগের ফল দ্বিতীয় বৎসরেও কতক পরিমাণে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বৎসরেও যে ক্ষেতে হাড়ের গুঁড়া প্রদান করা হইয়াছিল তাহারই ধান অধিক হইয়াছে

এবং ফস্ফেটের অনুপাতে হাড়ের গুঁড়া প্রযুক্ত ক্ষেত্রের লাভ যথাক্রমে ৪৲ টাকা ও ৯৲ টাকা।

খাসিয়া পর্ব্বতে এক একর একটি ক্ষেত্রে হাড় সার প্রয়োগ দ্বারা ৭২০ পাউণ্ড ও ইজিপসিয়ান ফস্ফেট প্রয়োগ দ্বারা ৫১০ পাউণ্ড ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে, পক্ষান্তরে বিনা সারে ২৬০ পাউণ্ড মাত্র ধান পাওয়া গিয়াছে। কীটাদির উপদ্রব না থাকিলে সার প্রয়োগ দ্বারা আরও উৎকৃষ্ট ফল লাভকরা যাইতে পারিত ইহাই কৃষি বিভাগের বিশ্বাস।

কৃষি যন্ত্র ব্যবহারে আসাম—কামরূপ ও শিবসাগর ক্ষেত্রে মেষ্টন লাঙ্গলের ব্যবহার দেখিয়া স্থানীয় চাষীরা মেষ্টন লাঙ্গল ব্যবহার করিতেছে। চাষীরা বিগত বর্ষে ৭ খানি মেষ্টন লাঙ্গল খরিদ করিয়াছে। তিন রোলারযুক্ত আখমাড়া কলের ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িতেছে। বিগত বর্ষে ১৩টি আখমাড়া কল স্থানীয় লোকে ব্যবহার করিতেছে।

লেবু পোকা নিবারণের উপায়—কমলা ও অন্যান্য মিষ্ট লেবুগাছে পোকা লাগিয়া পাতা খাইয়া প্রায়ই গাছ নিস্তেজ করিয়া ফেলে ও মারিয়া ফেলে। দেখা গিয়াছে যে তীক্ষ্ণ অম্লরসযুক্ত সরবতী প্রভৃতি লেবুর ডালে যদি কমলা প্রভৃতির চোখ কলম করিয়া নূতন গাছ উৎপন্ন করা যায় তাহা হইলে ঐ সকল লেবু গাছে পোকার উপদ্রব খুবই কম হয়।

কৃষি যন্ত্র ব্যবহারে-মান্দ্রাজ—কৃষি যন্ত্রের ব্যবহারে মান্দ্রাজ সর্ব্বাগ্রণী। ১৮৬৪ সালে মান্দ্রাজে কৃষি উন্নতি কল্পে গভর্ণমেণ্টের বড় ঝোঁক হইয়াছিল। এখন সে ঝোঁক গিয়াছে কারণ বিলাতী কৃষি যন্ত্রগুলি প্রায়ই এদেশে ব্যবহারের উপযোগী নহে অথবা মূল্যে অত্যন্ত অধিক কিম্বা সেগুলি চালাইবার মত দক্ষ লোক পাওয়া যায় না। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ স্থানীয় কৃষি যন্ত্রাদির উন্নতি ও তাহাদের উপযুক্ত ব্যবহারের যথেষ্ট চেষ্টা এখানে হইয়াছে। মান্দ্রাজী ড্রিল, (শ্রেণীবদ্ধ বীজ ছড়াইবার উপযুক্ত) চৌকা ও ত্রিকোণ বিদা ও কয়েক প্রকার লাঙ্গল, বলদে টানা কোদাল যন্ত্র, মান্দ্রাজ গ্রবার বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। মান্দ্রাজ গ্রব্যার—ইহা এক প্রকার বিদা বিশেষ, ইহাতে ৫ বা ততোধিক দন্ত থাকে, দাঁতগুলি বাঁকা। কোপান জমির ঢিলগুলা ভাঙ্গিতে, মাটি চূর্ণ করিতে, শিকড় ও আগাছার কাণ্ড মূলাদি জমি হইতে সাফ্ করিতে বিশেষ উপযোগী। ইহার দুইপাশে দুই খানি চাকা সংযুক্ত থাকে এবং সেই হেতু বলদে সহজে টানিতে

পারে ও কাজের খুব সুবিধা হয়। মান্দ্রাজে নারিকেল, শুপারি গাছের পোকা নিবারণের জন্য অনেক সময় পিচকারি ব্যবহার না করিলে চলে না, এই জন্য এখানে দমকল পিচকারীর ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িতেছে। উন্নত প্রণালীর গুড়ের দুইটি কারখানা ও এখানে স্থাপিত হইয়াছে।

বিলাতী লাঙ্গলের মধ্যে এখানে ডিস্ক লাঙ্গলের (Disc plaugh) ব্যবহার দৃষ্ট হয়। শক্ত মাটি ভেদ করিতে এই লাঙ্গল বিশেষ উপযোগী। চালক ইহার উপর বসিয়া এই লাঙ্গল চালাইয়া থাকে। তাহারই শরীরের ভারে মাত্র ডিস্ক ঘুরিতে ঘুরিতে মাটিতে বসিয়া যায়। ইহার দাম কিছু অধিক। ইংলণ্ড হইতে একখানি লাঙ্গল এখানে পৌছিতে সর্ব্বসমেত আজকালের বাজারে ২০০৲ টাকার কম নহে। কৃষি-বিভাগে এই লাঙ্গল আনাইয়া ভাড়ায় খাটাইবার ব্যবস্থা করিলে চাষীর পক্ষে সুবিধা হয়।

বিহার ও উড়িষ্যায় ভাদুই শস্য—১৯১৫।১৬—বিহার এবং উড়িষ্যা প্রাদেশিক বিবরণীতে প্রকাশ যে এ বৎসরের আবহাওয়া ভাদুই শস্যের পক্ষে বড় ভাল ছিল না কিন্তু আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে অনুকূল বৃষ্টি হওয়ায় অনেকটা শুধরাইয়া গিয়াছে। এ বৎসর গত বৎসর অপেক্ষা মোট ৫১,০০০ একর বেশী জমীতে অর্থাৎ ৭,৯৯১,৮০০০ একর জমীর স্থলে, ৮,০৪২,৮০০ একর জমীতে ভাদুই শস্যের চাষ হইয়াছে, মোটের উপর গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসরে ৬২,০০০ মণ বেশী অর্থাৎ ৩,৭১৮,১০০ মনের স্থলে ৩,৭৮০,১০০ মণ শস্য পাওয়া গিয়াছে।

বিহার ও উড়িষ্যায় নীলের আবাদ—১৯১৫।১৬—বিহার এবং উড়িষ্যা প্রাদেশিক বিবরণীতে প্রকাশ যে এবৎসরের আবহাওয়া নীলের পক্ষে ভাল ছিল না, বিশেষতঃ আশ্বিন মাসে বৃষ্টি না হওয়ায় জমিতে ভালরূপ 'যো' ছিল না কিন্তু গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসরে ২২,৩০০ একর বেশী জমীতে অর্থাৎ ৩৮,৫০০ একরের স্থানে ৬০,৮০০ একর জমীতে নীলের চাষ হইয়াছে। নীল চাষ এত বৃদ্ধি হওয়ার কারণ গত বৎসর হইতে যুদ্ধের জন্য বিলাতী নীলের দর অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। এবৎসরে নীলের ফসল শতকরা ৬৫ ভাগ; মোট ফসল গত বৎসর অপেক্ষা ২,৪০৩ মণ বেশী অর্থাৎ ৮১৮১ মণের স্থলে ১০,৫৮০ মণ হইয়াছে।

বিহারে তিলের আবাদ—১৯১৫।১৬—বিহার এবং উড়িষ্যা প্রাদেশিক বিবরণীতে প্রকাশ যে এবৎসর আবহাওয়া তিলের পক্ষে মন্দ ছিল না গত বৎসর

অপেক্ষা এবৎসর ৭০০ একর বেশী জমিতে অর্থাৎ ১৯৩,৩০০ একর জমীর স্থানে ১৯৪০০০ একর জমীতে তিলের আবাদ হইয়াছিল ফসল গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসরে খুব ভাল জন্মিয়াছে। গত বৎসরে গড়ে শতকরা ৮০ ভাগ ফসল হইয়াছিল কিন্তু এ বৎসরে শতকরা ৯৮ ভাগ ফসল পাওয়া গিয়াছে গত বৎসরের ফসল ২৬১০০ টন অপেক্ষা এবৎসরে ৫৩০০ টন বেশী অর্থাৎ ৩১,৪০০ টন ফসল পাওয়া গিয়াছে।

বিহার ও উড়িষ্যায় তুলা—১৯১৫।১৬—বিহার এবং উড়িষ্যা প্রাদেশিক তুলা চাষের পৌষ মাসের বিবরণীতে প্রকাশ যে এবৎসর আবহাওয়া অনুকুল থাকায় জাট চাষ বেশ ভালই হইয়াছে তবে ভাদ্র মাসের প্রথমে বন্যা হওয়ায় বিহারের উত্তরাংশের নাবি চাষের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল কিন্তু শেষ সময়ে আবহাওয়া ভাল থাকায় তাহা অনেকটা শুধরাইয়া গিয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসরে ১৭৮০ একর কম জমীতে অর্থাৎ ৪৫,৪৩৩ একরের স্থানে ৪৩৬৫৩ একর জমীতে জ্যাট তুলার চাষ হইয়াছে। আবাদ এত কমিয়া যাইবার কারণ দারভাঙ্গা জেলাতে বন্যায় অধিকাংশ জমী ভাসিয়া গিয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও এবৎসরে গত বৎসর অপেক্ষা ৯৯৩ গাঁইট বেশী অর্থাৎ ৭৮৫৭ গাঁইটের স্থানে ৮৮৫০ গাঁইট জাট তুলা উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু নাবি তুলা ৪৫৯ গাঁইট কম অর্থাৎ ৭৬৮৩ গাঁইটের স্থলে ৭২২৪ গাঁইট পাওয়া গিয়াছে।

মাঘ, ১৩২২ সাল।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

বা

প্রাইমারী স্কুলে কৃষি শিক্ষা

——:*:——

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কৃষিকার্য্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদের দেশে কৃষি সম্বন্ধীয় ব্যাপারটি একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে স্কুল কলেজে কৃষি-শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেকালে মানুষের জীবন সংগ্রাম এত গুরুতর ছিল না সুতরাং বিশেষভাবে স্কুলে পাঠশালে কৃষিকার্য্য শিখাইবার আবশ্যকতাও তাদৃশ অনুভূত হয় নাই। এদেশে কৃষিকার্য্য চিরকালই চাষার কার্য্য এবং অতি হেয় ও ঘৃণ্যএ কথা পুরাবৃত্ত পাঠকগণ কিছুতেই স্বীকার করিতে রাজী নহেন এবং তাঁহাদের স্বাপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণও আছে। বেদ উপনিষদাদি প্রামান্য গ্রন্থ তাঁহাদের কথা সপ্রমাণ করিতেছে—

> মাধ্বীনঃ সন্ত্বোষধয়ঃ মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ।
> কৃষি ধন্যা কৃষি মেধ্যা জন্তুনাম জীবনং কৃষিঃ।
> অন্নং বহু কুর্বীত তদব্রতম্।

ইত্যাদি বহু প্রবচন উদ্ধৃত করা যায়। পরাশর সংহিতায় কৃষি সম্বন্ধীয় বহু আলোচনা আছে এবং তাহাতে কৃষি যন্ত্রের, শস্যের, গোময় সারের গোকুলের পূজার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে পুরাকালে কৃষি ইতর ভদ্র সকলের নিকট সমাদৃত ছিল এবং প্রাচীনকালে ঋষি কান্তকাগনও

কৃষিকর্ম্মে লিপ্ত থাকিতেন। তাঁহারা ধেনু পরিচর্য্যা ও উদ্ভিদ পরিচর্য্যা অতি গৌরবের কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। রাজ কুমারীরাও সখী পরিবৃত হইয়া উদ্যানে বৃক্ষ লতাদি পরিচর্য্যায় লিপ্ত আছেন এবং লতাগুল্মাদির আলবালে জল সেচন করিতেছেন, পুষ্পচয়ন ফলাহরণ করিতেছেন এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। কোন সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বদেশ হইতে হাঁটা রাস্তায় কলিকাতায় ফিরিতেছিলেন। আসিতে আসিতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে কোন এক স্থানে দুইজন কৃষক হাল ছাড়িয়া বসিয়া তামাকু সেবনের উদ্যোগ করিতেছে ও পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতেছে। তাহাদের কথার দুই একটা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাণে যাওয়ায় তিনি তাহাদের সন্নিকটে গেলেন এবং বুঝিলেন উভয়ের মধ্যে ন্যায়ের তর্ক চলিতেছে, উভয়েই জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইহাতে বুঝা যায় যে সেকালে কৃষি কর্ম্মটা নিরক্ষর চাষার কার্য্য ছিল না। মধ্যযুগে যখন আবার কৃষির সঙ্গে সঙ্গে কৃষির সহজাত শিল্পসমূহ ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে লাগিল তখন ছোট বড় সকল ঘরের স্ত্রীগণ পর্য্যন্ত চাষবাস ও শিল্প কার্য্যে অনবিস্তর নিযুক্ত থাকিতেন, এমন কি হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ কন্যাগণ পর্য্যন্ত রেশম ও কার্পাসজাত বস্ত্র শিল্পের অনেক সাহায্য করিতেন। জরির কাজ, বিবিধ শুচিকার্য্য ও অন্যান্য কত প্রকার কারুকার্য্য স্ত্রীগণের ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একচেটে ছিল। কালের বিপর্য্যয়ে তেহিনো দিবসাঃ গতাঃ। বিদেশীয় বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায়, বিদেশীয় ধনীগণের পসার ও প্রতিপত্তি হেতু আমরা আমাদের মৌলিকত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমাদের কুটীর শিল্প এখন ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে, আমাদের ছোট খাট কল কব্জাগুলি এখন অকেজো হইয়া পড়িয়াছে, বড় বড় কল কব্জা তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে এবং আমরা সেই সকল কলে কাজ করিতে শিখিয়া কলের মানুষ হইয়া গিয়াছি। বড় বড় কারখানায় আমরা ভাল জামা জোড়া পরিয়া কেরানী ও বাবু। বিদেশাগত সভ্যতার বাহ্যচাকচিক্যে আমরা মুগ্ধ এবং ভাল পোষাক পরিয়া আমরা তথাকথিত সভ্যতাভিমানী হইয়াছি। চাকরি করিলে অনায়াসে দু পয়সা রোজগার হয় এবং সুবেশ পরিয়া সুসভ্যের মত বেড়ান যায় এইটি আমাদের বদ্ধমূল ধারণা হইয়াছে। চাষাভুষারা পর্য্যন্ত এখন কথায় বলে "যেনন তেমন চাকরি ঘি ভাত"। আমরা বিদেশীগণের বাহ্যিক অনুকরণ করিতেছি কিন্তু তাহাদের প্রকৃত আদর্শটি আমরা ধরিতে পারি নাই। তাহারা রাখালবেশে রাখালি করে এবং রাজবেশে সভাসমিতিতে যোগদান করে এবং ক্লবে গিয়া আমোদ করে। আমাদের মধ্যে যাহারা একটু সামান্য ইংরাজী শিখিয়াছে তাহারা আর রাখালি করিতে পারে না, পক্ষান্তরে আত্ম বিক্রয় করিতে উদ্যত। তাহারা আর মাটি ঘাঁটা বা গোধন চরাণ যেন আদৌ বাঞ্ছনী বলিয়া মনে করে না। এই প্রকার পরস্পর বিরোধী ঘটনাস্রোতে পড়িয়া আমরা কৃষিকে হেয় বোধ করিতে অভ্যাস করিয়াছি। ভদ্র পরিবারগণ—যাহাদের জমি জমা আছে—

জমির খাজনা পাইলেই সন্তুষ্ট, জমির উন্নতি কিসে হইবে এবং কি প্রকারে কৃষককুলের উন্নতি সাধন হইবে এই কথা ভাবিবার তাহাদের অবসর নাই। এখনও কিন্তু এমন ভদ্রবংশ আছে যাঁহারা হাল গরু রাখিয়া চাষের কার্য্য সুসম্পন্ন করেন এবং সানন্দে সুখে ভাতে জীবন যাপন করেন। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। এই সকল মানুষ সহরবাসী পরসেবারত লোকের চক্ষে যেন একটু অসভ্য, পাড়াগেঁয়ে ও একঘেয়ে এবং তাঁহাদের সহরবাসীদিগের মত বৈচিত্রময় জীবন নহে। পূর্ব্বকালে সকল গৃহস্থেরই নিজস্ব কৃষি ও শিল্পকর্ম্ম ছিল এবং তাহাদের সন্তান সন্ততিগণও কুলক্রমাগত কর্ম্মসমূহ অনায়াসে শিক্ষা করিবার সুবিধা পাইত এবং ঐ সকল বিদ্যা শিক্ষার জন্য তাহারা স্কুল কলেজের অপেক্ষা করিত না। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহই এক একটী বিশিষ্ট শিক্ষালয়। অধিকন্তু বিশিষ্ট ছাত্রগণ গুরুগৃহে বাসকালে গুরুসেবারত থাকিয়া নানা বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ পরিচর্য্যা, গো পরিচর্য্যা, মনুষ্য পরিচর্য্যা ও অশেষ প্রকার গৃহস্থালীর কর্ম্ম শিক্ষা করিত। ভারতীয় সমাজে ও য়ুরোপীয় সমাজে অনেক পার্থক্য আছে। ভারতীয় সন্তান সন্ততিগণ পিতামাতা ও পরিজনবর্গের মধ্যেই লালিত পালিত হয় কিন্তু য়ুরোপীয় সমাজে বালক বালিকাগণ অধিকাংশস্থলে পিতামাতা ও পরিজনবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া মানুষ হয় সুতরাং বিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যতীত তাহারা অনন্যোপায়। ভারতের শিক্ষা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, বস্তুর বিচার করিয়া শিক্ষা। অধুনা য়ুরোপে সেই শিক্ষা পদ্ধতিই প্রচলিত হইয়াছে। ইহাকেই বলে কিণ্ডারগার্টেন (Kindergarten) শিক্ষা পদ্ধতি। কিন্তু আমরা ভারতীয় সমাজ য়ুরোপীয় আদর্শে নূতন করিয়া গঠিত করিতে বাসনা করিয়াছি। য়ুরোপের স্বাধীনভাবের ও আত্মত্যাগের পূর্ণ আদর্শটি আমরা কিন্তু ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই, অথচ আমরা য়ুরোপীয় সভ্য সমাজের বাহ্য চাকচিক্যে একেবারে মুগ্ধ। আমরা বিলাতী ধরণে চলাফেরা করিতে, বিলাতী ধরণে থাকিতে, এমন কি বিলাতী ধরণে হাসিতে ও কাশিতে পর্য্যন্ত ভালবাসী এবং বিলাতী ধরণ বজায় রাখিবার জন্য কোন রকমে দিনগুজরাণের একটা সহজ ব্যবস্থা করিয়া লওয়া, কোন প্রকারে নিজের সাময়িক স্বার্থটা সিদ্ধ করাই আমাদের এখন সঙ্কল্প, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উচ্চ আদর্শ আমাদের চোখের সাম্‌নে যেন নাই। অনেকেই তাই এখন দাসখতে সহি দিয়াছেন। তাহাদের সন্তান সন্ততিগণের শিক্ষা প্রদানের সময়ও নাই, শক্তিও নাই এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোন একটা কিছু গড়িয়া তুলিবার প্রবৃত্তিও যেন তিরোহিত হইয়াছে। তাই এক্ষণে স্কুলে কলেজে কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা মন্দের ভাল বলিয়া বোধ হয় এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা ব্যতীত আমরা আর গত্যন্তর দেখিনা।

ছেলেমেয়েরা লতা পাতা ফুল ফল লইয়া খেলা করিতে স্বভাবতই ভালবাসে। মাটি জল লইয়া নাড়াচাড়া করিতেও তাহাদের কম আমোদ হয় না। অনতিকালপূর্ব্বে

য়ুরোপীয় স্কুল সমূহে লিখিতে, পড়িতে ও গণনা মাত্র করিতে শিখান হইত (The three Rs—Reading, Writing and Arithmetic)। ভারতেও এই শিক্ষাই প্রচলিত হইয়াছে। এখন য়ুরোপীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে ঘোর বিবর্ত্তণ সংঘটিত হইয়াছে—হাতে হাতিয়ারে কার্য্য দ্বারা শিক্ষালাভ এখন সব শিক্ষার মূলসূত্র হইয়া দাড়াইয়াছে এবং তাহাই প্রকৃত শিক্ষা এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া শিক্ষা বিভাগের কার্য্যের ধারা নির্দ্ধারিত হইতেছে।

বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগও প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন অথবা তাহার সূচনা করিয়াছেন মাত্র কিন্তু তাহার পদ্ধতি এখনও ঠিক করিয়া দেন নাই। অনুমান হয় যে, কি প্রকার শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত হইলে তাহা এ দেশের উপযুক্ত হইবে তাহা অদ্যাপিও এ দেশীয় শিক্ষা-বিভাগ ভাবিয়া স্থিরকরিতে পারেন নাই। স্কুলের শিক্ষকগণের মধ্যে কে ছাত্রগণকে কৃষি-শিক্ষা প্রদান করিবেন, কোন্ পুস্তক অবলম্বনে শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহার উদ্যোগ আয়োজন বা কিরূপ করিতে হইবে শিক্ষা-বিভাগ তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন নাই। আমাদের বোধ হয় ভারতের মত এমন একটা কৃষি প্রধান দেশে সরকারী কৃষি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই একথা শুনিলে পাছে সভ্যজগতে সুসভ্য ব্রীটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গে কলঙ্ক স্পর্শ করে তাই গভর্ণমেণ্ট নিজ দোষ স্খালনার্থ কাগজে কলমে কৃষি শিক্ষার একটা সুচনা করিয়া রাখিয়াছেন মাত্র।

আমাদের মতে আমরা বলি যে প্রাথমিক কৃষি-শিক্ষার জ্ঞানলাভের জন্য গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনায় প্রয়োজন হয় না। এস্থলে বালক বালিকাগণকে প্রকৃতির সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়াই প্রধান কার্য্য। প্রাকৃতিক স্থূল পদার্থগুলিকে ও কৃষি-কর্ম্মে তাহাদের প্রয়োগ প্রণালী সংক্ষেপে ও সরলভাবে শিক্ষা দেওয়া প্রথম কর্ত্তব্য। প্রকৃতির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপনই এই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এরূপ ক্ষেত্রে ছাত্রগণের পুস্তক পাঠের আবশ্যকতা কম কিন্তু শিক্ষকগণের নিমিত্ত পুস্তক (Guide-book) আবশ্যক। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ বৎসর কাল কৃষি-শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ইহার মধ্যে চারি বৎসর কাল ছাত্র ছাত্রীদিগকে কৃষি-পুস্তক অধ্যয়ন করিতে দিবার আবশ্যকতা নাই। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণকে পূর্ব্ব হইতেই প্রয়োজন মত দৈনন্দিন শিক্ষার বিষয় স্থির করিয়া লইতে হয়। গৃহে কিছু কিছু কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে বিদ্যালয়ে প্রত্যহ কৃষি-শিক্ষার আবশ্যক নাই। সপ্তাহে এক কিম্বা দেড় ঘণ্টাকাল কৃষি কিশার ব্যবস্থা থাকিলে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, বালক বালিকাগণ গাছপালা জীব জন্তুর সংস্রবে আসিলে তাহাদের সম্বন্ধে নানা তথ্যানুসন্ধানে সমুৎসুক হয় সুতরাং বিদ্যালয় কিম্বা গৃহে কৃষি-শিক্ষায় তাহারা প্রায় শিথিল প্রযত্ন হয় না। ছাত্রগণকে প্রাকৃতিক সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করাই প্রাথমিক শিক্ষার মহান লক্ষ্য।

কেন বালক বালিকাগণ উৎফুল্ল মনে উদ্যান চর্য্যায় নিযুক্ত হয় তাহার অনেকগুলি কারণ আছে—প্রথমতঃ তাহারা স্বভাবের শিশু প্রকৃতির সহিত স্বভাবে খেলায় আমোদ পায়, দ্বিতীয়তঃ তাহাদের নিকট প্রথম জীবনটা একটা প্রহেলিকা বলিয়া উদ্ভাসিত হইতে থাকে। বালকগণ ও বালক অপেক্ষা বিশেষতঃ বালিকাগণ এই প্রহেলিকার মর্ম্মোদঘাটনে অধিকতর সমুৎসুক। তৃতীয়তঃ একটা সামান্য কিছু হইতে একটা কাজের বা সৌন্দর্য্যের কিছু একটা গড়িয়া তুলিতে পারিবে এই আশায় তাহারা উৎফুল্ল ও উদ্বিগ্ন। একটিমাত্র অকিঞ্চিৎকর দর্শন বীজ হইতে একটা সুখদর্শন গাছ জন্মিল এবং তাহা আবার সময়ে লোভনীয় ফল ফুলে শোভিত হইল এ দৃশ্য দেখিয়া সকল শিশুই আনন্দিত হয় এবং ইহা তাহাদের নিজ কৃত কর্ম্মের ফল স্বরূপ বুঝিতে পারিলে কেবল শিশুগণ কেন কত শত সরল মানব হৃদয় আহ্লাদে গদগদ হয়। ফুলের নয়ন মনোহর বিচিত্র বর্ণ ও প্রাণাকুলকারী গন্ধে কীট পতঙ্গের ন্যায় সকল শিশু হৃদয়ই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। চতুর্থতঃ উদ্যানচর্য্যায় শিশুগণের মধ্যে একটা যেন জেদের ভাব ফুটিয়া উঠে। একজন করিতেছে আমি পারিব না কেন, একজনের টি বেশ সুন্দর হইল আমার টি সুন্দর হইবে না কেন, এই রকমের একটা ইচ্ছা আপনা হইতে আসিয়া জুটে এবং কৌশলে কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। উদ্যানচর্য্যায় শিশুগণের কার্য্য প্রণালী লক্ষ্য করিয়া—তাহাদের আচরণ, কর্ম্মে দৃঢ়তা ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তির ছায়াপাত দ্বারা তাহাদের একটা ভবিষ্যত ছবি যেন প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে।

বিদ্যালয়ে উদ্যান বা কৃষিচর্য্যা করিতে হইলে বিদ্যালয় সংলগ্ন একটি উদ্যান থাকা চাই। এখন স্কুলের বাগানটি কোথায় অবস্থিত হইবে একথা যদি চিন্তা করা যায় তাহা হইলে সতঃই মনে হইবে যে, কেন স্কুল প্রাঙ্গনেই উদ্যানের স্থান নির্দ্দিষ্ট হউক না। কিন্তু তাহা না হইয়া বিদ্যামন্দিরের কাছাকাছি কোন একটা স্থানে হইলে ভাল হয়। শিক্ষাগার হইতে বাহির হইয়া যেন বালকবালিকাগণ সতন্ত্র স্থানে আসিল এ ভাবটি মনে আসিলে বালকেরা নূতন উৎসাহে উৎসাহিত হয়। শাসন, শিক্ষার চির সহচর। শাসন না হইলে কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মায় না, চরিত্র গঠন হয় না এমন কি সম্যক জ্ঞানলাভের অধিকারী হওয়া যায় না। তাই সকল শিক্ষাগারই শাসনাগার। Diciplineটি আগে চাই। কিন্তু শিক্ষাগার অতিক্রম করিয়া যখন বালকবালিকাগণ উদ্যানে আসিল তখন তাহারা কিছুক্ষণের জন্য কথঞ্চিৎ স্বাধীন এইরূপ একটা ভাব জাগিল। এখানেও তাহাদের discipline চাই, তাহাদের কৃত ভুলচুকের সংশোধন চাই ও সঙ্গে সঙ্গে শাসন চাই সত্য কিন্তু এখানকার শাসন তাদৃশ কঠোর নহে। প্রকৃতির ক্রোড়ে আসিয়া যেন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী, ছাত্র ছাত্রী কেমন একটি কোমল মধুরভাবে বিভোর হইয়াছে—এটা হইয়া থাকে, কেননা এখানে স্বভাবের আধিপত্য অধিক। এই জন্যই বলা, সম্ভব হইলে উদ্যানটি বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গন ছাড়াইয়া নিকটবর্ত্তী

কোন সহর স্থানে হইলেই ভাল হয় এবং সুবিধা পাইলে কোন জলাশয়ের ধারে, পর্ব্বত সন্নিকটে কিংবা নদীতটে বা নির্ঝরণীর কোলে বা কোন স্বভাব মনোহর অরণ্যানীর একাংশে অবস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাগানের স্থান নির্ণয় হইয়া গেলে বাগানের বেষ্টনী বা বেড়ার চিন্তা সর্ব্বাগ্রে। শিক্ষকগণ প্রথমতঃই বেষ্টনীর আবশ্যকতা ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিবেন। তৈয়ারি বাগান থাকিলে কেন বেড়া দেওয়া আছে, না থাকিলে বা ক্ষতি কি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিবেন। তারপর বাগানটির রাস্তা পথ ঠিক করিয়া ফেলা বা রাস্তা পথের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেওয়া; অতঃপর বাগানটিকে বিদ্যালয়ের শ্রেণী বিভাগ অনুসারে বিভাগ করা। সব্জী ক্ষেত্র ও পুষ্প ক্ষেত্রের জন্য পৃথক স্থান নির্দ্দেশ ও তারপর বাহারী লতাপাতা গাছ দিয়া বাগানটিকে সাজান ইত্যাদি উদ্যান রচনার প্রথম কার্য্য সম্পাদন করিতে হয় অথবা তৈয়ার বাগান হইলে তাহার রচনা কৌশলের মর্ম্ম কথাচ্ছলে শিশুহৃদয়ে পরিস্ফুট করিয়া দিতে হয়।

বাগানে শিক্ষা দিবার প্রণালী শিশুজনোচিত হওয়া কর্ত্তব্য একথা আমরা সুরুতেই বলিয়া রাখিয়াছি।

প্রথম দ্বিতীয় বর্ষে সর্ব্ব নিম্ন দুই শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দকে—

(১) বাগানে ব্যবহারোপযোগী যন্ত্রাদির পরিচয় দিতে হয়।

(২) বৃক্ষ লতাদির নাম শিখাইতে ও উহাদের আকৃতিগত পার্থক্যের মোটামুটী একটা ধারণা করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে হয়।

(৩) উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের কার্য্য প্রণালী দেখাইয়া তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ শক্তির ক্রম বিকাশ ও কর্ম্মে অনুরাগ জন্মাইতে হয়।

(৪) কতকগুলি শাক সব্জী ফুল বীজের সহিত তাহাদের পরিচয় করিয়া দেওয়া এবং স্বহস্তে বীজবপন করিতে শিখান।

তৃতীয় চতুর্থ বর্ষে মধ্য দুই শ্রেণীর ছাত্রগণকে—

(১) কৃষি যন্ত্রাদির ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া।

(২) জমি প্রস্তুত, বীজ বপন, বৃক্ষলতাদি রোপণ।

(৩) বীজক্ষেত্র বা হাপর প্রস্তুত করা, চারা তোলা ও ক্ষেত্রে বসান।

(৪) শস্য কাহাকে বলে, নিত্য ব্যবহার উপযোগী ফল, ফুল, শস্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও চাষাবাদের প্রণালী শিক্ষা দেওয়া ও উহাদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য মূলতত্ত্ব অবগত করান।

(৫) প্রাঙ্গণ সজ্জা, গৃহ সজ্জা, টবে গামলায় গাছ বসান।

(৬) ফল শস্যাদি সম্বন্ধে গার্হস্থ্য ব্যবহার ও মিতব্যয়িতা শিক্ষা।

৫ম ও ৬ষ্ঠ বর্ষে উচ্চ দুই শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীগণের শিক্ষার বিষয়,—

(১) উদ্ভিদতত্ত্ব স্থূলতঃ বুঝান।

(২) শাক সব্জীর জীবন ইতিহাস।

(৩) বার্ষিক, দ্বিবার্ষিক শস্য ও স্থায়ী লতা বৃক্ষগুল্মাদির সহিত যথা সম্ভব পরিচয়।

(৪) কন্দ, মূলের বিচার।

(৫) বীজ নির্ব্বাচন, বীজ সংরক্ষণ।

(৬) বীজ হইতে চারা উৎপাদন ও লতা গুল্ম ও বৃক্ষাদির কলম প্রণালী।

(৭) উদ্ভিদের খাদ্য, উদ্ভিদের জীবন সংগ্রাম।

(৮) উদ্ভিদতত্ত্ব (Botany)—বৃক্ষাদির কাণ্ড, শিকড়, পত্র, ফল, ফুল সম্বন্ধীয় স্থূল তত্ত্ব।

(৯) বৃক্ষলতাদির উৎপত্তি, বীজের জীবনীশক্তি, বীজাঙ্কুরের জন্মবৃত্তান্ত।

(১০) শস্য নাশক কীট পতঙ্গাদির উপদ্রব ও তন্নিবারণোপায়।

(১১) মনুষ্য পশ্বাদির খাদ্য বিচার।

(১২) পুষ্পের প্রয়োজনীয়তা।

(১৩) আগাছা, কুগাছার দ্বারা ফল শস্যের ক্ষতি বুঝান এবং তন্নিবারণার্থে পূর্ব্ব সাবধানতা।

(১৪) জল সেচনের মর্ম্ম, তাহার উপকারিতা।

(১৫) মৃত্তিকা বিচার এবং মৃত্তিকার সহিত উদ্ভিদের সম্বন্ধ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বা গৃহস্থের স্বক্ষেত্রে উদ্যান ও কৃষির স্থূলতত্ত্বগুলি অবগত হইলে তবে ভবিষ্যৎ জীবনে উদ্যান চর্য্যার বা কৃষিতত্ত্বের বা উদ্ভিদ তত্ত্বের সূক্ষ্ম সূত্রগুলির আলোচনার সুবিধা পাওয়া যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে জ্ঞানের প্রথমালোক তরুণ হৃদয় উদ্ভাসিত করে ভবিষ্যত জীবনে তাহা ক্রম বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উদ্যানচর্য্যা শিক্ষাদানকালে ছাত্রগণের কার্য্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। ক্ষেতটি আগাছা কুগাছায় পরিপূর্ণ হইলে, আবর্জ্জনাস্তূপ যথা তথা পড়িয়া থাকিলে, মৃত্তিকা যথেচ্ছা খোদিত হইলে, যথা তথা খানা খোন্দল থাকিলে, উদ্যান যন্ত্রগুলি ইতস্ততঃ পড়িয়া থাকিলে, উদ্যানটি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হইবে না। কার্য্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে না শিখিলে ভবিষ্যত জীবনে কাজের লোক হওয়া যায় না। বৃক্ষলতাদি রোপণের সময় নিরূপণ এবং সময়মত সব কাজ করিতে এখানে যেমন শিখা যায় এমন আর কোথাও শিখা যায় না।

একণে শিক্ষাবিভাগের নিকট আমাদের নিবেদন, তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর বালকগণের জন্য ও শিক্ষকগণের কার্য্যপরিচালনা জন্য পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারণ করুণ, স্কুলে স্কুলে উদ্যান ও কৃষিতত্বজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করুন। উদ্যানভূমির ব্যবস্থা করুন ও বাগানে ব্যবহারোপযোগী যন্ত্রাদি ও সাজসরঞ্জামের সমাবেশ করিয়া দিন। সরকারী সাহায্য ব্যতীত এ কার্য্য পূর্ণতা লাভ করিতে কোন কালেই পারিবে না। যতদিন তাহা না হয় ততদিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা নামে মাত্র পর্য্যবসিত থাকিবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহারোপযোগী কৃষি যন্ত্রাদি-
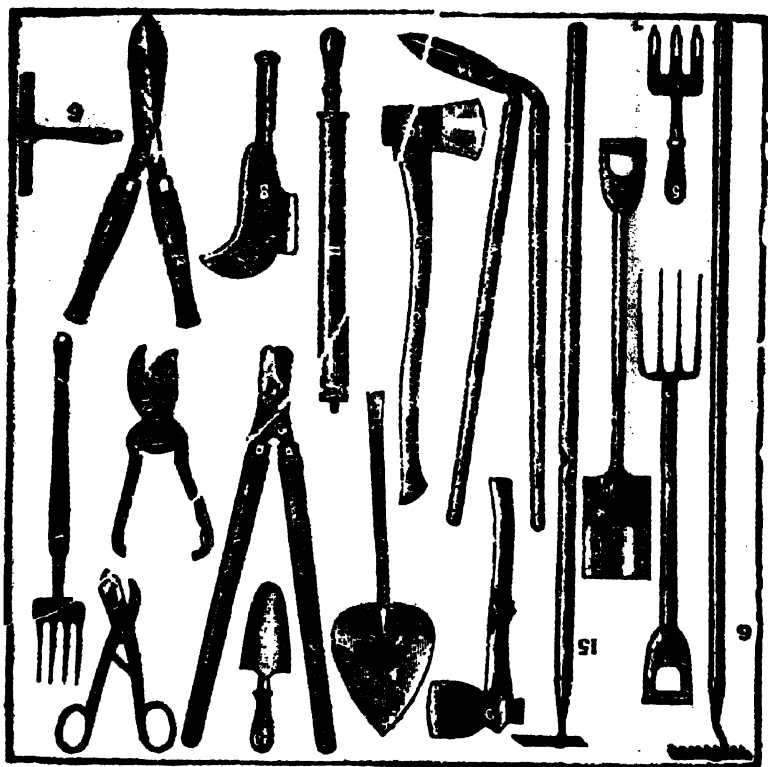
১। জমি নিড়াইবার জন্য—নিড়ানি।

২। শস্য কাটিবার জন্য—কাস্তে।

৩। জমিতে আঁচড়া দিবার জন্য—হাতবিদা। (৬)

৪। গাছের গোড়া আল্‌গা করিবার ও আগাছা তুলিবার জন্য—উইড্‌ফর্ক (৫)

৫। চারা তুলিবার জন্য—ট্রাওয়েল। (৩)

৬। গর্ত্ত খননের জন্য ও বড় গাছ তুলিবার জন্য—খোন্তা।

৭। জমি কোপাইবার জন্য—ছোট হাত কোদাল

৮। ডাল ছাঁটা ও ফুলতোলা—ছোট বড় কাঁচি।

৯। ক্ষেতে জল দিবার জন্য—জলের ঝারি ও ঝোমা।

১০। গাছ ধৌত করিবার জন্য—পিচকারী।

১১। মাপের জন্য—গজ কাটি।

১২। লাইন ঠিক করিবার জন্য—দড়ি।

১৩। ডাল কাটা ও সাধারণ কাজের জন্য—ছোট বড় ছুরি কাটারি।

স্কুল পাঠ্য কৃষি-পুস্তক—

উচ্চ চারি শ্রেণীর ছাত্রগণের পাঠের জন্য ক্রমান্বয়ে অধ্যাপক শ্রীগিরীশচন্দ্র বসু প্রণীত কৃষি সোপান ও কৃষিদর্শন; বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সহকারী ডিরেক্টর শ্রীনৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত সরল কৃষি-বিজ্ঞান ও শর্করা বিজ্ঞান; কৃষক সম্পাদক প্রণীত কৃষি সহায় ও বীজ বপনের সময় নিরূপণ পুস্তিকা; ভারতীয় কৃষি-সমিতি সম্পাদক শ্রীমন্মথনাথ মিত্র ও শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু প্রণীত সব্জী চাষ; কৃষি ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরি প্রণীত কৃষি-রসায়ন ও খাদ্য তত্ত্ব প্রভৃতি পুস্তকনির্ব্বাচনের পরামর্শ দেই। ইহার মধ্যে অধিকাংশ পুস্তকই ভারতীয় কৃষি-সমিতি হইতে প্রকাশিত ও কৃষক অফিসে প্রাপ্তব্য।

পত্রাদি।

—:•:—

আশু ও আমন ধান সরু, মোটা—

শ্রীকাশীচন্দ্র সেন গুপ্ত, মাণিকছড়ি; চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন ১—আউস ধান—সরু ও মোটা সি পি আউস আছে কি না এবং টাকায় কত সের হিসাবে বিক্রয় করেন। এবং অন্য কোন ভাল আউস আছে কিনা যাহা আউস হইতেও বেশী ফলে এবং চাউল উৎকৃষ্ট হইবে। যদি থাকে তাহার নাম ও বিবরণ লিখিবেন।

উত্তর ১—আমাদের এ অঞ্চলে সি পি আউসের ফলস অত্যন্ত কম হইত বলিয়া ভারতীয় কৃষি-সমিতি সে আউস চাষ ছাড়িয়া দিয়াছে। কেলে রাঁঙি, রূপসাল, লক্ষ্মী পারিজাত প্রভৃতি আউস ধানের চাষই অধিক লাভজনক বলিয়া মনে হয়। ইহাদের মধ্যে লক্ষ্মী-পারিজাত কথঞ্চিৎ সরু, চাউল অপেক্ষাকৃত শাদা। অন্যগুলি মোটা কিন্তু ফলনে অপেক্ষাকৃত অধিক। লক্ষ্মী পারিজাত ভাল জমীতে বিঘায় ৩ মণ, অপরগুলি বিঘায় ৪ মণ ফলে।

প্রশ্ন ২—শালি ধানের মধ্যে খুব ফলে এবং চাউলও উৎকৃষ্ট এইরূপ ধান আছে কি না যদি থাকে তবে তাহার নাম ও কোন সময় রোপণ ও কোন সময় পাকিবে বিবরণ টাকায় কত সের হিসাবে বিক্রয় করেন লিখিবেন পাটনাই ও পেশোয়ারি ধান আমাদের এইখানে হয় কি না এবং তাহার ফলন কেমন জানাইবেন।

উত্তর ২—এতদঞ্চলের শালি (আমন) ধানের মধ্যে বাঁকতুলসী, দাদখানি, বাসমতি কামিনীসরু, হরিমন্নী এইগুলি বেশ মিহি ও উৎকৃষ্ট চাউল হয়। পাটনাই, সিলেট প্রভৃতির অপেক্ষাকৃত মোটা চাউল কিন্তু চাউল সুন্দর, ভাত সুস্বাদু নয়। ফলনে দাদ্খানি, বাঁক-তুলসী অপেক্ষা অধিক। পাটনাই সিলেট প্রভৃতি এখানে বিঘায় ৬ হইতে ৮ মণ ফলে কিন্তু দাদখানি প্রভৃতির ফলন ৫ হইতে ৭ মণের অধিক হয় না। ভারতীয় কৃষিসমিতি পেশোয়ারি সোয়াতি ধানের চাষ ক্রমান্বয়ে ৪ বৎসের যাবৎ করিয়া দেখিয়াছে। ইহার ফলন এ প্রদেশে ৩।৪ মণের অধিক হয় না। ধান ক্রমান্বয়ে মোটা হইয়া যায়। দামের জন্য কৃষক অফিসে পত্র লিখুন।

কলাগাছের সার,—

শ্রীকিশোরি মোহন পাল, নছিপুর, হুগলী।

প্রশ্ন—৩০০ বিঘা কলা বাগান করিতে চাই—কলাগাছে কি সার প্রদান করা যাইবে কিরূপে প্রদান করা যাইবে ?

উত্তর—অনেকবার এই আলোচনা হইয়াছে আবার নূতন করিয়া বলি যে, কলাগাছে উদ্ভিজ্জ কিম্বা জান্তব সার, পটাস ও ফস্ফরিকাম্লসার প্রয়োগ করিতে হয়। উদ্ভিজ বা জান্তব সার হইতে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ বা জান্তব সার পচাইবার জন্য কিঞ্চিৎ চূণ প্রদান প্রয়োজন। কলার পাতা, খোলা বা ঘুঁটে (শুষ্ক গোময়) দগ্ধ করিয়া যে ছাই পাওয়া যায় তাহা হইতে পটাস পাওয়া যায়। ফস্ফারিকাম্লসার প্রদানের জন্য হাড়ের গুড়া ব্যবহার করিতে হয়। রেড়ির খৈল প্রদান করিলেও নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের কার্য্য হয়। অধিকন্তু রেড়ীর খৈল প্রদান করিলে গাছের পোকা লাগার আশঙ্কা কম থাকে। রেড়ীর খৈল তিব্র গন্ধে পোকা রে পলায়।দু রেড়ীর খৈলে

ফাস্ফরিকাম্ল সারে কিছু মাত্রায় আছে। যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ভিজ্জ ও পটাস সার থাকে। প্রত্যেক কলাগাছের ঝাড়ে মাঝারি ঝোড়ার দুই ঝোড়া হিসাবে পাঁক মাটি, অর্দ্ধসের পরিমাণ রেড়ীর খৈল, এক পোয়া গুঁড়া চুণ ও কিছু পরিমাণ ছাই প্রদান করিলে সেই ঝাড়ে সম্পূর্ণ সার দেওয়া হইল। প্রতি বৎসর ফল পাকান্তে মৃত কলাগাছের এটে (গোড়া) তুলিয়া অধিক তেউড় মারিয়া ঝাড় সাফ করিয়া এরূপ সার প্রদান করিতে হয়। কার্ত্তিক মাস এই কার্য্যের বিশিষ্ট কাল আপনি লিখিয়াছেন যে, ৩০০ বিঘা কলা বাগান করিবেন। আপানার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না কারণ আমাদের দেশের লোক বিস্তৃত ফলের বাগান রচনা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন এ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। যদি সত্য বড়ই সুখের কথা। বিস্তৃত বাগান করিলে তবে অতি হিসাব করিয়া সার প্রদান বা অন্যান্য কার্য্য করিতে হয়—যাহাতে লোকসান না হয়। ২৫ টা বা ৫০ টা কলাগাছ বসাইয়া এত সতর্ক হইবার আবশ্যক হয় না। সাধারণতঃ খনার বচনটি মনে রাখা ভাল।

গোয়ে গোবর, কলার মাটি।
অফলা নারিকেলের শিকড় কাটি॥

কলাগাছের আহার্য্য সারের প্রায়ই সমুদই পাঁক মাটিতে আছে। উদ্ভিজ ও জান্তব সার আছে, পটাস আছে, ফস্ফরিকাম্ল আছে, চূণ আছে।

সূর্য্যমুখী ফুলের চাষ ও মাটবাদাম বসাইবার সময়, বিঘা প্রতি কত বীজের পরিমাণ—

শ্রীতারণকৃষ্ণ ভৌমিক, চাঁদপুর, পানসী পাড়া, রাজসাহী।

প্রশ্ন—সূর্য্যমুখী ফুলের বিস্তৃত আবাদ করিতে চাই—কখন চাষের সময় ও বিঘাতে কত বীজ বপন করিতে হইবে? বীজ কোথায় পাওয়া যাইবে?

উত্তর—বাঙ্গালা দেশে চাষের সময় বর্ষার পর আশ্বিন কার্ত্তিক মাস। বিঘা প্রতি দেড় সের বীজ বপন করিলে যথেষ্ট হইবে। রসিয়ান সূর্য্যমুখীই চাষের উপযোগী। এই বীজ ভারতীয় কৃষি-সমিতীর অফিসে ও অন্য বীজ বিক্রেতার নিকট পাওয়া যাইতে পারে।

প্রশ্ন—মাটে বাদামের চাষের সময়? বিঘা প্রতি বীজের পরিমাণ? বীজের দাম—?

উত্তর—মাটবাদামের চাষ দুইবার হয় একবার গ্রীষ্মে—বৈশাখ জৈষ্ট মাসে, আর একবার আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বিঘা প্রতি বীজের পরিমাণ গুঁটি সমেত ৵৫। ৵৬ সের

কিম্বা শুঁটি ছাড়ান বীজ /৩। /৪ সের পর্য্যন্ত। বীজের খুচরা দর প্রতি সের ।০ আনা। আবশ্যক হইলে প্রতি মণ ৮৲ টাকা।

চেস্‌নট্, বিচমাষ্ট—

প্রশ্ন—চেস্‌নট (Chestnuts), বিচমাষ্ট (Buchmost) এই সকল গাছ এদেশে হয় কি না?

উত্তর—চেসনট বাদাম স্পেন দেশীয় বাদাম। বীচ গাছও ইয়ুরোপীয় গাছ। এতদ্দেশে হিমালয় পর্ব্বত উপত্যকায় হইতে দেখা যায়। বাঙ্গালায় সমতল ভূমিভাগে এই সকল হইতে দেখা যায় না।

বিন, লেনটিল্—

সীম (বিন, Beans), লেনটিল্ (Lentil)—সীম মটর আদি—

প্রশ্ন—বিন, লেনটিল্ আদি এখানে হয় কি?

উত্তর—বহুবিধ সীম মটর এদেশে হইয়া থাকে, তাহার তালিকা—Hand book of Agriculture কিম্বা কৃষি সহায় পুস্তকে পাইবেন।

সার-সংগ্রহ

—:*:—

ভারতে লবণের ব্যবহার—

আমাদের দেশীয় লবণ বন্ধ হওয়া অবধি নানা প্রকার বৈদেশিক লবণ বিক্রয়ার্থ কলিকাতায় আমদানি হইতেছে। উৎপত্তি স্থানের নামানুসারে লবণের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়া থাকে। যথা—লিবারপুল লবণ (Liverpool salt), জার্ম্মান লবণ (German salt), ফ্রেঞ্চ লবণ (French salt), ইতালীয়ান লবণ (Italian salt) সেলিফ লবণ (Salif salt), পোর্টসৈয়দ লবণ (Port Said salt), জেদ্দা লবণ (Jeddha salt), মস্কট লবণ (Muscat salt), এডেন লবণ (Aden salt)। কেবল বোম্বাই (Bombay) ও মান্দ্রাজ (Madras) হইতে দেশীয় লবণ অল্প

পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া কলিকাতায় আমদানি হয়। ইহার ব্যবহারও বেশী নহে।

লবণ দুই ভাগে বিভক্ত ; যথা—পাঙ্গা (Powdered salt), ও কর্কচ (Kurkutch salt)। প্রথমে যখন লিভারপুল হইতে পাঙ্গা লবণ আমদানি হইতে আরম্ভ হইল, হিন্দুগণ উহাকে অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত মনে করিয়া ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য হিন্দুগণ, ফ্রান্স, ইতালি, জেদ্দা প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত কর্কচ অর্থাৎ ডেলা লবণ নিজ নিজ গৃহে চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিতেন। এক্ষণে সে ভ্রম অপসারিত হইয়াছে, দুইপ্রকার লবণই ব্যবহার অবাধে চলিতেছে।

লবণ দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়। কয়েক প্রকার লবণ স্বভাবতঃ জন্মে এবং কয়েক প্রকার জল হইতে উৎপন্ন করা হয়। লিবার পুল লবণ ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী চেসায়ারে (Cheshire) সমুদ্রের জল হইতে উৎপন্ন হয়। সমুদ্রের লবণময় জল অল্প গভীর পুষ্করিণীতে আনীত হইলে, উহা সূর্য্যের উত্তাপে ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যায়। তৎপরে অবশিষ্ট কর্দ্দমময় জলকে বৃহৎ বৃহৎ লৌহ কটাহে জাল দিয়া অনাচ্ছাদিত স্থানে স্তূপাকারে রাখা হয়, রৌদ্রে ও শিশিরে ইহা পরিস্কৃত হয়। লবণ যত পুরাতন হয়, তত শ্বেত ও সূক্ষ্ম হয়। লিবারপুল লবণ আবার দুই প্রকার,—সূক্ষ্মদানা (stoved or fine) ও মোটাদানা (Butter salt)। ইহা জলপথে ভারতবর্ষে আনা হয়। প্রতি জাহাজে প্রথমোক্ত লবণ একভাগ ও শেষোক্ত লবণ দুইভাগ থাকে।

জার্ম্মাণ লবণ, জার্ম্মাণির অন্তঃপাতী হামবর্গ (Hamburgh), আন্তয়ার্প (Antwerp) ও ব্রিমেন (Bremen) নগরে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা স্বভাবতঃ ভূমির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় জন্মায়। তদ্দেশীয়গণ এই সকল পাহাড় হইতে লবণ কর্ত্তন করিয়া কলে পেষণ করতঃ এ দেশে পাঠায়। পিষাই হইলে এই লবণ অতি সূক্ষ্ম হয়। লিবার পুল লবণ অপেক্ষা ইহাতে অধিক ক্ষার থাকে বলিয়া, ইহা অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তথাকার লোকেরা আহার ব্যতীত অন্যান্য অনেক প্রকারে ইহা ব্যবহার করে। লবণের পাহাড় হইতে কাচের ন্যায় পাতলা স্তর কাটিয়া স্থানে কাচের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে এবং বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার দরজায়ও বসান হয়। আমাদের দেশে কেবল গুঁড়া লবণই আইসে।

সৈন্ধব লবণ—

আমাদের দেশে এক প্রকার সৈন্ধব লবণ (Rock salt) পাওয়া যায়। ইহা অতি বিশুদ্ধ লবণ। গুঁড়া করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। ইহাও পার্ব্বতীয় লবণ। সমুদ্র উপকূলস্থিত মৃত্তিকা কোন নৈসর্গিক কারণে ভূমির উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া পর্ব্বতোপরে

স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেবার্চ্চনায় ও মাঙ্গলিক কার্য্যে এই লবণই ব্যবহার হইয়া থাকে।

সমবায়-সমিতি—

যুক্তপ্রদেশের ছোটলাটের বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই যে সমবায়-সমিতিগুলি এইটুকু জানিয়া রাখা উচিত যে, উত্তমর্ণ বা সুদখোর মহাজনদিগের অত্যাচার দমনই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য নহে। সমিতিগুলির সাহায্যে যে অর্থ ও সুবিধা জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত হইতেছে, তাহার প্রকৃত সদ্ব্যবহারই মুখ্য লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপনের সাপক্ষে ইহা আশা করা যায় যে, এক্ষণে যে টাকা গৃহে নিতান্ত অলস ও অকর্ম্মণ্য ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে, সেই টাকা পরে এই ব্যাঙ্কের হস্তে আসিতে পারে। তখন এই টাকায় দেশের কল্যাণ হইবে। তিনি বলেন, "গ্রামের সুদখোর মহাজনদিগের হস্তে যে টাকা রহিয়াছে, আমি সে টাকার কথা বলিতেছি না; সে টাকা সমবায়-সমিতিগুলিই ক্রমশঃ গ্রহণ করিবে। দেশের ধনীদিগের অর্থসম্বন্ধেই আমি একথা বলিতেছি। ইঁহারা অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিতে করিতে জানেন না। আমি এই সকল টাকা দেশের শিল্পকৃষির উন্নতি ও অন্যান্য সংকার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে ইচ্ছা করি। যে পরিমাণ অর্থ এক্ষণে মামলা মোকদ্দমায় ও অন্যান্য অনাবশ্যক কার্য্যে ব্যয়িত হইতেছে, সেই অর্থ দ্বারা দেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের ও দেশের প্রভুত কল্যাণ সাধিত হইবে।"

কৃষিকার্য্যের উন্নতি—

বিশেষজ্ঞগণের প্রস্তাব—সম্প্রতি পুসায় কৃষিতত্ত্বজ্ঞ বিশেষবিদ্‌গণের এক সম্মিলন হইয়াছিল। সম্মিলনে উত্থাপিত প্রস্তাবের মধ্যে একটী এই :—হাতে কলমে উন্নতপ্রণালীর কৃষিপদ্ধতি কৃষকদিগকে দেখাইয়া দিবার জন্য যে ব্যয় হইবে, গবর্মেণ্ট তাহার ব্যয়ভার বহন করিবেন। এই ভাবে হাতে কলমে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় না বলিয়া এ দেশের কৃষকেরা উন্নতপ্রণালীতে কৃষিকর্ম্ম করিতে চাহে না। যাহাতে কৃষকদিগকে উন্নতপ্রণালীর কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য হাতেকলমে দেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃতভাবে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হয় গবর্মেণ্টকে তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহ করিতে হইবে। এক্ষণে সরকারী কৃষিবিভাগে যে সকল কর্ম্মচারী আছেন তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। তাঁহাদের দ্বারা এই বিরাট কর্ম্মসাধিত হওয়া অসম্ভব।

প্রস্তাবটী সমীচীন হইয়াছে। যাহা বহুদিন পূর্ব্বে উত্থাপিত হওয়া উচিত ছিল, তাহা এতদিনে হইয়াছে। সুখের বিষয় কৃষিতত্ত্বের সরকারী বিশেষজ্ঞগণ এতদিনে বুঝিয়াছেন যে, কৃষকদিগকে সরকারী ব্যয়ে হাতেকলমে উন্নতপ্রণালীর কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা দিতে না পারিলে তাহারা কোনও মতেই আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্য করিবে না। সরকারী ইস্তাহার, রিপোর্ট, পুস্তক, পুস্তিকা বুলেটিন বিতরণ এবং জেলায় জেলায় আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিলে কৃষকেরা উন্নত প্রণালী অনুযায়ী কৃষিকর্ম্ম করিবে না। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এ সকল উপায় দ্বারা কোনও ফলই হয় নাই। পরে তথাকার কৃষিবিভাগ গবর্মেণ্টের ব্যয়ে কৃষকদিগের নিজস্ব ক্ষেত্রে গিয়া হাতেকলমে চাষের পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। সে পরীক্ষায় সুফল ফলিতেছে এবং তাহাদের অভ্যস্ত প্রণালী অপেক্ষা নূতন প্রণালীতে বেশী ফসল উৎপন্ন হইতেছে দেখিয়া তাহারা অতঃপর নূতন পদ্ধতিতে কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ করিতেছে। মার্কিণের শিক্ষিত কৃষকেরাও কেবল মুখের কথায় প্রাচীন কৃষিপদ্ধতি ত্যাগ করে নাই; সুতরাং এদেশের নিরক্ষর কৃষকেরা কি প্রকারে প্রাচীনের মায়া বর্জ্জন করিবে?

কৃষকদিগের কোনও একটী ক্ষেত্র লইয়া, সেই ক্ষেত্রে সরকারী খরচে হাতে কলমে নূতন প্রণালীতে চাষ করিয়া যদি গবর্মেণ্টের কৃষিবিভাগ দেখাইতে পারেন যে, নূতন পদ্ধতিতে পুরাতন অপেক্ষা চাষ ভাল হইতেছে তাহা হইলে এদেশের কৃষকেরাও তাহাদের চিরকালের অভ্যস্ত প্রণালী ত্যাগ করিয়া নূতন পথের পথিক হইবে। এরূপ হাতে কলমে চাষবাসের পরীক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত না হইলে কোনও ফল হইবে না। কিন্তু গবর্মেণ্ট এ পক্ষে একটু মুক্তহস্ত হইবেন কি?—"বাঙ্গালী"।

বাগানের মাসিক কার্য্য

ফাল্গুন মাস।

সব্জী বাগান—তরমুজ, খরমুজ, শশা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি যে সকল দেশী সব্জী চাষ মাঘ মাসে প্রায় সমস্তই আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এই মাসে প্রায় শেষ করিতে হইবে।

সজীক্ষেত্রে জল সেচনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। চাপানটে বীজ এইসময় বপন করিলে ও জল দিতে পারিলে অল্পি গরুর নটে শাক পাওয়া যায়।

কৃষিক্ষেত্র—ছোলা, মটর, যব, শরিসা, ধনে প্রভৃতি সমুদয় এতদিনে ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া গোলাজাত করা হইয়াছে। এইসময় ক্ষেত্র সকল চষিয়া ভবিষ্যতে পাট, ধান প্রভৃতি শস্যের জন্য তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। ইক্ষু এই সময় বসান হইয়া থাকে। আদা, হলুদ এই সময় জমি হইতে উঠান হয়। হলুদ ও আদার মুখীগুলি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বসাইবার জন্য বাছাই করিয়া রাখিয়া, বাকী ঘর খরচ অথবা বিক্রয় হয়।

ফলের বাগান—ফলের বাগানে আম, লিচু, লকেট, পিচ প্রভৃতি ফলবৃক্ষে জল দিবার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কার্য্য নাই। গোলাপ জামের গাছে যাহাতে ফলের চাকি করিয়াছে সেই গুলি চট দিয়া বাধিয়া দিতে হয়। চট মুড়িয়া না দিলে গোলাপ জামের ফল উৎকৃষ্ট হয় না।

ফুলের বাগান—এখন বেল, জুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুলগাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুলগাছগুলির তদ্বির না করিলে জল্‌দি ফুল ফুটবে না। জল্‌দি ফুল না ফুটিলে পয়সা হইবে না। ব্যবসায়ি কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

টব বা গামলার গাছ—এইসময় টবে রক্ষিত পাতাবাহার, পাম প্রভৃতি ও মৃণাল ফুল ও বাহারি গাছ সকলের টব বদলাইয়া দিতে হয়।

পান চাষ—পান চাষ করিবার ইচ্ছা করিলে এই সময় পানের ডগা রোপণ করিতে হয়।

বাঁশের পাইট—বাঁশ ঝাড়ের তলায় পাতা সঞ্চিত হইয়াছে, সেই পাতায় এই সময় আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই ছাই বাঁশের গোড়ায় সারের কার্য্য করে, এবং নিম্ন-বঙ্গে যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক, সেইখানে এই প্রকার বহুদূরব্যাপী অগ্নি জ্বালিলে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।

ঝাড়ের গোড়া হইতে পুরাতন গোড়া ও শিকড় উঠাইয়া না ফেলিলে ঝাড় খারাপ হয়। আগুন দ্বারা পোড়াইলে এই কার্য্যের সহায়তা হয়। পুকুরের পাঁক মাটিতে বাঁশের খুব বৃদ্ধি হয়।

কৃষক।

সূচীপত্র।

ফাল্গুন ১৩২২ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

আলু চাষের কথা

—:*:—

শ্রীনিবারণ চন্দ্র চৌধুরী এম, আর, এ, এস, ডিপ-ইন-এগ্রি লিখিত

বঙ্গদেশের মধ্যে হুগলী, বর্দ্ধমান, দারজিলিঙ্গ, রঙ্গপুর ও জলপাইগুড়িতে যথেষ্ট পরিমাণে আলু উৎপন্ন হয়। বেহারের প্রায় সর্ব্বত্র, ছোটনাগপুরের মধ্যে হাজারিবাগ রাঁচি ও পালামৌ জেলায় এবং উড়িষ্যায় মাত্র কটকে আলুর চাষ আছে। এতদ্দেশে প্রায় সর্ব্বত্র আলু জন্মান যাইতে পারে। উত্তরবঙ্গে এবং বেহারের অন্তর্গত মতিহারী জেলায় আলুতে জল সেচনেরও প্রয়োজন হয় না। তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানে জল সেচন ব্যতীত আলু জন্মে না। বালু মিশ্রিত মাটীতে অধিক ফসল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মেটেল মাটীতে ফসল কম হয় বটে, কিন্তু কৃষকগণ বলে যে, এই মাটীর আলু অধিকদিন রক্ষা করা যাইতে পারে, তজ্জন্য যখন আলু দুষ্প্রাপ্য হয় তখন এই আলু অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়।

বঙ্গদেশে—শেওড়াফুলি (বৈদ্যবাটী), মেমারী, পোস্তা (বড়বাজার), বালিয়াঘাটা, ঘুম, আসামে চিরাপুঞ্জি; বেহারে পাটনা, কলগাঁও ও বেতিয়া বীজ—আলুর প্রধান বাজার। এক্ষণে দারজিলিঙ্গ ও ঘুম পাহাড় ব্যতীত বঙ্গদেশে কোন স্থানেই বীজ আলু রক্ষা হয় না। বৈদ্যবাটী ও মেমারীতে, প্রধানতঃ পাটনা হইতে বীজ আলু আমদানি হয়। পোস্তা বাজারে নৈনিতাল, আম্বালা ও ঘুম পাহাড় হইতে বীজ আলু আসে, বেলিয়াঘাটে দেশীয় নৌকায় চেরাপুঞ্জি হইতে বীজ আলু আসিয়া থাকে। কলগাঁওের বীজ আলু প্রধানতঃ পাটনায় বিক্রয় হয়। বেতিয়া আলু, বেহার ও যুক্তপ্রদেশের সর্ব্বত্র চাষ হইয়া থাকে। পাটনাই আলু বেহারে ও বঙ্গদেশের বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলায় প্রচুর পরিমাণে চাষ করা

হয়। যুক্ত-প্রদেশে এই আলু সামান্ত পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত আলুগুলিকে আট শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। যথা—

১। পাটনাই—কানপুরী

২। পাটনাই—সহারণপুর

৩। বেতিয়া

৪। কলগাঙ্গীয়া

৫। বোম্বাইয়া

৬। কারিয়া

৭। নৈনিতাল

৮। আম্বালা

ইহারা অনেক স্থলে বিভিন্ন নামে পরিচিত।

১। পাটনাই—কানপুরী। ইহার বীজ আলু প্রথমতঃ দারজিলিং হইতে পাটনায় আসে। পাটনায় চাষ হইলে ইহা পাটনাই আলু নামেই খ্যাত হয়। কিন্তু পাটনার কৃষকগণ ইহাকে কানপুরী আলু বলে। সমতল ভূমিতে এই আলু ১৪ সপ্তাহে পরিপক্ক হয়। সমতল ভূমিতে ইহার ফসল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এইজন্য ইহার চাষ বহু বিস্তৃত। ইহার গাত্রের বর্ণ রক্তাভা বিশিষ্ট; অভ্যন্তরে হরিদ্রাভাযুক্ত। এই আলু সিদ্ধ করিলে বিলক্ষণ আটালে হইয়া থাকে। ইহার বীজ আলু * দারজিলিং হইতে আনা হয়। এই বীজ আলু খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া পাটনায় রোপিত হয়। প্রত্যেক খণ্ডে এক একটী করিয়া চক্ষু থাকে। ইহা কাটিয়া রোপণ করা হয় বলিয়া ইহাকে "কাটোয়া" বলে। ইহার ফলন অধিক হয় না। ইহা হইতে যে আলু উৎপন্ন হয় তাহাকে পাটনায় "নয়কা" বা "এক মাটিয়া" বীজ বলে। নয়কা বীজ হইতে উৎপন্ন আলুকে "দোমাটিয়া" বীজ আলু বলে। দোমাটিয়া বীজ হইতে যে আলু ফলে, তাহকে "তেমাটিয়া" বলে। দোমাটিয়ার ফলন কাটোয়ার ফলন অপেক্ষা অধিক কিন্তু নয়কার ফলন অপেক্ষা কম। তেমাটিয়া আলু পাটনায় বীজ আলু বলিয়া ব্যবহৃত হয় না। কারণ ইহার ফলন অত্যন্ত কম এবং ইহার বীজ রাখিলে অধিকাংশ পচিয়া যায়। এই আলু খুব সস্তায় বিক্রয় হয়। সস্তায় পাইয়া বিদেশী পাইকারগণ ইহা খরিদ করিয়া লইয়া যায় ও বীজরূপে বিক্রয় করে। কখন কখন তাহারা এই আলু নয়কা অথবা দোমাটিয়া আলুর সহিত মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করে। শেওড়াফুলীর পাইকারগণ কদাচিৎ নয়কা আলু আমদানী করে। তাহারা দোমাটিয়া আলুকেই "নয়কা" বলিয়া কৃষকদিগকে প্রতারণা করে। জমীর অবস্থা ও আলুর আকৃতি অনুসারে বীজ আলুকে পাটনায় পুনরায় বিভাগ করা হয়। আলু,

* ইহাকে দারজিলিংএর অধিবাসিগণ "রেত" আলু বলে

ফুলকপি বা আলুর চাষ করিয়া সেই জমীতেই সেই বৎসরই বীজ আলু উৎপন্ন করিলে তাহাকে "দোহন" আলু বলে। আর যে জমীতে বর্ষাকালে কোন ফসল থাকে না তথায় আলু উৎপন্ন করিলে তাহাকে "চৌমাস" বীজ বলে। এইরূপে বীজ আলুকে এক মাটিয়া "দোহন" বা এক মাটিয়া "চৌমাস" অথবা "দোমাটিয়া দোহন" বা "দোমাটিয়া চৌমাস" নাম প্রদত্ত হয়। আকৃতি অনুসারে পাটনায় বীজ আলুকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। ডিম্বাকৃত আলুকে "মাঝোলা", সুপারি আকৃতি বিশিষ্ট আলুকে "গোল্‌কি" ও মটরের আকৃতির বীজকে "নান্‌কি" বা "ঝেরি" নামে পরিচিত। বড় আলু তরকারীর জন্যই ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজ রাখিলে পচিয়া যায়। অধিকাংশ কৃষক "গোলকী" আলুই পছন্দ করে। বিঘায় ৩ মণ "মাঝেলা", ২ মণ "গোল্‌কী" ও ৩০ সের "নান্‌কি" বীজের প্রয়োজন হয়। গোল্‌কী বীজের দর অধিক এবং "নান্‌কি" বীজ সস্তা। অন্যদিকে ৩ মণের স্থলে ৩০ সের বীজে ১ বিঘা রোপণ করা যায়। এইজন্য গয়া ও পশ্চিম দেশীয় কৃষকগণ "নান্‌কি" আলুই অধিক খরিদ করে। কিন্তু ইহার ফসল খুব কম। "মাঝোলার" ফসল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বীজের মধ্যে "দোহন" সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া বিবেচিত হয়। তৎপরে "চৌমাস"।

২। পাটনাই সহরুয়া—এই আলু পাটনায় বহুদিন যাবৎ চাষ হইতেছে। ইহার ফলন "নয়কা কানপুরী" আলুর প্রায় অর্দ্ধেক। এইজন্য তথায় এখন ইহার চাষ যৎসামান্য মাত্র। পাটনার অনেক কৃষকের নিকট ইহার গন্ধ ও স্বাদ বড় প্রীতিকর, এইজন্য তাহারা তাহাদের ব্যবহারের জন্য অতি অল্প পরিমাণে এই আলুর চাষ করিয়া থাকে। এই আলু তিন মাসে পরিপক হয়। ইহার আকৃতি বড় ও লম্বা, চর্ম্ম মোটা ও ঈষৎ রক্তবর্ণ বিশিষ্ট। চক্ষু গভীর, অভ্যন্তরে হরিদ্রাভাযুক্ত। সিদ্ধ করিলে এই আলু খুব আঠালে হইয়া থাকে। অনেক দিন এই আলু ঘরে রাখা যাইতে পারে।

৩। বেতিয়া—"বেতিয়া" আলু বহুদিন যাবৎ মতিহারী জিলার অন্তর্গত বেতিয়া সবডিভিসনে চাষ হইতেছে। এই আলু পাটনা, কানপুরী আলুর ন্যায় ফলপ্রদ নয়। কিন্তু এই আলু অনেক দিন পর্য্যন্ত ঘরে রাখিয়া ব্যবহার করা যায়। এইজন্য তথাকার কৃষকগণের নিকট এই আলু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদরণীয়। তিন মাসে এই আলু পরিপক হয়। ইহার ফলন অধিক নয় বলিয়া বাঙ্গালার কৃষকগণ ইহাকে মোটেই পছন্দ করে না। তবে পাটনাই বীজ আলুর অভাব হইলে, বাঙ্গালী কৃষকগণ সামান্য পরিমাণে ইহার চাষ করিয়া থাকেন। ইহার আকৃতি ক্ষুদ্র ও অনেকটা গোলাকার, চর্ম্ম পাতলা ও ঈষৎ রক্তাভাবিশিষ্ট, চক্ষু গভীর, অভ্যন্তরে ইহার বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাভাযুক্ত। বৎসরে প্রায় ৫০ হাজার মণ এই বীজ আলু অন্যত্র রপ্তানি হয়। গত পাঁচ বৎসর যাবৎ দুই তিন প্রকার পোকার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে বীজ রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

৪। কলগাছিয়া—এই আলু ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত কলগাছে চাষ হইয়া থাকে। পাটনাই আলুর একার্দ্ধের অধিক ইহার ফলন হয় না। এই আলু ঘরে অনেক দিন রক্ষা করা যায়। অল্প সময়ে অর্থাৎ মাত্র দুই মাসে এই আলু পরিপক্ক হয়। এইজন্ত পাটনার কৃষকগণ এই আলু বিলক্ষণরূপে চাষ করে। তাহারা অতি প্রথমে নূতন আলু বিক্রয় করিয়া বেশ লাভ করিয়া থাকে। বর্ষা থাকিতে না থাকিতেই উচ্চ জমিতে এই আলু চাষ করিয়া থাকে। এইরূপ ভূমির এক ফুট তলে বালি বা কাঁকর থাকা আবশুক, তাহা না থাকিলে এই ভূমির জল শীঘ্র নিকাশ হয় না। সুতরাং বর্ষা হইলে এই জমীর আলু পচিয়া যায়। ইহা আকৃতিতে মধ্যম ও দেখিতে ডিম্বের ন্যায়। চক্ষু অগভীর ও রক্তবর্ণ বিশিষ্ট। অভ্যন্তরের বর্ণ বেতিয়া আলুর অনুরূপ। চর্ম্ম পাতলা ও নাইনিতাল আলুর ন্যায় শুভ্র। আলুর পোকা দ্বারা বীজ বিনষ্ট হওয়ায় কলগাছে ইহার বীজ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে।

৫। বোম্বাইয়া—আসামের অন্তর্গত চিরাপুঞ্জি পাহাড়ে এই আলু প্রধানতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। দারজিলিঙ্গেও এই আলু অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পাটনায় এই আলুকে দারজিলিঙ্গা আলু বলে। ইতঃপূর্ব্বে হুগলী ও ২৪ পরগণা জেলায় এই আলু যথেষ্ট পরিমাণে চাষ হইত। তথায় ইহা বোম্বাইয়া বা চিরাপুঞ্জি আলু নামে খ্যাত। এই আলু অনেক দিন রক্ষা করা যায় না। এই জন্য ইহার চাষ কমিয়া গিয়াছে। সমতল ভূমিতে প্রথম বৎসরে ১২ সপ্তাহে এই আলু পরিপক্ক হয়। তৎপরে মাত্র নয় সপ্তাহের প্রয়োজন হয়। ইহার আকৃতি ডিম্বের মত; কিন্তু তদপেক্ষা বৃহৎ। চর্ম্ম মোটা ও মসৃণ। চর্ম্মের বর্ণ রক্তাভাবিশিষ্ট শুভ্র; অভ্যন্তরের বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাভাযুক্ত। চক্ষু গভীর।

জগদীশচন্দ্র বসুর বক্তৃতা

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সভাস্থলে অধ্যাপক বসু তাঁহার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে পাশ্চাত্য আদর্শে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে মূর্ত্ত ও জীবনীশক্তিসম্পন্ন করিতে হইলে ভারতীয় নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও মনস্বীবর্গকে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারের সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে। বিজ্ঞান প্রাচীর বা প্রতীচীর

কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে। তবে যে দেশে ইহা বৃদ্ধি পাইয়াছে,—সেই দেশের মৃত্তিকা ইহাকে বিশেষ ভাবে পরিপুষ্ট করিয়াছে। পাশ্চাত্যখণ্ডে বিজ্ঞানকে বহু শাখায় বিভক্ত করিবার ঐকান্তিক আগ্রহের ফলে একটা বিষম বিভ্রাট সংঘটিত হইয়াছে। সে বিভ্রাট এই যে, এই বিশ্বে একটা বিরাট বিজ্ঞান আছে,—অন্যান্য শাখা-বিজ্ঞান তাহারই অন্তর্ভুক্ত—একথা তথাকার লোক বুঝিতে পারিতেছে না। বিশ্বের এই বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের মধ্যে যে একটা বিরাট সাম্য ফিরিতেছে,—এই সত্য কেবলমাত্র যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না করিয়া, পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, বিজ্ঞানের রাজ্যে বিশেষ সম্পদ বৃদ্ধি করা হইবে। জড়ের উপর শক্তির কার্য্যসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে করিতে বক্তা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, জড়ের ও চেতনের মধ্যস্থিত সীমান্ত রেখাটি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং জড় ও চৈতন্যের মেশামেশি ভাবটা ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিস্ময়ে বিভোর হইয়া গিয়াছে। অদৃশ্য আলোকসম্বন্ধে অনুসন্ধান দ্বারা লব্ধ তথ্য হইতে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই বিশাল বিশ্বের দিগন্তবিসারী আলোক-পারাবারে মানুষ প্রায় অন্ধবৎ দণ্ডায়মান। কিন্তু এই অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় লইয়া মানুষ বিজ্ঞানবলে যে চিন্তার ভেলা রচিয়াছে,—তাহা অবলম্বন করিয়া তাহারা এই অজ্ঞাত সাগর পার হইতে সাহসী হইয়াছে। দৃশ্যমান আলোকের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়,—সে আলোকের রাজ্য দর্শন-শক্তির সীমানা পারে অবস্থিত সেইরূপ অনুসন্ধানের দ্বারা যখন দেখা গেল, সে স-রব জগত নী-রব জগতে যাইয়া নিমজ্জিত হইয়াছে, তখনই জন্মমৃত্যুর সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান সম্ভাবনার গণ্ডীর মধ্যে আসিয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—মানবের জীবনের সহিত, মানবের জীবনী শক্তির সহিত উদ্ভিদের জীবনের কোনরূপ সম্বন্ধ সংস্থাপনের সম্ভাবনা আছে কি? এই সমস্যা কেবল স্বপ্নরাজ্যের কল্পনার দ্বারা সমাধান করিবার বিষয় নহে, উদ্ভিদদিগের আপন আপন স্বাক্ষরযুক্ত সাক্ষ্য দ্বারা সমাধান করিতে হইবে, পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ঐ সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে। মানব জীবনীর সহিত উদ্ভিদ্ জীবনীর একত্ব বা সমত্ব সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। বক্তা অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র উদ্ভাবিত করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, উদ্ভিদের জীবনীশক্তি ও তৎসম্পর্কিত তারতম্য এবং জীবের জীবনী শক্তি ও তৎসম্পর্কিত তারতম্য একই। এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার ফলে শরীর বিদ্যা, ভৈষজ্য-বিদ্যা ও মনো-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন অনুসন্ধানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল সমস্যার সমাধান অসম্ভব বলিয়া মনে হইত, তাহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামূলক অনুসন্ধানের আমলে আসিয়াছে। শরীর বিজ্ঞানে জীবন ও মরণের লক্ষণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরব্ধ হইয়াছে এবং জীবের স্বেচ্ছায় কার্য্যকারিত্ব সম্বন্ধে সমস্যার সমাধান কল্পে অনুসন্ধান চলিতেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে,—জৈব বস্তুর (protoplasm) উপর ঔষধের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কিরূপ তাহার অনুসন্ধান আরব্ধ হইয়াছে। একই ঔষধ দুই

বিভিন্ন ব্যক্তির উপর প্রযুক্ত হইলে পরস্পর বিপরীত ক্রিয়া প্রকাশ করে কেন,—সেই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে। উদ্ভিদ্ দেহে স্নায়বিক স্পন্দনের আবিষ্কার ফলে মনোবিজ্ঞানে নূতন তথ্য সংযোজিত হইয়াছে। উদ্ভিদের স্নায়ুতে আবিষ্কৃত কতকগুলি প্রত্যক্ষ ব্যাপার হইতে বুঝা গিয়াছে যে, সুখ ও দুঃখ রূপ অনুভূতি কেবল বাহ্য শক্তি প্রয়োগের তারতম্য অনুসারে সংঘটিত হয় না,—পরন্তু ঐ প্রযুক্ত শক্তির অনুভূতিবাহী স্নায়ুমণ্ডল পূর্ব্বে যে ভাবে অনুরঞ্জিত থাকে, তদনুসারেই সুখ দুঃখের অনুভূতি হয়। কৃত্রিম উপায়ে এইরূপ স্নায়ুমণ্ডলে এরূপ অনুরঞ্জনের তারতম্য করা যায়। এইরূপ আরও অনেক অনুষ্ঠানের সূচনা ভারতেই হইয়াছে। উহা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর প্রভাব বিস্তৃত করিবে। এই ব্যাপারটি কি এক ব্যক্তিতেই নিবদ্ধ থাকিবে,—এবং একই ব্যক্তির সহিত ইহার শেষ হইবে,—অথবা ভারতের এই অবদান এক সম্প্রদায় মনস্বীর দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া, বিজ্ঞানের রাজ্যে ভারতের দানের পারম্পর্য্য-গৌরব রক্ষা করিবে? ভারত যদি পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে কিছু দান করে, তাহা হইলে,—আমাদের সকলের আশানুরূপ ভারতের গৌরব বর্দ্ধিত হইবে। যত দিন ভারতবাসী জগতের বুদ্ধিমান জাতিদিগের মধ্যে স্থানলাভ না করিতেছে,—ততদিন অতীত গৌরবের কথা বলাই উচিত নহে। ভারতের এই অধঃপতন কেন হইল, ভারতকে তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে,—এবং আত্মপ্রসন্ন ও সঙ্কীর্ণ অভিমানকে মন হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে। উহা সংঘাতিক দুর্ব্বলতা। তাহার উন্নতির পথে বাধা কি? তাহার মন কি কুসংস্কার-বিজৃম্ভিত ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে নাই; পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। ভারতের প্রাচীন ঋষিরা চিন্তাসম্বন্ধে স্বাধীনতারই পক্ষপাতী ছিলেন। যে সময় গোরি ও ব্রুনোকে তাঁহাদের মতামতের জন্য দগ্ধ করিয়া ফেলা হইতেছিল, সেই সময় আর্য্যঋষিগণ বলিয়াছেন, বেদবাক্যও যদি সত্যের সহিত সম্পর্কশূন্য হয়,—তাহা হইলে তাহাও পরিত্যজ্য। তাহারা সকল বিষয়ে অজ্ঞাতকারণের অনুসন্ধান করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন,—তাঁহাদের মতে অতি-জাগতিক ব্যাপার কিছুই নাই,—সবই অজ্ঞাতকারণ ফলে সংঘটিত হইতেছে। তাঁহারা জ্ঞানের প্রসার ভয়ে ভীত ছিলেন কি? কখনই না। তাঁহাদের মতে জ্ঞানই ধর্ম্ম। উপসংহারে বসু মহাশয় বলেন,—এই আশা আমাদের অনুপ্রাণিত করিবে। হিন্দুর শিক্ষার এক অপূর্ব্ব জীবনীশক্তি আছে, যাহা কালের ধ্বংসিনী শক্তিতে ধ্বংশ করিতে পারে নাই।

গৃহস্থালী

———:•:———

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।

আজ কাল যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে, সকল দিক রক্ষা করিয়া চলা, মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়িয়েছে। পূর্ব্বে বোধ হয় সমাজে মধ্যবিত্ত লোকের অবস্থাই সকলরূপে স্বচ্ছল ছিল, আর তখন সকলে মনের শান্তিতে কাটাইতেও পারিয়াছেন। আজ কাল কিন্তু সেই সমাজের অবস্থা অতীব শোচনীয়। দশের সঙ্গে মিলিতে মিশিতে হইবে; সমাজের চাল চলন বজায় রাখিতে হইবে। সমাজের চাল, চলন অন্যরকম হইয়াছে,—সমাজে ফেসন প্রবেশ করিয়াছে। সমাজ অর্থে এখন কেবল ফাঁকা আদব কায়দা ও কতকগুলি ফেসনের সমষ্টি। হাতে পয়সা নাই, ঘরে খাবার নাই কিন্তু, ফেসন মাফিক চলা চাই, এটা যে কেবল পুরুষের পক্ষে সত্য এমত নহে স্ত্রী সমাজে এটা বরং আরও বেশী সংক্রামক আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বে গৃহলক্ষ্মীগণ হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতেন। সংসারিক কাজ কর্ম্মে সারাদিন অতিবাহিত করিতেন। এই সকল কাজের মধ্যে, বোধ হয় প্রধানই ছিল, গৃহপালিত পশুর সেবা, সন্তান পালন, দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথীর সেবা, ধান্যাদি খাদ্য শস্যের আহরণ, ও সংরক্ষণ, ধান ভাঙ্গিয়া চাউল তৈয়ারি করা, কলাই ভাঙ্গিয়া দাউল প্রস্তত করা, রন্ধন পরিবেষণ করা। সাঁজে সকালে স্ত্রীলোকগণের এক মুহূর্ত্ত কর্ম্মের বিরাম থাকিত না। মধ্যাহ্নে বা বৈকালে বা অন্য অবসর সময় সংসারিক, গৃহস্থালীর কত খুটিনাটি কাজ করিতে হইত তাহার গণনা হয় না,—জিনিষ পত্রের খোজ লওয়া, যেখানে যিটি থাকিবে রাখিয়া দেওয়া, মশারী খানা ছিঁড়ে গেছে তাহাতে একটা তালি দেওয়া, বালিশটার ওয়াড় নাই উহার ওয়াড় সেলাই করা, ছেলে মেয়ের জন্য কাঁথা সেলাই করা ইত্যাদি কত কাজই গৃহলক্ষ্মী-গণ করিতেন, কত হিসাব দিব। আজকাল, নানা ফেসনের বিলাতি সুজনী উঠিয়াছে, আমরা বাবু হইয়াছি, গৃহলক্ষ্মীগণ বিলাসিনী হইয়াছেন, এখন আর তাই গৃহলক্ষ্মীগণ কাঁথা সেলাই করেন না, আর করিতেও চাহেন না। পাচকে রন্ধন করিতেছে, চাকরে সমুদয় কাজ করিতেছে, তবু তাঁহারা অবসর পান না, মূল্যবান সময়, ঘুমে ও বাজে গল্প গুজবেই কাটাইয়া দেন, যেই সময়ে নাকি সামান্য, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলে সংসারের অনেক উপকার হয়, এই দুর্দ্দিনে, ভ্রাতা, পিতা, স্বামী প্রভৃতির অনেক পয়সা ইচ্ছা করিলেই বাঁচাইতে পারেন কিন্তু আমাদের শিক্ষার এতই বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে যে, এত কষ্টে সংসার চালাইতেছি, তবু চিন্তা করিনা বা চেষ্টা করি না যাহাতে সংসারের দু পয়সা বাঁচিতে পারে তাহার কেমন করে ব্যবস্থা করিব।

আজ আমি যাহা বলিব তাহা অতি সহজ সাধ্য কাজ, যাহা নাকি, আমাদের গৃহের কুললক্ষীগণ অনায়াসেই শিখিতে পারেন; আর উহা শিক্ষা করিলে তাঁহারা তাঁহাদের পিতা ভ্রাতা স্বামী পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়গণের অনেক বৃথা অর্থব্যয় বাঁচাইতেও পারেন। এই বিষয়টী অন্য কিছুই নহে, সহজ কাজ—আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য জামা কাপড় সেলাই করা।

আমরা অধিক মাত্রায় জামা কাপড় ব্যবহার করিতে শিখিয়াছি এবং তাহাতে আমাদের অতি মাত্রায় ব্যয় হয়। অনেকদিন হইতে আমার মনে হইতেছিল, কিরূপে আমরা সংসারের একটা বড় খরচ কমাইতে পারি, তাহার কোন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে কিনা? এতদিনের পর আমি এই উপসংহারে পৌছিয়াছি যে, যদি আমাদের গৃহলক্ষীগণ, আমাদের, কার্য্যের কিছু সাহার্য্য করেন (যাহাতে কতকগুলা বৃথা খরচের হাত হইতে নিজ পরিশ্রম দ্বারা আমাদিগকে বাঁচাইতে পারেন এইরূপ হয়) তবে আমাদের অনেক ব্যয় বাহুল্য কমিয়া যাইতে পারে। আজ কালকার খরচের মধ্যে পোষাক একটা সর্ব্ব প্রধান। খাওয়া অপেক্ষা পোষাকে অধিক খরচ হয় বলিলে ভুল হয় না। [illegible] এমন সামান্ত জামার জন্য, দরজির নিকট যাই যাহা নাকি সামান্ত [illegible]টা ১০।১২ বৎসরের বালিকায় তৈয়ার করিতে পারে, যেমন, বালিসের [illegible], মশারী, ছেলেদের সর্ব্বরকম আটপৌরে জামা, মেয়েদের সেমিজ। এই [illegible]নিষ বোধ হয় প্রতি পরিবারেই মেয়েদিগকে সামান্য শিক্ষা দিলেই নিজেরা উহা তৈয়ার করিতে পারেন। ভেবে দেখুন এই সমুদয় সামান্য সামান্ত জিনিষের জন্য, প্রতি ভদ্র পরিবারের বাৎসরিক কত টাকা দরজির দেনা মিটাইতে হয়।

যাহাতে এই সমুদয় নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষগুলা, অতি সামান্ত লেখা পড়া জানিলেও বই দেখিয়া একটু চেষ্টা ও অভ্যাস করিলে শিখিতে পারেন তাহার জন্য, যতদূর আমার সাধ্য স[illegible]সেলাই শিক্ষা প্রথম ভাগ নামে একখানা বই লিখিয়াছি। উহা সাধ্যমত সরল ভাষাতেই লিখিতে চেষ্টা করেছি, ইহার বিষয়গুলা ধারা বাহিক রূপে শিক্ষা করিলে গৃহ-ব্যবহার্য্য সমুদয় আবশ্যকীয় জামা কাপড় সেলাই শিক্ষা একরূপ সম্পূর্ণ না হউক [illegible]কটা শিক্ষা করিবার আশা করা যাইতে পারে। এই সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি, সময়মত কৃষকেও বাহির করিবার ইচ্ছা রহিল, স্থানাভাব বশতঃ এইবার ইহা হইতে অধীক অগ্রসর হইতে পারিলাম না।

আপনাদের মধ্যে যে কেহ সেলাই সম্বন্ধে যে কোন প্রশ্ন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন উহা আমি আমার সাধ্যমত উত্তর দিতে ত্রুটী করিব না। মধ্যবিত্ত সমাজে ইহার খুব বিস্তার হউক ইহাই আমার আন্তরীক অভিপ্রায়।

আমার ঠিকানা—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাময়িক কৃষি-সংবাদ

—:*:—

বাঙলায় কৃষি শিক্ষা—বাঙলাদেশে কোন কৃষি কলেজ নাই। এই হেতু বাঙলায় ছাত্রগণকে বাধ্য হইয়া উচ্চ কৃষি-শিক্ষা লাভার্থ সাবর কৃষি কলেজে যাইতে হয়। সাবর কলেজের অধ্যক্ষের বিবরণীতে প্রকাশ যে বিগত বর্ষে মার্চ্চ মাসে যে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে তাহাতে পাঁচটি ছাত্রের মধ্যে ৪টি ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগে, দুইজন বিহার ও উড়িষ্যা কৃষি-বিভাগে কর্ম্ম পাইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে এই প্রদেশের ৮ জন ছাত্র উক্ত কৃষি কলেজের নিম্ন শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াছে।

১৯১৪ সালে একটি বঙ্গদেশীয় ছাত্র পুষাতে কৃষি বিদ্যা লাভার্থ প্রবেশ করিয়াছিল। সেই ছাত্র দুই বৎসরকাল কৃষি ও ব্যবহারিক উদ্ভিদতত্ত্ব শিক্ষা করিয়া এক্ষণে ছত্রকতত্ত্ব শিক্ষা করিতেছে। পুষাতে সম্প্রতি মাসিক ৩০৲ ত্রিশ টাকা [illegible] ছাত্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যে কোন ছাত্র এই বৃত্তি লইয়া দুই বৎসরকাল এখ[illegible] করিতে পারিবে। এখনও পর্য্যন্ত এই বৃত্তি লাভার্থ কোন ছাত্র জুটে নাই।

প্রাইমারি স্কুলে কৃষিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ তত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ সাক্ষাত সম্বন্ধে বস্তু দ[illegible] শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু এইরূপ শিক্ষা দানার্থ উপযুক্ত শিক্ষক [illegible] এবং এতসম্বন্ধীয় যে সমস্ত দ্রব্যাদির প্রয়োজন তাহার অভাব লক্ষিত হইতেছে। রঙপুর সম্মিলনীতে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের সহিত এই বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। ঢাকা ট্রেনিং কলেজের শিক্ষকগণ কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু শিক্ষা পাইতেছেন।

কলিন্‌পঙে স্কুল সংলগ্ন দুইটি উদ্যান আছে। একটি উদ্যানে ছো[illegible]ট শিশু-ছাত্রগণ বৃক্ষ লতাদি উৎপন্ন করে। অপর উদ্যানে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্রগণ কৃষিতত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্বের স্থূল হইতে সূক্ষ্মতত্ত্বগুলি ক্রমশঃ আলোচনা করিতে শিক্ষা করে।

গভর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্র সমূহে শিক্ষানবিশ লওয়া হইতেছে। যুবকবৃন্দ এখানে [illegible] হাতিয়ারে কাজ করিবার অবসর পাইতেছে। এই শিক্ষা প্রাপ্ত যুবকেরা এতা[illegible] কৃষি প্রদর্শকের (Agricultural demonstrator) কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পা[illegible]। সকলে কৃষিপ্রদর্শক হইতে না পারিলেও এবং সকলের ভাগ্যে সরকারী চাকুরি না জুটিলেও তাহারা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে বা বে-সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারে এবং যে কোন উপায়ে দেশের কৃষিকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া কৃষিজ্ঞানের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে।

বর্দ্ধমান ক্ষেত্রে আলু—বিগতবর্ষে আলু চাষের পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইটালিয়ান জাতীয় আলু হইতে এক একরে ১৮৬ মণ আলু উৎপন্ন হইতে পারে কিন্তু নৈনিতালের ফলন একরে ৬০ মণ মাত্র। ভারতীয় কৃষি-সমিতির গোবিন্দপুর ক্ষেত্রে নৈনিতাল, আমড়াঝাঁটি বা কানপুরী, বোম্বাই এই কয় জাতীয় আলুর চাষ করা হইয়াছিল। দার্জ্জিলিঙ আলুর নামই বোম্বাই আলু। কানপুরী আলুর ফলনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাঁড়াইয়াছে। ফসলের পরিমাণ নিম্নানুরূপ—

কানপুরী	৮১	মণ প্রতি বিঘা
দার্জ্জিলিং	৬৫	,, ,,
নৈনিতাল	৪৫॥	,, ,,

বঙ্গদেশের মধ্যে হুগলী জেলাই আলু চাষের প্রধান কেন্দ্র বলিতে হইবে। এখানে নৈনিতাল আলুর চাষই অধিক। এখানে যদি ফলন খুব কম হয় তবে বিঘায় ৬০ মণের নিম্নে হয় না [illegible] ফলন সাধারণতঃ বিঘায় ৮০।৮৫ মণ হইয়া থাকে। ভারতীয় কৃষি- [illegible] শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র পাল বর্ত্তমান বর্ষে এক বিঘা জমিতে ৮৬ মণ [illegible] করিতে পারিয়াছেন। বিঘায় তিনি ১০ মণ রেড়ীর খৈল খরচ করিয়াছিলেন [illegible] সপ্তাহ অন্তর আটবার সেচ দিয়াছিলেন, তাঁহার ক্ষেত্রে কাটা ও গোটা উভয় প্রকারেই আলু বসান হইয়াছিল, উভয়বিধ আলুর ফলন প্রায়ই সমান। তাঁহার বিঘা প্রতি বীজ আলুর পরিমাণ গোটা ৫ মণ এবং কাটা ২॥০ মণ পরিমাণ মত লাগিয়াছিল।

কা[illegible] কালনা প্রভৃতি অঞ্চলে চাষীরা বিঘা প্রতি ২৫ মণ হিসাবে শরিষার খৈল ব্যবহার [illegible] তাহারা দেশী ও কানপুরী আলু বিঘা প্রতি ১০০ মণের অধিক ফলাইতে পারে। হুগলী ও বর্দ্ধমানের কতকাংশে আলুর ফলন যেমন হয় বাঙলায় কোথায়ও তদনুরূপ হয় না।

ঢাকা ক্ষেত্রে আউস ধানের ফলন—আউস ধানের বীজ বাছাই করিয়া বপন করা হইয়াছিল। বীজধান লবনজলে ফেলিয়া নিমজ্জিত ভারি বীজ লইয়া চাষ করা হয়। একর প্রতি এক মণ ও অর্দ্ধমণ বীজ বপন করা হয়, ফলন যথাক্রমে ১৮॥০ সাড়ে আঠার মণ ও ১৩।২ তের মণ বার সের।

বৰ্দ্ধমানে ইন্দ্রশালী ধান—আমন ধানের পরীক্ষায় ইন্দ্রশালী ধানের ফলন অধিক বলিয়া স্থির হইয়াছে। বিগত বর্ষে আবহাওয়া তাদৃশ অনুকুল না থাকিলেও একর প্রতি ১৩।০ সোয়া তের মণ হইয়াছে। এতদঞ্চলে নাগরার ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। নাগরা মোটা ধান, ইহার ফলন এই বৎসর ১১॥০ সাড়ে এগার মণের অধিক হয় নাই। বাদসাভোগ, সমুদ্রবালি, বাঁকতুলসীর ফলন আলোচ্য বর্ষে অত্যন্ত কম। শেষ শেষ সময়ে বৃষ্টি অভাব বশতঃ এই সকল ধান ভাল ফুলে নাই। ঢাকাতেও ইন্দ্রশালী ধান্যের চাষ হইয়াছে। তথাও ইহা ফলনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাঁড়াইয়াছে।

২৪ পরগণার বারুইপুর, মগরা, ডায়মণ্ড হারবার প্রভৃতি অঞ্চলে পাটনা, সিলেট, বাঁকতুলসী, হরিময়ী ধানের চাষই অধিক। দাউদখানির চাষও অল্প বিস্তর আছে। ভারতীয় কৃষি-সমিতি অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইয়াছে যে বৰ্ত্তমান বর্ষে ধানগুলির গড়ফলন নিম্নলিখিতরূপ—

পাটনাই, সিলেট	৮	মণ	প্রতি বিঘা
হরিময়ী	৬॥০	,,	,,
বাঁকতুলসী	৫	,,	,,
দাউদখানি	৪॥০	,,	,,

ভারতীয় কৃষি-সমিতির নির্দ্দেশমত এতদঞ্চলের চাষীরা বিঘা জমিতে দুই বা আড়াই মণ হিসাবে শরিষার খৈল ব্যবহার করিয়া সুফল পাইয়াছে।

নিঃস্ব চাষীগণ উক্ত সমিতির উপদেশমত বিল জমির ধান-ক্ষেতে মাটিকা গোময় ছড়াইয়া দিয়া তাহাদের মৃতপ্রায় ধান গাছগুলিকে আবার সতেজ করিয়া তুলিতে পারিয়াছে। অন্ততঃ মাঝারি ঝুড়ির ২০ ঝুড়ি গোময় বিঘা প্রতি প্রদান না করিলে তাদৃশ ফল হয় না।

বৰ্ত্তমান ক্ষেত্রে পাট—এখানে দেশী পাটই ভাল জন্মিয়াছে, ফলন,—

দেশী (Corchours olitorius)—১৬ মণ প্রতি একর

পুবে পাট (C. Capoularis)—১৪ মণ ,,

বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে পলিপড়া জমিতে পাটের ফলন অধিক হইয়া থাকে, তথায় ফলন, বিঘায় সাধারণতঃ ৬।৭ মন একরে ১৮।২০ মণ। অনুকূল অবস্থায় বিঘায় ১০ মণ, একরে ৩০ মণ পর্য্যন্ত ফলন দাঁড়ায়।

বিহার এবং উড়িষ্যায় পাটের আবাদ, ১৯১৫—বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশে মোট ১৮৮,১০০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। এই প্রদেশের পুর্ণিয়া জেলাতেই বেশী পাটের আবাদ হয়। বর্ত্তমান বর্ষে গত বৎসর অপেক্ষা ১২২,৩৯০ একর কম জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে অর্থাৎ মোট ১৫৮,৮৩০ একর জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে। গত বৎসর হইতে য়ুরোপ মহাদেশের ভয়ঙ্কর যুদ্ধের জন্য পাটের বাজার নরম থাকায় এবৎসর এরূপ কম চাষ হইয়াছে। নিম্নে বিগত ৫ বৎসরের পাটের আবাদের [illegible] দেওয়া গেল।

ইং ১৯১২	সালে	মোট	২৫৮, ১০০	একর
১৯১২	,,	,,	২৯৮, ৩০০	,,
[illegible]১৩	,,	,,	২১৮, ৪০০	,,
১৯১৪	,,	,,	৩৭০, ১০০	,,
১৯১৫	,,	,,	১৮৮, ১০০	,,

ইহা হইতেই বুঝা যায় যে পূর্ব্ব চারি বৎসরে ক্রমান্বয়ে পাট চাষের কিরূপ উন্নতি [illegible] বৃদ্ধি পাইতেছিল। গত বৎসর হইতে যুদ্ধ বাধিয়া পাটের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া [illegible]ছে এবং বাজারও অত্যন্ত নরম আছে।

ফাল্গুন, ১৩২২ সাল।

জল সেচনের সরকারী ব্যবস্থা

—:*:—

উত্তম বীজ, সার ও মৃত্তিকার ন্যায় জলও কৃষিকার্য্যের জন্য একান্ত আবশ্যক, তাহা সকলেই জানেন। অধিকাংশ স্থলেই জলের জন্য কৃষককে বৃষ্টির উপর নির্ভর [illegible] কিন্তু অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি বশতঃ চিরকালই কৃষিকার্য্যের ক্ষতি হইয়া থাকে। বা[illegible]নের এখনও এতদূর উন্নতি হয় নাই যাহাতে স্বল্পাধিক বারিপাতের সম্ভাবনা পূর্ব্ব হইতে সঠিক বলিতে পারা যায় এবং তদ্দারা কৃষক উপকৃত হয়। পক্ষান্তরে সকল সভ্য ও উন্নত দেশেই দৈবের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর না করিয়া কৃষিকার্য্যের জন্য আবশ্যকীয় জল সঞ্চয় ও বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এতদ্দেশেও বহু পুরাকাল হইতে খাল বিল পুকুর খনন প্রভৃতি কার্য্য পুণ্যলাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে কৃষিকার্য্যের জন্য কূপ, তড়াগ, খাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার কথা দূরে থাকুক, পানীয় জলের জন্যই জলাশয়ের অভাব প্রায় প্রতি গ্রামেই দেখিতে পাওয়া যায়। নূতন জলাশয় ত হইতেছেই না বরং যে সমুদয় পুরাতন জলাশয় ছিল তাহাও বহুদিনের উপেক্ষায় ও অযত্নে আজকাল কেবল ম্যালেরিয়া বীজ বহনকারী মশকের জন্মক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে। বস্তুতঃ প্রাণী ও উদ্ভিদের উভয়েরই জীবন ধারণের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ পরিষ্কার জল যে কত আবশ্যক তাহা আমাদের দেশবাসীগণের মধ্যে অনেকেই বুঝেন না অথবা বুঝিলেও সমবেত চেষ্টায় তাহার প্রতিকারের উপায় করেন না। এরূপ অবস্থায় আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল সদাশয় গবর্ণমেণ্ট। লোকজনের ও কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট জলপথ ও জলাশয়াদির কিরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

জল সেচনের উপযোগী পূর্ত্তকার্য্য সমূহকে তিনটি প্রধান প্রণালীতে বিভক্ত করিতে পারা যায় ;—১। উত্তোলন (কূপ) ২। সঞ্চয় (পুষ্করিণী, দিঘী প্রভৃতি) এবং ৩। নদী (খাল প্রভৃতি) প্রণালী। ভারতের মোট কৃত্রিম উপায়ে জল সিঞ্চিত আবাদী জমির শতকরা ২৫ ভাগ কূপের জলে চাষ হয়। খালের জলে চাষের জমির ইহার দ্বিগুণ অপেক্ষা কিছু কম এবং পুকুরের জলে চাষের জমি ইহার অর্দ্ধেক অপেক্ষা কিছু বেশী। সুতরাং জল সেচনের হিসাবে খালই সর্ব্বপ্রধান, তৎপরে কূপ এবং তৎপরে পুকুর। বলা বাহুল্য যে অধিকাংশ কূপ এবং ছোট ও মাঝারি পুকুর বে-সরকারী সম্পত্তি, সুতরাং তৎসমুদয় হইতে যে কি পরিমাণ জমি আবাদের জল পাওয়া যায় তাহা বলা যায় না। বড় বড় দিঘী প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের খাস না হইলেও অনেক স্থলে তাঁহাদের তত্ত্বাবধারণে থাকে। খালসমূহ অবশ্য খাস সরকারী। এই শেষোক্ত দুই প্রকার জলাশয় হইতে কত জমি জল পাইয়া থাকে তাহার অঙ্ক গবর্ণমেণ্টের বিবরণীতে প্রকাশিত হয়।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, সকল সরকারী খাল হইতেই আবাদের জল পাওয়া যায় না। এমন অনেক খাল আছে যাহা কেবল লোকাদি যাতায়াতের জন্যই প্রস্তুত হইয়াছে পক্ষান্তরে কতকগুলি খালের উদ্দেশ্য কেবল জল নিকাশ অথবা জল সরবরাহ। এই সমস্ত খালই কৃষকের পক্ষে বিশেষ উপকারী। সরকারী হিসাবে পয়ঃপ্রণালী সমূহকে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র এই দুইটি শ্রেণীভুক্ত করা হইয়া থাকে। বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী আবার দুই প্রকারের ১ম উৎপাদক অর্থাৎ যে সমুদয় লাভের আশায় প্রস্তুত হইয়াছে এবং ২য় রক্ষক অর্থাৎ দুর্ভিক্ষাদির সময় লোকজনের জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থানের জন্য যে সমুদয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং যাহা হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা আপাততঃ কোন লাভের আশা নাই। ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালীসমূহ তিন শ্রেণীভুক্ত, কিন্তু ইহাদের শ্রেণীবিভাগ মূলতঃ উহাদের হিসাব নিকাশ লইয়া ; সুতরাং বর্ত্তমানস্থলে উল্লেখ অনাবশ্যক।

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উভয় প্রকার পয়ঃপ্রণালী হইতেই কৃষিক্ষেত্রের জল দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বিগত বর্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কি পরিমাণ জমি এই সমুদয় দ্বারা উপকৃত হইয়াছিল, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রদেশের নাম	জমির পরিমাণ, একর হিসাব
১। বঙ্গ	৮০,৯৫৮
২। মান্দ্রাজ	৩,৯৬৬,৭২৮
৩। বোম্বাই	২,৩১০,৭৮১
৪। যুক্ত প্রদেশ	২,৬৯৮,২৭২
৫। বিহার ও উড়িষ্যা-	৯৬৮,৮৫৬

৬।	পঞ্জাব	৭,৩০০,৩৩৪
৭।	ব্রহ্ম	৭৩৮,৬৭২
৮।	মধ্যপ্রদেশ	৬১,৮১৫
৯।	উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২৩৫,৬০৪
১০।	আজমীর মাড়বার	২৪,৪৯০
১১।	বৃটিস শাসিত বেলুচিস্থান	৬,৪১৬

ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে পঞ্জাব প্রদেশেই কৃত্তিম উপায়ে জল সিঞ্চিত জমির পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বস্তুতঃ মরুসদৃশ মধ্য পঞ্জাব এই সমুদয় খালের সাহায্যে আজকাল ভারতের অন্যতম শস্যক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে। এক চেনাব (চন্দ্রভাগা) খালই ২০ লক্ষ একার জমিতে জল প্রদান করে ; এতদ্ভিন্ন আরও বড় বড় খাল রহিয়াছে। পাঞ্জাবের পরেই মান্দ্রাজ। মান্দ্রাজে জল সেচনের খাল ভিন্ন প্রায় অন্যূন ৩০ হাজার বড় বড় পুকুর আছে। এগুলির তত্ত্বাবধান গবর্ণমেণ্টই করিয়া থাকেন। যুক্ত প্রদেশে ও উত্তর ও নিম্নগঙ্গার খাল এবং পূর্ব্ব যমুনার খাল যথেষ্ট পরিমাণ জমি আবাদের সহায়তা করিয়া থাকে। বোম্বাই প্রদেশেও জল সিঞ্চিত ভূমির পরিমাণ কম নহে। ভারতের বড় বড় প্রদেশসমূহের মধ্যে কেবল একমাত্র বঙ্গদেশেই কৃত্তিম উপায়ে জল সিঞ্চিত জমির মাত্রা অতি সামান্য দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যদিক হইতে দেখিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বঙ্গদেশে জলকরের মাত্রা খুব কম। একর প্রতি দুই টাকা মাত্র। বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে জলকর ৩৲; মান্দ্রাজ, যুক্ত প্রদেশ, ব্রহ্ম ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ৪৲; পঞ্জাবে ৫৲ এবং বেলুচিস্থানে ১০৲। অবশ্য জলকরের মাত্রা পয়োপ্রণালী প্রস্তুতের ও উহা তত্ত্বাবধানের খরচের উপর নির্ভর করে। বঙ্গদেশে মৃত্তিকা ও তদভ্যন্তরে জল সংস্থানের হিসাবে খরচ কম হইবারই কথা।

১৯১২-১৩ সাল পর্য্যন্ত এই সমুদয় পয়োপ্রণালীতে গবর্ণমেণ্টের ৬৫ কোটি টাকা মূলধন ব্যয় হইয়াছে এবং উক্তখালে মোট আয়ের পরিমাণ ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। সুতরাং লাভের মাত্রা শতকরা ৭ টাকারও অধিক। ২০ বৎসর পূর্ব্বে এই কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট ৩৫ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা আয় করিয়াছিলেন, অর্থাৎ গড়ে প্রায় শতকরা ৪॥০ টাকা হিসাবে হইয়াছিল। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে পয়ঃ-প্রণালী প্রতিষ্ঠায় গবর্ণমেণ্টকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয় নাই, বরং উত্তরোত্তর লাভের মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ১৩১২-১৩ সালে মোটে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ একর জমি পয়ো-প্রণালী সমুদয় হইতে জল প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভারতের মোট আবাদী জমির তুলনায় ইহা সামান্য মাত্র।

বঙ্গদেশের বিষয় বিশেষরূপে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে অপরাপর প্রদেশের ন্যায় এতদ্দেশে কৃত্রিম জল সেচনের তেমন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এইরূপ উক্তি প্রধানতঃ, পূর্ব্ববঙ্গ ও নিম্ন বঙ্গের কতিপয় স্থানের পক্ষে প্রযুয্য। অবশিষ্ট পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের কত জমি যে উপযুক্ত পরিমাণ জলাভাবে অনাবাদী পড়িয়া থাকে এবং কত পরিমাণ জমির ফসল যে সময়োপযুক্ত বারিপাতের অভাবে নষ্ট হইয়া যায় তাহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। কিন্তু এরূপ জমির পরিমাণ যে যথেষ্ট তাহা সকল কৃষি বিশেষজ্ঞই স্বীকার করিবেন। সরকারী বা বেসরকারী সভা সমিতিতে বহুকাল হইতে এই বিষয়ের আন্দোলন ও আলোচনা হইয়া আসিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে সম্যক মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। রেলপথের বিস্তারে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তাহার সামান্য অংশও যদি পয়োপ্রণালী প্রস্তুতে ও পুরাতন খাল বিল পুষ্করণী প্রভৃতির সংস্কারে ব্যয় হইত তাহা হইলে দেশীয় জনসাধারণের যে কত উপকার হইত তাহা গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে দেখিয়াও দেখিতে চান না।

অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি—উভয়ের দ্বারাই কৃষিকার্য্যের অপকার হইয়া থাকে। অথচ বৈজ্ঞানিক হিসাবে ভাবিতে গেলে একটি আর একটির প্রতিকার। অতি বৃষ্টির জল যদি সঞ্চয় করিতে পারা যায় তাহা হইলে অনাবৃষ্টির জন্য ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। যে সমুদয় সুসভ্যদেশে বারি পাতের একটা কিছু স্থির নিয়ম নাই সে সমুদয় দেশে বড় বড় পায়োপ্রণালী অথবা জলাশয় করিয়া বৃষ্টির জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাতে কৃষকগণকে একবারে দৈবমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। মিশরে, সোমাপোটেমিয়ায় পঞ্জাবে এই প্রকার পয়োপ্রণালা যে কত লোকের অন্ন সংস্থান করিয়া দিতেছে তাহা বলা যায় না। সুতরাং ইহা অতীব দুঃখের বিষয় এইরূপ কার্য্যের অতি শীঘ্র বিস্তার হইতেছে না। এক হিসাবে কৃষির উন্নতির চেষ্টা অপেক্ষা জল সেচনের ব্যবস্থা অধিক গুরুতর ও আবশ্যকীয় কার্য্য। কারণ জল না হইলে উৎকৃষ্ট বীজ, উন্নত প্রণালীর চাষ, উত্তম কৃষি যন্ত্র এবং উর্ব্বরতা উৎপাদক সার সকলই বিফল হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় কৃষির উন্নতির চেষ্টার সহিত জল সেচনের প্রণালীর প্রসারও একান্ত প্রয়োজনীয়।

কিন্তু এস্থলে বলা আবশ্যক যে কেবল গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে জল সেচনের কখনই পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ব্যবস্থা হইবে না। যাঁহারা পল্লীগ্রাম প্রভৃতির স্বাস্থ বিধানের জন্য আজকাল বন জঙ্গল পরিস্কারের ও পুষ্করিণী প্রভৃতির সংস্কারের মনোযোগ প্রদান করিতেছেন তাহাদের ইহাও জানা আবশ্যক যে শুধু পানীয় জলের জন্য নয়, চাষের জলের জন্যও জলাশয়ের ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। কারণ কৃষকের কোন লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে সে জলাশয় সংরক্ষণে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করিবেনা এবং কৃষকের সাহানুভুতি না থাকিলেও গ্রামে কোন অনুষ্ঠান সফল হওয়া সম্ভবপর নহে। অধিকন্তু জলাশয় প্রতিষ্টা করিতে হইলে বড় জলাশয় প্রতিষ্টা করাই উত্তম এবং যদি

কৃষকমণ্ডলীর সমবেত চেষ্টায় এইরূপ জলাশয় প্রতিষ্ঠা হয় তাহা হইলে খরচ যে কম হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। অবশ্য সকল স্থানে যে কৃষিকার্য্যের জন্য জলাশয় আবশ্যক হইবে তাহা আমারা বলিতে চাই না, কিন্তু উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে যে অনেক স্থলেই এরূপ জলাশয়ের বিশেষ অভাব রহিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

পত্রাদি

—:*:—

রঙপুর কৃষি-সমিতি—

শ্রীআশুতোষ মজুমদার সম্পাদক রঙ্গপুরকৃষি সমিতি—বিগত ২৫শে জানুয়ারী রংপুর কৃষি-সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় ডেয়ারী ফারমে একবৃহতী সভার অধিবেশন হয়। যে সমস্ত কৃষক কৃষিবিভাগের উপদেশানুসারে উন্নত প্রণালীতে চাষবাদ করিতেছে তাহাদিগকে উৎসাহ দানাথ এই সমিতি দ্বারা পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

রাজসাহি বিভাগের কমিশনার সাহেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের লোক যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় জমীদার, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী কৃষি-সম্প্রদায় ও সরকারী গণ্যমান্য কর্ম্মচারীবৃন্দ উপস্থিত হইয়া সভার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

এইসঙ্গে একটী ছোটখাট কৃষি-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল উহাতে কৃষিজাত দ্রব্য, উন্নত কৃষি যন্ত্রাদি, নানাপ্রকার নির্ব্বাচিত বীজাদি, ননাপ্রকার ইক্ষু ও গো খাদ্য এবং ডেয়ারী ফারমের উৎকৃষ্ট গোবৎসাদি দেখান হইয়াছিল। সমিতির সভাপতি মিঃ জে, এন্ গুপ্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুর সমীতির কার্য্যবিবরণী পাঠকালে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন যে নির্ব্বাচিত বীজ, সার ও যন্ত্রাদি দ্বারা অধিক পরিমাণে ফল লাভ করা যাইতে পারে।

অতঃপর বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের ডাইরেকটার মিঃ জেঃ আর ব্লেকউড মহোদয় এক সার গর্ভ বক্তৃতা দ্বারা ও এক বিস্তৃত হিসাব সাহার্য্যে বুঝাইয়া দিলেন যে,

উন্নত জাতীয় ও বাছা ধান ও উৎকৃষ্ট পাটের বীজ ব্যবহারে এই জিলায় এককোটী টাকা আয় বৃদ্ধি হইতে পারে।

তৎপর কমিশনার সাহেব ১৬জন কৃষককে পুরস্কার বিতরণ করেন; কৃষকগণ পুরস্কার স্বরূপ কৃষি যন্ত্র ও বীজাদি পাইয়াছে।

জমিদার শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ লাহিড়ী কাব্য ব্যকারণতীর্থ মহাশয় সভায় পঠিত সমিতির কার্য্য বিবরণী ও ব্লাকউড সাহেবের বক্তৃতার সারমর্ম্ম বাঙ্গালা ভাষায় অতিসুন্দর রূপে সকলকে বুঝাইয়া দেন। সর্ব্বশেষে স্থানীয় লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, বি, এল, মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন ও তাহার পর সভাভঙ্গ হয়।

এই উপলক্ষে ডেয়ারী ফারম সুচারুরূপে সাজান হইয়াছিল। ফারমের প্রবেশ দ্বার ধান্য ও জইর শীর্ষ, কফি ও তামাকের পাতা এবং ইক্ষুর দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল। প্রবেশ দ্বার হইতে সভাপ্রাঙ্গন পর্য্যন্ত রাস্তায় উভয় পার্শ্বে ইক্ষু দ্বারা সুশোভিত করা হয়।

মিঃ জেঃ এন্ চক্রবর্ত্তী ও তাহার সহকর্ম্মীগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও উদ্যোগে সভার কার্য্যাদি সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছে। কৃষি সমিতি তাহাদিগকে এই জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।

সম্ভবতঃ রঙ্গপুরের পূর্ব্বে বাঙ্গালার অন্যকোথাও এইরূপ কৃষি সমিতীর আয়োজন হয় নাই। স্থানীয় কৃষকগণ এবিষয়ে যেরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিল তাহাতে মনে হয় ভবিষ্যতে কৃষি সমিতি অধিকতর সুন্দর কর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিতে পারিবেন।

রঙ্গপুর কৃষি সমিতির এবংবিধ উদ্যোগ ও যত্নের ফলে আশাকরি বঙ্গদেশের কৃষকগণের মধ্যে নবোৎসাহের সঞ্চার হইবে।

শস্য ক্ষেত্রে ইন্দুর—

শ্রীভুতনাথ সেপাই, কল্যানপুর, ২৪ পরগনা

মহাশয়, ইন্দুরের উৎপাতে ক্ষেতের ধান কলাই রক্ষা করা ভার, বোধ হয় ক্ষেতের সিকি ফসল ইন্দুর বহন করিয়া লইয়া যায় ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?

উত্তর—ইন্দুর বংশের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করা বড়ই কঠিন। সেঁকো বিষ বা অন্য বিষ খাবারে মাখাইয়া রাখিয়া দিলে দুই এক দিন কতকগুলা ইন্দুর মরে বটে কিন্তু অবশেষে তাহারা শেয়ানা হইয়া যায় আর ঐরূপ খাবার স্পর্শ করে না। আবার নিকটে জলাশয় থাকিলে তাহারা সেই জল পান করিয়া বিষক্রিয়া হইতেও অব্যাহতি পায়।

কল পাতিয়াও বিশেষ কোন কাজ হয় না, কয়টা কল পাতা যাইবে এবং কত ইন্দুরই ধরিতে পারা যাইবে!

সাঁওতাল ও ভিলেরা ইঁদুর খায়। তাহারা ক্ষেতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ইঁদুর ধরে এবং গর্ত্ত হইতে ধান কলাই বাহির করে। কোন কোন স্থানে এরূপ নিয়ম আছে যে "এইরূপে" সংগ্রহিত শস্যের একের তৃতীয় অংশ তাহারা লয়, বাকী ক্ষেত্র-স্বামীকে দেয়। এই উপায়ে শস্য হানি কিছু পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে এবং ইঁদুরের সংখ্যাও কিছু হ্রাস হওয়া সম্ভব। কেহ কেহ বলেন ইন্দুর গর্ত্তের মধ্যে বাঁকনল সাহায্যে কাটকয়লা ও গন্ধকের ধুঁয়া প্রবেশ করাইতে পালিলে ইঁদুর মারিতে পারা যায়।—চেষ্টা করিয়া দেখা মন্দ নহে।

চাষের লাঙ্গল ও অন্য সরঞ্জাম অর্থ সাহার্য্য—

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কুণ্ড খাগড়া।—

আমি অতিক্ষুদ্রব্যক্তি; আপনি একজন কৃতবিদ্য ও বহুদর্শী এবং চাষকার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ; আপনার নিকট কয়েকটী বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি, আশা করি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে উপদেশ প্রদান করিয়া স্বীয় মহত্ত্বতার পরিচয় প্রদান করিবেন।

আপনি ১৩২০ সালের ফাল্গুনমাসের কৃষকে "তামাক" প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া দেখিলাম "চারারোপণ ও তদ্বির পরিচ্ছেদে" আপনি "হাত লাঙ্গল" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ঐ লাঙ্গল আমাদের দেশের বলদের দ্বারা চালিত কি হস্ত দ্বারা কলে চালিত লাঙ্গল? বলদ মহিষের সাহায্য ব্যতীত হস্ত দ্বারা চালান যায় এমন লাঙ্গল আমাদের দেশে কোন কোম্পানীর কারখানায় পাওয়া যায় কিনা?

Turn Wrest—মাটি উল্টান লাঙ্গল; চাকাওয়ালা জুনিয়ার হো; আককানি, যব গম কাটা ও পাট কাটা যন্ত্র; বীজ রোপণ যন্ত্র; দাড়াটানা যন্ত্র; গোড়া তুলিয়া ফেলিতে কলের চালিত কোদাল; মেষ্টন লাঙ্গল; টি, সি লাঙ্গল কোথায় পাওয়া যায় এবং তাহার মূল্যই বা কত লিখিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

আমার ন্যূনধিক ১৫০/ বিঘা জমি আছে। গবর্ণমেণ্টের চাকরি করিতাম। চাকরি করা কালীন খাজনা দিয়া জোতজমা রক্ষণ করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে সামান্য পেনসন পাইতেছি। জমিগুলি মধ্যে অধিকাংশই পতিত আছে যাহা ভাগজোতে আছে তাহার ফসলও সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। অবস্থাও তাদৃশ স্বচ্ছল নাহে এমনকি অর্থাভাবে দুই জোড়া বলদ পর্য্যন্তও খরিদ করিতে অক্ষম। এসময় আমার পূর্ণ অবকাশ কিন্তু

অর্থাভাবে চাষের যন্ত্রাদি ও বলদ মহিষ খরিদ করিতে না পারিয়া বড়ই বিপদ গ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছি অতএব আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া গভর্ণমেণ্ট হইতে যন্ত্রাদির সাহায্য পাইবার ব্যবস্থা করেন তবে অতীব আনান্দিত হই।

আমারও চাষে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। চাষোপযোগী বলদ, মহিষ লাঙ্গলাদি পাইলে অথবা দুই জোড় বলদের মূল্য ১০০৲ টাকা ও যন্ত্রাদির মূল্য ৫০৲ টাকা ও দুইজন কৃষাণের বেতন ৬।৭ মাসের ১০০৲ টাকা একুনে ২৫০৲ টাকা বিনা শুদে সাহার্য্য পাইলে অনায়াসেই বার্ষিক ১০০৲ টাকা আয় হয়। আপনি অনুগ্রহ করিয়া যদি কোন সমবায় ঋণদান সমিতির নিকট হইতে আমাকে এই সাহার্য্য করইয়া দেন তবে বড়ই অনুগৃহীত হই। অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি প্রত্যুত্তর প্রদান করেন তবে কৃতার্থ হই। মহাশয়ের বিশ্বাস জন্য যদি জোত সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে আদেশ করা. মাত্রেই মহোদয়ের সমীপে দাখিলাত সহ উপস্থিত হইব!

উত্তর—উপরিউক্ত পত্রখানি কৃষিতত্ত্ববিদ্, গভর্ণমেণ্ট কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র চৌধুরি M. R. A. S. Dip-in-Agriculture মহাশয়কে পাঠান হইয়াছিল। তিনি প্রত্যুত্তরের জন্য—অত্র অফিসে পাঠাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে হস্তচালিত লাঙ্গল, প্লানেট জুনিয়ার হাতলাঙ্গকেই উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে। ইঞ্জিন চালিত লাঙ্গলের দাম ১০০০৲ টাকা হইতে ৪০০০৲ টাকা। ইঞ্জিন চালিত লাঙ্গল বসাইতে ও তাহা চালাইবার জন্য ক্ষেতের অন্যান্য সাজ সরঞ্জম লাঙ্গলের মূল্য সমেত ৮ হাজার হইতে ১০ হাজার টাকা খরচ পড়ে।

যত প্রকার লাঙ্গলের ও কৃষিযন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার অধিকংশগুলিই বিলাত হইতে আনাইতে হয়। ইংলণ্ডের র‍্যামসন, সিমস্ এবং জেফ্রিস্ প্রসিদ্ধ কৃষিযন্ত্র বিক্রেতা। ভারতীয় কৃষি সমিতি এইখান হইতে মেম্বরদিগের ব্যবহার জন্য কৃষি যন্ত্রাদি আনাইয়া থাকেন। কলিকাতা লেস্‌লি, টি, টমসন্ ও বরন কোম্পানিও—লাঙ্গল, জলোত্তলন যন্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া থাকেন। ভারতীয় কৃষি সমিতির সহিত এই সকল কোম্পানিরও সংশ্রব আছে। আপনি যে সাহার্য্য প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা সাধারণের গোচর করা গেলে। আপনি স্থানীয় ধনী কিম্বা জমিদারের শরণাপন্ন হইলে এবং তাঁহাদের সহিত একযোগে কার্য্য করিলে আপনার আশা সফল হইতে পারে এবং তাঁহারাও লাভবান হইবেন।—

সার-সংগ্রহ

—:*:—

কৃষিকর্ম্মের অন্তরায়

(কৃষি শব্দের অর্থে সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম বুঝিতে হইবে)

যে শিক্ষাপ্রণালীর ফলে বালকদিগের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ উন্নতি যথা সামঞ্জস্য সাধিত হইবে, সেই শিক্ষাপ্রণালীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এ কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আবার বাল্যশিক্ষাতে কৃষিশিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য আমরা শিক্ষাসমস্যা বিষয়ক আলোচনাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া আসিয়াছি। এখানে কৃষিশব্দের অর্থে আমরা কেবল ধান্যাদি চাষমাত্র করা বলিতেছি না, গোপালন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সহ কৃষিকর্ম্মের অর্থে কৃষিশব্দ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি।

সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম অত্যাবশ্যক

আমরা যতই এ বিষয়ে আলোচনা করিতেছি, ততই আমাদিগের দৃঢ় ধারণা হইতেছে যে ভারতবাসীর পক্ষে সাঙ্গ কৃষিবিদ্যা কেবলমাত্র নানাবিধ লাভের কারণে অত্যাবশ্যক নহে। যে সকল বিষয়ের শিক্ষা ছাত্রদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি আনয়ন করিতে পারে সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম তাহাদিগের মধ্যে অন্যতর প্রধান বিষয়। সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম একদিকে কৃষিপ্রধান ভারতের অধিবাসীগণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের বিশেষ সহায়, অপরদিকে ইহা কৃষিপ্রধান ভারতের সর্ব্বকালেই প্রাণরক্ষার শ্রেষ্ঠতম উপায়।

সংগ্রামের কালে কৃষিকর্ম্ম

দেশে যখন শান্তির রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন, কৃষিকর্ম্ম যে দেশের প্রাণরক্ষা বিষয়ে কিরূপ সাহার্য্য করে তাহা আমরা ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমরের ন্যায় প্রলয়ব্যাপারের আঘাতে দেশ যখন ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য যখন যুদ্ধের গোলযোগে অবরুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়, তখনই কৃষিকর্ম্মের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। কৃষিকর্ম্মে বাণিজ্যের অর্দ্ধেক লাভ হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহা দেশের শান্তিময় অবস্থাতেই প্রযুজ্য। যুদ্ধের সময় কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত কথা। সে সময়ে বরঞ্চ বাণিজ্যেই কৃষিকর্ম্মের অর্দ্ধেক লাভ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইউরোপীয় মহাসমরে জর্ম্মানি যে এতদিন বাণিজ্য অবরোধের নিদারুণ আঘাত সহ্য করিয়াও দাঁড়াইতে পারিয়াছে, প্রচণ্ডবলে মিত্রসংঘকে আঘাত দিতে সক্ষম হইতেছে, তাহারা অন্যতর প্রধান কারণ জার্ম্মানির প্রকর্ষকর কৃষিকর্ম্ম। আমাদিগের স্মরণ হয় যে আমরা সংবাদপত্রে পড়িয়াছি যে, জর্ম্মানির নিজ

দেশে উৎপন্ন শস্য সমগ্র জর্ম্মনিবাসীদিগকে এক বৎসর সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে পারে। ভাল চাষ হইলে বিদেশের শস্যের আমাদানীর উপর জীবনরক্ষার জন্য জর্ম্মানিকে খুব অল্পই নির্ভর করিতে হয়। মহাসমরে কৃষিকর্ম্মের এইরূপ উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়া ইংলণ্ডেও এবিষয়ে বিশেষ আন্দোলন ও আলেচনা চলিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাবস্থা পর্য্যন্ত গ্রেটব্রিটেন কৃষিকর্ম্মে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিত, কিন্তু নৈপোলিয়ন সমরের পর চারিদিকে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে গ্রেটব্রিটেন ক্রমে ক্রমে বাণিজ্যের প্রতি মনোযোগ দিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকর্ম্মের প্রতি অমনোযোগী হইয়া উঠিল। এখন ইংরাজদিগের মহা আশঙ্কার কারণ হইতেছে এই যে, ইংলণ্ডের বাণিজ্য কোন প্রকারে অবরুদ্ধ হইলে অতি অল্পকালের মধ্যেই তথায় অন্নের জন্য হাহাকার উঠিবে। ইংলণ্ডবাসী কৃষিকর্ম্মে মনোযোগ প্রদান করিলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হই, কারণ আশা হয় যে, ইংরাজদিগের দৃষ্টান্তে স্বদেশবাসীগণও কৃষিকর্ম্মের পক্ষপাতী হইবেন।

কৃষিকর্ম্মের অন্তরায় ধনীসম্প্রদায়

কি স্বদেশ কি বিদেশে স্বহস্তে কৃষিকর্ম্ম করিবার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় ধনীসম্প্রদায়। তাঁহাদিগের অনেক অর্থ সঞ্চিত থাকাতে তাঁহারা ইচ্ছামত যে কোন দ্রব্য মূল্যের দ্বারা কিনিতে পারেন। সেইটুকু পারেন বলিয়াই তাঁহাদিগের বিলাসিতা ও ভোগস্পৃহা প্রভৃতি জাগ্রত হইয়া উঠে। সেই সকল বৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া অব্যবহার ও অপব্যবহারের ফল দুর্ব্বলতা। এই সুপ্রষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাঁহারা শরীরে ও মনে নানাপ্রকারে দুর্ব্বল হইয়া পড়েন এবং নিজেদের দুর্ব্বলতার দৃষ্টান্ত প্রভৃতি নানা উপায়ে বংশপরম্পরায় অনুক্রামিত করেন। তাঁহারা নিজেদের সেই দুর্ব্বলতা সমর্থন করিবার জন্য হাতেহেতেড়ে কাজমাত্রকেই হেয় চক্ষে দেখিয়া মানহানিকর ও "ছোটলোকের" কার্য্য বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহারা ইহা ভাবিয়া দেখেন না যে, তাঁহারা যে কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি হাতেহেতেড়ে কাজগুলিকে ছোটলোকের কার্য্য বলিয়া ঘৃণা করিতে চাহেন, সেই সকল কার্য্য ব্যতীত, সেই সকল "ছোটলোকের" সাহায্য বিনা তাঁহাদের অন্নবস্ত্রের সম্পূর্ণ অভাব হইত। শ্রমের যে একটা মূল্য আছে, মর্য্যাদা আছে, সে কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান। ধনীরা মনে করেন যে, চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকা, নানা কারুকার্য্যবিশিষ্ট দ্রব্যসমূহে নিজের ধনবত্তার পরিচয় প্রদান করা এবং পরগাছার ন্যায় অপরের ঘর্ম্মাক্ত পরিশ্রমের উপর নিজেদের ভোগেচ্ছা চরিতার্থ করাতেই যত কিছু মান ও যত কিছু মর্য্যাদা—হাতেহেতেড়ে শ্রমজনক কার্য্যের কোনই মান বা মর্য্যাদা নাই।

ধনীদের সহরপ্রীতির কারণ

মূল্যের বিনিময়ে নিজেদের ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার উপযোগী নানা দ্রব্য সহজে পাওয়া যাইতে পারিবে এবং কৃষক প্রভৃতির রক্তের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা

সংগৃহীত নানাবিধ দ্রব্যের প্রদর্শনী খুলিয়া, আন্তরিক না হইলেও মৌখিক প্রশংসা পাইবার অনেক লোকজন পাওয়া যাইবার সুবিধা আছে বলিয়া ধনীরা পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সহরে বাস করিতে ভাল বাসেন। ধনীরা তোষামোদকারীদিগের মুখে স্বকৃত সকল বিষয়ে সায় প্রাপ্ত হইলে এবং প্রশংসা শুনিতে পাইলেই পরম পরিতৃপ্ত হয়েন। সেই সকল প্রশংসার ভিতরে কতটুকু বা সত্য, আর কতকটুকুই বা মিথ্যা আছে, সে বিষয়ে ধনীরা চিন্তা করিয়া দেখিবার অবসরও পান না এবং দেখিতে চাহেনও না।

দরিদ্র শিক্ষিত পল্লীবাসীগণের সহরপ্রীতির কারণ

ধনী সহরবাসীগণের ঐশ্বর্য্য ও তজ্জনিত বাহিরের জাঁকজমক ও সুখভোগ কতকটা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং কানাঘুষায় সেই সকল বিষয়ের কথা খুব বৃহদাকারে শুনিয়া, দরিদ্র পল্লীবাসীগণ সহরে গিয়া প্রভূত ঐশ্বর্য্যলাভ এবং তাহার ফলে সুখের সাগরে চিরকাল অবগাহনের অবসর পাইবার কল্পনায় ও মহা সুখস্বপ্নে বিহ্বল হইয়া পড়েন। তখন তাঁহারা সুখভোগেচ্ছা পরিতৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে পল্লীগ্রামের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সহরবাসী হইবার অভিলাষী হইয়া পড়েন। এইরূপে পল্লীবাসীগণের মধ্যে যাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষা পাইবার ফলে সহরে আসিয়া চাকরী, ব্যবসায় বা অন্যান্য উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের সক্ষমতা ধারণ করেন, তাঁহারা কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া সহরবাসী হইয়া পড়েন।

সক্ষম লোকদিগের পল্লীগ্রাম পরিত্যাগের কুফল

যাঁহারা পল্লীগ্রামের কোন উপকার করিতে পারিতেন, সেই ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিবার কারণে তাঁহাদিগের আদিম বাসস্থান সকল অমনোযোগের বিষয় হইয়া পড়ে। তখন সেই সকল স্থানের জলাশয়গুলি পানা ও মাটিতে ভরাট হইয়া যায় এবং গ্রামগুলি বনজঙ্গলে পূর্ণ হইয়া নানাবিধ রোগের আশ্রয় স্থান হইয়া পড়ে। তখন আবার, সেই সকল ধনী ও শিক্ষিত সহরবাসীগণ রোগের দোহাই দিয়া, খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়জলের অভাব প্রভৃতির দোহাই দিয়া পল্লীগ্রামে বাস করিতে অস্বীকার করেন। পরিণামে পল্লীগ্রামের উন্নতির সকল সম্ভবনাই রুদ্ধ হইয়া যায়। অপরদিকে, অশিক্ষিত দরিদ্র পল্লীসাসীগণ রোগজীর্ণ শরীর লইয়া স্বীয় বাসস্থানের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে চাহে না এবং সমর্থও হয় না—তাহারা চিরকালের জন্য বংশপরম্পরায় রোগজরাময় অবস্থাতেই যথাকথঞ্চিৎরূপে জীবন রক্ষা করে। অবশেষে যখন সেই সকল পল্লীবাসীগণ রোগজরাজীর্ণ দেহে নূতন নূতন রোগের অক্রমণফলে চাষবাষ করিতে নিতান্তই অক্ষম হয় এবং অগত্যা তাহাদের নিকট হইতে খাজানা প্রভৃতি আদায়ের বিলম্ব হওয়ায় ধনীদিগের বিলাসভোগে ব্যাঘাত ঘটে এবং সহরবাসীদিগের অন্নবস্ত্র মহার্ঘ হইয়া উঠে, তখন সকলে মিলিয়া দরিদ্র পল্লীবাসীদিগের স্কন্ধে ধনীদিগের

বিলাসের অভাব ও সহর বাসীদিগের অন্নবস্ত্রের মাহার্ঘতার সমস্ত দোষ নিক্ষেপ করিয়া, তাহাদিগের প্রতি অলস ও দুষ্ট প্রভৃতি কতকগুলি কটুকাটব্য প্রয়োগ করিয়া হাহুতাশ করিতে থাকে এবং নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার প্রদান করে।

কৃষিকর্ম্মে বিমুখতার কারণ

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে দেশে যখন শান্তি বিরাজ করে, তখন কৃষিকর্ম্মের প্রতি অমনোযোগী হইবার কুফল আমরা ভালরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না। তখন বাণিজ্য প্রভৃতি অন্যান্য উপায়ে কৃষিকর্ম্ম অপেক্ষা নিয়মিতভাবে ও অধিকতর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি বলিয়া আমারা কৃষিকর্ম্মকে একঘেয়ে মনে করি এবং ইহা অলাভজনক বলিয়াও যে মনে না করি তাহা নহে; কাজেই তাহাকে হেয় চক্ষেও দেখিতে অভ্যাস করি। আমাদের দেশের ধনীদিগের মধ্যে আজকাল প্রদর্শনী সমূহে পুরস্কার লাভের প্রত্যাশায় বাগান করা একটা সখের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও তাঁহারা কৃষিকর্ম্মকে হেয়চক্ষে দেখিবার ফলে সেই বাগান সম্বন্ধেও স্বহস্তে কোন কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহেন—সকল কার্য্যই মালী প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগের সাহায্যে হইয়া থাকে। আর, বাগানেও তাঁহারা ক্রোটন প্রভৃতি যে সকল বৃক্ষাদি রোপণ করেন, তাহারও অধিকাংশ বাগানকে কেবলমাত্র সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য করিবার উদ্দেশ্যেই রোপিত হয়, লাভের সহিত সে সকলের কোনই সম্পর্ক থাকে না। সহরে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিলে আমরা দেশের সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক বড় বড় বিষয়ের আন্দোলন আলোচনা করি, কিন্তু কৃষিকর্ম্মের বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ দেওয়া আবশ্যকই মনে করি না।

পল্লীগ্রামে শ্রমজীবীর অভাব ও তাহার কারণ

ধনী পল্লীবাসীদিগের সহরে আসিবার দৃষ্টান্তে কেবল যে শিক্ষিত দরিদ্র পল্লীবাসীগণ উপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে সহরে বাস করিতে আসেন তাহা নহে। অশিক্ষিত দরিদ্র পল্লীবাসী-দিগেরও মধ্যে অনেকে সহরে মজুরী করিয়া অধিকতর উপার্জ্জনের প্রত্যাশায় পল্লীগ্রামের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সহরে আসে। পল্লীগ্রামে এই সূত্রে শ্রমজীবীর অভাব একটা গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি যে পল্লীগ্রামে ছয়টা পয়সা দিলেই মজুর পাওয়া যাইত, অর্থৎ ছয়টী পয়সাতে একটী পরিবারের একটা দিনের জীবনধারণের উপায় হইয়া কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত থাকিত এবং যিনি মজুরকে নিযুক্ত করিতেন তাঁহারও কার্য্য সুসম্পন্ন হইত। কিন্তু আজ সেই স্থলে ছয় আনার কমে একটা মজুর পাওয়া যায় না। অথচ এক একটী পরিবারের আয় যে খুব বাড়িতেছে তাহা তো মনে হয় না—বরঞ্চ, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইতে হইতে আয় ক্রমাগত হ্রাসের দিকেই চলিয়াছে। আর, এদেশবাসীর

আয়ই বা কি যৎসামান্য! * সেই আয়ের উপর আমাদের ব্যয় যদি চতুর্গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে আমাদের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? আমারা খাইব কি? যদি দেশের ধনীলোকেরা তাঁহাদের নিজ নিজ জমীদারীতে অথবা পল্লীগ্রামস্থিত আদিম বাসস্থানে অধিকাংশ সময় যাপন করেন, তাহা হইলে দেশের লোকের অন্নবস্ত্রের অসংস্থানজনিত দুঃখকষ্টের অনেকটা লাঘব হয় এবং বর্ত্তমান দুর্নীতি ও বৈপ্লবিক ভাবও অনেকটা কমিয়া যায়। বিদ্যালয় সমূহে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থার অভাব বর্ত্তমান দুর্নীতি ও বৈপ্লবিকভাবের অন্যতর প্রধান কারণ বটে, কিন্তু একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে অন্নবস্ত্রের অভাবজনিত কষ্টও সেই বৈপ্লবিকভাবের অগ্নিতে শুষ্ক ইন্ধন প্রদান করে।

কৃষিকর্ম্মই অর্থাগমের মূল ও নিশ্চিত উপায়

দেশে যখন শান্তির রাজত্ব থাকে, তখন আরও এক কারণে কৃষিবিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। দেশের ধান্য প্রভৃতির অকুলান পড়িলে বাণিজ্যসূত্রে বিদেশ হইতে প্রয়োজন মত তাহার আমদানী হয় বলিয়াই সেই অকুলানের কথা আমাদের মনেই আসে না। কাজেই দেশের জমী যে কি হইতেছে সে বিষয়ে কোন দৃষ্টিই পড়ে না; কৃষকদিগের যে কি অবস্থা হইতেছে তাহার কোন সংবাদই রাখা হয় না। কিন্তু একটু খানি চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে কৃষিকর্ম্মই অর্থাগমের মূল ও নিশ্চিত উপায়, এবং যদি কোন শিল্প শিক্ষা করা সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক হয় তবে তাহা কৃষিকর্ম্ম।

কৃষিকর্ম্মে শারীরিক উন্নতি

আমরা বারম্বার বলিয়া আসিয়াছি যে কৃষিকর্ম্মই বালকদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের অন্যতর প্রধান উপায়। কৃষিকর্ম্ম যে শারীরিক উন্নতির বিশেষ সহায় তাহা কৃষকদিগের মাংসপেশীবিশিষ্ট এবং অক্লান্তভাবে রৌদ্রবৃষ্টিসহিষ্ণু দৃঢ় বলিষ্ঠ শরীর দেখিলেই বুঝা যায়। বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়াগ্রস্থ কৃষকদিগকে অদর্শস্থলে রাখিয়া আমরা এ কথা বলিতেছি না বটে, কিন্তু এই ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত কৃষকদিগেরও মধ্যে অনেককে সহরবাসীদিগের অপেক্ষা কত অধিক দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে কৃষিকর্ম্ম করিতে থাকিলে পল্লীগ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগসমূহ দূরে পলায়ন করিবে বলিয়াই আশা করা যায়। আমরা অবশ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে কৃষিশিক্ষা দিবারই কথা বলিয়া অসিয়াছি। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষিত কৃষক তাঁহার ক্ষেত্রের প্রয়োজনমত ড্রেন, জলাশয় প্রভৃতির বন্দোবস্ত না করিয়া থাকিতে পারিবেন না এবং কাজেই তাঁহার বাসস্থানের নিকটে রোগও সহজে

* আমাদের স্মরণ হইতেছে, আমারা আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে, যেখানে প্রত্যেক ইংলণ্ডবাসীর গাড়ে আয় ত্রিশ টাকা, সেখানে প্রত্যেক ভারতবাসীর গড়ে আয় মাত্র দুই টাকা।

পদার্পণ করিতে পারিবে না। এতদ্ব্যতীত শিক্ষিত কৃষক গোজাতির উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হইতে বাধ্য হইবেন। গোজাতির উন্নতি সাধিত হইলেই দেশের ছেলেরা একটু খাঁটি দুধ ঘি খাইতে পাইয়া বাঁচিয়া যাইবে এবং পুষ্টিকর আহারের অভাবে যে সকল রোগের হাতে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল, সেই সকল রোগের হাত হইতে তাহারা নিস্তার পাইবে।

কৃষিকর্ম্মে মানসিক উন্নতি

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকর্ম্ম চালাইতে গেলে শারীরিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উন্নতিও যে অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য তাহা বলা বাহুল্য। প্রথমত, স্বহস্তে কৃষিকর্ম্ম করিতে গেলেই কৃষকের নিজের পর্য্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার প্রসারবৃদ্ধির ফলে তো মানসিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, তাহার উপর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিলে কৃষককে কৃষিবিদ্যার সঙ্গে আরও নানা বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইবে। সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম বলিতে জমীতে লাঙ্গল দেওয়া হইতে ধন্য কাটিয়া মরাইবাঁধা পর্য্যন্ত কার্য্যগুলিকেই যে বুঝাইবে তাহা নাহে। সাঙ্গ কৃষিকর্ম্মের অর্থে আমরা চাষকরা, আহার্য্য, পশুপক্ষী পালন, হংস প্রভৃতি, বাটীর সৌন্দর্য্য বিধায়ক পশুপক্ষী পালন, পশুপক্ষী চিকিৎসা, ফল উৎপাদন, শাকসবজী উৎপাদন, গোপালন, মৎস্যপালন, মধুমক্ষিকাপালন, দুগ্ধদোহন, মাখন প্রভৃতি প্রস্তুত করণ, ফল প্রভৃতি হইতে মোরব্বা চাটনী প্রভৃতি প্রস্তুত করণ, অন্তত এগুলি সমস্তই বুঝি। উপরোক্ত বিষয়গুলির নাম দেখিলেই বুঝা যাইবে যে সাঙ্গ কৃষিকর্ম্মে সুশিক্ষিত হইতে গেলে কতপ্রকার বিভিন্ন বিদ্যা আয়ত্ত করা আবশ্যক।

কৃষিবিদ্যার অনুষঙ্গিক বিদ্যা বিষয়ে ইঙ্গিত

জমীজমা রাখিতে গেলেই তো জমীমাপ করিতে হইবে, ফসলের হিসাব রাখিতে হইবে, দেনাপাওনার হিসাব রাখিতে হইবে; এ সকলের জন্য গণিত শিক্ষা আবশ্যক। জমীজমায় প্রতি পদে গণিতের প্রয়োগ দেখা যায়; গণিত না জানিলে তোমাকে প্রতিপদে প্রতারিত হইতে হইবে। তার পর কোন্ জমীতে কি প্রকার শস্য বা বৃক্ষ সুবিধামত হইবে, কোন্ জমীর কত নীচে জল পাওয়া যাইতে পারে, প্রস্তারাদি পাওয়া গেলে কি প্রকারে পাওয়া গেল, এ সকল জানিবার জন্য মৃৎতত্ত্ব ভূবিদ্যা প্রভৃতি জানা আবশ্যক। গণিতের ন্যায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানও প্রতিপদে আবশ্যক—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান না জানিলে অনেক বিষয়ে অন্ধের ন্যায় কাজ করিয়া যাইতে হয়। যেখানে বৃক্ষ প্রভৃতি লইয়াই সর্ব্বপ্রধান কার্য্য, সেখানে যে উদ্ভিদবিদ্যা নিতান্তই আবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য। তারপর, কোন্ বৎসরে কত বৃষ্টি হওয়া সম্ভব, কোন্ বৎসরেই বা অনাবৃষ্টি হওয়া সম্ভব, এ সকল জানিয়া ভাবী অমঙ্গলের প্রতিরোধ করিতে ইচ্ছা করিলে নভোবিদ্যা (meteorology) জানা

আবশ্যক। পশুপক্ষীদের পালন ও রক্ষণের জন্য প্রাণীতত্ত্ব ও প্রাণীচিকিৎসা জানিতে হইবে। কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্য হইতে নানা যৌগিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য রসায়নবিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইবে। এক কথায় যতপ্রকার বিদ্যার সাহায্যে মানুষের সুখস্বচ্ছন্দ্য আসিতে পারে ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে, সাঙ্গ কৃষিকর্ম্মে সুকৃতকার্য্য হইতে গেলে ততপ্রকার বিদ্যাই আয়ত্ত করিতে হইবে।

কৃষিকর্ম্মে আধ্যাত্মিক উন্নতি

কৃষিকর্ম্মের ফলে শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতিরও যে সম্ভাবনা আছে, এ কথা শুনিলে অনেকে আশ্চর্য্য হইতে পারেন। কিন্তু ইহাতে অশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। প্রথমেই তো দেখা যায় যে কৃষিকর্ম্মে যতপ্রকার উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রাণালী অবলম্বিত হউক না কেন, দৈবানুগ্রহ ব্যতীত, ভগবানের কৃপা ব্যতীত কৃষিকর্ম্মে কৃতকার্য্যতার কোনই সম্ভাবনা নাই। যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টি রৌদ্র প্রভৃতি না হইলে শতসহস্র উপায় অবলম্বন সত্ত্বেও কৃষকের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। কাজেই কৃষকের হৃদয় আধ্যাত্মিক উন্নতির একটী অতি শ্রেষ্ঠ সোপান ভগবানের প্রতি নির্ভর না করিয়া থাকিতে পারে না। আর, তাহার উপর, পল্লীবাসী কৃষক সহরের বৃথা কোলাহল প্রভৃতি চিত্তবিক্ষেপক বিষয় হইতে রক্ষা পাইয়া নির্জ্জনে আত্মচিন্তা করিবার সুন্দর অবসর পায়। সহরে সহরবাসী ঘরে বাহিরে লোকসমাগমের মধ্যে পড়িয়া থাকে; তাহার সম্মুখে পশ্চাতে আশেপাশে কেবলই জনস্রোত চলিতেছে, সকলেরই চিত্ত বিষয়চিন্তাতে নিমগ্ন—বিশ্রামের যেন অবকাশ মাত্র নাই। এ অবস্থায় সে ভগবানের চিন্তা করিবে কখন্? ওদিকে পল্লীবাসী কৃষক সমস্ত দিবস কৃষিকর্ম্মের পর যখন সায়াহ্নের আলো-আঁধারের ছায়ার মধ্য দিয়া গরুগুলিকে গৃহে ফিরাইয়া আনিয়া বিশ্রামের সুখ অনুভব করে তখন সে তাহার হৃদয়ে কি অগাধ শান্তি অনুভব করে, সে তখন সেই শান্তির মধ্যে স্বভাবতই সেই শান্তির আকর ভগবানের করুণারই কথা স্মরণ করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হয়।

পল্লীবাসীর মঙ্গলে দেশের মঙ্গল

এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে কৃষিকর্ম্ম যেমন আপদকালে দেশের প্রাণরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়, তেমনি তাহা দেশের ছেলেদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনেরও অন্যতর প্রধান সহায়। সেই কৃষিকর্ম্মকে আমরা বন্ধুভাবে গ্রহণ না করিলে আমাদিগকে আত্মহত্যা ও পুত্রহত্যার পাপে নিমগ্ন হইতে হইবে। আমরা যদি নিজেদেরও উন্নতির জন্য কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন না করি, তথাপি ছেলেমেদের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া তাহা করা কর্ত্তব্য। ছেলেমেয়েরাই দেশের ভবিষ্যতের আশাস্থল। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির ও আত্মরক্ষার এমন একটী উপায় হেলায় পরিত্যাগ করা আমাদের কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। ইহাও যেন আমরা

না ভুলি যে পল্লীবাসী সন্তানগণের মঙ্গলামঙ্গলের উপরেই দেশের মঙ্গলামঙ্গল বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। পল্লীবাসীদিগের তুলনায় সহরবাসী কয়টী?—মুষ্টিমেয় মাত্র। তাই পল্লীবাসীগণের বাসস্থান যাহাতে স্বাস্থ্যকর হয়, তাহারা যাহাতে পুষ্টিকর আহার প্রাপ্ত হয়, তাহাদের কৃষিকর্ম্মপ্রধান বিদ্যালয়ের যাহাতে সুবন্দোবস্ত হয় সে বিষয়ে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির দৃষ্টি রাখা দরকার।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকর্ম্ম প্রবর্ত্তনে গবর্ণমেণ্টের মঙ্গল

কেবল দেশের লোকের নহে, কৃষিকর্ম্মের বন্দোবস্ত বিষয়ে এবং পল্লীবাসীদের মঙ্গলসাধনে গবর্ণমেণ্টেরও বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বর্ত্তমান মহাসমর যদি আরও কিছুকাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস যে গবর্ণণ্টেকে বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে ভারতবাসীদিগের দ্বারা সেনাদল সংগঠনে মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। এই সেনাদল সংগঠনে বঙ্গবাসীদিগকে কিছুতেই একেবারে বাদ দিতে পারা যাইবে না, অথচ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগকাতর বাঙ্গালীদিগকেও সেনাদলে লওয়া চলিবে না। এই সেদিন গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং বলিয়াছেন যে এখনকার ম্যালেরিয়াজীর্ণ শরীরবাহী বাঙ্গালীদিগের মধ্য হইতে কনষ্টেবল করিবারও উপযুক্ত লোক পাওয়া দুর্ঘট। এ অবস্থায় কৃষিকর্ম্মে দেশবাসীদের মনোযোগ দেওয়াইতে পারিলে গবর্ণমেণ্টেরও সমূহ মঙ্গল। আমাদের মতে বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিলে যেরূপ বৈপ্লবিক ভাব অনেকটা বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপ আমরা বলের সহিত বলিতে পারি যে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও ছাত্রদিগকে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি উপায়ে এদেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম প্রবর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিলে দেশ হইতে বিপ্লব দূর করিবার আর একটী বিশেষ উপায় বিধান করা হইবে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

পণ্য-চিত্রশালা—

কলিকাতায় "কমার্সিয়াল মিউজিয়ম" বা "পণ্য-চিত্রশালা" প্রতিষ্ঠিত হইল। বাঙ্গালার গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল সম্প্রতি এই চিত্রশালার প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।—শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত পাঁচ বৎসর এইরূপ চিত্রশালা বা স্থায়ী প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত করিবার পরামর্শ দিয়া আসিতেছেন।—১৯২২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গের পরিবর্ত্তনের পর যখন প্রথম স্বদেশী প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়, তখন সুরেন্দ্র বাবু এইরূপ স্থায়ী অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেন। গত আগষ্ট মাসে শ্রীযুত অনরেবল বীটসন বেল ব্যবস্থাপক সভায় বলেন,—গভর্ণমেণ্ট পণ্যচিত্রশালা-প্রতিষ্ঠার বন্দো

করিয়াছেন। সেই কল্পনা এতদিনে কার্য্যে পরিণত হইল।—লর্ড কারমাইকেল প্রতিষ্ঠার দিন তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন,—"বাঙ্গালায় এত রকম ও এত উৎকৃষ্ট সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহা জানিতাম না। এই সকল দ্রব্য দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। যাঁহারা বহুকাল বাঙ্গালায় আছেন, তাঁহাদের অনেকেও আমার মত বিস্মিত হইয়াছেন!" বাস্তবিক, এক স্থানে, এক সঙ্গে, সমস্ত বস্তুর সমাবেশ করিতে না পারিলে, দেশের শ্রমশিল্পের প্রকৃত অবস্থা ও পরিণতির অভিজ্ঞান অত্যন্ত অসম্ভব। লর্ড কারমাইকেল বলিয়াছেন,—দেশে কি কি দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, এই পণ্যচিত্রালয়ে জনসাধারণ তাহা দেখিবার ও জানিবার অবকাশ লাভ করিবে। বিজ্ঞাপন দিলেই অনেক স্বদেশী বস্তুর কাটতি হইতে পারিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই পণ্যচিত্রশালা প্রদর্শনীর কাজ করিবে। কিন্তু ইহার কার্য্যক্ষেত্র ও উপযোগিতা প্রদর্শনী অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত।—উৎপাদক এই চিত্রশালায় আসিয়া, ক্রেতা কি চায়, তাহা বুঝিতে পারিবে। ক্রেতাও বুঝিবার অবকাশ পাইবেন,—দেশে কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে; কোন কোন বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্ত্তে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহৃত হইতে পারে। উৎপাদক বিদেশী দ্রব্যের প্রদর্শন দেখিয়া বুঝিতে পারিবে, স্বদেশী উপাদানে সেই সকল বস্তুর উৎপাদন করিতে পারিলে দেশের অভাব মিটিতে পারে; উৎপাদকেরও লাভ হইতে পারে। ভারতের উপাদানেই অধিকাংশ বিদেশী বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে।—সুতরাং এই চিত্রশালার উপযোগিতা ও উপকারিতা অল্প নহে।—কিন্তু কথা এই, কেবল এই অভিজ্ঞানে স্বদেশী শ্রমশিল্প অগ্রসর হইতে পারিবে কি? দৃষ্টান্তস্বরূপ জাপানী পণ্যের কথা বলিব। জাপান যে মূল্যে যে বস্তু ভরতের বাজারে বেচিতেছে, স্বদেশী উৎপাদক সেই বস্তু সেই মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে কি? গবর্মেণ্টের রক্ষিত, গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক পুষ্ট, প্রচুর মূলধনে পালিত, বিদেশী শ্রমশিল্পের সহিত উদীয়মান শিশু স্বদেশী শিল্প গবর্মেণ্টের সাহায্য না পাইলে প্রতিযোগিতা সফল যইতে পারিবে কি?

শুনিতে পাই,—ভারতবর্ষই এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র দেশ। অথচ ন্যূনাধিক তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ধন-সম্পদে এই দেশই জগতে অদ্বিতীয় ছিল। গত তিন শত বৎসরে অর্থাৎ মোটামুটী বারো পুরুষেই এ দেশের আর্থিক অবস্থার এরূপ শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে।

সম্রাট আকবর বলিতেন,—এ দেশের শিল্প-বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও কলা সকলই হিন্দুদিগের হাতে। আমাদের তরবারি চালনা হিন্দুদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু শিল্প-ব্যাপারে হিন্দুর সমকক্ষ কেহ নাই। হিন্দুর শিল্প জগতে অতুলণায়। তাই পৃথিবীর চারিদিকের ধন-রত্ন এখন হিন্দুস্থানে সঞ্চিত হইতেছে। জগতের কোনও জাতিই হিন্দুর সহিত শিল্পে প্রতিযোগিতা করিতে অক্ষম; সেই জন্য সকল সভ্য দেশেই হিন্দুর শিল্প সমাদৃত, এবং সর্ব্বত্রই ইহার অবাধ গতি।

তিনি আরও বলিতেন,—হিন্দু জাতিকে ধ্বংস করিলে, উহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে না পারিলে, ভারতের শিল্প-সম্পদ নষ্ট এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী-শ্রীও অন্তর্হিত হইবে। তখন ভারতবর্ষ অত্যন্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িবে। এই জন্য আমি হিন্দু জাতির রক্ষার এত প্রয়াসী।

আকবর বিচক্ষণ ও পরিণামদর্শী সম্রাট ছিলেন। তিনি প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এখন সত্যে পরিণত হইয়াছে। শিল্প-নাশের সঙ্গে সঙ্গে

ভারতবর্ষ দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। আজ সত্য সত্যই ভারতের মত দরিদ্র দেশ পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

আজ জগতের শিল্প-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের যেরূপ অবস্থা, এককালে ভারতের অবস্থাও ঠিক তেমনই ছিল।—ভারতের বয়ন-শিল্প—ঢাকার মসলিন, কাশ্মীরের শাল, বাঙ্গালার নানা স্থানের রেশমী বস্ত্র, নানা প্রকার ছিটের কাপড় জগতে অতুলনীয় ছিল। পৃথিবীর অন্য কোনও দেশ ভারতের সহিত এই সকল শিল্পের প্রতিযোগিতা করিতে পারিত না। ভারতের সূচী-শিল্প, খোদাইয়ের কাজ, সুগন্ধি দ্রব্যাদি পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। মোট কথা,—ভারতের শিল্প তখন জগতের সকল সভ্য দেশেই রপ্তানি হইত। পৃথিবীর নানা স্থানের বণিকেরা কোটী কোটী মুদ্রার বিনিময়ে এই সকল শিল্প দ্রব্য ভারত হইতে লইয়া যাইত। বিখ্যাত পরিব্রাজক টেরী তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"সকল নদীই যেমন সমুদ্রে পতিত হয়, সেইরূপ পৃথিবীর বহু রৌপ্যনদী এই রাজ্যে (ভারতে) পতিত হইতেছে।" ইঁহার উক্তি বিন্দু-মাত্রও অতিরঞ্জিত নহে। কারণ, প্রসিদ্ধ পর্য্যটক বার্ণিয়ারের মুখেও আমরা শুনিতে পাই,—"মেক্সিকো দেশের সমস্ত রৌপ্য এবং পেরু রাজ্যের সমুদয় সুবর্ণ ইউরোপ ও এসিয়ার পশ্চিমাঞ্চল ঘুরিয়া ভারতে প্রবেশ করিত। এখান হইতে সেগুলি আর বহির হইত না।"

ভারতবর্ষের এইরূপ অর্থসম্পদ ছিল বলিয়াই মোগল বাদশাহের দুই হাতে অজস্র অর্থব্যয় করিতেন। শুনিতে পাই,—মানসিংহকে বৎসরে দুইবার করিয়া বাদশাহের সহিত দেখা করিতে হইত, এবং প্রত্যেকবার সাক্ষাতের সময় তিনি বাদশাহকে ১৮ লক্ষ টাকা নজর দিতেন। আকবরের সিংহাসনের মূল্যই ছিল,—ন্যূনাধিক তিন কোটী টাকা! আগ্রার দুর্গ নির্ম্মাণে সাড়ে ছাব্বিশ কোটী টাকা খরচ হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর বাদশাহের অন্তঃপুরে প্রতি বৎসর ১৫ কোটী টাকার উপর খরচ হইত। বিবাহের সময়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে ৭ কোটী টাকা কেবল জহরত কিনিতে দিয়াছিলেন।

প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যে দেশের আর্থিক অবস্থা এইরূপ উন্নত ছিল, আজ সেই দেশের দৈন্য দেখিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে হয়।

এ দেশের শিল্প-সম্পদ গিয়াছে। শিল্পিকুল ধ্বংস পাইতে বসিয়াছে। দেশের শিল্প-বিনাশের সহিত লোকে নিদারুণ দারিদ্র্যের পেষণে নিষ্পিষ্ট হইতেছে। এখন শিল্পকে রক্ষা করিতে না পারিলে দেশের দৈন্য ঘুচিবে না, এমন কি, জাতি-হিসাবেও আমাদিগকে মরিতে হইবে।

তাই বলিতেছি,—জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে আমাদিগের মুমূর্ষু শিল্প-গুলিকে সঞ্জীবিত করিতেই হইবে। শুনিয়াছি মাধবের করুণা হইলে শুষ্ক তরুও মুঞ্জরিত হয়। কিন্তু এ দেশের মৃতপ্রায় শিল্প-তরু কোন্ মাধবের করুণায় মুঞ্জরিত হইবে, কে বলিবে? "বাঙালী"—

করাচীর মৎস্য ব্যবসায়—

ভারতের মধ্যে করাচী বন্দরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মৎস্যের ব্যবসায় চলিয়া থাকে, কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সেখানকার লোকে ধারনাই করিতে

পারিত না যে মাছ ধরিয়া আনিয়া সহরের বাজারে দুই চার পয়সায় বিক্রয় করা ছাড়া সামুদ্রিক মৎস্যের অন্য কোনও প্রকার গতি হইতে পারে।

সোল (Sole) মাছ করাচীতে যেমন হয় তেমন ভারতের আর কুত্রাপি হয় না। সামুদ্রিক মৎস্য ভোজীদের নিকটে সোল মাছ অত্যন্ত প্রিয়। ইংলণ্ডের ইহা 'নবাবী খানা' বলিলেও চলে। সেখানে ইহার দর এক শিলিং ছয় পেন্স (১৵০) ২ শিলিং (১৷০) করিয়া পাউণ্ডের (আধসের) নিম্নে নামে না। এই সোল মাছ সেই সময় করাচীতে দুই দুই পয়সা সের বিক্রয় হইত। মিষ্টার উজলার নামক জনৈক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যবসায়ী করাচীর মাছের ব্যবসায়ের এই অবস্থা প্রথম লক্ষ্য করেন। তিনি এখানকার মৎস্য ভারতের নানা স্থানে রপ্তানী করিলে কিরূপ লাভ হইতে পারে বুঝিতে পারিয়া রীতিমত ঐ ব্যবসায় আরম্ভ করেন ও বড়লাট বাহাদুরের প্রাসাদে রীতিমত ইহা সরবরাহ করিয়া ব্যবসায়ে বিশেষ সুপ্রতিষ্ঠিত হন। সৌভাগ্যের বিষয় ঠিক সেই সময় করাচীতে বরফের কল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মিষ্টার উজলারের ব্যবসায়ের বিশেষ সুবিধা হয়। দূরদেশে মাছ বরফের মধ্যে রক্ষিত হইয়া প্রেরিত হইতে লাগিল এবং তাহার ফলে করাচীর সোল মাছ, সিমলা, কোয়েটা, মসুরা প্রভৃতি শীত প্রধান দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া লাহোর অমৃতসর আম্বালা প্রভৃতি স্থানে ভীষণ গরমের বাজারে বহু পরিমাণে আমদানী ও বিক্রয় হইতেছে।

করাচীর মাছের ন্যায়সেখানকার শুক্তিরও পূর্ব্বে কোনও আদর ছিল না, লোকে বড় উহা খাইত না, কেবল শ্বেতাঙ্গেরা সখ করিয়া কিছু কিছু আহার করিতেন, কাজেই বাজারে উহার চাহিদা তেমন বিশেষ ছিল না, যাহা যৎসামান্য আসিত তাহা এক আনা ডজন আন্দাজ দরে বিক্রয় হইত। ধীবরেরাও শুক্তি ধরিতে মনোযোগ দিত না অনেকে ইহা ধরিতেই জানিত না। ক্রমে ধীরে ধীরে যখন শুক্তির চাহিদা বাড়িল তখন বাজারে সেই অনুরূপ মাল পাওয়া গেল না। ক্রমে এমন হইল কিছুদিন যাবৎ করাচীর বাজারে আর শুক্তি পাওয়াই যাইত না। তখন ধীবরেরা কচ্ছ প্রদেশে শুক্তি ধরিতে গমন করিল, কিন্তু তাহাতেও চাহিদার অনুরূপ মাল পাওয়া গেল না, আর যাহাও যাইত তাহা আনিতে এত বেশী খরচ পড়িত যে তাহা লইয়া ব্যবসায় করা চলে না। তখন বোম্বায়ের গবর্মেণ্ট মিষ্টার ডবলিউ এইচ লুকাস নামক একজন সিভিলিয়ানকে করাচীর মৎস্য ব্যবসায় ও চাষের তদন্তে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত করিলেন। মিষ্টার লুকাসের তদন্তের ফলে আজ করাচীর মৎস্য এবং শুক্তির চাষ ও ব্যবসায় বিস্তর উন্নত লাভ করিয়াছে, এবং নানা দূরদেশে ইহা রীতিমত রপ্তানী হইয়া বহু শ্রমশীল উদ্যোগী পুরুষে লক্ষ্মীলাভের পন্থা করিতেছে।

বাঙ্গালায়ও "ফিসারী কমিশন" এখানকার মৎস্যের চাষ ও উন্নতির উপায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু বোম্বায়ের অধিবাসীগণ যেমন গবর্মেণ্টের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া একটী লাভজনক ব্যবসায় আপনাদের করায়ত্ত করিয়া লইয়াছে সেইরূপে বাঙ্গালার কয়জন লোক মৎস্যের ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিয়া বাঙ্গালার গবর্মেণ্টের পরিশ্রম সার্থক ও নিজের ধনাগমের পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা আমাদের অজ্ঞাত।

বাগানের মাসিক কার্য্য

চৈত্র মাস।

সব্জীবাগান।—উচ্ছে, ঝিঙ্গে, করলা, শসা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি দেশী সব্জী চাষের এই সময়। ফাল্গুন মাসে জল পড়িলেই ঐ সকল সব্জী চাষের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতির চাষ ফাল্গুন মাসের শেষে করিলেই ভাল হয়। সেই গুলিতে জল সেচন এখন একটী প্রধান কার্য্য। ঢেঁড়স স্কোয়াস বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। ভুট্টা দানা এই মাসের শেষ করিয়া বসাইলে ভাল হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য অনেক সময় গাজর ও বীটের চাষ করা হইয়া থাকে। সেগুলি ফাল্গুনের শেষেই তুলিয়া মাচানের উপর বালি দিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। ফাল্গুনে ঐ কার্য্য শেষ করিতে না পারিলে চৈত্র মাসের প্রথমেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। আশু বেগুনের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। কেহ কেহ জলদি ফলাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে বেগুন বীজ বুনিয়া থাকে।

কৃষিক্ষেত্র।—এই মাসে বৃষ্টি হইলে পুনরায় ক্ষেত্রে চাষ দিতে হইবে এবং আউশ ধানের ক্ষেতে সার ও বাঁশ ঝাড়ে, কলা গাছে ও কোন কোন ফল গাছে এই সময় পাঁকমাটী ও সার দিতে হয়। এক্ষণে বাঁশের পাইট সম্বন্ধে একটী প্রবাদবাক্য লোককে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। "ফাল্গুনে আগুন, চৈত্রে মাটী, বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি।" বাঁশের পতিত পাতায় ফাল্গুন মাসে আগুন দিতে হয়, চৈত্র মাসে গোড়ায় মাটী দিতে হয় এবং পাকা বাঁশ না হইলে কাটিতে নাই।

এই মাসেই ধঞ্চে, পাট, অরহর, আউশ ধান বুনিতে হয়।—চৈত্রের শেষে ও বৈশাখ মাসের প্রথমে তুলা বীজ বপন করিতে হয়। ফাল্গুন মাসেই আলু তোলা শেষ হইয়াছে। কিন্তু নাবী ফসল হইলে এবং বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত শীত থাকিলে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

ফুলের বাগান।—শীতকালের বিলাতী মরসুমি ফুলের মরসুম শেষ হইয়া আসিল। শীতেরও শেষ হইল, গোলাপেরও ক্রমে ফুল কমিয়া আসিতেছে; এখন বেল, মল্লিকা, জুঁই ফুটিতেছে। এই ফুলের ক্ষেত্রে জল সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। শীত প্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে মিগোনেট, ক্যাণ্ডিটাফ্‌ট, পপি, ষ্টাষ্টারসন্‌, ফ্লক্স প্রভৃতি ফুলবীজ এই সময় বপন করা চলে। পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই সময় সালগম, গাজর, ওলকপি প্রভৃতি বীজ বপন করা হইতেছে, আলু বসান হইতেছে।

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে জল সিঞ্চন ব্যতীত এখন অন্য কোন বিশেষ কার্য্য নাই। জলদি লিচু যাহা এই সময় পাকিতে পারে, সেই লিচু গাছে জাল দ্বারা ঘিরিতে হইবে।

জায়ফল-কুঞ্জ
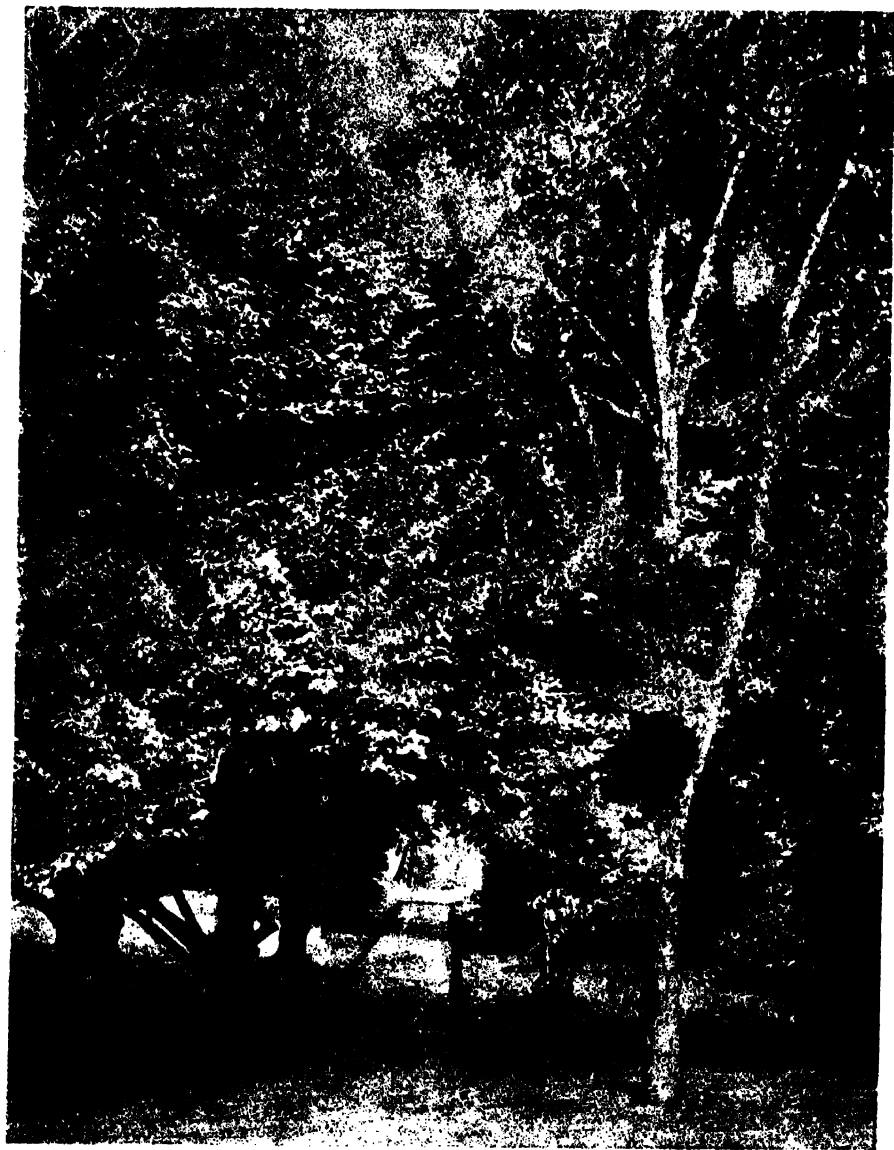
বৃক্ষগুলি সর্ব্বদাই সবুজ পত্রে সুশোভিত থাকে। মালাক্কা, জাভা, মালয়, সিংহল দ্বীপে এই বৃক্ষ স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে, ঐ সকল স্থানে ইহার আবাদ করাও হইয়া থাকে। নদীতীরে পলিমাটিতে ইহার আবাদ সহজে হয়। ক্রমশঃ ইহার আবাদ বাড়িতেছে। ৮।১০ বৎসরে এই বৃক্ষ ফলবান হয়।

কৃষক।

সূচীপত্র।

চৈত্র ১৩২২ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৬শ খণ্ড। { চৈত্র, ১৩২২ সাল। } ১২শ সংখ্যা।

মশালার গাছ গাছাড়া

—:*:—

রসায়ন তত্ত্ববিদ শ্রীনলিনবিহারী মিত্র, এম, এ, লিখিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মশালা সম্বন্ধে তিনটি প্রবন্ধ কৃষকে প্রকাশিত হইয়াছে। আরও দুইটি প্রবন্ধে মশলা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবনা শেষ হইবে। মশালা শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেক নিত্য ব্যবহার্য্য নানাবিধ মশালার গুণাগুণ জানিতে চাহিয়াছেন। অনেকে যাহা মশালা নহে তাহার মশালা আখ্যা দিয়াছেন। এই প্রস্তাবনার আলোচ্য বিষয়টি কি তাহা আমরা অত্র প্রবন্ধে বিশদরূপে বুঝাইতে চাই এবং নিত্য ব্যবহার্য্য নানাজাতীয় মশালার শ্রেণীবিভাগ করিয়া এক তালিকা দিতে চাই।

বাঙ্গালা ভাষায় মশালা সঙ্গাটি অতিবিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়—ইমারতাদি প্রস্তুতের ইট, কাট চুণ, শুরকীও মশালা, কোন একটি ঔষধ কিম্বা কাঁচ, কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুতের উপাদানগুলিও মশালা। মশালার সাধারণ অর্থ—কোন একটি মিশ্র পদার্থের উপাদান। আমরা এস্থলে খাদ্যোপযোগী, গন্ধোৎপাদক ও রন্ধনোপযোগী মশালার গাছ গাছড়ার বিষয় বলিব। আহার্য্য মশালাগুলি পরোক্ষে শরীর পোষণের সহায় হইলেও কেবলমাত্র ইহার উপর নির্ভয় করিলে জীবন রক্ষা হয় না; ফলতঃ সতন্ত্রভাবে ইহা খাদ্য নহে। অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন ও অনুলেপনার্থ তৈলাদি সুঘ্রাণ করিতে ও বস্ত্রাদি রঞ্জন করিতে সুগন্ধী ও রঞ্জক মশালার আবশ্যক হয়। স্থূলতঃ দেখা যাইতেছে যে মশালাগুলি

(ফল, ফুল, বীজ, লতা পাতা) দ্রব্য বিশেষের উৎকর্ষ সাধনার্থ ব্যবহৃত হয়, রসনার ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ও নয়নের তৃপ্তিসাধনই তাহাদের প্রধান কার্য্য। সুস্বাদু, সুপেয়, সুঘ্রাণ নয়নমনোহর খাদ্য দ্রব্য ব্যবহারে হৃদয় উৎফুল্ল হয় ও শরীরের সজীবতা সম্পাদিত হয়—মশালা সেই সজীবতা আনিয়া দেয়। আমরা মশালা জিনিষটাকে অতঃপর **আহার্য্য মশালা, সুগন্ধী মশালা ও রঞ্জনের মশালা** এই কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতে পারি।

আহার্য্য মশালা—বহুবিধ। ভারতবর্ষে অন্ন, ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন, পোলাও পকান্ন যাহা কিছু প্রস্তুত করা হউক না তাহাতে কোন না কোন মশালার আবশ্যক মশালার ব্যবহার ভারতে যেমন এরূপ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। য়ুরোপ, এমেরিকা জাপান, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের লোকে সিদ্ধ, পক্ক, ভর্জিত দ্রব্যে অপেক্ষাকৃত কম মশালা ব্যবহার করে। তাহারা কোন কিছু দ্রব্যে বড় জোর শরিষা গুঁড়া মথাইল কিম্বা করি, কোর্ম্মা প্রভৃতিতে দুই তিনটি মশালা প্রদান করিল অথবা ভিনিগার মিশ্রিত আদা পেঁয়াজ রসুন লীকের সস্ ঢালিয়া দিল—কিন্তু ভরাতের অন্ন ব্যঙ্গনাদি রিতিমত দুই চারিখানা মশালা সংযোগে সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। মশালার এম্বপ্রকার ব্যবহার যে দোষের তাহা বলা যায় না; কিন্তু এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের ধারণা অন্যরূপ তাঁহাদের বিশ্বাস অধিক মশালা ব্যবহারে পরিপাকের ব্যাঘাত হয়। অত্যাধক মশালা ব্যবহার অবশ্য দোষের হইতে পারে, বিশেষতঃ অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে যদৃচ্ছভাবে মশালা ব্যবহার অনিষ্টকর হইয়া থাকে কিন্তু সাধারণতঃ মশালা ব্যবহারে অনেক গুণ দর্শায়—আহার্য্য বস্তু সুঘ্রাণ সুস্বাদু হইলে আহার কালে মন প্রফুল্ল হয়, অন্নে রুচি হয়, রসনায় রস সঞ্চার হয়, চর্ব্বনকালে অধিকতর লালা নিঃসরণ হয় সুতরাং আহার্য্য বস্তুতে মশালা সংযুক্ত হইলে উপকার অপেক্ষা অপকারের সম্ভাবনা কম। আদা, হরিদ্রা, শরিষাদি লবঙ্গ, দারুচিণি, মরিচাদি অনেক মশলার দ্বারা শরীরের অনিষ্টকারী জীবাণু নষ্ট হয়। মশালগুলি আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য। আমাদের নিত্য ব্যবহারের দ্রব্যাদি সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। এই হেতু আমরা মশালার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

আহার্য্য মশালার অনেকগুলি উপবিভাগ আছে। রন্ধনের মশালার মধ্যে লঙ্কা, হলুদ, জিরা মরিচ ধনে শরিষা এই গুলি পেষণ করিয়া (বাটিয়া) বা গুঁড়া করিয়া ব্যঞ্জনে ব্যবহার করা হয়। এই কারণে বাঙ্গলা চলিত কথায় ইহাদিগকে বাটনার মশালা বলে। জিরা মৌরি রন্ধনি কখন কখন পেষণ করিয়া প্রয়োগ করা হয় বটে, কিন্তু প্রায়ই জীরা, মৌরি চন্দনী বা রাঁধুনী, মেথি প্রভৃতি মশালা ব্যঞ্জনে সম্ভার দিতে (ফোড়ন) প্রযুক্ত হয়। এই গুলিকে এই জন্য চলিত কথায় ফোড়নের মশালা বলা যায়। তেজপত্র ও সম্ভারে আবশ্যক, তেজপাতা বাটিয়াও ব্যবহার হয়। পেঁয়াজ রসুন সম্ভারে লাগে কিম্বা

বাটিয়া দেওয়া যায়। পেঁয়াজ তরকারীর মত খণ্ড খণ্ড করিয়াও ব্যবহার হয়, রসুনের এরূপ ব্যবহার হয় না। আদা বাটিয়া তাহার রস বা পিষ্ট আদা বা আদার কুচি, ব্যঞ্জন, অম্ল বা চাটনির উপাদান। আস্ত লঙ্কা, পেঁয়াজ বা রসুন কোয়া অম্ল ও চাটনির প্রধান উপাদান। লঙ্কা ফোড়নেও খুব ব্যবহার হয়। শরিষার তৈলের সহিত লঙ্কা, আদা, পেঁয়াজ, বা রসুন সংযোগে—আম, তেঁতুল, কুল, জলপাই কমরাঙ্গা করমচার অতি উপাদেয় চাটনি প্রস্তুত হয়। হিঙও চাটনি ব্যঞ্জনাদির মশালা—হিঙের ব্যবহার ফোড়নে সমধিক। যাঁহারা পেঁয়াজ রসুন খান না তাঁহারা ডাল, ঝোল অম্লে হিঙের সম্ভার দেন। মাংসাহারে রত অনেকেই বলেন যে পেঁয়াজ রসুন প্রয়োগ না করিলে মাংস সুস্বাদু হয় না, চলিত কথায়—মাংস মজে না। কিন্তু পেঁয়াজ রসুন ব্যবহার যাঁহারা নিষিদ্ধ বলিয়া মনে করেন তাঁহারা পেঁয়াজ রসুনের কার্য্য হিঙে সারিয়া লন।

ধনে (Coriandrum Sativum), শরিষা (Brassica Spp) পৃথিবীর বহুতর স্থানে জন্মিয়া থাকে,—য়ুরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ সর্ব্বত্রই ইহাদের চাষ বিস্তার লাভ করিয়াছে। যব, গম, জৈ প্রভৃতি রবিখন্দের সহিত ইহার আবাদ হয়। যে সকল ক্ষেতে যব, গম জন্মায় তাহাতে ধনে শরিষা হয়।

লঙ্কা—অনেক রকমের লঙ্কা আছে—যে ক্ষেতে বেগুন হয়, আলু হয় তাহাতে লঙ্কাও হয়। লঙ্কা, আলু, বেগুণ সমশ্রেণীরই উদ্ভিদ। লঙ্কার আবাদ এসিয়া, য়ুরোপ, এমেরিকা সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে তবে এমেরিকায় কিছু অধিক।

মৌরি—(Forniculum vulgari) ইহা মিসর গ্রীস্ পূর্ব্ব এসিয়ার মহাদেশ সমূহে জন্মে—ইহা রন্ধনে, মিষ্টান্ন, পক্কান্ন ও পানের সহিত ব্যবহার হয় বটে কিন্তু ইহার প্রধান প্রয়োজন তৈলের জন্য। এই তৈলের ভেষজগুণ আছে। ইহার শিকড় ঔষধার্থ ব্যবহার হয়। ইহাকে পটহার্ব্ব পর্য্যায় ভুক্ত করা যায়। এই জাতীয় উদ্ভিদের শাকপাতা অন্নব্যঞ্জন সুঘ্রাণ করিতে আবশ্যক হয়। বিলাতী পটহার্ব্ব যথা মার্জোরাম, থাইম, ল্যাভেণ্ডার, সেজ প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ধনে শাক, পচাপাতা (Pogostemon Patchouli), মিণ্টশাক (Mentha Sativa Arvensis), মেথি শাক (Trigonella Focnumgraecum, বেথুয়া শাক (Chenopodium album) প্রভৃতিকেও হার্ব্ব বলা যায়। বাগান জমিতে এই সকলের চাষ হয়।

গোটার মশালা—আমাদের বাঙলা দেশে কাঁচা আমের সময় গোটার মশালা নামে এক প্রকার মিশ্রিত গুড়া মশালা প্রস্তুত হয় ; তাহা ব্যঞ্জনে ব্যবহার করিলে ব্যঞ্জন অতিশয় সুস্বাদু হইয়া থাকে। ভাজা চাউল বা মুড়িতে তৈল মাখাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ গোটার মশালা মিশ্রিত করিলে তাহা খাইতে অতি উপাদেয় ও মুখরোচক হয়। এমন কি অনেকে লুচি কচুরি ফেলিয়া এবম্প্রকারে মুড়ি খাইতে পছন্দ করেন। এই মিশ্র মশালায় শরিষা, ধনে হলুদ, লঙ্কার গুড়া থাকে। এতদ্ব্যতীত জিরে, মৌরি, মেথির

গুঁড়াও কিঞ্চিৎ পরিমাণে মিশ্রিত করা হয়। ধনে, জিরা, মৌরি, মেথি ভাজিবার খোলায় আগুণের তাপে সামান্য উত্তপ্ত করিয়া লইলে তবে গুড়াইবার সুবিধা হয়। হলুদ, লঙ্কা ধনে ও শরিষার গুঁড়ার পরিমাণই অধিক এবং এই কয়টি প্রায় সমভাগে মিশ্রিত থাকে। জিরা মেথি মৌরি প্রভৃতি গুঁড়ার পরিমাণ উহাদের ১৬ ভাগের এক মাত্র। পচাপাতা গোলাপপাপড়ি, একাঙ্গি কস্তুরি প্রভৃতি তৈলে ব্যবহারোপযোগী সুগন্ধী মশলাগুলিও গোটার মশালার উপাদান। ইহাদের পরিমাণ কিন্তু যৎসামান্য। প্রায় আড়াই সের আন্দাজ গোটার মশালায় বেনের দোকান হইতে ৵০ আনা হিসাবে দুই পাতা* মাথাঘসা বা তেলের মশালা ।০ আনায় খরিদ করিলে যথেষ্ট হয়। এই গুলিও অল্প ভাজিয়া লইলে তবে গুঁড়া হয়। গোটার মশালায় আর একটি উপাদান কাঁচা আমের রস। সমস্ত গুঁড়াগুলি মিশ্রিত করিয়া তাহাতে আমের রস মাখাইয়া রৌদ্রে ঐ মিশ্র মশালা শুকাইতে হয়। ঝোলে, ঝালে অম্লে যে কোন ব্যঞ্জনে এই মিশ্র মশালা ব্যবহার করা যায়। বলাবাহুল্য ইহার সহিত সামান্য পরিমাণ লবণ মিশ্রিত থাকে। ইংরাজি ভাষায় যাহাকে করি পাউডার (Curry powder) বলে, গোটার মশালাকে তাহার নামান্তর বলিলেও বলা যায়। ইহা খুব স্বাস্থ্যপ্রদ।

দারুচিনি (Cinnamonum Zeylanicum), তেজপত্র (Cimamonum Tamala) এই দুইটিই এক জাতীয় গাছ। তেজপাত ও দারুচিনির গাছ গ্রীষ্মমণ্ডলে বহুদুর ব্যাপিয়া জন্মিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। জাভা, সিংহলা মালয়, মালাবার, উত্তর ভারত ও আরও বহুতর স্থানে জন্মিতেছে। সিংহলে দারুচিনির সুবৃহৎ বাণিজ্য চলিতেছে। তথা হইতে বৎসরে প্রায় ৫০ লক্ষ পাউণ্ড দারুচিনি য়ুরোপ, এমেরিকায় চালান যায়। এখানে অত্যধিক পরিমাণে আবশ্যক হয়। ভারতে পলান্ন, পায়স, পক্কান্ন ও মিঠাই প্রস্তুতে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। হিমালয়ের মধ্যপ্রদেশে দারুচিনি ও তেজপাতার বন আছে। তেজপাতার ফুলের গন্ধও মনোহর।

পানের মশালা—পান অর্থে পানীয় কেহ না বুঝেন। পান তাম্বুল অর্থে এখানে ব্যবহার হইয়াছে। ভারতবর্ষে পানের (তাম্বুল) ব্যবহার অতিশয় অধিক। আসমুদ্র, হিমাচল আহারের পর এতদ্দেশে পান অনেকেই ব্যবহার করে। পানে চূণ সংযুক্ত করিয়া চর্ব্বণ করা হয়। শুপারি, যোয়ান, ধনে, চন্দনী, মৌরি, লবঙ্গ, দারুচিনি, দুই রকম এলাচ, জৈত্রি, জায়ফল, কর্পূর, কাবাবচিনি, খদির প্রভৃতি মশালা সংযোগে পান সুবাসিত করা হইয়া থাকে। খদির চূণের সহিত মিশ্রিত হইলে টুকটুকে লাল রঙ ফলিয়া উঠে। খদিরের ভেষজ, জীবাণু নষ্টকারী গুণ ব্যতীত রঞ্জক গুণ আছে বলিয়া ইহা রঞ্জনেরও মশালা। শুপারির দন্ত দৃঢ় করিবার শক্তি আছে। পানের জীবাণুনাশক

---

* পাতা—বেতের দোকানে তৈলের বা গোটার কয়েক প্রকার সুগন্ধী মশালা কাগজে বাধিয়া এক পাতা হিসাবে বিক্রয় হয়।

শক্তি বিলক্ষণ রূপে আছে। গুপারির (Areca Catechu, Betel-nut palm) আবাদ ভারতবর্ষে যথেষ্ট আছে। সরস মাটি না হইলে গুপারি হয় না। নদীর চড়ায়—যেখানে নদীর জল উঠিয়া পলি পড়ে, তথায় গুপারি সুন্দররূপে জন্মিতে দেখা যায়। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক গুপারি বাগান আছে। ব্রহ্মদেশ, ভারতের পূর্ব্ব উপকূল সিংহল ও মালয় দ্বীপ হইতে বহুটাকার গুপারি ভারতবর্ষে আসে—এখানে গুপারির খরচও বিস্তর। দাউল ও মাংসাদি সুসিদ্ধ করিতে হইলে সিদ্ধ করিবার হাঁড়ি বা কটাহে গুপারি কাটিয়া দেওয়া হয়। মশালা মাত্রেরই জীবাণু নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে—কর্পূরের জীবাণু নাশক গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সমস্ত মশালায় পাচকগুণ আছে কিন্তু অত্যাধিক ব্যবহারে অনিষ্ট হয়। জায়ফল (Myristica malabarica) ইহার গাছ দেখিতে অতি সুন্দর। বৃহৎ ঝাড়াল বৃক্ষগুলি সর্ব্বদাই নবীন সবুজ সাজে সজ্জিত। জায়ফল ও জয়িত্রীর অপর নাম রামফল ও রাম জৈত্রী। মালাবার উপকূলে ও ত্রিবাঙ্কুরে ইহা জন্মিয়া থাকে। জাভা, সিংহল ও মালয় দ্বীপে যথা তথা জায়ফলের গাছ আছে। জাভা হইতে প্রায় ৪ লক্ষ টাকার জায়ফল রপ্তানি হয়, জায়ফল উৎকৃষ্ট গরম মশালা। পোলাও রান্না জায়ফল ব্যতীত হয় না। ইহার ভেষজগুণ আছে—নিদান চিকিৎসায় নিতান্ত প্রয়োজন।

গরম মশালা—লবঙ্গ, ছোট এলাচ, বড় এলাচ, দারুচিনি এইগুলি গুঁড়া করিয়া বা পেষণ করিয়া ব্যঞ্জন সুঘ্রান করিতে আবশ্যক হয়। পলান্ন রাঁধিতে লবঙ্গ, ছোট এলাচ, জায়ফল, সা-জিরা, সা-মরিচ, জাফ্রানের আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত লঙ্কা, ধনে তেজপত্রেরও প্রয়োজন হয়। জাফ্রান গুঁড়া, দুধের সহিত মিশাইয়া পোলাওয়ের চাউলে মাখান হয়। অন্য মশলা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লইয়া সেই জলে চাউল সিদ্ধ করা হয়।

ছোট এলাচের গুঁড়া, জায়ফলের গুঁড়া বড় এলাচ, লবঙ্গ, পায়স, পক্কান্ন, মিষ্টান্ন স্বাদ গন্ধে মনোহর করিবার জন্য অহরহ ব্যবহার হইয়া থাকে। কমলার খোসা দ্বারা কমলার গন্ধযুক্ত কমলার বরপি ও আম আদা দ্বারা আম সন্দেস ও আমের সরবৎ প্রস্তুত হয়। আম আদা সংযোগে তেঁতুল ও পেঁপেদ্বারা সুন্দর মুখরোচক চাটনি ও অম্ল প্রস্তুত হয়। মিঠাই মিষ্টান্নে জৈত্রির ব্যবহার দেখা যায়। কমলার খোসা বা আম আদার এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হইল বটে এই দুইটি কিন্তু গরম মশলা পর্য্যায়ভুক্ত নহে। বরং পেঁয়াজ, রসুনকে গরম মশলার শ্রেণীতে ফেলিলেও ফেলা যায়; কারণ ইহাদের অন্যান্য গরম মশলার ন্যায় উত্তেজক গুণ আছে। কর্পূর গরম মশলার অন্তর্ভুক্ত। মিষ্টান্নাদিতে ও পানীয় জল সুবাসিত করিতে কর্পূর ব্যবহার করা হয়, এতদ্ব্যতীত ঔষধার্থে কর্পূরের ব্যবহারই অধিক। কাবাব চিনি পানের ও রন্ধনের মশলা। পিপুল রন্ধনের মশলা, আবার ইহার আচার ও মোরব্বা হয়। ঔষধে ব্যবহারের জন্য ইহা আতদৃ।

মশালাগুলি কোথায় উৎপন্ন হয় এবং সাধারণতঃ ইহাদের চাষ কারকিৎ কি প্রকার এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা সকলের পক্ষে আবশ্যক। আদা (Zingiber officinalis) ও হরিদ্রার (Curcuma longa) চাষ একই রকম। দোয়াস সরস মাটিতে ইহারা ভালরূপ জন্মায়, পাঁকমাটি ইহাদের পক্ষে উত্তম সার। গ্রীষ্মপ্রধান এসিয়া ভূখণ্ড ভিন্ন ইহার চাষ দৃষ্ট হয় না।

পান (Pipper Betel), গোলমরিচ (P. Nigrum), কাবাব চিনি (P. cubeba), পিঁপুল (P. longum) ইহাদের পক্ষে শৈত্যপ্রধান স্থান ও সরস দোঁয়াস মাটি উপযোগী। পানের আবাদ ভারতবর্ষ, সিংহল ও মালয় দ্বীপে দৃষ্ট হয়। পিপুল পানের মত লতানিয়া গাছ এবং পানের মত সমস্বাভাবিক অবস্থায় জন্মায়। যেখানে পান জন্মান সম্ভব সেখানে পিপুল হইবে। সিংহল, ভারতবর্ষ ও মালয়দ্বীপে পিপুল স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যায়। গোলমরিচ ও কাবাব চিনির লতানিয়া গাছ হয়, এই সকল গাছ খুব উচ্চ হয় না, ইহাদের কাণ্ড ঝুপী ও ঝাড়াল হয়।

লবঙ্গ (Eugenia Caryophyllata), দারুচিনি (Cinnamonum Zeylanicum), কর্পূর (C. Camphora), তেজপত্র (C. Tamala) ইহাদের মধ্যে লবঙ্গ মাডাগাস্কার দ্বীপে প্রধানতঃ স্থান পাইয়াছে। দারুচিনির ভারতবর্ষ, সিংহল, মালয়দ্বীপে অনেক গাছ আছে। কর্পূর ফর্ম্মোসা দ্বীপের ও চীন, জাপানের গাছ। ভারতের যথা তথা তেজপাতার গাছ আছে পার্ব্বত্য প্রদেশে কিছু অধিক। জায়ফল, মালাক্কা ও জাভা দ্বীপ হইতে আমদানী হয়; এখান হইতে প্রায় ১০ লক্ষ পাউণ্ড জায়ফল ইতস্ততঃ রপ্তানি হয়।

জাফ্রান (Crocus sativus) চীন সাম্রাজ্য, স্পেন ও ভারতবর্ষে কাশ্মীর প্রদেশে ইহার আবাদ হইয়া থাকে। আর এক রকম বন্য জাফরান আছে তাহার নাম ক্যারম কুয়ী (Carum carui) ইংরাজীতে ইহাকে Caraway seed বলে। কাশ্মিরে ও আফগানিস্থান প্রভৃতি স্থানে ইহা কর্ষিত ভূমির আগাছা। ইহার বীজ চূর্ণ বা আস্ত ব্যঞ্জনে ও মিষ্টান্নে ব্যবহার হয়।

পিঁয়াজ, রসুন, লিক, এসপারাগসগ ইহারা উদ্ভিদশাস্ত্রমতে লিলিয়াসি বর্গের অন্তর্গত। ইহাদের চাষের প্রণালী একই প্রকার। শীতকালে ইহাদের আবাদ হয়; ইহাদের জন্য হাল্‌কা দোয়াস বগোন জমিই প্রশস্ত।

জীরা (Cuminum cyminum) ইহা শাদা ও কাল দুই প্রকারের আছে, মরিচ ও কাল শাদা দুই রকমের আছে। শাদা মরিচ কিন্তু সতন্ত্র একজাতীয় মরিচ নহে, কাল মরিচের খোলা ছাড়াইলে মরিচগুলি শাদাবর্ণের দৃষ্ট হয়। কিন্তু শা জিরা (Carum bulbo castaneum) নামে সতন্ত্র একজাতীয় জিরা আছে। ইহা কাল রঙের। কাশ্মীর ও শিমলা পাহাড়ের উত্তরস্থিত রামপুর বুসায়ার প্রভৃতি অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে।

বড় এলাচ (Elettaria Cardamom) ও ছোট এলাচ মশালার রাজা বলিলে হয়। রন্ধনে, পানে, মিষ্টান্নে সর্ব্বরকমে ইহার ব্যবহার অত্যধিক। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অনেক জায়গায় ইহারা জন্মায়। জাভা, সুমাত্রা, ভারতবর্ষ, ভারতের পূর্ব্ব পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল, পশ্চিম আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে এই দুই উদ্ভিদ দৃষ্ট হয়। শৈত্যপ্রধান পার্ব্বত্য বনভূমি ইহাদের প্রিয় স্থান। ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতগাত্রে বড় এলাচির বহু বিস্তৃত ক্ষেত্র আছে। ছোট এলাচ কিম্বা বড় এলাচ নিম্ন ভূমিতে জন্মে না। যদি বা বড় এলাচের ফুল ফল হয় কিন্তু ফল পুষ্ট হয় না। ছোট এলাচের ফুল ফল আদৌ হয় না। সিংহলে প্রায় ৯০০০ একর যড় এলাচের আবাদ আছে। তথা হইতে বৎসরে ৮ লক্ষ পাউণ্ড এলাচ ইতস্ততঃ রপ্তানি হয়। ১ পাউণ্ড বাঙলা দেশের মাপে প্রায় আধ সের। মহীশূর ও মালাবার উপকূল, ত্রিবাঙ্কুর, কুর্গ প্রভৃতি অঞ্চলে ছোট এলাচ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। মলয় দ্বীপপুঞ্জে ও জাঞ্জিবারেও ছোট এলাচের চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

সুগন্ধী মশালা—সুগন্ধী মশালার মধ্যে অগুরু (Aquilaria Agallocha) কাষ্ঠ, ধূপ, নাগকেশর ফুল, জটামাংসীর শিকড়, কুটমুল (কাশ্মির), মুথা, দেবদারুকাষ্ঠ, শ্বেতচন্দন, দোলন চাঁপার ফুল (Hedychim Spicatum) আয়ুর্ব্বল (Juniper berries) খস্ খস্ মুল, রোজাঘাষ (Rosa grass) দোনা, মেথী, একাঙ্গী, কস্তুরি (Hibiscus abelmoschus), পচাপাতা, তৃণ বা লেবুঘাষের পাতা, কেতকিপত্র, কেতকী ফুল, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, পিমেণ্টা (এতদ্দেশে এ গাছ নাই, ভূমধ্যসাগরের উপকূলে জন্মে), আম আদা ও গোলাপের পাপড়ি প্রধান। এই সমুদয় মশালার অধিকাংশগুলি তৈল সুগন্ধ করিতে কিম্বা গন্ধসার প্রস্তুত করিতে প্রয়োজন হয়। কতকগুলি দ্বারা (যেমন দোলন চাঁপা ফুল, নাগকেশর ফুল, শ্বেতচন্দন কাষ্ঠ খস্‌খস্, রোজা ঘাষ, গোলাপ পাতা) জল, সরবৎ প্রভৃতি পানীয় দ্রব্য সুবাসিত হইতে পারে। দোনা, রোজা ঘাষ, কেতকিপত্র, লেবু ঘাষের পাতা, চাউল সিদ্ধ করিবার সময় হাঁড়িতে দিয়া সিদ্ধ করিলে ভাত খুব সুবাসিত হয়। দারুচিনি, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, পিমেণ্টা প্রভৃতির মাশাসার গন্ধ কথঞ্চিৎ উগ্র। এইজন্য বিশেষ বিশেষ কার্য্যে এইগুলির ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে কেঁয়া খয়ের নামক এক প্রকার সুগন্ধী খয়ের প্রস্তুত হয়। কেঁয়াফুলের গুঁড়া, পাপড়ি খয়ের, জোয়ান, চন্দনী, বড় এলাচ ছোট এলাচের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া লইয়া তাহাতে জল সংযুক্ত করিয়া লেইবৎ তরল করিয়া ফেলিতে হয়। ইহা কেঁয়া পাতায় বাঁধিয়া কলার আকারে রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে কেঁয়া খয়ের প্রস্তুত হইল। ইহা সুন্দর। কেঁয়া খয়েরে কেঁয়া ফুলের গুঁড়া ও খদিরের পরিমাণই অধিক। অন্যান্য মশালার পরিমাণ অনুপাতে কম। সন্দেশের খালাতে আম আদার রস সংযোগ করিয়া আম সন্দেশ প্রস্তুত হয়।

কমলা লেবুর খোসা কিছুক্ষণ গরম সন্দেশের থালার উপর রাখিয়া কোন পাত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলে তাহাতে কমলার সুন্দর গন্ধ সঞ্চারিত হয়। এই রকমেই কলিকাতার সুবিখ্যাত কমলার বরপি তৈয়ার হইয়া থাকে।

রঞ্জনের মশলা—আলকাতরা হইতে অ্যানিলিন্ নামক রঞ্জক পদার্থ আবিষ্কৃত ও ব্যবহার হওয়ার পূর্ব্বে যাবতীয় শিল্প অথবা কারুকার্য্যে উদ্ভিজ্জ রঙই প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। আজকাল উদ্ভিজ্জ রঙ ব্যবহারের অভাবে অনেক পরিমাণে লোপ পাইয়াছে। কেবল কয়েকটির এখনও পর্য্যন্ত চলন আছে। ব্যবসায়িক হিসাবে অধিক পরিমাণে যে সমুদয় রঞ্জক পদার্থ দেখা যায় সে গুলি প্রায়ই কষ অথবা ট্যান (Tan)। বাবলার ছাল ও শুঁটি (Acacia arabica), ভোরার ছাল (Phizophora mucronata), তারওয়ার ছাল (Cassia auriculata) শোঁদালের ছাল (Cassia fistula ও হরিতকী (Terminalia chebula)—এই গুলিই সর্ব্বপ্রধান রঞ্জক কষ। দেশে ও বিদেশে চামড়া প্রভৃতি রঙ করিবার জন্য ইহাদের যথেষ্ট কাটতি আছে; সুতরাং বাজারেও সচরাচর পাওয়া যায়। অন্য কতকগুলি কষের ব্যবহার অল্প বিস্তর পরিমাণে স্থানীয়; তাহাদের মধ্যে এস্থলে নিম্ন লিখিত গুলির নাম করিতে পারা যায়:—মাদ্রাজে রক্তপিত্ত (Ventilago Madraspatana), মধ্য প্রদেশে সাঁই (Terminalia tomentosa) ও শাল (Shora robusta) এবং নানাস্থানে পারুল (Lagarstiomia parviflora), জিওল (Odina wordier) ও জাম (Eugenia Jambolana)।

বস্ত্রাদি রঞ্জনের জন্য নানাবিধ বৃক্ষের মূল, কাষ্ঠ, ত্বক ও পুষ্পাদি ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রক্তচন্দন কাষ্ঠ (Pterocarpas Santalinas) হইতে লালরঙ, কাঁটাল কাঠ আচ্‌মূল হইতে পীত রং, লোধ ছাল (Symplocos racemosa) হইতে লাল ও পীত রঙ বিশেষ রূপে উল্লেখ করিতে পারা যায়। এতদ্ভিন্ন স্থান বিশেষে বিশেষ রঞ্জক পদার্থ উৎপাদিত হয়। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশের বামলা গুঁড়ি (Mallotus Phillipineusis) হইতে লাল রঙ ব্যতিত কৃমি নাশক ঔষধ ও প্রস্তুত হয়। ভারতের পশ্চিম উপকূলে সুর্গী অথবা তাম্বা নাগকেশর নামক ফুলে এক প্রকার লাল রঙ হয়। সরকার হইতে প্রতি বৎসর এই গাছগুলি বিলি হয়। মালাবার ও উত্তর ও দক্ষিণ কানড়ায় ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

লটকানের রঙ (Bixa Orillana) এখনও পর্য্যন্ত কতক পরিমাণে রেশমী কাপড় রঙ ও ছানা পনির প্রভৃতি রঙ করিতে ব্যবহৃত হয়। পলাশ ফুল, শিউলী ও চম্পক ফুলও অল্পবিস্তর রঙ করিবার জন্য কোন কোন স্থানে ব্যবহার হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে নীল, কুসুমফুল, জাফ্রান ও আলকানিমূলের এখনও পর্য্যন্ত কতক কতক পরিমাণে চাষ হয়।

গোপালনের কথা

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত।

গোপালনের উপকারিতা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানী কবি লিখিয়াছেন,—

"ধরাপতিনাম পরমা হিতেয়ম্, পয়োভিরাজ্যৈস্বীয় ঘৃতৈশ্চদয়া,
পুষ্ণাতি পুত্রৈশ্চ মহী নিকর্ষে, গৌরেব মাতা জননী ন মাতা।"

ধরাপতির পরম হিতকারিনী, দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা প্রতিপালককে পুত্রবৎ পালন করেন, ভূমি কর্ষণ জন্য স্বীয় পুত্রকে দান করেন, অতএব জননী মাতাও গোমাতার তুল্য নহেন।

মহর্ষি ব্যাসদেব ধেনুমাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"পৃষ্ঠে ব্রহ্মা গলে বিষ্ণু মুখে রুদ্র প্রতিষ্ঠিতো, মধ্যে দেবগণাঃ সর্ব্বে রোমকূপে মর্হষয়ঃ।
নাগা পুচ্ছে ক্ষুরাগ্রেষু যে চাষ্টৌ কুলপর্ব্বতা, মূত্রে গঙ্গদয়োনদ্যো নেত্রয়ো শশীভাস্করৌঃ।
এতে যস্যাস্তনৌ দেবাঃ সা ধেনু বরদাস্তমে, বর্ণিতং ধেনুমাহাত্ম্যং ব্যাসেন শ্রীমতাত্বিদম্॥"

পৃষ্ঠে ব্রহ্মা, গলে বিষ্ণু, মুখে রুদ্রদেব প্রতিষ্ঠিত, শরীর মধ্যে দেবগণ, রোমকূপে মহর্ষিগণ, পুচ্ছে নাগাবলী, ক্ষুরাগ্রে অষ্টকুল পর্ব্বত সংস্থিত, মূত্রে গঙ্গাদি নদী, নেত্রদ্বয়ে শশী ভাস্কর অবস্থিত, যে ধেনুর শরীরে এই সকল দেব ঋষির অধিষ্ঠান তিনি আমার প্রতি বরদাত্রী হউন।

ভগবান স্বয়ং গোপালরূপে গোলকে গোপালন করেন, এজন্য তাহার প্রণামে—"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায়চ" শব্দ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তিনি ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞ কার্য্যে প্রয়োজনীয় ঘৃতের জন্য গোলক হইতে মহর্ষি জমদগ্নিকে নন্দা, ভরদ্বাজকে সুভদ্রা, বশিষ্ঠকে সুরভি, অত্রিকে শীলা এবং গৌতমকে সুমনা এই পঞ্চ গাভী দিয়াছিলেন, তাহা হইতে ভূতলে গো বৃদ্ধি হইয়াছে।

ভারত হিন্দুর দেশ, হিন্দুর উপাস্য প্রত্যক্ষ দেবতা গো, ব্রাহ্মণ। হিন্দুগৃহ বিগ্রহ গোমাতার সেবা ও পালন পরম পুণ্য ও সৌভাগ্যজনক মনে করে। অনবধানতাবশতঃ অথবা দৈবাৎ গোবধ হইলে হিন্দু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পবিত্র হয়। গাভীর মল, মূত্র, দুগ্ধ দ্বারা হিন্দু নিত্য উপকৃত হয়, গোময় ভিন্ন হিন্দুর গৃহশুদ্ধি হয় না, পঞ্চগব্য না হইলে অশৌচ ত্যাগ হয় না। পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধে যে বৃষোৎসর্গ করা হয়, তাহার উদ্দেশ্য গোবংশ বৃদ্ধি। এখনও ভারতে এমন হিন্দু আছেন, যিনি অগ্রে গোগ্রাস না দিয়া জল গ্রহণ করেন না। কিন্তু কালমাহাত্ম্যে হিন্দুর মনে ভ্রম হওয়াতে অনেকেই গোপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। যে অল্পসংখ্যক লোক দুগ্ধের লোভে দুই একটা গাভী রাখে, তাহারা কেহই স্বয়ং গাভীর সেবা যত্ন করে না, এইরূপ হতাদরে বিশেষতঃ পর্য্যপ্ত খাদ্যাভাবে গোজাতির

অতি অবনতি ঘটিয়াছে। তাহার পর সমগ্র ভারতে যে তিন লক্ষেরও অধিক কশাই আছে, তাহাদিগের দ্বারা প্রতি বৎসরে যত গো জন্মে, তাহায় অধিক হত্যা হওয়াতে গোবংশ নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছে। চর্ম্মের লোভে পাষণ্ডেরা বিষ প্রয়োগে কত গো বধ করিতেছে এবং মড়কে ও অন্যান্য কারণে প্রতিবৎসর কত গোবৎস মরিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতি বৎসর কত যে গবাদি পশু কালগ্রাসে পতিত হয় তাহার সংখ্যা হয় না। আগে গোবংশের এত অকাল মৃত্যু ছিল না তখন গোচারণের মাঠ ছিল, গবাদির সচ্ছন্দ বিচরণের সুবিধা ছিল, গবাদির তৃণ ঘাষাদি ও পানীয় জল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মিলিত। গোবংশ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ছিল। অধুনা পঙ্কিল অপেয় জল পান করিয়া, অর্দ্ধাসনে বা অনসনে গোবংশ ক্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে সুতরাং নানা প্রকার রোগাদির আক্রমণ তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

এইরূপে নানা কারণে গোবংশ ধ্বংস হওয়াতে গোময় অভাবে ভূমির উর্ব্বরতা হ্রাস হইয়া দেশের শস্যহানি ঘটিয়াছে। গো অভাবেই খাঁটী দুগ্ধ এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। যে দেশে টাকায় কুড়ি সের দুগ্ধ ছিল, তথায় বর্ত্তমান সময়ে টাকায় চারি সের হইয়াছে! মৎস্য, মাংস, ময়দা, তণ্ডুল যত প্রকার খাদ্য সামগ্রী আছে, এক দুগ্ধেই সেই সকলের পুষ্টিকারিতা বিদ্যমান। কেবল দুগ্ধ পান করিয়াই জীবন ধারণ করা যায়। দুগ্ধদ্বারা ছানা, মাখন, দধি, ঘোল, ঘৃত, পণীর, সরভাজা, রাবড়ী, মিষ্টান্ন পরমান্ন হিন্দুর কতই সুস্বাদু সামগ্রী প্রস্তুত হয়, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই—গো অভাবে মাতৃহীন শিশুর পক্ষেও বিশুদ্ধ গো দুগ্ধ দুর্লভ হইয়াছে। বিদেশী টীনের কৌটায় আবদ্ধ জমাট দুগ্ধই এখন শিশুদিগের জীবন ধারণের প্রধান সম্বল হইয়াছে। ঘৃতে গো শূকর সর্পাদির বসা বিষ মিশ্রিত হওয়ার মুল কারণ গো অভাবে দুগ্ধের অপ্রাচুর্য্য।

ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষিতদল কেবল নিজেদের সুখ সুবিধার জন্যই লালায়িত। দেশের নামে বৃথা হৈ চৈ করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উড়াইয়া সভা সমিতি করিতেই মজবুত, দেশের প্রকৃত হিতজনক কার্য্য কেহ করিতে পারেন না, এমত অসহায় নির্ব্বাক গোজাতির কষ্ট কাহিনীর কথা হয়ত অনেকের নিকট গল্পমাত্র জ্ঞান হইবে। এমনই কালের মাহাত্ম্য! যে গোবংশের বলীবর্দ্দ হলাকর্ষণ করিয়া আমাদিগের উদরান্নের সংস্থান করিয়া দিতেছে, আমরা তাহাদিগের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করি না, ইহাপেক্ষা অকৃতজ্ঞতা আর কি হইতে পারে। গোজাতি মরিয়াও যে শৃঙ্গ, চর্ম্ম, অস্ত্র, লোম, অস্থি, ক্ষুর, সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা মানবের উপকার করে, একথা কি কেহ ভ্রমেও চিন্তা করে। বাস্তবিক আমরা গোজাতির প্রতি যতই হতাদর করিতেছি, ততই দেশময় দুঃখ দারিদ্র্য, অন্নাভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। নিরীহ নির্ব্বাক গো বেচারীর কঙ্কালময় শীর্ণাবস্থা একবার চাহিয়া দেখ, গোচারণের মাট অভাবে চরিতে না পাইয়া শুষ্ক বিচালী চর্ব্বণে তাহাদের শরীর শুষ্ক। দুগ্ধের লোভে ফুকা দিয়া তাঁহার শোণিত শোষণ করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়, যাহা দুধ বলিয়া জলবৎ বিক্রয় হয়, তাহা কি

প্রকৃতপক্ষে দুগ্ধ অথবা শ্বেত শোণিত একবার দোহন দেখিলে দুগ্ধপানের স্পৃহা লোপ হয়। অতি দোহনে বৎসটী স্তন্যাভাবে ভাতের মাড় চাটিয়া শুষ্ক দেহে অকালে পঞ্চত্ব পায়, তখন উহার অন্ত্রাদি বাহির করিয়া পেটে খড় পুরিয়া রৌদ্রে বিশুষ্ক করিয়া অপত্য স্নেহবতী অবোধ গাভীর সম্মুখে ধরে, সে স্নেহবশে লেহন করিতে থাকে, এই সময় তাহার স্তনেন্দ্রিয়যোগে বাঁশের সরু চোঙ্গ প্রবিষ্ট করাইয়া শুষ্ক লবণ ফুঁ দিয়া উদরে প্রবেশ করায়, ইহাকেই ফুকা দেওয়া বলে। লবণের ক্ষারত্ব হেতু গাভীটী অভিভূত হইয়া কাঁপিতে থাকে, তখন নিষ্ঠুর গোয়ালা দোহন করিয়া দুগ্ধরূপী শোণিত বাহির করিতে থাকে, এই দুগ্ধই সহরের সভ্যতার প্রদীপের অধস্থ অন্ধকারে বিক্রয় হইতেছে, আর হিন্দু নামধারী সকলে পান করিতেছেন।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে হিন্দুর এরূপ হীনাবস্থা দুগ্ধ-দুর্গতি ছিল না। পূর্ব্বকালে হিন্দুর গৃহলক্ষ্মীরা পবিত্রভাবে স্বয়ং গো দোহন করিতেন, কারণ পিতৃগৃহে তিনি দোহন করিতেন বলিয়াই তাঁহার এক নাম "দুহিতা"। তিনি বিবাহিতা হইয়া পিতৃ মাতৃ দত্ত যৌতুক "লক্ষ্মী" নাম্নী প্রথম প্রসূতা একটী গাভী লইয়া স্বামী গৃহে আসিয়াছিলেন, কালক্রমে লক্ষ্মীর গঙ্গা, যমুনা, ধবলী, শ্যামলী কত বৎস হয়, পুনরায় সেই বৎসের বৎস রাঙ্গী, কমলী, কালিন্দী, প্রত্যেকেরই তিনি নাম জানেন। তাহারা তাহার শৃঙ্গহীন মস্তকে গুঁতা দিয়া আদর ও ভালবাসা জানায়, গো সেবার জন্য দুইজন চাকর রাখিয়াছেন তথাপি তিনি সময়ক্রমে স্বহস্তে গোয়াল কাড়েন, গোবৎসগুলিকে খেতে দেন, গায়ে হাত বুলান, কোনদিন দোহনও করেন। আহা! এক লক্ষ্মী হইতে তাহার সেবা যত্নে এক গোয়াল ভরা গাই বাছুর হইয়াছে। প্রত্যহ প্রায় ১০।১২ সের দুগ্ধ হয়, বিতরণ করিয়াও ঘরের ছেলেরা দোহন মাত্র সফেন দুগ্ধপানে হৃষ্টপুষ্ট। ঘরে মিষ্টান্ন পরমান্নের অভাব নাই। সুখ সৌভাগ্যের তুলনা নাই। ইন্ধনের জন্য ঘুঁটে টাল করা আছে! গোবরের পচা সারে বাগানে কতই শাক সবজী তরকারী জন্মে, এই দেখুন সেকালের গার্হস্থ্য দৃশ্য। একালের লক্ষ্মীরা পায় গোবর লাগিয়া আলতার নকল ম্যাজেণ্টা রঙ মাটী হবে এই ভয়ে গোয়াল ঘরে যান না। তবে তাহার নাম দুহিতা, এজন্য স্বামীর শোণিত দোহন করিয়া সোণার চন্দ্রহার গড়াইতেছেন, গাই গরু তাহার আগমনের পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহার কতক "বিক্রমপুরে", আর কতক খাইতে না পাইয়া "যমপুরে" যাওয়ায় আপদ চুকিয়াছে। তিনি চা-খান বিলাতী টীনের দুধে, ছেলেকে মাই দেন না, ছেলেটা গাধার দুধ খায়, গাধার দুধ খাইয়া ছেলেটার বুদ্ধিও গাধার মতই হয়। এই দেখুন আধুনিক কালের পারিবারিক ছবি!

সংসারে যত প্রকার ধন সামগ্রী আছে, তন্মধ্যে গোধন অভাবেই হিন্দু নির্ধন হইয়াছে। গোপালন পাশ্চাত্য জগতে কিরূপ যত্নের সহিত করা হয় তাহা বিলাতী টীনের দুধ মাখন পনীর দ্বারা জানা যায়। এক একটী বিলাতী গাভী ন্যূনকল্পে ১০।১২

সের দুধ দেয়, তথায় এরূপ গাভীর মূল্যও দুই শত টাকা। তথাকার ৩০।৩৫ সের দুধের গাভীর কথা শুনিয়া আমরা অবাক হইয়া থাকি। আর ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের গরুর ১০।১৫ টাকা মূল্য, দুধও দেয় অর্দ্ধসের। এ অবনতি বাঙ্গালীর অনাদর জন্য কিম্বা গোপগণের নিজের দোষ কি শিক্ষা জ্ঞানের অভাব জন্য তাহা এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। বর্ত্তমান শিক্ষা অজ্ঞানতামূলক, তাই আর্য্য হিন্দু জাতি পূর্ব্বাচরিত কার্য্যে বিমুখ হইয়া আমরা বিলাসিতার স্রোতে দুঃখসাগরে সাঁতার দিতেছি, যতদিন দেশে গোপালন ও কৃষির জন্য সুবৃষ্টিজনক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হইবে, ততকাল দুঃখ দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ ঘুচিবে না। গোপালন ও গো পরিচর্য্যায় দেখিতে পাইবেন, গোমাতার আশীর্ব্বাদে গৃহ শান্তিময় ও ধন ধান্য পূর্ণ হইয়াছে।

চৈতে বেগুণ

গোয়লন্দের চৈতে বেগুণ।

সাধারণ চৈতে বেগুণ।

ইহাকে সচরাচর পুলি বেগুণ বা কুলি বেগুণ বলা হয়। পুলির মত আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া ইহাকে পুলি বেগুণ বলে এবং সস্তা দামের বেগুণ বলিয়া এই বেগুণ প্রায়ই কল কারখানার সন্নিহিত কুলি বাজারে আমদানী হয় ও কুলিরা অধিক মাত্রায় খরিদ করে এই হেতু ইহা কুলিবেগুণ এই আখ্যাও প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার শাস্ত্রীয় নাম সোলেনম্ লঙ্গম (Solanum longum)। মাঘ মাসের শেষে ফাল্গুণ মাসের মধ্যে ইহার চারা তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়। চৈত্র মাসে ক্ষেতে চারা রোপিত হইলে বৈশাখ হইতে ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করে। এই সময় পৌষীয় বেগুণের ফল থাকে না এবং, চৈতে বেগুণ এই সন্ধিক্ষণে মানুষের তরকারী যোগান দেয় এই হিসাবে ইহা আদৃত। নতুবা পৌষীয় বা আউসে বেগুণ ফেলিয়া কেহ ইহা ব্যবহার করিতে চাহিবে না। যদি মাঘ মাসের মধ্যে চৈতে বেগুণের চারা তৈয়ারি করিতে পারা যায় তবে

আরও ভাল হয়। চৈত্রমাসে চৈতে বেগুণ পাইলে লোকে আরও অধিক আদর করিয়া কিনিয়া থাকে।

বাঙলাদেশে ফাল্গুণ চৈত্র মাসে বৃষ্টি কদাচিত হয় সুতরাং চৈতে বেগুণের ক্ষেতে জল সেচনের ব্যবস্থা না করিলে চলে না। চারাগুলি হাপর হইতে তুলিয়া আবশ্যকমত শিকড়াগ্রভাগ কিঞ্চিৎ ছাঁটিয়া ক্ষেতে বসাইতে হয় এবং বসাইবার কালে গোড়ায় একটু জল দিতে হয়। বৈকালে ঠাণ্ডার সময় চারা বসান বিধি। ক্ষেতে চারা বসাইবার পর এক মাসের মধ্যে দুইবার জল সেচন না করিলে চলে না।

৩´×৩´ অন্তর চারা রোপণ করিলে এক বিঘা জমিতে (১৪৪০০ বর্গ ফিট) ১৬০০ চারা রোপণ করা যাইবে। বেগুণের জন্য পটাস প্রধান সারের আবশ্যক। এক বিঘা জমিতে যাহাতে ২৫ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, ৬০ পাঁউণ্ড পটাস, ৩০ পাউণ্ড ফস্ফরিকাম্ল সংযোগ হয় এবম্প্রকার সার প্রয়োগ করিতে হইবে। নাইট্রোজোনর জন্য খৈল, পটাস সারের জন্য ভস্ম, ফস্ফরিকাম্লের জন্য হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিতে হয়। সাধারণতঃ বিঘা প্রতি ৩০০ শত ঝুড়ি পুষ্করিণীর শুষ্ক পাঁক মাটি এবং প্রত্যেক গাছে এক ছটাক হিসাবে সরিষার খৈল দিলে সম্পূর্ণ সার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়া হইল বলিয়া মনে করা যায়।

চৈতে বেগুণ ছোট বড় দুই রকম দৃষ্ট হয়—ছোট জাতীয় চৈতে বেগুণ ৭।৮ ইঞ্চের অধিক বড় হয় না কিন্তু একগুচ্ছে অনেকগুলি ফল ধরে। এই জাতীয় দীর্ঘাকৃতি বেগুণ অপেক্ষা ইহার ফলন অধিক বলা যায়। দীর্ঘাকৃতি বেগুণ বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে সমধিক জন্মিতে দেখা যায়। ইহা আকারে ১।১৷৷০ ফুঠ পর্য্যন্ত লম্বা হয় এবং অপেক্ষাকৃত মোটা হয়। কিন্তু গাছে অধিক ফল ধরিলে ফল ছোট ও সরু হয়। যদি গাছের সমুদয় কুঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়া ৩।৪টি কুঁড়ি রাখা যায় তাহা হইলে ফল অতিশয় লম্বা ও মোটা হয়।

আয় ও ব্যয়—১ বিঘা জমি

১৬০০ গাছের মধ্যে হাজা, শুকা, পোকালাগা ৩০০ গাছ বাদ দিলে		
১৩০০ গাছের প্রত্যেকটিতে ফলন ১ সের হিসাবে ১৩০০ সের		
১ সের বেগুণের দাম /০ হিসাবে—		৮১৷০
১ আউন্স বা ২৷৷০ তোলা বীজের দাম	৷৷০	
লাঙ্গল মৈ দেওয়া, চারা রোপণ, আইল বাঁধা, জল সেচন	১৬৷৷০	
খৈল ২৷৷০ মণ	৬৷০	
মাটি ছড়ান ৩০০ শত ঝুড়ি	১৷৷০	
পোকা লাগার প্রতিবিধান ও ফল আহরণ ইত্যাদি	৫৷০	
জমির খাজনা	৫৲	
	৩৫৲	৩৫৲
নেট মুনফা		৪৬৲

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক ১/০ বিঘা ক্ষেতে যদি ১০০ শত গাছ বীজের জন্য ছাড়িয়া রাখা যায় তাহা হইলে গাছ পিছু অর্দ্ধ ছটাক বীজ লাভ হইবে এবং ১০০ গাছ হইতে ঝাড়িয়া বাছিয়া /২ সের ভাল বীজ পাওয়া সম্ভব। দুই সের ঝাড়া বাছা বীজের পাইকারী দাম ৮৲ টাকা হিসাবে ১৬৲ টাকা ইহা হইতে বীজ তৈয়ারী করা ও ঝাড়া বাছার খরচ ৪৲ টাকা বাদ দিলে উপরন্তু আরও ১২৲ টাকা লাভ হইতে পারে। ইহা হইতে ১০০ শত গাছের আয় ৬।০ ছয় টাকা চারি আনা বাদ দিলে ৫৸০ পাঁচ টাকা বার আনা নেট মুনফা উপরন্তু থাকিবে। এরূপ প্রকার একটা চাষ হইতে লাভ করা সুচাষীর পক্ষে সম্ভব। মামুলী চাষে ইহার অর্দ্ধেক লাভও হয় না। প্রাণপণ করিলে তবে লাভ হইবে এবং লাভের মাত্রা অধিক হইবে।

সাময়িক কৃষি-সংবাদ

——:*:——

রঙ্গপুর কৃষি-সমিতির সংক্ষিপ্ত কার্য্যাববরণ

স্থানীয় কতিপয় উৎসাহী ভদ্রলোকর যত্নে ১৯০৪ সালে রঙ্গপুর কৃষি-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত এই কৃষি-সমিতি নির্দ্দেশ অনুসারে রঙ্গপুর আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে বিবিধ উন্নত কৃষি-প্রণালী সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা করা হয়। ১৯১২ সালে এই সমিতি রেজেষ্ট্রী করা হয়, এবং আপাততঃ ইহার সভ্য সংখ্যা ১১২। এই সমিতির আয় সভ্যগণের চাঁদা ও দানের উপরেই নির্ভর করে; এবং সময় সময় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডও কিছু সাহায্য করিয়া থাকেন। সমিতি হইতে নানারূপ বীজ, সার, কৃষিযন্ত্র আনিয়া ক্রয় মূল্যে কৃগকদিগের ভিতর বিতরণ করা হয়। কৃষিকার্য্যে উন্নত কৃষিপ্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক যাহারা বিশেষ সুফল দেখাইতে পারেন, তাহাদিকে পুরস্কার দেওয়া হয়; সময় সময় কৃষি সম্বন্ধীয় পুস্তিকা প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়।

কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলে যে সকল বিষয়ে সুফল পাওয়া গিয়াছে, কৃষিজীবিগণকেও সেই সমস্ত বিষয়ে আপন আপন ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে ১৯১৩ সাল হইতে চেষ্টা করা হইতেছে। কৃষকগণ যাহাতে কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারিদিগের উপদেশ অনুসারে উন্নত কৃষিপ্রণালীর অনুসরণ করে, কৃষি-সমিতির সদস্যগণ সেই বিষয়ে কৃষকদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন, এবং সমিতি উৎকৃষ্ট বীজ, সার, যন্ত্র ইত্যাদি সরবরাহ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই অল্প সময়ের ভিতরেই ১৮০/০ মণ হাড়ের সার, ৩৭৫/০ মণ দারজিলিং (এবং অন্যান্য পার্ব্বত্য) আলু, ১২০ খানা মেষ্টন লাঙ্গল কৃষকদিগের ভিতর বিক্রয় করা হইয়াছে। কেহ কেহ চেইন্ পাম্প, গরুর জাব কাটা কল ইত্যাদিও পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

অনেক কৃষককে যত্নপূর্ব্বক গোবর সংরক্ষণ ও বীজ নির্ব্বাচন করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। অনেকে নির্ব্বাচিত বীজ হইতে এক বৎসর শস্য উৎপাদন করিয়াই তাহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ভুষভাণ্ডার এবং হাতীবান্ধার নিকট অনেক কৃষক এখন সবুজ সারের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া উহার জন্য রীতিমতভাবে বরবটীর চাষ করিতেছেন।

বিগত তিন বৎসরের মধ্যে আমরা কৃষিসংক্রান্ত উন্নতির বিষয়ে যতটা অগ্রসর হইয়াছি, উহা আপাতদৃষ্টিতে কাহারও কাহারও নিকট অপর্য্যাপ্ত মনে হইতে পারে, কিন্তু আমাদিগের মনে রাখিতে হইবে যে, রঙ্গপুরের ভূমি স্বভাবতঃই উর্ব্বরা, এবং কৃষকদিগের অবস্থাও মন্দ নহে। তাহারা জমি হইতে যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাই তাহাদের সামান্য অভাব নিবারণের জন্য পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করে, এবং তদধিক লাভ করিবার নিমিত্ত বেশী পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা করে না। ১৯১৩ সালে ৩২২ জন কৃষককে লইয়া এই কাজ আরম্ভ করা হয়; বর্ত্তমানে ১১০০ জনের অধিক কৃষকের জমিতে কাজ চলিতেছে। পরন্তু সমবায়-সমিতি এবং সভাপতি পঞ্চায়েত দ্বারা বীজ ইত্যাদি সরবরাহ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। কাজের এইরূপ বিস্তারের জন্য রঙ্গপুর বীজাগার

হইতে সমস্ত বীজ ইত্যাদি সরবরাহ করা বিশেষ অসুবিধা বোধ হইতেছে; সেই নিমিত্ত গাইবান্ধা ও লালমণির হাটে দুইটী শাখা বীজাগার স্থাপন করা হইতেছে।

যে সমস্ত কৃষক উন্নত কৃষিপ্রণালী দ্বারা সুফল পাইতেছেন, তাহাদিগকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিবার জন্য রঙ্গপুর কৃষি-সমিতি পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করেন। এই মতানুসারে রঙ্গপুর ডয়ারী ফার্ম্মে বঙ্গের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯১৫সালের ২০এ ফেব্রুয়ারী তারিখে আহূত সভায় ১৭ জন কৃষককে ১৫০৲ টাকার পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রধানতঃ উৎকৃষ্ট আলু উৎপাদন ও বীজ নির্ব্বাচনের জন্যই পুরস্কার দেওয়া হয়। ইহার ফলে এই বৎসর আরও অধিক সংখ্যায় কৃষক বিশেষ উৎসাহ সহকারে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রতি বৎসরেই এইরূপ পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে আশা করা যায়।

বর্ত্তমান কৃষিপ্রণালীতে সামান্য পরিবর্ত্তন দ্বারা যে কিরূপে ফল লাভ করা যাইতে পারে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কয়েক বৎসর পরীক্ষার পর আপাততঃ বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ এক জাতীয় শালিধান্যের প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন। গত বৎসর রঙ্গপুর আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে এবং ডেয়ারী ফার্ম্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, স্থানীয় ধান্য অপেক্ষা এই ধান্যের ফলন বিঘা প্রতি প্রায় তিন মণ বেশী। রঙ্গপুর জেলাতে এইরূপ শালিধান্যের উপযুক্ত প্রায় ১২,০০০০০ বিঘা জমি আছে। যদি সমস্ত জেলাতে এইরূপ প্রচলন করা যাইতে পারে, তাহা হইলে শুধু এই উপায়েই বিনা আয়াসে ৬৩,০০০০০৲ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

গত বৎসর কৃষি-বিভাগ যে পাটের বীজ বিতরণ করিয়াছিলেন, এবং যে সমস্ত বীজ নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল, তাহার ফলন সাধারণ পাট অপেক্ষা বিঘা প্রতি প্রায় ॥০ অর্দ্ধমণ বেশী দেখাগিয়াছে। রঙ্গপুরে প্রায় ৭,০০,০০০ বিঘা পাটের জমি আছে। যদি সেই সমস্ত জমিতে এইরূপ ফল লাভ করা যায়, তাহা হইলে রঙ্গপুর জেলার আয় আরও, ২৫,০০০০০৲ লক্ষ টাকা অধিক হইতে পারে। আমাদের এইটুকু স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, নিকৃষ্ট বীজ এবং উৎকৃষ্ট বীজের মূল্যের তারতম্য অত্যন্ত কম।

স্থানীয় জমিদার, জোতদার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নানারূপে এই সমিতির কার্য্যের সহায়তা করিতে পারেন। তাঁহারা কৃষকদিগকে এই সমস্ত অল্পব্যয়সাধ্য উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিতে সর্ব্বদাই উৎসাহিত করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের যে নানারূপ অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কার আছে, তাহা দুর করিতে চেষ্টা করাও তাহাদিগের পক্ষে অসম্ভব নহে। স্থানীয় কৃষিকর্ম্মচারিদিগের সহিত পরিচিত করিয়া কৃষকদিগকে উৎসাহিত করাও তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভবপর। কৃষকদিগের সংখ্যার তুলনায় স্থানীয় কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের সংখ্যা অতি অল্প; এই সমস্ত উন্নত কৃষিপ্রণালী কৃষকদিগের ভিতর প্রচার করিবার জন্য আমাদিগকে স্থানীয় জমিদার, জোতদার প্রভৃতির উপরেই নির্ভর করিতে হইবে। যাঁহারা কৃষি-সমিতির এই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট রঙ্গপুর কৃষি-সমিতি বিশেষ কৃতজ্ঞ। বিশেষতঃ যে সমস্ত কৃষিজীবি নিজের ক্ষেত্রে নানারূপ উন্নত কৃষিপ্রণালী পরীক্ষা করিয়া তাহাদের উপযোগিতা

প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকধ আমরা বিশেষভাবে ঋণী। আশা করা যায় রঙ্গপুরের সমুদয় কৃষকবৃন্দ ইহাদিগের অনুসরণ করিবেন।—জে, এন, গুপ্ত, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সভাপতি রঙ্গপুর।

আসামে তুলার চাষ—এবৎসর আসাম প্রদেশে ৩১,০০০ একর জমি হইতে ১০,৫০০ বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে, গত বৎসরের তুলনায় এবারে শতকরা ১৩ ভাগ কম তুলা জন্মিয়াছে। বীজ বপনের সময় অতিবৃষ্টি এবং কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাসে আবশ্যকমত বৃষ্টি না হওয়াই ফসল কম হইবার কারণ বলিয়া জানা গিয়াছে।

ধান—এবৎসরে আসাম প্রদেশে গত বৎসর অপেক্ষা ১২৭,৬০০ একর বেশী অর্থাৎ ৩,১০২,০০০ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে, গড়ে একর প্রতি ৯ হন্দর ফলন এবং মোট ২১,৭৭৬,০০০ হন্দর ফসল হইয়াছে।

ভারতবর্ষে এবৎসর মোট ৭৬,৭৯২,০০০ একর জমিতে অর্থাৎ গত বৎসর অপেক্ষা মোট ১৬৭,০০০ একর বেশী জমিতে (শতকরা ০·২ ভাগ বেশী) ধানের চাষ হইয়াছে। ফসল গত বৎসর অপেক্ষা (শতকরা ২১ ভাগ বেশী) মোট ৫,৬৩৫,০০০ টন বেশী অর্থাৎ ৩২,৮৭৭,০০০ টন ফলন হইয়াছে নিম্নে গত বৎসর এবং এ বৎসরের জমির ও ফসলের তালিকা দেওয়া গেল—

	ফসলের পরিমাণ		জমির পরিমাণ	
	১৯১৫-১৬	১৯১৪-১৫	১৯১৫-১৬	১৯১৪-১৫
	টন	টন	টন	টন·
বাঙ্গালা	৮,২৭৬,০০০	৬,৪৯১,০০০	২০,৯১৬০০০	২০,৪৫০,০০০
বিহর ও উড়িষ্যা	৮,৭৬৮,০০০	৫,৯৪৭,০০০	১৬,২৪৯,০০০	১৬,১৩০০০০
মান্দ্রাজ	৪,৭৬৪,০০০	৪,২৪৭,০০০	১০৬৬৮০০০	১০৮৭৬০০০
ব্রহ্ম প্রদেশ	৪২৭৫০০০	৩,৬৭৫,০০০	১০০২৪০০০	৯৯৯৩০০০
যুক্তপ্রদেশ	২৩৩৪০০০	২০৩২০০০	৬৪৯৮০০০	৬২০০০০০
মধ্যপ্রদেশ এবং বিরার	১৬৯৩০০০	১৬৫৫০০০	৫০৯৭০০০	৫০৮৩০০০
আসাম	১৩৩৪০০০	১৪২০০০০০	৪০৫১০০০	৪০৪৫০০০
বোম্বাই	১,০০০,০০০	১৩৯৬০০০	২১৬৫০০০	২৬৫০০০০
সিন্ধু	৩৮০০০০	৪০৬০০০	১০৪২০০০	১১১৭০০০
কুর্গ	৩৫০০০	৫৩০০০	৮২০০০	৮১০০০
	৩২৮৭৭০০০	২৭২৪২০০০	৭৬।৯২০০০	৭৬৬১৫০০০

ফাল্গুন, ১৩২২ সাল।

দেশীয় শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক কয়েকটি সমস্যা

আমাদিগের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অনেকেরই ইচ্ছা যে দেশটা শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে জগতের আধুনিক সুসভ্য দেশ সমূহের সমকক্ষ হইয়া উঠুক। আকাঙ্খাটা স্বদেশ প্রেমিকতার বিশিষ্ট লক্ষণ এবং আগ্রহটা নবপ্রাণে অনুজীবিত জন-সংঘের পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু অভিলষিত বিষয় প্রাপ্তির পন্থা বড়ই জটিল, বড়ই দুরূহ। সমগ্র ভারতের বর্ত্তমান অর্থ নৈতিক অবস্থা আলোচনা করিলে এবং বিভিন্ন দেশে শ্রমশিল্প বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতি বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে এখনও পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থলে শ্রমশিল্প উন্নতির চেষ্টা প্রকাশ পাই নাই। কোন কোন বিশেষ শিল্প অথবা বাণিজ্যে কোন কোন প্রদেশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—যেমন তুলার কল প্রভৃতিতে বোম্বাই এবং পাটের কলে বঙ্গদেশ। কিন্তু এরূপ প্রাধান্যের মূল কারণ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রজ দ্রব্যের বাহুল্যতা স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের একটা অসাধারণ অধ্যবসায় অথবা উদ্যোগের ফল নহে।

অতি অল্প দিবস হইল বোম্বাই সহরে শ্রমশিল্প সমিতির অধিবেশন উপলক্ষে স্যার দিন্‌স পেটিট্ বলিয়াছিলেন যে "It seems strange that a country so vast and so thickly populated as India with its mineral and other resources should depend to such a considerable extent on foreign countries for even common things of every day use and consumption :—অর্থাৎ ইহা আশ্চর্য্য বোধ হয় যে ভারতের ন্যায় এরূপ বিশাল ও জন বহুল, ও খণিজ ও অন্যান্য স্বভাবজ সম্পত্তিশালী দেশ এমন কি নিত্য ব্যবহার্য্য

দ্রব্যাদির জন্য এতদূর পর্য্যন্ত অপর দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে! এই উক্তিতে দেশীয় সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আন্তরিক ভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু ভারত এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইবার কারণ কি এবং ইহার প্রতিকারই বা কি? এই দুইটিই অবশ্য প্রথম ও প্রধান সমস্যা। দেশীয় ও বিদেশীয় মনিষীগণ ইহার নানাবিধ কারণ নির্দ্দেশ করেন এবং প্রতিকারের জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু এতদ্বিষয়ক সাধারণ আলোচনা ও তর্কবিতর্কের মধ্যে কয়েকটি বিষয় স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। আমরা এস্থলে তৎসমুদয়েরই আলোচনা করিব।

বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান চারিটি:—মূলধন, স্বভাবজ দ্রব্য, শ্রম ও বিজ্ঞান। প্রথমটি অর্থাৎ মূলধন সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে আপাততঃ এতদ্দেশে যে সমুদয় বড় বড় কল কারখানা চলিতেছে, তৎ সমুদয়ের ভিত্তি অনেক পরিমাণে বিদেশীয় মূলধনের উপর স্থাপিত। এতদ্দেশ অপেক্ষাকৃত নিঃস্ব এবং এতদ্দেশে মূলধন ব্যবসায় বানিজ্যে নিযুক্ত করা অপেক্ষা সঞ্চয় অথবা সুদে খাটানর আকাঙ্ক্ষাটা অধিক। ইহার অনেক কারণ আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান—ইংরাজদের পূর্ব্বে রাজনৈতিক অবস্থার অস্থিরতা। কবে রাজা পরিবর্ত্তিত হয়, কবে কে প্রবল হইয়া উঠে, কবে অরাজকতায় ও অত্যাচারে ধন সম্পত্তি হারাইতে হয়—এই সমস্ত ভয়ে লোকে অর্থ হয় মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখিত, কিম্বা সোণা রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুতে পরিবর্ত্তিত করিত। ইংরাজ শাসনে আর সেরূপ অরাজকতার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া জনসাধারণে গোপনে সঞ্চয় করার অভ্যাস অনেক পরিমাণে ত্যাগ করিয়াছে। তথাপি ইহা যে নাই, তাহা বলা যায় না। প্রথম পাশ্চত্য শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় এইরূপ সঞ্চিত-ধন কতক পরিমাণে ব্যবসায়ে আসিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কয়েকটি বড় বড় কারবার উঠিয়া যাওয়ায় ও অন্য কয়েকটি কারবার আশানুরূপ ফল প্রসব না করায় লোকে অনেকটা ভগ্নোৎসাহ ও সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষার ও সহযোগীতার বিস্তারে এরূপ অবস্থা ক্রমশঃ ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইবে বলিয়া অনেকে আশা করিয়া থাকেন।

যে সমুদয় স্বভাবজ দ্রব্য লইয়া আন্যান্য দেশ বড় বড় ব্যবসায় চালাইতেছে, আমাদের দেশে ঠিক সেইগুলি না থাকিলেও সমগুণ বিশিষ্ট দ্রব্যের অভাব নাই। খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ মূল উপাদানে ভারতকে সুতরাং নিঃস্ব বলিতে পারা যায় না। ভারতের বন জঙ্গল, নদ নদী ও পাহাড় পর্ব্বতে অনেক ব্যবসায়োপযোগী উপাদান নষ্ট হইয়া যাইতেছে ইহা সকলেই জানেন। অতএব এ সম্বন্ধে এস্থলে অধিক কিছু বলা অনাবশ্যক।

অনেকে মনে করেন যে এদেশে শ্রম অথবা শ্রমজীবীর অভাব নাই। কিন্তু সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে, বাস্তবিক তাহা নহে। মজুর অনেক থাকিতে পারে বটে, কিন্তু আধুনিক কলকব্জা সাহায্যে পরিচালিত শ্রমশিল্পের জন্য উপযুক্ত মজুর পাওয়া সুকঠিন।

প্রমাণস্বরূপ কর্ম্মবীর স্বর্গীয় তাতার উপযুক্ত পুত্র স্যার ডোরাব তাতা বিগত ভারতবর্ষীয় শ্রমসমিতির অধিবেশনে উক্তি উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। তিনি বলেন যে—"It is evident that for modern industrial purposes, the Supply of labour in India is neither plentiful nor cheap"। এখনও পর্য্যন্ত দেশে কৃষি কর্ম্মের অবসরে অথবা অজন্মার সময়েই শ্রমশিল্পের জন্য অধিক মজুর পাওয়া যায়। সুসময় পড়িলে আবার তাহারা দেশে ফিরিয়া যায় এবং তাহাদের অল্প দিবসের শিক্ষা কোন কার্য্যে আসে না। উপযুক্ত মজুর প্রচুর পরিমাণে পাইতে হইলে এক এক দল এমন শ্রমজীবী তৈয়ারী হওয়া আবশ্যক যাহারা বিশেষ বিশেষ শিল্পে অধিক দিন নিযুক্ত থাকিয়া সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। বড় বড় শ্রমশিল্পের বিস্তারের সহিত সেরূপ দক্ষ শ্রমজীবী যে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সে সময় আসে নাই।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের দেশ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে পশ্চাতপদ তাহা সকলেই বিদিত আছেন। এক রকমে ধরিতে গেলে সকল ব্যবসায় বাণিজ্যের মূলে বিজ্ঞান। আমরা এস্থলে স্যার ডোরাব তাতার অন্য একটি উক্তি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি শ্রম সমিতির সভাপতি স্বরূপ বলিয়াছিলেন যে To the eye of the unskilled observer, raw material, labour and capital are merely so much raw material, hands and things. It is only the organising brain that detects the industrial possibilities of assembling these together at a suitable time, place and proportion as if by intuition." অদক্ষ ব্যক্তির চক্ষুতে মূলধন, শ্রম ও স্বভাবজ দ্রব্য কেবলমাত্র স্থূল উপাদান ও দ্রব্য বিশেষ। কর্ম্মানুষ্ঠান দক্ষ মনিষীই এই সমুদয়কে উপযুক্ত স্থান, কাল ও অনুপাতে সমষ্টি করিলে যে কিরূপ শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে তাহা যেন স্বভাব সিদ্ধভাবেই বুঝিতে পারেন। কথাটা যে ঠিক তাহা নিঃসন্দেহ। আমাদের দেশে নানাস্থানে যে নানাপ্রকার শিল্পের অনুষ্ঠান হইতে পারে তাহা একটা সাধারণ জ্ঞান। কিন্তু যাঁহাদের উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা ও জ্ঞান আছে তাঁহারাই কেবল এই সাধারণ জ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন।

বাণিজ্য ব্যবসায়ের মূলাধার শ্রম, মূলধন, স্বভাবজ উপাদান ও বিজ্ঞান ব্যতীত এমন আরও কয়েকটি বিষয় আছে, যে সমুদয়ের উপর শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি নির্ভর করে। ইহার মধ্যে অন্যতম—কর ও শিল্প সম্বন্ধে দেশীয় ব্যক্তিবর্গের স্বাধীনতা। দেশে একটি শিল্প স্থাপিত হইল, শিল্পজাত দ্রব্যও বাজারে আমদানি হইতে লাগিল, কিন্তু সমশ্রেণীর বিদেশীয় দ্রব্যের প্রতিদ্বন্দীতায় তাহা অধিক দিবস স্থায়ী হইতে পারিল না। এরূপ অবস্থায় আমাদের শাসকগণের কর্ত্তব্য যে নবজাত শিল্পকে, বিদেশীয় সমশ্রেণীর

শিল্পের উপর কর অথবা শুল্ক চড়াইয়া রক্ষা করা। কিন্তু ভারতের শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে ভারতবাসী অপেক্ষা বিদেশীয় বণিকের কথা অধিক পরিমাণে রক্ষা পায়। অবশ্য যদি অন্য কোন প্রকার স্বাভাবিক সুবিধা না থাকে তাহা হইলে কেবল শুল্কের প্রাচীরে বেষ্টন করিয়া যে নবজাত শিল্পকে রক্ষা করিতে পারা যাইবে তাহা আশা করা বাতুলের কার্য্য। কিন্তু ইহাও ঠিক যে কিছু পরিমাণে রক্ষণকারী শুল্কের সাহায্য না পাইলে বড় বড় শ্রমশিল্প স্থাপিত হইতে পারে না। জগতের সকল সুসভ্য ও উন্নত দেশ ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে এবং ইহাও ঐতিহাসিক সত্য যে ইংরাজগণ নিজদেশে শিল্পাদির দৃঢ়ভিত্তি সম্পন্ন হওয়ার পর অবাধ-বাণিজ্যের পক্ষপাতী হইয়াছেন, তাহার পূর্ব্বে হন নাই।

কিন্তু কর ও শুল্কের কথা বলিতে গেলে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। তাহা Natural protection অথবা স্বভাবিক রক্ষণ। স্বভাবিক রক্ষণের উদ্দেশ্য উপযুক্ত স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠা। যে স্থানে শিল্পের মূল্য আছে, উপাদান প্রচুর ও সুলভ, যে স্থান হইতে বিক্রয়ের বাজার সন্নিকট, যে স্থানে উপযুক্ত পরিমাণ দক্ষ শ্রমজীবী পাইতে কষ্ট হয় না—সেইরূপ স্থল নির্ব্বাচন করিয়াই কোন শিল্প প্রতিষ্টা করা সুযুক্তি সঙ্গত। বিদেশীয় পণ্যসমূহকে ব্যবহারকারী ব্যক্তিবর্গের হস্তগত হওয়ার পূর্ব্বে জলে ও স্থলে অনেক ভাড়া দিতে হয়; এতদ্ভিন্ন সাধারণ ভাবে নাড়াচাড়া করারও খচর অনেক। হিসাব করিতে গেলে উৎপাদনের মূল্যের উপর শতকরা ১৫ হইতে ২০ গুণ মূল্য এই সমস্ত কারণেই অধিক হয়। দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার সময় যদি এইগুলি বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য অপেক্ষা ১৫ হইতে২০ গুণ সুলভ হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রতিষ্ঠাতারা সকল সময় এই বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করেন না।

আর একটি বিষয়েও প্রতিষ্ঠাতাগণের শৈথিল্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা সর্ব্বসময়ে বিবেচনা করেন না যে আমাদের দেশটা গরীব। এদেশের লোকের জন্য যে দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা যতদূর উপাদান ও কারুকার্য্য হিসাবে উৎকৃষ্ট হউক আর না হউক মূল্যে সুলভ হওয়া সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। জর্ম্মানগণ ইহা বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন এবং জাপানীরাও ইহা বিলক্ষণ বুঝেন। সেই জন্য তাঁহাদের পণ্যের প্রসার এতদূর বাড়িয়াছিল কিম্বা বাড়িতেছে। খরিদ্দার হিসাবে দ্রব্য সরবরাহ করা ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র। ইহা সম্যকরূপে যতদিন শিল্প-প্রতিষ্ঠাতাগণ উপলব্ধি না করিবেন ততদিন শিল্পের প্রসার হইবে না।

সর্ব্বশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে শিক্ষার প্রভূত বিস্তার না হওয়া পর্য্যন্ত শিল্পের বিস্তার অসম্ভব। সাধারণ শিক্ষার অভাব ত দেশে যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে; এতদ্ভিন্ন কলা-শিক্ষার ব্যবস্থা ত এক প্রকার নাই বলিলেও হয়। প্রত্যেক প্রদেশের অভাব অভিযোগ বুঝিয়া, বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ শিল্পের উন্নতির ও অনুষ্ঠানের

সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া, কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা এই সমুদয় বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবেন, শিক্ষান্তে যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষার উপযোগী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন তাহারও বন্দোবস্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। নতুবা কেবল অভিজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া কোন লাভ নাই। আমরা অবগত আছি যে ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান প্রত্যাগত অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি এখন উপযুক্ত কার্য্যের অভাবে বসিয়া আছেন; অথবা এমন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন যে তাহাতে তাঁহাদের অর্জ্জিত জ্ঞানের কোন ফলোদয় হয় নাই। এইরূপ উৎসাহ, উদ্যম ও শিক্ষার অপব্যয় হওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। গবর্ণমেণ্টের অবশ্য শিক্ষা বিষয়ে অগ্রণী হওয়া উচিত, কিন্তু শিল্প বাণিজ্য বিষয়ে দেশকে উন্নত করা দেশের লোকেরই কর্ত্তব্য। মূলতঃ আমরা যতদূর আশা ও আকাঙ্খা করি তদনুপাতে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক নহি। যখন আকাঙ্খার উপযুক্ত প্রয়াস হইবে তখনই উন্নতির সূত্রপাত হইবে।

কার্পাসবীজ। তুলাজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার সর্ব্বদেশে বহুকাল হইতে বিদিত থাকিলেও তুলাবীজের উপকারিতা অপেক্ষাকৃত অল্পদিন আবিষ্কৃত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ মণ তুলাবীজ ইতিপূর্ব্বে অযত্নে নষ্ট হইত। আমেরিকা-বাসীরা তাহা দেখিয়া তুলাবীজ হইতে তৈল ও পশুখাদ্যাদি প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবনা করে। এক্ষণে আমেরিকায় তুলাবীজ-জাত দ্রব্যাদির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের দেশ অর্থ-বিষয়েই পশ্চাৎপদ; সেই জন্য ভারত জগতের মধ্যে অন্যতম কর্পাসক্ষেত্র হইলেও এখানে কিয়দ্দিবস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কার্পাসবীজ বিশেষ কোন ব্যবহারে আসিত না সম্প্রতি বোম্বাই প্রদেশে কিন্তু একটি তুলাবীজের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। উহার নাম Indian Cotton Oil 'Co। কোম্পানির দ্বারা প্রকাশিত "Cotton seed products in India" নামক পুস্তিকা পাঠে আমরা অবগত হইলাম যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথার কল-কব্জা আনাইয়া এবং বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়া বোম্বাইর নিকটবর্ত্তী 'নবসরী' নামক স্থানে তাঁহারা তুলাবীজ হইতে তৈল, পশুখাদ্য, সার ও মনুষ্যের আহারোপযুক্ত আটা ময়দা ও ঘৃত প্রস্তুত করিতেছেন। আমরা 'ঘৃত' বলিলাম, কারণ পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে তুলাবীজের পরিষ্কৃত তৈল গব্য অথবা মহিষজাত ঘৃত অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে, বরং মূল্য ও বিশুদ্ধতার হিসাবে অনেক অংশে উৎকৃষ্ট। বীজের আটা ও ময়দা হইতে প্রস্তুত বিস্কুট প্রভৃতি খাইয়া অনেকেই প্রশংসা করিয়াছেন। তরুণ অথবা সংরক্ষিত ঘাস, বিচালী প্রভৃতি হইতে কার্পাস বীজের ভূষী অধিক পুষ্টিকর পশু খাদ্য। যাহারা ইংরাজী জানেন তাহারা পুস্তিকা খানি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে কার্পাস বীজ কত প্রকারে মনুষ্য ও গবাদি পশুর উপকারে আসিতে পারে। কার্পাস বীজের তৈল, খৈল ইত্যাদি মূল্যে অত্যন্ত সুলভ হইলেও বোম্বাই অঞ্চল হইতে এতদ্দেশে আসিয়া কতদূর লাভজনক হয় তাহা বলা যায় না।

তবে কতিপয় কার্য্যের জন্য তুলা তৈল যে অনতিবিলম্বে প্রসার লাভ করিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। কোম্পানির উদ্যম ও উদ্যোগ সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। তাঁহারা একটি এ পর্য্যন্ত অনাদৃত বস্তুকে লাভজনক দ্রব্যাদিতে পরিণত করিবার পন্থা প্রদর্শন করিয়া দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছেন।

বঙ্গদেশের বনবিভাগ:—১৯১৪-১৫ সালের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ যে উক্ত বৎসর কোন নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। আরণ্য বৃক্ষাদির কীটরোগ নিবারণের জন্য যে সমুদয় অনুসন্ধান চলিতেছে তন্মধ্যে শাল বৃক্ষের কীটরোগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সালের একপ্রকার ছত্রক রোগও দেখা দিয়াছে। সুন্দরীর রোগ নিবারণের জন্যও চেষ্টা হইতেছে। কতিপয় বন্য গাছ হইতে তন্তু নিষ্কাষনের জন্য কলিকাতার সওয়ালেস্ কোম্পানি অনুমতি পাইয়াছেন। বিগত বৎসর ব্যাঘ্রের আক্রমণে সুন্দরবনে ৭৯ জন লোকের মৃত্যু হয় এবং উক্ত স্থলে মোট ৩৯টি ব্যাঘ্র স্বীকার করা হয়। করসঙ্গে যে বন-বিদ্যালয় আছে, উহার আরও উন্নতি সাধন করিয়া বঙ্গ ও আসাম দেশের ছাত্রগণের অধ্যয়নের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব হইয়াছে। বিগত বৎসর বন বিভাগের মোট আয় ১১,৯৯,৭০২৲ টাকা হয়, ব্যায়ের পরিমাণ ৬,৭২,০০৪৲ টাকা। উদ্বৃত্তের পরিমাণ তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক কম। ইহার প্রধান কারণ সুন্দরবন, জলপাইগুড়ি ও বক্সা বনবিভাগে অল্প পরিমাণ কাষ্ঠ বিক্রয় এবং বিক্রীত কাষ্ঠের মূল্যের স্বল্পতা।

সরকারী সিঙ্কোনা আবাদ:—অনেকেই অবগত আছেন যে কুইনাইন প্রস্তুতের জন্য গবর্ণমেণ্ট চাষ করিতেছেন ও একটি কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এই কারখানা হইতে ১৯১৪-১৫ সালে মোট ৩৮,৯৯৭ পাউণ্ড দ্রব্য চালান হয়, ইহার মধ্যে ৩৪,৫৯৬ পাঃ কুইনাইন। আর অবশিষ্ট অপরাপর কুইনাইন সংঘটিত দ্রব্য। বৎসরান্তে কারখানায় ১,৬৩,০০০ পাঃ কুইনাইন মজুত ছিল। বলা বাহুল্য যে গবর্ণমেণ্ট কুইনাইন প্রস্তুতের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করেন এবং আবাদ ও কারখানার মূল্য ৯॥ লক্ষ টাকার উপর হইবে। আমাদের দেশ ক্রমশঃ যেরূপ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে কুইনাইন উৎপাদন ও বিতরণের মাত্রা যত অধিক হয় ততই মঙ্গল। শস্যের হিসাব; ১৯১৪-১৫ সালের সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ যে উক্ত বৎসর দেশে মোট ২৭,৯৬৪,০০০ টন চাউল উৎপাদিত হয়। গোধূমের উৎপাদনের মাত্রা ১০,২৬৯,০০০ টন, মসিনা ৩৯৫,০০০টন, তুলা ৫,২৩৩,০০০ গাঁইট, পাট ১০,৪৪৩,৯০০ গাঁইট। মোটের মাথায় দেখিতে পাওয়া যায় যে ধান গড় পড়তা কম ফলিয়াছে; গোধূম ও ইক্ষু উভয়েরই ফলন বাড়িয়াছে। অন্যান্য ফসলে তারতম্য সামান্য।

পত্রাদি

গোলাপ—

অনেকেই প্রশ্ন করেন যে গোলাপ কখন বসাইলে সুবিধা হয় এবং গোলাপ গাছের পোকা নিবারণের উপায় জানিতে চান। এই সকল কথার উত্তর যে আমরা কতবার কত রকমে দিয়াছি তাহার সংখ্যা করা যায় না। ফলতঃ আবার বলি গোলাপ গাছ তাত বাত দুইই সহ্য করিতে পারে না। অধিক তাতে জল না পাইলে মরিয়া যায়। আবার গাছের গোড়ায় জল বসা হইলে গোলাপ গাছ যত মরে, যত শীঘ্র মরে অন্য গাছ তত শীঘ্র মরে না। বিহার প্রদেশে গোলাপ গাছে অত্যন্ত উইয়ের উপদ্রব। উই নিবারণার্থ ক্ষেতটি মাঝে জলে ডুবাইয়া দিলে ভাল হয়। রেড়ীর খৈল ব্যবহার করিলে উই পোকা ক্ষেত ছাড়িয়া পালাইতে পারে। চারা গোলাপ গাছ পোকায় কাটিয়া দেয়। তাহার একটা প্রতিকার আমরা চেষ্টা করিয়া স্থির করিয়াছি। চারাগুলির গোড়ায় দুই তিন ইঞ্চ পর্য্যন্ত চারিদিকে চারিটা সরু আলকাতরার দাগ দিলে তাহার নিকট আর পোকা ঘেঁসে না। চারাগুলি বাড়িয়া বড় হইলে এবং গোড়াটা মোটা শক্ত হইলে পোকায় গোড়া কাটিতে পারে না। তখন অন্য একদল পোকা আসিয়া গোলাপের পাতা খাইয়া গাছ মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। পারমাঙ্গানেট অব পটাস, বা তুতের জল মাঝে মাঝে গাছে দিলে পোকা পালাইতে পারে। রাত্রে আলো জ্বালিয়া পোকা মারিতে পারিলে ভাল হয়। ক্ষেতে আলো দেখিলে পোকারা দলে দলে আলোর নিকট আসে তখন তাহাদিগকে মারার সুবিধা হয়। আলো অনেকটা ফাঁদের কার্য্য করে। সব পোকা কিন্তু পাতা ছাড়িয়া আসে না তাহারা পাতার উলটা পিঠে থাকিয়া আহার কার্য্য বেশ চালাইতে থাকে। আরোক ছিটাইয়াও তাহাদের কিছু করিতে পারা যায় না। পাতা উল্টাইয়া তাহাদিগকে মারিতে হয় বা তলদেশ হইতে তাহাদের গায়ে পিচকারী দ্বারা আরক ছিটাইতে হয়।

গ্লাসের কাজ শিক্ষা—

শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, গ্রাম বরগ, পোঃ ছাতিমাইন, সিলেট,।

প্রশ্ন—কোন একটী Secondary Education প্রাপ্ত যুবক গ্লাসের কাজ শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক। ভারতে কোথায় এরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে ?

উত্তর—মধ্য প্রদেশে যব্বলপুরে কাঁচের কারখানা আছে—নাম যর্ব্বলপুর গ্লাস্ ফ্যাক্টরি। অম্বালাতে অপার ইণ্ডিয়া গ্লাস্ ওয়ার্কস্ নামক কাঁচের কারখানা আছে। এই দুই স্থানে শিক্ষার্থী মাত্রকেই লওয়া হয় কি না পত্র লিখিয়া জানিতে পারেন। অধিকন্তু শিক্ষার্থীকে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিতে বলিবেন—

Director General of Commercial Intelligance, Calcutta.

থাইমল—

শ্রীনফর চন্দ্র দাস, গাফরগাঁও, বহরমপুর (বেঙ্গল)।

১। লিখিতেছেন যে যুক্তপ্রদেশের কৃষি-বিভাগ পচন নিবারক "থাইমস" নামক ঔষধ প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন। ঐ পুস্তিকা তাঁহার আবশ্যক।—পুস্তিকা অদ্যাপি আমরা পাই নাই। যুক্তপ্রদেশের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের নিকট আমরা পুস্তিকা প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতেছি আমরা পাইলে আপনাকে একখণ্ড পাঠাইব। আপনিও স্বয়ং তাঁহাকে লিখিতে পারেন।

বঙ্গদেশে স্বাস্থ্যকর স্থানে চাষের জমি আবশ্যক—

শ্রীগোপালদাস বসু, পোঃ বুজরুকদিঘি, বর্দ্ধমান।

বঙ্গদেশের ভিতরে বা বাহিরে এমন কোন একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন, যেখানকার জল বায়ু ভাল, জমিজমাও সস্তাদরে পাওয়া যায়, জন মুজুরের বড় একটা অভাব হয় না, আর সর্ব্বোপরি জলের অভাব হয় না। এমন কোন স্থান হইলে সেখানে গিয়া আমি বসবাস করি এবং সুখে চাষবাস করিয়া দিনাতিপাত করি।—কি চাষ করিলে একটা সংসার নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যায়, এবং কত মূলধনেরই বা আবশ্যক, তাহাও দয়া করিয়া লিখিবেন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ দিবেন।

উত্তর—হাজারিবাগ, ময়ুরভঞ্জ এ সমস্ত স্থানে অনেক চাষের জমি আছে এবং এতদঞ্চলে জলহাওয়াও ভাল। চাষী বা মজুরের এখানে অভাব নাই, জলেরও সংস্থান আছে। আসামেও জমি পাওয়া যায় কিন্তু তথাকার স্বাস্থ্য হাজারিবাগ, ময়ুরভঞ্জের মত নহে এবং তথায় মজুর মেলা দায়। তবে চা বাগানে যে রকমে মজুর মিলে সেই রকমে মজুর সংগ্রহ হয় কিন্তু তাহা পয়সা সাপেক্ষ।

৫০ বিঘা জমি লইয়া চাষ করিলে একটি ভদ্র পরিবারের সচ্ছন্দে জীবন নির্ব্বাহ হইতে পারে। কিন্তু কেবল একটি মাত্র চাষ লইয়া পাড়িয়া থাকিলে চলিবে না। জমিটি দোফসলী বা তেফসলী হওয়া আবশ্যক। এক জমি হইতে ব্যৎসরে দুই অথবা সম্ভব হইলে তিনটী ফসল উঠান আবশ্যক। খরচ বিঘা প্রতি ২৫৲ টাকা হিসাবে ১২৫০৲ টাকা হইবে দৈবী আপৎ প্রতিকারের জন্য কিছু মূলধন পৃথক করিয়া রাখা আবশ্যক। এমতাবস্থায় বোধ হয় ১৫০০৲ টাকা মূলধন ৫০/ বিঘার আবাদকার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। হাল, বলদ, অন্যান্য আবশ্যকীয় সাজ সরঞ্জম বাবদ খরচ ২৫০৲ টাকার কম নহে। এই খরচ বাৎসরিক নহে; একবার সাজসরঞ্জম ঠিক করিয়া লইলে কিছুকালের মত নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। বিঘা প্রতি মুনকল্পে ২৫০০৲ টাকা আয় হওয়া সম্ভব এবং আর ১২৫০৲ টাকা বাদে ১২৫০৲ লাভ হইতে পারে। দৈবী অর্থাৎ প্রতিকার কল্পে প্রতিবৎসর আরও ৫০৲ টাকা খরচ বাদ দিলে কোন সুদক্ষ চাষীর বারমাসে বারশত টাকা মুনফা হওয়ার আশা করা দুরাশা নহে।

সার সংগ্রহ।

——:*:——

ভারতীয় শিল্পবিদ্যালয়—

সম্প্রতি ভারতীয় শিল্পবিদ্যালয়ের এক বিংশতিতম বাৎসরিক উৎসব ও পুরস্কার বিতরণ সভার অধিবেশন হইয়াছে। নসিপুরের মহারাজা, মিঃ কে, সি, দে, মিঃ সি, এইচ, বম্পাস, পিন্স আকরাম হোসেন, মিঃ পারসি ব্রাউন, কুমার ক্ষিতীন্দ্রনাথ দেব প্রভৃতি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের শিল্পীছাত্রগণ উৎসব সভা পরম মনোহররূপে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। মাননীয় মিঃ বম্পাস সভাপতির কার্য্য করেন।

সভাপতি তাঁহার সংক্ষিপ্ত হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় বলিয়াছেন;—"বাঙ্গালীর ললিত কলাবিদ্যার দিকে স্বাভাবিক অনুরাগ রহিয়াছে, কিন্তু সেই অনুরাগ এখনো বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। বাঙ্গালী অন্ধভাবে বিদেশী অনুকরণ না কারয়া মৌলিক চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করুন, আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে সেই সকল চিত্র য়ুরোপে আদৃত হইবে।"

সভাপতি মহাশয়ের এই মন্তব্য সর্ব্বাংশে সত্য। আমাদের চিত্রশিল্পী বাবু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্রশিল্পে যুগান্তর আনায়ন করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফরাসী রাজ্যের চিত্রশিল্পপ্রদর্শনীতে তিনি অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালী ভাব সম্পদে দরিদ্র নহেন, সুতরাং বাঙ্গালীর চিত্রশিল্পী আপনার পথে চলিলে নিঃসন্দেহ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন।

রেশম শিল্প—

অধুনা বঙ্গদেশে সমস্ত শিল্পেরই অধোগতি ঘটিয়াছে। বাঙ্গালাদেশের রেশমের বস্ত্র এক সময়ে সমস্ত পৃথিবীর আদরের সামগ্রী ছিল। সেই শিল্পের একরূপ বিলোপ সাধন হইয়াছে। দেশের জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্ট প্রজাবৃন্দের অর্থাগমের এই উপায়গুলি সংরক্ষণের চেষ্টা না করিলে দেশের হাহাকার ও অন্নকষ্ট কিছুতেই দূর হইতে পারে না। "বীরভূমবাসী" পত্রিকায় এই সম্বন্ধে সংপ্রতি একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা উক্ত পত্র হইতে কিঞ্চিত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বঙ্গের পণ্যসম্ভারের ভিতর বীরভূমের রেশম ও রেশমীবস্ত্র একদিন উচ্চস্থান অধিকার করিয়া পৃথিবীর সভ্যমণ্ডলীর দৃষ্টি আর্কষণে সমর্থ হইত। মুর্শিদাবাদের শেঠ বংশীয়দিগের প্রাধান্যকাল পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, মালদহ ও বীরভূম রেশম ও রেশমী বস্ত্র জল ও স্থলপথে পরিচালিত হইয়া সহস্র ধারায় এই কয়েক জেলার অধিবাসীগণের ধনাগার

পরিপূর্ণ করিত। যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কাশিমবাজারে রেশমী কুঠী খুলিয়া উঁহার বহির্ব্বাণিজ্য কিয়ৎপরিমাণে নিজেদের হাতে লইয়াছিলেন তখনও বীরভূমের রেশম ও রেশমীবস্ত্রের ব্যবসায় বিশেষ শোচনীয় ছিল না। ইংরাজরাজ্য সংস্থাপনের পর যখন ইংরাজ বণিকগণ স্থানে স্থানে রেশমী কুঠী খুলিয়া গুটীপোকা হইতে কাঁচা রেশম প্রস্তুত করিবার কার্য্যভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। তখন দেশীয় বনিকগুলি অবগত হইতে আরম্ভ হয় এবং ধীরে ধীরে রেশমসূত্র প্রস্তুত কার্য্য উক্ত কোম্পানীর হাত পড়ে। মার্শেল কোম্পানী ময়ূরাক্ষী নদীর তীরস্থিত গনুটিয়া গ্রামে এক বিরাট রেশমী কুঠী সংস্থাপন করিয়া গুটিপোকা হইতে রেশম তুলিবার ব্যবস্থা করেন। ময়ূরেশ্বর থানার অধীন কোটাসুর, তারাপুর এবং নলহাটির অধীন ভদ্রপুরে উহাদের শাখা কুঠী সংস্থাপিত হয়। সকল কুঠীতে বহুদিন ধরিয়া কার্য্য চলে। দেশীয় বণিকগণের রেশম তোলা কলগুলির কার্য্য বন্ধ হয় এবং উক্ত কোম্পানী রেশমতোলা কার্য্যে সকল স্থানে জয়যুক্ত হন। যদিও উক্ত কুঠী সংস্থাপনে দেশীয়গণের সম্পূর্ণ ক্ষতি হইয়াছিল কাঁচা রেশম প্রস্তুত বণিকদলের হস্তে পতিত হইয়াছিল তথাপি পলুপোঁকা পুষিয়া উহারা কম অর্থ প্রাপ্ত হইত না। উক্ত বণিকগণ বীরভূমের কৃষকগণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত সুবর্ণবর্ণ রেশম কোশ ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা সূত্র উৎপন্ন করিত ইহাই কাঁচা রেশম নামে কথিত। সাধারণতঃ বীরভূমের উৎপন্ন গুটিপোকা হইতে তাহাদের উক্ত ৪টি রেশম কুঠীর কার্য্য চলিত তবে কখন কখন তাহারা মালদহ হইতে গুটি আনাইয়া রঙ্গের সময় অতিবাহিত হইলে উহা হইতে রেশম প্রস্তুত করিতেন। এই রেশম শিল্প হইতে যে অর্থ উৎপন্ন হইত বীরভূমের কৃষকগণ তাহার অর্দ্ধেক প্রাপ্ত হইত তাহার সন্দেহ নাই এই রেশমকীটের খাদ্য তুঁতপাতা।

এই তুতপাতের চাষ বীরভূমের অধিবাসীগণের এক লাভবান চাষরূপে পরিগণিত ছিল। এক বিঘা জমির চাষ করিয়া ১৫০।২০০ টাকা লাভ বৎসরে সকল কৃষককেই প্রাপ্ত হইত। বৎসরের মধ্যে প্রধান চারিমাস পলুর চাষের সময়। প্রথম খন্দ আষাঢ় বা শ্রাবণ। ২য় খন্দ কার্ত্তিক। ৩য় খন্দ পৌষ শেষ বন্দ চৈত্র। এই চারিমাসে বীরভূমের প্রত্যেক পল্লী মুদ্রার ঝণঝণ শব্দে নিয়ত প্রতিধ্বনিত থাকিত।

বসোয়া, বিষ্ণুপুর, কড়িধা প্রভৃতি গ্রামে বিস্তর তাঁতির বাস। উহারা দেশীয় কলের প্রস্তুত, কাঁচারেশমের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া প্রচুর পরিমাণে লাভবান হইত। উহাদের একদিন সৌভাগ্যের সীমা ছিল না উহারা অট্টালিকায় বাস করিত। ইহাদের প্রস্তুত রেশমী বস্ত্র ভারতের নানাস্থানে প্রেরিত হইত। লণ্ডনের বাজারেও উহাদের প্রস্তুত রেশমীথান সমাদরে বিক্রীত হইত। বিষ্ণুপুর ও বশোয়ার অনেক মহাজন উহাদের নিকট বস্ত্র ক্রয় করিয়া লণ্ডনে চালান দিতেন। একদিন রেশম শিল্পে বীরভূমের এত সৌভাগ্য ছিল। ধান্য বিক্রয় করিয়া কাহাকেও খাজনা দিতে হইত না। যাবতীয় নৈমিত্তিক ব্যয় নিত্যব্যয়ের

অধিকাংশ কৃষকগণ রেশমশিল্প ও তুতপাতের চাষ হইতে সংগ্রহ করিত। আজপ্রায় ৮১০ বৎসর হইল হঠাৎ উক্ত মার্শেল কোম্পানী তাঁহাদের কুঠীগুলিকে তুলিয়া দিয়াছেন। উহাঁদের শুভা গমনে প্রাচীন কালের রেশমতোলা কলগুলি নির্ম্মুল হইয়াছিল এজন্য সাহেবদের কুঠী উঠিয়া যাওয়া হেতু ক্রেতার অভাবে গুটিপোকা অবিক্রীত রহিল সুতরাং দুই চাষিবার ক্ষতি সহ্য করিয়া কৃষকেরা উক্ত লাভনজক ব্যবসা গুটি প্রস্তুত কার্য্যে বিরত হইল। পলুর চাষ বন্ধ হওয়ায় তুতপাতা বিক্রয় হইল না, কৃষকগণ উহার চাষ তজ্জন্য বন্ধ করিয়া দিল। যে গ্রামে পূর্ব্বে ১০০ বিঘা জমিতে তুত উৎপন্ন হইত এখন তথায় ২৪ বিঘা তুতের জমি আছে কিনা সন্দেহের বিষয়, পূর্ব্বে যে গ্রামে ১০০ শতখান তাঁত মাকুর ঘুঙ্গুরের ঝন ঝন শব্দে নিয়ত প্রতিশব্দিত হইত তথায় এখন ১০খান তাঁত চলে কিনা বলা যায় না। ১০।২০ বৎসর পূর্ব্বের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে। এই রেশম শিল্পের ক্রমশঃ ক্রমশঃ ঘোরতর অবনতি ঘটিয়াছে। এইরূপ দ্রুত অবনতি দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, উক্ত শিল্পের বুঝি একেবারে নাশের আর বিলম্ব নাই। এই রেশম ব্যবসা যাহাতে একবারে লোপ না পাইয়া আবার ক্রমশঃ ক্রমশঃ উন্নত হইতে পারে এবং কি করিলে বীরভূমে আবার উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় আমাদের দয়াবান ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহার উপায় চিন্তা করেন ইহাই বিনীত প্রার্থনা। সঞ্জীবনী।

ইন্দ্রযব—

গ্রীষ্মকালে বঙ্গের সর্ব্বত্রই বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। কখন কখন শীতকালেও কলেরা আবির্ভাব দেখা যায়। ইন্দ্রযব এই বিষম রোগ নিবারণের অন্যতম ঔষধ। ইহা "এনথেল মিন্টিক্" অর্থাৎ কৃমিঘ্ন। সুতরাং কৃমিজনিত কলেরায় ইন্দ্রযব আরও বিশেষ কাজ করিয়া থাকে। ভারতের লণ্ডন বিশ্ববিদ্যায়ের প্রথম এম, ডি, প্রথম সিবিল সারজন বারাকপুর নিবাসী পরলোকগত মাহাত্মা ডাক্তার ভোলানাথ বসু একমাত্র ইন্দ্রযব ব্যবহার করিয়া বহু সংখ্যক বিসূচিকাগ্রস্থ রোগীকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ইন্দ্রযব আর কিছুই নহে ইহা কুরচির ফল মাত্র। ইহার গঠন শশার বিচির মত। বাজারে সর্ব্বদা বেণের দেকানে পাওয়া যায়। দুই পয়সার ইন্দ্রযব বেণের দেকান হইতে আনিয়া তাহা হইতে মিশ্রিত অন্যান্য কাটাকুটাগুলি ফেলিয়া দিয়া তাহা পরিস্কৃত জলের সহযোগে বাটিতে হয়। পরে ঐ বাটা ইন্দ্রযব এক সের পরিস্কৃত জলে উত্তমরূপ সিদ্ধ করিতে হয়। এক পোয়া জল থাকিতে নামাইতে হয়। নামাইবার পর ঐ জল শীতল হইলে পরিষ্কার ধৌত বস্ত্রের নেকড়ায় ছাঁকিয়া লইতে হয়। জল ঠাণ্ডা হইলে ব্যবহারের উপযোগী হয়। দুই ঘণ্টা অন্তর এক চামচা ঐ জল খাওয়াইতে হয়। দাস্ত শীঘ্র শীঘ্র হইলে ঐ ঔষধ অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করান বিধি।

ছোট শিশুর কলেরা হইলে অতি ছোট চামচার এক চামচা। পূর্ণ বয়স্কের বড় চামচার এক চামচা। ইন্দ্রযব, ডাক্তার বসুর বিশেষ পরীক্ষিত ঔষধ। গবর্ণমেণ্টও এই ঔষধ সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ডাক্তার বসুর একখানি রিপোর্ট আছে। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে একবার সমস্ত ফরিদপুর জেলায় এপিডেমিক কলেরা হয়, সে সময় তাঁহার ব্যবস্থা মত ইন্দ্রযব প্রয়োগে বহুসংখ্যক কলেরা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। তিনি সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট জজ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণকেও কলেরা ও রক্তামাশয় রোগে ইন্দ্রযব দিবার ব্যবস্থা করিতেন। ডাক্তার বসু ন্যূনাধিক পনর ষোল বৎসর ফরিদপুর জেলায় সিবিল সারজন ছিলেন। ডাক্তার বসুর ইচ্ছানুসারে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ঐ জেলায় রাখিয়াছিলেন। আমাদের মনে হইতেছে ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের বঙ্গদেশের স্যানিটারী কমিসনরের রিপোর্টে ডাক্তার বসুর ইন্দ্রযব প্রভৃতি দুই একটী দেশীয় ঔষধের নাম উল্লেখ আছে।

গ্রীষ্মকালে গৃহস্থ ব্যক্তি মাত্রেরই ইন্দ্রযব সংগ্রহ করিয়া গুঁড়া করিয়া রাখা উচিত। কলেরার সময় বিদেশ ভ্রমণকারী ব্যক্তির পক্ষে ঐ পাউডার বড় উপকারী। ইন্দ্রযবের পাউডার অল্পপরিমাণ জলের সহিত মুখে ফেলিয়াও সেবন করা যাইতে পারে, কিন্তু রোগী বড় দুর্ব্বল হইলে ইন্দ্রযবের গুঁড়া সুবিধা নহে। ইন্দ্রযবের সিদ্ধ জলই প্রশস্ত।

আমাদের বৈদ্যক শাস্ত্রেও ইন্দ্রযবের ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

ইন্দ্রযব—ত্রিদোষনাশক, ধারক, কটুরস, শীতবীর্য্য, অগ্নি প্রদীপক এবং জ্বর, অতিসার, বমি, বীসর্প কুষ্ঠ, অর্শরোগ, গণ্ডদোষ, বাতরক্ত, কফ ও শূল নাশক।—হিতবাদী।

নারী শিল্পাশ্রম—

বঙ্গদেশে বিধবাদিগের যে কি প্রকার কষ্ট তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম। স্বামীর মৃত্যুর পর অসহায়া বিধবাগণ যখন একটু করুণার ভিখারিণী হইয়া আত্মীয়স্বজনের নিকট দীনভাবে উপস্থিত হন এবং দুরন্ত সংসার যখন তাঁহাদিগকে পায়ে ঠেলিয়া দেয় তখন সেই সকল নারী এক মুষ্টি অন্নের জন্য অথবা নিজের সন্তানের মুখে দুধটুকু দিবার জন্য নয়নের জলে ভাসিতে ভাসিতে বাঙ্গালী জাতির প্রতি যে অভিসম্পাত করিতে থাকেন, বুদ্ধিমান বাঙ্গালী জাতির পক্ষে তাহা অপেক্ষা লজ্জা ও অপমানের বিষয় আর কি হইতে পারে? আজ কাল জাপানী দ্রব্যে বাঙ্গালার হাট বাজার পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ঐ সমস্ত দ্রব্যের অধিকাংশই জাপানের রমণীগণের দ্বারা প্রস্তুত। জাপানের রমণীগণ এদেশের অর্থে ধনী হইতেছেন। আর আমাদের মাতা ও ভগিনীগণ একমুষ্টি অন্নের কাঙ্গালিনী। আমি আজ আপনাদিগকে সেই সকল নারীর দুঃখের বিষয় চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। এই সকল নিরাশ্রয়া নারীকে

আশ্রয় দান করিবার নিমিত্ত ও তাঁহাদিগকে শিল্প শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এই "নারী শিল্পাশ্রম" প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

নারী শিল্পাশ্রমে অসহায়া স্ত্রীলোকদিগকে আশ্রয় দান করা এবং তাঁহাদিগের ভরণ পোষণের বন্দোবস্ত করা ও নানা প্রকার শিল্প কার্য্য শিক্ষাদান করিয়া উপার্জ্জনের উপযুক্ত করিয়া দেওয়া—এই আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমানে এখানে দর্জ্জির কাজ, কৃত্রিম ফুল, জমাট দুগ্ধ, সাবান, মোমবাতি, চিরুণী ও বোতাম প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইবে। পরে শিক্ষালয়ের উন্নতি হইলে আরও নানা প্রকার শিল্পকার্য্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাইবে।

এই শিক্ষালয়ের জন্য বাড়ী ভাড়া মাসিক ৮০৲ টাকা, দর্জ্জির বেতন ৩০৲ টাকা, একজন পিয়নের বেতন ১০৲ টাকা, বোর্ডিংএর জন্য একজন ঝি অথবা চাকরের বেতন ১০৲ টাকা ও অন্যান্য খরচ ২০৲ টাকা মোট ১৫০৲ টাকা আবশ্যক।

যদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত সাহায্য সংগ্রহ করিতে পারা যায় তবে একখানি গাড়ীর বন্দোবস্ত রাখিয়া স্থানীয় মহিলাদিগকেও এখানে আনিয়া শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করা যাইবে।

এককালীন কতকগুলি টাকা সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া কতিপয় লোকের নিকট হইতে ১৫০৲ টাকা মাসিক সাহায্য লইয়া এবং এক একজন অর্থশালী লোকের নিকট হইতে এক একটী বিধবার খরচ বাবদ মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া সাহায্য গ্রহণ করতঃ এই স্কুল চালাইতে মনস্থ করিয়াছি। ইহাতে একটী সুবিধা এই যে, যতদিন স্কুল চলিবে তত দিবস তাঁহাদিগের টাকার সদব্যবহার হইবে। ভবিষ্যতে যদি স্কুল উঠিয়াও যায় তাহাতে সাহায্যকারীগণকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। তবে শিক্ষাদানের উপযুক্ত যন্ত্রাদি ও দ্রব্যাদি প্রস্তুতের উপকরণ এবং বোর্ডিংএর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদের নিমিত্ত এককালীন কিছু সাহায্যেরও প্রয়োজন। ইহার কার্য্যকারিতায় লোকে সন্তুষ্ট হইলে তৎপরে ইহাকে স্থায়ী করিবার জন্য একটী বাড়ীর জন্য চেষ্টা করা যাইতে পারে।

যাঁহারা সাহায্য করিবেন, তাঁহাদিগের নিকট একটি বিশেষ অনুরোধ এই যে, প্রত্যেক মাসের চাঁদা নিয়মিতভাবে দিবেন। কারণ ঠিক সময়ে সাহায্য না পাইলে স্কুলের কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে এবং বোর্ডিংএর মেয়েদের অনাহারে কষ্ট পাইতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও বিশেষ বিপন্ন হইতে হইবে। শ্রীমনোরমা মজুমদার। বাঙ্গালী।

যুক্ত প্রদেশের শিল্প গবর্মেণ্টেসাহায্য—

ভরতীয় বাজারের উপযুক্ত সাবান প্রস্তুত করার সম্বন্ধে বিজ্ঞানাগারে পরীক্ষা চলিতেছে। সম্ভবতঃ পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইবে।

চামড়ার কার্য্য শিখাইবার জন্য ১লা ডিসেম্বর কানপুরে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য গবর্মেণ্ট ৪৮২৫ টাকা দান করিয়াছেন।

বোতাম, পেনসিল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প দ্রব্যের সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও তাহাদের প্রবর্ত্তনের সাহায্য করিবার জন্য গবর্মেণ্ট ৫০০০ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। বোর্ড এ বিষয়ে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছে।

যুক্ত প্রদেশে পাকা চামড়ার কার্য্য ভালরূপ চালাইবার জন্য চামড়ার পাইট্ করিবার উপযোগী মশলার সম্বন্ধে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে অনেক কার্য্য সাধিত হইয়াছে। সরকারী শিল্প বিভাগ চর্ম্ম ব্যবসায়ীদিগকে কাঁচা চামড়া ট্যান করিবার উপযোগী অনেক নূতন মসলার সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন।

ভারতেই আরও বেশী পরিমাণে পাকা চামড়া উৎপাদন করার কাজ চলে কি না তাহা স্থির করিবার জন্য, চামড়ার রপ্তানীর ব্যবসায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতেছে।

বেরিলীর দেশালইয়ের কারখানায় সাহায্যের আবশ্যকতা আছে কি না সে বিষয়ে গবর্মেণ্টে অনুসন্ধান করিয়াছেন। ফলে, সরকারী জঙ্গল হইতে দেশলাই প্রস্তুত করিবার উপযোগী কাষ্ঠ সরবরাহের সর্ত্তগুলির সন্তোষজনকরূপে সংশোধন আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে, গবর্মণ্টের বিশ্বাস, কারখানাওয়ালারা বিদেশী দেশলাইয়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবেন।

কানপুরে পাণ্যশালা—যুক্ত প্রদেশের গ্রাম গ্রামে নগরে নগরে নানা প্রাকারের যে সকল শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা সাধারণের দৃষ্টিগোচর করিবার জন্য এবং তাহার ক্রয়বিক্রয় সুবিধার যন্য যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট কানপুরে একটী কেন্দ্রীয় পণ্যশালা প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এতদর্থে দশহাজার টাকার সংস্থান করিয়াছেন। বিগত বর্ষে ১লা অক্টোবর এই পণ্যশালা স্থাপিত ও সাধারণ্যে উন্মুক্ত হইয়াছে। এখানে যে সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের তালিকা প্রস্তুত হইতেছে এবং এই সকল মাল বিদেশে চালান দিবার জন্য বৈদেশিক বণিকগণের সহিত কথাবার্ত্তা চলিতেছে।—বিজ্ঞান।

মান্দ্রাজে চন্দনের বন—

মন্দ্রাজে অরণ্য-বিভাগের বিবরণীতে প্রকাশ,—মহীশূর রাজ্যে চন্দন-কাষ্ঠের বাক্স তৈয়ারী হয়। সে সকল বাক্সে শিল্পীর অপূর্ব্ব কারুকৌশল বিদ্যমান। সাধারণের ধারণা, মহীশূর এই শিল্পের জন্মভূমি বলিয়া ইহা চন্দন-তরুরও লীলাক্ষেত্র; মহীশূরেই চন্দনতরু জন্মে। বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নহে, মান্দ্রাজ প্রদেশেও চন্দন-তরুর উৎপত্তি স্থান। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অনেক অরণ্যে সংখ্যাতীত চন্দন-তরু বিদ্যমান। অর্কট অঞ্চলে চিত্তরী ও জাভাদী পর্ব্বতে সুবিস্তীর্ণ চন্দন বন আছে।—চন্দন-তরুর ব্যাপ্তি অতি শীঘ্র ঘটে। পক্ষীদিগের ভুক্ত বীজের দ্বারা চন্দন-তরু সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। সুতরাং মদ্রাজ অঞ্চলে দ্রুতগতিতে বংশ বিস্তার ঘটিতেছে। চন্দন মূল্যবান সামগ্রী অতএব যে পরিমাণে চন্দন-তরুর সংখ্যা বাড়িতেছে, সেই পরিমাণে মান্দ্রাজ সরকারও ধনশালী হইয়া উঠিতেছেন।

বাঙলায় বৃষ্টির অভাব—বর্ত্তমান বর্ষে বাঙলা দেশে কোথাও আবাদ উপযোগী সুবৃষ্টি হয় নাই। ধান ও পাট বীজ যাহা উপ্ত হইয়াছিল তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ক্ষেতে শুকাইয়া যাইতেছে। এখনও যদি বৃষ্টি হয় তবে ঐ সমস্ত জমি পুনরায় চষিয়া ধান পাট বীজ বপন করিতে হইবে। কৃষক ২৫শে বৈশাখ ১৩২৩

বাগানের মাসিক কার্য্য

বৈশাখ মাস।

সব্জীবাগান—মাখন সীম, বরবটী, লবিয়া প্রভৃতি বীজ এই সময় বপন করা উচিত। টেঁপারি কেহ কেহ ইতি পূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন, কিন্তু টেঁপারি বীজ বসাইবার এখন সময় হয় নাই। টেপারি বীজ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বুনান চলে। শসা, বিলাতি কুমড়া, লাউ, স্কোয়াস বা বিলাতী কদু, পালা ঝিঙ্গা, পুঁই, ডেঙ্গো, নটে প্রভৃতি শাক বীজ এখনও বপন করা চলে। কিন্তু বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ঐ সমস্ত বীজবপন কার্য্য শেষ করিতে পারিলে ভাল হয়। ভুট্টা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা বীজ বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বসাইতে পারা যায়। আশু বেগুনের চারা তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। বৈশাখ মাসে ২।১ দিন একটু ভারি বৃষ্টি হইলে উহাদিগকে বীজ-ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়।

কৃষিক্ষেত্র—বৈশাখ মাসের শেষভাগে আশুধান্য, ধনিচা, অরহর, পাট প্রভৃতি বীজ বপন করিতে হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্যও এই সময় রিয়ানা ও গিনি ঘাস প্রভৃতি ঘাসবীজ বপন করিতে হইবে। কিন্তু বলা বাহুল্য বৃষ্টি হইয়া জমিতে "যো" হইলে তবেই ঐ সমস্ত আবাদ চলিতে পারে। ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি বীজ বৈশাখের প্রথমেই বপন করা উচিত, যদি উক্ত কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তবে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

কিঞ্চিৎ অধিক বারি পতন হইলেই চৈত্রের শেষে বা বৈশাখের প্রথমেই উহাদের বীজ বপন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বৈশাখের শেষভাগে গাছগুলি তৈয়ারী হইয়া তাহাদের গোড়ায় মাটি দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে। চৈত্র মাসের মধ্যেই বীজ-ইক্ষু বা আখের টাঁক বসাইবার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ইক্ষুক্ষেত্র বৈশাখ মাসে মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হইবে। দুই শ্রেণী আখের মধ্যস্থল হইতে মাটি উঠাইয়া আখের গোড়ায় দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

ইক্ষুক্ষেতে ও শসাক্ষেতে জলের আবশ্যক হইলে সেচ দিতে হইবে। চুবড়ী আলু ও ওল এই সময়ে বা জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই বসাইতে পারিলে ভাল হয়। কলা, বাঁশ ও তুঁত গাছের গোড়ায় পাঁক মাটি এই সময় দিতে হয়।

ফুল বাগান।—বৈশাখ মাসে কৃষ্ণকলি, আমারান্থাস্, দোপাটী, গ্লোব আমারান্থাস্ সনফ্লাওয়ার বা রাধাপদ্ম, লজ্জাবতী, মাটিনিয়াডায়াণ্ডা, মেরিগোল্ড, সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, ধুতুরা প্রভৃতি দেশী মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হয়। বেলা ও যুঁইফুলের ক্ষেতে এখন জল সিঞ্চনের সুব্যবস্থা চাই। উপযুক্ত পরিমাণে জল পাইলে অপর্য্যাপ্ত ফুল ফুটিবে।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি গাছে আবশ্যক মত জল সেচন ও তাহাদের ফল রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কাজ নাই। আনারস গাছগুলির গোড়ায় এই সময় মাটি দিয়া তাহাতে জল দিতে পারিলে শীঘ্র ফল ধরে ও যত্ন পাইলে ফলগুলি বড় হয়।

আদা, হলুদ, আর্টিচোক যদি ইতিপূর্ব্বে বসাইয়া দেওয়া না হইয়া থাকে তবে সেগুলি বসাইতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।